বাঘবন্দী

১ম ও ২য় পর্ব একত্রে

প্রফুল্ল রায়

প্রতিভাস

কলকাতা

প্রথম প্রতিভাস প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৯১

প্রচ্ছদ : শুভাপ্রসন্ন

প্রতিভাস-এর পক্ষে বীজেশ সাহা কর্তৃক ১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলকাতা-৭০০০০২ থেকে প্রকাশিত, সুকুমার দে কর্তৃক বাসন্তী প্রেস, ১৯/এ, ঘোষ লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত।

বাঘবন্দী

বাঘবন্দী

বাঘবন্দী

বাঘবন্দী

বাঘবন্দী

বাঘবন্দী

(প্রথম পর্ব)

সেই বিকেল থেকেই পাখিদের মন ছিল উড়ু-উড়ু। কখন ফেরার সময় হবে সে জন্য বার বার তারা চঞ্চল হচ্ছিল। আর শীতের রুক্ষ নীলাকাশ দিগন্তের ওপারে যেখানে ধনুরেখায় নেমে গেছে ঠিক সেইখানে শিথিল বোঁটায় সূর্যটা ঝুলছিল।

কিন্তু কতক্ষণ আর! কখন যেন একসময় সেই বোঁটা থেকে টুপ করে খসে পড়ল সূর্যটা। আর তখনই পাখিদের ফিরে যাবার সময় হল। আকাশ শূন্য করে ঝাঁকে ঝাঁকে উধাও হতে লাগল তারা।

সূর্য নেই। তবু পশ্চিম দিগন্ত হঠাৎ লজ্জা-পাওয়া মেয়ের মুখের মত আরক্ত হয়ে রইল আরো কিছুক্ষণ। আর ঠিক সেই সময় শংকরতলার ডাউন লোকাল ট্রেনটা হুড়মুড় করে রানীপুরে এসে থামল।

পেছন দিকের একটা কামরা থেকে বিচিত্র ঘোরের মধ্যে প্ল্যাটফর্মে নেমে এল রাজেশ। দুপুর আর বিকেলের মাঝামাঝি এক সময় রানীপুর রওনা হয়েছিল সে। তখন থেকেই বুকের ভেতরটা দুন্দুভি হয়ে উঠেছে। দুন্দুভিটা অবিরত বাজছিলই; তবে ধীরে ধীরে। প্ল্যাটফর্মে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র নিখাদে সেটা গুরু গুরু করে উঠল।

কত কাল—কত কাল পর রানীপুরে ফিরছে সে? হিসেব না কষেও অনায়াসেই বলে দিতে পারে রাজেশ—দশ বছর।

দশ বছর আগে রানীপুরের এই প্ল্যাটফর্মেই দুরন্ত অভিমানে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে আঠার বছরের রাজেশ চাঁপদানির ট্রেন ধরেছিল। মনে মনে সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিল সে; এই যেন তার শেষ যাওয়া হয়।

এত কাল ধরে না ফেরার-সঙ্কল্পটা অটুটই রেখেছিল রাজেশ। জীবন থেকে রানীপুরকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েই সে। একদিন চলে গিয়েছিল সে। কিন্তু কি আশ্চর্য বিড়ম্বনা! এতদিন পর রানীপুরে আবার তার ডাক পড়েছে।

নেভির চাকরি। সারা পৃথিবী ঘুরতে ঘুরতে একবছর দু-বছর পর পর হঠাৎ কখনো তাদের কলকাতায় ফেরা ঘটে। কলকাতায় এলেই চাঁপদানিতে গিয়ে বুড়া দিদিমা আর মামাদের সঙ্গে দেখা করে আসে রাজেশ। দেশের সঙ্গে ওইটুকু বন্ধনই যা আছে।

এবার দিনসাতেক আগে তাদের জাহাজ কলকাতায় এসেছে। সেদিনই

চাঁপদানিতে ছুটেছিল রাজেশ। সেখানে গিয়ে স্তম্ভিত হতে হয়েছিল। স্তিম্ভত কেননা, রানীপুর থেকে গত এক বছর ধরে ভবেশ নাকি চিঠি লিখে যাচ্ছেন। রাজেশ ফিরে এলেই যেন রানীপুর পাঠিয়ে দেওয়া হয়। শুধু চিঠি পাঠিয়েই নিশ্চিন্ত থাকেন নি ভবেশ; একবার নাকি চাঁপদানি ঘুরেও গেছেন।

ভবেশ অর্থাৎ রাজেশের বাবা। তাঁর রক্তের ঋণ অস্বীকার করেই না একদিন রানীপুর থেকে চলে এসেছিল রাজেশ। বুঝিবা মুক্তিই দিয়ে এসেছিল ভবেশকে।

আশ্চর্য, দীর্ঘ একযুগ পর সেই ভবেশের তাকে দিয়ে কী প্রয়োজন? যে মানুষ সারা জীবনে শ্বশুরবাড়িতে চারখানার বেশী চিঠি লেখেন নি হঠাৎ সেখানে চিঠির বান ডাকিয়ে তার খোঁজ নেবার পেছনে কী কারণ থাকতে পারে? বিয়ের পর বার তিনেকের মত চাঁপদানিতে গেছেন ভবেশ; তাও সেই দশ বছর আগে—রাজেশের মা বেঁচে থাকতে। যুগ-যুগান্ত পার করে তার জন্য এবার সেখানে হানা দিয়েছেন তিনি। মামাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা বহুকাল একটা নিদারুণ স্নায়ুযুদ্ধের পর্যায়ে রয়েছে। তা সত্ত্বেও চাঁপদানিতে গেছেন ভবেশ। রানীপুরে রাজেশকে ফিরিয়ে নিয়ে কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চান তিনি?

ভবেশের চিঠি পড়ে এবং চাঁপদানিতে তাঁর হানা দেবার কথা জেনেও রাজেশের প্রাণ ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেনি। তার বদলে মুখের রেখাগুলি কঠিন, চোয়াল শক্ত আর স্নায়ুগুলো আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিল।

রানীপুরে আসতে চায় নি রাজেশ। এক যুগ আগে সে প্রতিজ্ঞা করেছিল, সেখানে আর ফিরবে না। তারপর দশ বছর ধরে বাবার প্রতি বিদ্বেষ, ঘৃণা আর অভিমান দিয়ে তিলে তিলে সেই শপথের ভিতটাকে দৃঢ় করে নিয়েছিল।

আসতে চায় নি তবু আসতে হল। এই আসা নিয়ে বুড়ী দিদিমা আর মামাদের সঙ্গে তিনদিন যুদ্ধ হয়েছে রাজেশের। তাঁরা তাকে রানীপুরে আসতে বলেছেন। দুর্বিনীত ঘাড় বাঁকিয়ে সে শুধু না-না করে গেছে।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য মামাদের ইচ্ছাটাই জয়ী হয়েছে। বাবাকে দু-দিন আগে আসার কথা জানিয়ে চিঠি লিখেছে রাজেশ। তারপর আজ দুপুরের ট্রেন ধরেছে। আঠার বছরের যে ছেলেটি বাবার প্রতি দুরন্ত অভিমান নিয়ে চলে গিয়েছিল আটাশ বছরে সে আবার রানীপুর ফিরে এল।

শহরতলীর ডাউন লোকাল ট্রেনটা রানীপুরের বুড়ী ছুঁতে না ছুঁতেই আবার ছুট লাগিয়েছে। সেদিকে লক্ষ্য ছিল না রাজেশের। দূরমনস্কের

শত মানুষের স্রোতে ভাসতে ভাসতে স্টেশন গেটের দিকে সে এগিয়ে আসছিল।

গেটে টিকিট জমা দিয়ে বাইরে আসতেই হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে গেল। ভবেশ দাঁড়িয়ে আছেন। নিজের অজ্ঞাতসারে পা দুটো থমকে গেল রাজেশের।

স্থির নিবদ্ধ দৃষ্টিতে একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কেউ চোখ সরাতে পারছে না যেন। না ভবেশ, না রাজেশ।

কতক্ষণ যে তারা তাকিয়ে ছিল, খেয়াল নেই। একসময় ভবেশের ঠোঁটই প্রথম নড়ে উঠল, 'কেমন আছিস রাজু?'

বাবার গলার স্বর অদ্ভুত কোমল আর সস্নেহ মনে হল। সঙ্গে সঙ্গে অনভ্যস্ত কানে বেসুর বাজল রাজেশের। সেটা অকারণে নয়। দশ বছর আগে আঠার বছরের রাজেশের অভিজ্ঞতায় এই কোমলতার লেশমাত্র ছিল না।

রুদ্ধশ্বাসে রাজেশ বলল, 'ভালই আছি।' বলেই ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে ভবেশের পা ছুঁল।

ন্যায্য প্রাপ্য বুঝে নেবার মত করে নিঃশব্দে ছেলের প্রণাম নিলেন ভবেশ। রাজেশ উঠে দাঁড়াতেই বলে উঠলেন, 'কাল তোর চিঠি পেয়েছি। পেয়ে কি আনন্দ যে হচ্ছিল! কিন্তু বাবা কোন ট্রেনে যে আসবি, সেটা লিখিস নি। সকাল থেকে যতবার ট্রেন আসছে ততবারই স্টেশনে ছুটে ছুটে আসছি।' একটু থেমে বলতে লাগলেন, 'সে যাক গে, তুই এসেছিস—তাতেই আমার ছোটাছুটি সার্থক হল।' বলতে বলতে হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠলেন, 'এ কি!'

ভবেশ কি বলতে চান, বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইল রাজেশ।

ভবেশ বললেন, 'একেবারে খালি হাত-পায়ে এসেছিস, দেখছি। তোর বাক্সটাক্স, জামা-কাপড়—এ সব কোথায়?'

'চাঁপদানিতে।' আড়ষ্ট মুখে সংক্ষিপ্ত জবাব দিল রাজেশ।

'আবার চাঁপদানিতে রেখে এলি কেন?'

স্বরহীন নিস্পৃহ গলায় রাজেশ বলল, 'একবছর ধরে আমাকে এখানে আসার জন্য চিঠি লিখছেন; নিজেও একবার চাঁপদানিতে গেছেন। তাই এলাম। কালই আমি ফিরে যাব। সে জন্য আর ওসব আনলাম না।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন ভবেশ। একসময় স্খলিত স্বরে বললেন, 'ফিরে যাবি!'

'হ্যাঁ।'

'এত তাড়া কিসের ?'

'আমাদের জাহাজ আর দিন সাতেক কলকাতায় আছে। তার মধ্যেই ফিরে যেতে হবে। যাবার আগের দিনক'টা চাঁপদানিতেই থাকব ঠিক করেছি।'

কি যেন বলতে গিয়ে থমকে গেলেন ভবেশ। পরক্ষণেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'ফেরার কথা পরে হবে। এখন বাড়ি চল—' বলেই স্টেশনের বাইরে পা বাড়িয়ে দিলেন। আর নিঃশব্দে মন্ত্রচালিতের মত রাজেশ তাঁকে অনুসরণ করতে লাগল।

স্টেশনের ঠিক বাইরে থেকেই পীচের চওড়া একটা রাস্তা পশ্চিমগামিনী হয়েছে। তার একধারে সুইস মডেলের সুদর্শন একখানা গাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়িটার কাছে এসে দরজা খুলে ভবেশ ডাকলেন, 'আয় রাজু, ওঠ্—'

উঠবে কি, প্রথমটা একেবারে হকচকিয়ে গেল রাজেশ। এমন চমৎকার একখানা গাড়ি নিয়ে ভবেশ যে তাকে অভ্যর্থনা করতে আসবেন, এ ছিল তার প্রত্যাশার বাইরে।

অথচ আটাশ বছর আগে একদিন রানীপুরেই জন্ম হয়েছিল রাজেশের। পৃথিবীর আলোতে প্রথম চোখ মেলে কী দেখেছিল সে ? দেখেছিল তার চারদিক বেষ্টন করে শুধু দৈন্য আর দৈন্য। শহরের দক্ষিণ মেরুতে পূর্বপুরুষের যে একতলা বাড়িটায় সে জন্মেছিল কালের নখরে সেটা ক্ষতবিক্ষত, জীর্ণ। ছাদে ফাটল ধরা।

আসবাব বলতে সেখানে ভাঙা তক্তাপোষ, পারদ-ওঠা আয়না, কার্নিস-ভাঙা পুরনো আমলের আলমারি। যেদিকেই চোখ ফেরানো যাক নিদারুণ অভাবের শীলমোহর মারা।

বাড়িটার সামনের দিকে আগাছার জঙ্গল ; পেছন দিকে পুকুর। পুকুরটা ঝাঁঝি আর টোপা পানায় শ্বাসরুদ্ধ।

যাই হোক, রাজেশ যত বড় হচ্ছিল রানীপুরের সেই বাড়িটার দৃশ্যপট কিন্তু দ্রুত বদলে যাচ্ছিল। ছাদ নতুন করে ঢালাই হল। দেওয়ালে পলেস্তারার পোশাক উঠল ; চুনকামের পালিশ পড়ল। আগাছার জঙ্গল সাফ করে সামনের দিকে একটু বাগান হল। আর পেছনের কণ্ঠরুদ্ধ পুকুরটাকে নতুন করে কাটিয়ে স্বচ্ছ টলটলে জলে তার শরীর ভরে দেওয়া হল।

এ সবই করেছিলেন ভবেশ। এমন কি রাজেশ যেদিন রানীপুর ছেড়ে চাঁপদানিতে চলে যায় তার মাসছয়েক আগে একখানা পুরনো ফীটন পর্যন্ত কিনে ফেলেছিলেন।

কিন্তু দশ বছর আগের সেই ফীটনটার সঙ্গে সুইস মডেলের ঝকঝকে

আধুনিক গাড়িটার মিল খুঁজতে যাওয়া বিড়ম্বনা। দুটোর মাঝখানে যে ফাঁক কিছুতেই তা ভরাট করতে পারছে না রাজেশ।

গাড়ি থেকে চোখ ফিরিয়ে ভবেশের দিকে তাকাল রাজেশ। বাবার চোখে-মুখে এবং সর্বশরীরে সচ্ছল সৌভাগ্যের ছাপ অনায়াসেই আবিষ্কার করা গেল। পরনে গরদের পাঞ্জাবি আর কুঁচনো দিশি ধুতি। পায়ে ক্রোম লেদারের চকচকে পাম্প শু। গায়ে নক্সা-পাড় কাশ্মীরী শাল। কব্জিতে-বাঁধা সোনার ব্যাণ্ডে দামী ঘড়ি। বোতাম আর অনামিকার আংটি থেকে পাথরগুলো যে-রকম দীপ্তি ছড়াচ্ছে তাতে নিঃসংশয়ে সেগুলোকে হীরে বলে চেনা যায়। তা ছাড়া গত দশ বছরে রীতিমত মেদ সঞ্চয় করেছেন ভবেশ।

এমনিতেই ভবেশের চেহারাটা রাজসিক। সেটা জন্মগত। কথাটা বোধ হয় ঠিক হল না। বলা উচিত বংশগত। বংশটাই তাদের রূপের জন্য বিখ্যাত।

চিরদিনই ভবেশ সুপুরুষ। তবে দশ বছর আগে তাঁর চেহারায় আজকের এই পরিতৃপ্তি এই মসৃণতার লেশমাত্র ছিল না।

ভবেশ আবার বলে উঠলেন, 'দাঁড়িয়ে রইলি যে, উঠে পড়।' একরকম তাড়া দিয়েই রাজেশকে গাড়িতে তুললেন তিনি। নিজে উঠে পাশে বসলেন।

দুই

কলকাতা থেকে শহরতলীর ট্রেন ধরে পঁচিশ মাইল উত্তরে ছুটলে রানীপুর স্টেশন। স্টেশনের ঠিক বাইরে থেকে যে রাস্তাটা পশ্চিম-গামিনী হয়েছে সেটা ধরে মাইল দুয়েক গেলে রানীপুর শহর। অন্তত দশ বছর আগে তাই ছিল।

সুইস মডেলের ঝকঝকে গাড়িটা শব্দহীন মসৃণ গতিতে উড়ে যাচ্ছিল। বাবার পাশাপাশি বসে ভয়ানক আড়ষ্ট বোধ করছিল রাজেশ। ঠিক আড়ষ্টতা হয় তো না। আশৈশব ভবেশের জন্য তার প্রাণে দু'টো মাত্র সক্রিয় অনুভূতি রয়েছে। তাদের একটার নাম বিদ্বেষ, দ্বিতীয়টি ঘৃণা। সেই অনুভূতি দু'টোই এই মুহূর্তে তার চেতনা আর অবচেতনার সকল দিককে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। বাবার দিকে আর তাকাচ্ছে না রাজেশ। জানালার বাইরে তার চোখ দু'টো ফেরানো।

সময়টা মাঘের শেষাশেষি। কিন্তু এরই মধ্যে ফাল্গুন-চৈত্রের মাতলামি

টের পাওয়া যাচ্ছে। শীতশেষের বাতাস থেকে থেকেই দুর্বিনীত হয়ে ওঠে; ধুলোর ঘূর্ণি উড়িয়ে পাক খেতে খেতে দিগ্বিদিকে ছুটে যায়।

ট্রেন থেকে নামতে না নামতেই লম্বা পায়ে শেষ মাঘের সন্ধ্যা এসে গিয়েছিল। এখন বেশ সমারোহ করে অন্ধকার নামতে শুরু করেছে।

দশ বছর আগে পশ্চিমবাহিনী এই রাস্তাটার দু-পাশে কোন দৃশ্য ছিল? শুধু আদিগন্ত ধানের ক্ষেত, হোগলাবন আর নয়ানজুলি। আর ছিল ঝিঁঝি এবং ব্যাঙেদের কনসার্ট। হঠাৎ সেখানে ময়দানবের ছোঁয়া লেগে গেছে যেন। ফল হয়েছে এই, সারি সারি অসংখ্য কারখানা আর বস্তি মাথা তুলেছে। কিছু কিছু নতুন পাকা বাড়িও চোখে পড়ে।

কল-কারখানা, বাড়ি-বস্তি – সব একাকার হয়ে নিরবচ্ছিন্ন একটা স্রোতের মত গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। মাঝে মাঝে দৃশ্যপট বদলের জন্য ইতস্তত দু-এক ছটাক ধানজমি, কিছু ফাঁকা মাঠ, মজা খাল।

হঠাৎ ভবেশ ডেকে উঠলেন, 'রাজু--'

বাইরে থেকে মুখ ফিরিয়ে নিস্পৃহ চোখে বাবার দিকে তাকাল রাজেশ।

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বললেন না ভবেশ। খুক খুক করে একটু কাশলেন। বোঝা গেল কাশিটা ভূমিকা-মাত্র। পরক্ষণেই কাঁপা ভারী গলায় শুরু করলেন, 'ছাখ বাবা, সারা জীবন তোর ওপর অনেক অবিচার করেছি। জানি তোর কাছে ক্ষমা চাইবার মুখ আমার নেই। তবু বড় আশা করে আছি। আমার মুখ কি তুই রাখবি রাজু?' বলতে বলতে যেন ঘোরের মধ্যে ছেলের হাত ধরলেন।

ব্যাপারটা যেমন নাটকীয় তেমনি আকস্মিক। ভবেশের স্বরের উত্থান-পতন, হাত-ধরা—সব মিলিয়ে রাজেশের অনুভূতিতে বিচিত্র প্রতিক্রিয়া ঘটে গেল। বিহ্বলের মত বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সে। ভাবতে লাগল, ভবেশ কি অনুতপ্ত? সেই ভবেশ, চিরদিন যিনি উদ্ধত আর দুর্বিনীত, বক্র এবং কুটিল!

ছেলের হাত ধরেই ছিলেন ভবেশ। আবার বলে উঠলেন, 'তুই হয়তো ভাবতে পারিস, এতকাল পর তোকে রানীপুর নিয়ে আসার জন্যে কেন আমি পাগল হয়ে উঠেছি?'

রাজেশ নিশ্চুপ। তার বিহ্বলতা কাটে নি।

ভবেশ বলতে লাগলেন, 'আমি প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই রাজু। একটা সুযোগ শুধু তুই আমায় দে।' রুদ্ধ ভারী আবেগে তাঁর কণ্ঠ তরঙ্গিত হতে লাগল।

কিছু বলতে চেষ্টা করল রাজেশ। পারল না।

হাতটা ধরাই ছিল। আরো একটু এগিয়ে ছেলের পাশে নিবিড় হয়ে বসলেন ভবেশ। কাতর অনুনয়ের সুরে বললেন, 'আমায় একটা কথা দিতে হবে তোর।'

এতক্ষণে গলায় স্বর ফুটল রাজেশের, 'কী কথা?'

'আগে বল রাখবি।'

রাজেশ উত্তর দিল না।

ছেলের নীরবতার কারণ অবোধ্য নয়। ভবেশ বললেন, 'বুঝেছি, সব না শুনে তুই কথা দিবি না। বেশ, বাড়ি চল। সেখানে বসে ধীরে সুস্থে সমস্ত শুনবি।'

এরপর অনেকক্ষণ চুপচাপ। আর তারই মধ্যে কখন যেন এক সময় সুইস মডেলের নতুন গাড়িটা রানীপুরের চৌহদ্দির মধ্যে এসে পড়ল।

দশ বছর আগে রানীপুরকে কোন্ রূপে দেখে গেছে রাজেশ? কলকাতার উত্তর দিগন্তে চার বর্গমাইলের এই সংক্ষিপ্ত ছোট্ট শহরটা সেদিন যেন আদ্যিকালের কোন নগরী। তার ভাঙাচোরা ধ্বসে-পড়া ইমারতে তার সাপের মত পাক-খাওয়া সরু গলিতে এ-কালের ছাপ তখনও পড়ে নি।

এক যুগ আগে এখানকার ক'টা লোকই বা চাকরি করত? বেশির ভাগই পূর্বপুরুষের সঞ্চয় ভাঙিয়ে, খেয়ে-ঘুমিয়ে, পরচর্চা করে আর তাস-পাশা খেলে জীবন কাটিয়ে দিত।

এ শহরে কেউ কোনদিন হৈ-চৈ করে বাঁচে নি। জীবনকে নিয়ে উৎসবে মাতার মত প্রাণশক্তি রানীপুরের ছিল না। তার চারপাশ ঘিরে কতকগুলো অদৃশ্য পাঁচিল টানা ছিল যেন। পৃথিবীর ফেনিয়ে ওঠা কলরব সেই দেওয়ালে আঘাত করে ফিরে যেত।

মনে পড়ে দশ বছর আগে এই শহরে ইলেকট্রিসিটির দাক্ষিণ্য ছিল না। মিউনিসিপ্যালিটির কল্যাণে গলিতে গলিতে টিমটিমে যে তেলের বাতিগুলো জ্বলত তাদের আয়ু আর কতক্ষণ? সন্ধ্যেয় চোখ মেলে রাতের একটা প্রহর পার হতে না হতেই অন্ধ হয়ে যেত। তারপর একটানা অন্ধকারের রাজ্য। রাতের বাকি তিন প্রহর রানীপুর তার বাসিন্দাদের অথৈ ঘুমের আরকে ডুবিয়ে রাখত।

আশ্চর্য! সেই রানীপুরের গায়ে কোন এক অদৃশ্য জাদুকর যেন তার মন্ত্র ছুঁড়ে দিয়েছে। রানীপুরের যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে পশ্চিমগামিনী সেই

রাস্তাটার দু-ধারেই তার আভাস পেয়েছিল রাজেশ। কিন্তু তাই বলে এতখানি প্রত্যাশা করতে পারেনি। সরু সরু পাকানো গলিগুলো এই দশ বছরে দরাজ হয়ে গেছে। ধ্বসে-পড়া প্রাচীন ইমারতগুলো উধাও। তাদের জায়গায় আধুনিক স্থাপত্যরীতির নতুন নতুন বাড়ি উঠেছে। তেলের প্রায়ান্ধ বাতিগুলোর জায়গায় টিউব লাইটের বান ডেকেছে। দশ বছর আগে এই শহরে সাতখানার বেশী মোটর ছিল না। লাহাবাবুদের একখানা, সাধুখাঁদের দু-খানা, উকিল সারদাবাবুর একখানা, সখিলাল মাড়োয়ারীর দু-খানা আর সরকারদের একখানা। অবশ্য ফীটন আর সাইকেল ছিল অনেক। আর আজ? চওড়া চওড়া রাস্তাগুলো বেয়ে মোটরের স্রোত নেমেছে যেন। আর বেড়েছে মানুষ। দশ বছরে এই শহর কানায় কানায় ভরে গেছে।

বদলে-যাওয়া সেদিনের নিস্তরঙ্গ রানীপুর আর বদলে-যাওয়া ভবেশ—দু-জনকে দেখতে দেখতে বুকের ভেতর সেই দুন্দুভিটা দ্রুততালে গুরু গুরু করে উঠছে। রাজেশের মনে হল, একটা জটিল গভীর আবর্তের মধ্যে এসে পড়েছে।

গাড়িটা একসময় শহরের মাঝখানে এসে পড়ল। এ-জায়গাটা বাজার পাড়া। দশ বছর আগে ইতস্তত ক'টি দোকান পসার ছাড়া কিছুই আবিষ্কার করা যেত না যেখানে আজ সেখানে জমজমাট মেলা বসে গেছে। হেয়ার কাটিং সেলুন, হরেকরকম বা অনেকগুলো স্টোর, ঝকঝকে রেস্তোরাঁ, ডে এ্যাণ্ড নাইট সারভিসের ডিসপেন্সারি, তারপর কতকগুলো লণ্ড্রী। দুটো সিনেমা হলও এদের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। একটা লাউড-স্পীকারের দোকান থেকে অবিরাম হিন্দি ফিল্মের রেকর্ড বাজছে। আলোয়-ভিড়ে-বর্ণে-গন্ধে আর কলরবে এলাকাটা উচ্চকিত।

নির্নিমেষে বাইরে তাকিয়ে ছিল রাজেশ। হঠাৎ তার খেয়াল হল গাড়িটা বাজার পাড়ার দক্ষিণে না ঘুরে উত্তরের রাস্তা ধরেছে। এই শহরের দক্ষিণ প্রান্তেই তো তাদের বাড়ি। সেদিকে না গিয়ে উত্তরে কোথায় চলেছে? ক্ষিপ্র গতিতে ঘাড় ঘুরিয়ে ভবেশের দিকে তাকাল সে। বলল, 'একি, আমরা বাড়ি যাচ্ছি না!'

'হ্যাঁ, বাড়িতেই তো যাচ্ছি।' ভবেশ বললেন।

'কিন্তু আমাদের বাড়িটা তো দক্ষিণ দিকে।' চোখেমুখে এবং গলার স্বরে বিস্ময় ফুটে বেরুল রাজেশের।

'সে বাড়িতে এখন আর থাকি না। ওটা ভাড়া দিয়েছি। আর উত্তর দিকে নতুন একটা বাড়ি কিনেছি। সেখানেই থাকি।'

'নতুন বাড়ি!' বিমূঢ়ের মত উচ্চারণ করল রাজেশ।

'হ্যাঁ, গেলেই দেখতে পাবি।'

তিন

প্রতি মুহূর্তে আজ কি চকিত, চমকিত আর স্তম্ভিত হবার দিন? রানীপুরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে রাজেশ যে বিস্ময়ের মধ্যে এসে পড়েছিল অবশেষে সেটা শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছল।

একসময় সুইস মডেলের ঝকঝকে নতুন গাড়িটা রানীপুরের উত্তর সেরুতে যে বাড়িটার ভেতর গিয়ে ঢুকল তার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না রাজেশ।

জীবনের প্রথম আঠারটা বছর রানীপুরে কাটিয়ে গেছে রাজেশ। সুতরাং ভিক্টোরীয় যুগের ক্যাসেলের মত সাহাবাবুদের এই সুবিশাল বাড়িটা তার অচেনা থাকার কথা নয়।

চেনা পর্যন্তই। নইলে এক যুগ আগে তার আঠার বছরের জীবনে বাড়িটার ভেতরে ঢোকার সুযোগ কোনদিন হয় নি। সাহসও না। ভয়ে ভয়ে আর অবাক বিস্ময়ে ছেলেবেলায় দূর থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে মাত্র। রূপকথার রাক্ষসপুরীর মত বাড়িটার অভ্যন্তরে কোথায় কী আছে, রাজেশ জানত না। দরজা-জানালা প্রায় সব সময়ই বন্ধ। কদাচিৎ দু-একটি মানুষ চোখে পড়ত কি পড়ত না।

সেদিন দূর থেকেই দেখেছে। আজ ভেতরে ঢুকে স্তম্ভিত হয়ে গেল রাজেশ। বাড়িটাকে ঘিরে চার একরের মত সুবিস্তৃত কম্পাউণ্ড। আর কম্পাউণ্ডটাকে বেষ্টন করে উঁচু প্রাচীর।

বাড়িটার সামনের দিকে দীঘির মত বাঁধানো পুকুর। টলটলে স্বচ্ছ জলে তার শরীর ভরে আছে। পুকুরটার একপাশে মরসুমী ফুলের গাছ, টেনিস কোর্ট, বাগান, সুরকির সুদৃশ্য পথ। পথের দু-দিকে সারিবদ্ধ পাম গাছ। বাগানে মাধবীলতার ছোট ছোট কুঞ্জ।

দশ বছর আগে এই বাড়ি-পুকুর-বাগান, প্রায় সবই ছিল। তবু আজকের অনেক কিছুই যেন সেদিন দেখেনি রাজেশ। এই টেনিস কোর্ট, উচ্ছ্বসিত ফোয়ারা আর মাধবীলতার কুঞ্জগুলো—সমস্তই নতুন। ফটকে নেপালী দারোয়ান সতর্ক এবং চটপটে। সব সময় তার স্নায়ুগুলো কুকুরের মত সজাগ।

কতক্ষণ যে বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে ছিল রাজেশ, খেয়াল নেই। এদিকে গাড়িটা বাগান-পুকুর পার হয়ে পোর্টিকোর তলায় গিয়ে থেমেছে।

ভবেশ ডাকলেন, 'রাজু—'

ঘোরের মধ্য থেকে রাজেশ সাড়া দিল, 'কি বলছেন ?'

'আমরা এসে গেছি ; এবার নামতে হবে।'

'এটা লাহাবাবুদের বাড়ি না ?'

'হ্যাঁ, লাহাদেরই তো ছিল। পাঁচ বছর ধরে আর নেই ; আমি কিনে নিয়েছি।'

'আপনি কিনে নিয়েছেন !' ঠিক স্বাভাবিক নয়, কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থের মত কথাগুলো বলে উঠল রাজেশ।

'হ্যাঁ, তাতে অবাক হবার কি আছে।' অনায়াস স্বরে ভবেশ বলে গেলেন, 'চিরদিন মানুষের অবস্থা একরকম যায় নাকি ? কথায় বলে পুরুষস্য ভাগ্যং—' বহুকালের পুরনো প্রবাদটা গড় গড় করে আবৃত্তি করে গেলেন।

কিন্তু রাজেশ কিছুই শুনতে পেল না। তার সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন করে ভিক্টোরীয় যুগের ক্যাসেলের মত এই বাড়িটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। পাঁচ বছর আগে ভবেশ নাকি এটা কিনে নিয়েছেন। যে একযুগ সে রানীপুরে অনুপস্থিত তার মধ্যে ভবেশ কি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হয়ে বসেছেন ?

ছেলের মনোভাব কিছুটা যেন অনুমান করতে পারলেন ভবেশ। মৃদু হেসে বললেন, 'দশ বছর তুই এখানে ছিলি না। তার মধ্যে আমাদের দিন কিছু ফিরেছে। এসেছিস যখন, সব জানতে পারবি। এখন নাম।' বলেই গাড়ির দরজা খুলে তিনি নেমে পড়লেন।

আর স্বপ্নচর মানুষের মত বাবার পিছু পিছু নেমে এল রাজেশ।

পোর্টিকো থেকে ভেতরে ঢুকলেই জয়পুরী কার্পেটে ঢাকা সুবিস্তৃত ড্রইং রুম। তার একধারে আধুনিক কেতায় সাজানো সোফা-সেটি-টিপয়। বিপরীত প্রান্তে উনিশ শতকের কিছুটা আবহাওয়া এখনও ধরে রাখা হয়েছে। সেখানে ঢালাও ফরাস। তাকিয়া, গির্দা, বালিশ আর গড়গড়ার নলে উদার আমন্ত্রণ। দেওয়াল-সীলিং সব ডিস্টেম্পার করা। মোগল আর কাংড়া চিত্রকলার কিছু কিছু দুষ্প্রাপ্য নমুনা দেওয়ালে টাঙানো। একপাশে একটা প্রকাণ্ড অ্যাকুয়েরিয়মে লাল নীল মাছেদের খেলা।

সব কিছু খুঁটিয়ে দেখার অবকাশ পাওয়া গেল না। বাইরের এই ঘরখানায় বাড়ির তাবত চাকর-বাকর-বয়-বাবুর্চি, একুনে প্রায় কুড়িজন, অপেক্ষা করছিল। রাজেশরা ঢোকামাত্র সারিবদ্ধভাবে তারা দাঁড়িয়ে পড়ল।

রাজেশকে দেখিয়ে বয়-বাবুর্চিদের উদ্দেশে ভবেশ বললেন, 'এই তোমাদের ছোটবাবু, এখন থেকে এখানে থাকবেন।'

ব্যাপারটা মনে হল, পূর্ব-পরিকল্পিত। রাজেশ আসবে বলেই সম্ভবত বয়দের বাইরের ঘরে প্রতীক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। যাই হোক ভবেশ তার পরিচয় দেওয়া মাত্র সমছন্দে কোমর ঝুঁকিয়ে তারা নমস্কার করল।

বয়বাহিনীর সেই বিচিত্র গার্ড অব্ অনারের দিকে লক্ষ্য ছিল না রাজেশের। ভবেশের শেষ কথাগুলো তাকে চকিত করে তুলেছে। শুধুমাত্র আজকের রাত্রিটাই এখানে কাটিয়ে যাবে, এই সংকল্প করেই চাঁপদানি থেকে বেরিয়েছিল সে। কিন্তু ভৃত্যদের কাছে ভবেশ যা ঘোষণা করলেন তা তার সংকল্পের বিপরীত। তাদের জানানো হল রাজেশ এখানে চিরদিনের জন্য থাকতে এসেছে।

রাজেশ একবার ভাবল, প্রতিবাদ করে। তার আগেই ভবেশ ডাকলেন, 'আয় রাজু, ওপরে যাই।' বলেই সামনের দিকে পা বাড়ালেন।

ড্রইং রুমের ঠিক মাঝামাঝি থেকে দোতলার সিঁড়ি উঠে গেছে।

সিঁড়ি দিয়ে বাবাকে অনুসরণ করতে করতে বিদ্যুৎ চমকের মত সেই মহিলাটির কথা মনে পড়ে গেল রাজেশের। সেই মহিলাটি, যাঁকে জীবনে কোনদিনই দেখেনি সে, অথচ তাঁরই জন্য চোখের জলে বুক ভাসিয়ে একদিন রানীপুর ছেড়ে চলে গিয়েছিল রাজেশ।

আশ্চর্য। রানীপুরে পা দেবার পর থেকে মহিলাটির কথা একবারও খেয়াল হয় নি। অথচ তাঁর কথাই সব চাইতে আগে মনে পড়া উচিত ছিল রাজেশের।

ড্রইং রুমে শুধুমাত্র ভৃত্যবাহিনীই ছিল। সেখানে মহিলাটিকে আবিষ্কার করা যায় নি। ভবেশের সঙ্গে স্টেশনে তাকে আনতেও যাননি তিনি। তবে কি তিনি দোতলায় আছেন ?

ওপরে উঠতে উঠতে বুকের ভেতরে সেই দামামাটা আবার বেজে উঠল। শ্বাস আসতে লাগল রুদ্ধ হয়ে আর পায়ের তলায় সিঁড়িগুলো ঢেউয়ের মত দুলতে লাগল।

ভবেশ আগেই উঠে পড়েছিলেন। তাঁর পিছু পিছু লাউঞ্জ আর দীর্ঘ করিডর পার হয়ে এগুতে লাগল রাজেশ। কোন দিকে তার লক্ষ্য ছিল না। নিশি-পাওয়া মানুষের মত বাবাকে অনুসরণ করে যাচ্ছে সে। তার চেতনা এবং অবচেতনার সকল দিক থেকে ক্রমাগত কারা যেন ফিস ফিস করতে লাগল, 'এইবার—এইবার সেই মহিলাটির সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।'

কিন্তু না, চলতে চলতে মহিলাটিকে কোথাও দেখা গেল না। অবশেষে দোতলার দক্ষিণ প্রান্তের শেষ ঘরখানায় এনে তাকে তুললেন ভবেশ। রাজেশের মনে হল একটা অন্তহীন মরুভূমি পাড়ি দিয়ে এল সে। এই শীতশেষের রাত্রিতেও রীতিমত ঘাম ছুটেছে তার।

যেদিকেই চোখ ফেরানো যাক, ঘরখানা সুরুচিতে শোভন। খাট, নেটের মশারি, ফোন, আলমারি, সোফা, ডিভান, বইয়ের সুদৃশ্য একটা র‍্যাক, এক-কোণে চমৎকার টেবিল, রবার ফোমের কেদারা, দেওয়ালে ত্রিভুজ একখানা ঘড়ি। শিয়রের কাছে রেডিওগ্রাম আর ছোট এ্যাকুয়েরিয়ম। প্যাগোডার আকারে আলোর শেড্। আরাম আর প্রয়োজনের কোন দিকই অপূর্ণ নেই।

ভবেশ বললেন, 'বস রাজু।'

সামনের একটা সোফায় নিজেকে সঁপে দিল রাজেশ। ভবেশও তার মুখোমুখি বসলেন। বললেন, 'এটা তোর ঘর। নিজের হাতে আমি সাজিয়েছি। পছন্দ হয়েছে তো?'

রাজেশ উত্তর দিল না। এই ঘর, বিলাস এবং আরামের এত অজস্র উপকরণ—কিছুই তার মধ্যে ছায়াপাত করতে পারছে না। রাজেশ শুধু সেই মহিলাটির কথাই ভাবছে। দশ বছর আগে তাঁকে দেখার কোন প্রশ্নই ছিল না। দেখার ভয়েই তো চুপিসাড়ে পালিয়ে গিয়েছিল রাজেশ। এতকাল পর রানীপুরে ফিরেও তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নি। তবু তাঁর অদৃশ্য অস্তিত্ব যেন অনুভব করতে পারা যাচ্ছে।

রাজেশের মনের ভেতর যে আলোড়ন চলছিল তার কিছু কিছু ছাপ মুখের ওপরও ভেসে উঠেছে। কপালে জটিল গভীর অসংখ্য রেখা দেখা দিয়েছে, ভ্রু-দুটো কোঁচকানো, চোখের তারায় দূরমনস্কতা। ছেলের দিকে তাকিয়ে ভবেশ কি বুঝলেন তিনিই জানেন। বললেন, 'কী ভাবছিস?'

সেই মহিলাটির কথা আরেকটু হলে বলে ফেলত রাজেশ। কি ভেবে থমকে গেল। আড়ষ্ট গলায় শুধু বলল, 'কিছু না।'

দ্বিতীয় আর কোন প্রশ্ন করলেন না ভবেশ। বললেন, 'অনেকক্ষণ ট্রেনে কাটিয়েছিস। সেই জন্যই বুঝি চোখমুখ শুকনো দেখাচ্ছে।'

রাজেশ এবার নিশ্চুপ।

ভবেশ বলে উঠলেন, 'এক কাজ কর; হাত-মুখ ধুয়ে ফেল। আরাম লাগবে।'

নিস্পৃহ সুরে রাজেশ বলল, 'আমি স্নান করব।'

একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন ভবেশ। তারপর ঘরের পশ্চিম দেওয়ালে

বার্নিশ করা সুদৃশ্য একটা দরজা দেখিয়ে বললেন, 'বাথরুমটা ওখানে। স্নান যখন করবি তখন বয়কে গরম জল দিতে বলি। এই শীতের রাতে ঠাণ্ডা জল গায়ে ঢালা ঠিক হবে না। জ্বর-টর এসে যেতে পারে!' ব্যস্তভাবে উঠে পড়লেন ভবেশ। পরক্ষণেই কি যেন মনে পড়তে আবার বললেন, 'ভাল কথা, জামা-কাপড় তো কিছুই আনিস নি। স্নানের পর কী পরবি?'

রাজেশ উত্তর দিল না। অবাক বিস্ময়ে বাবার দিকে তাকিয়ে রইল শুধু। তার স্বাচ্ছন্দ্য এবং স্বাস্থ্যের প্রতি আজ ভবেশের কি সতর্ক দৃষ্টি! অথচ দশ বছর আগে?

ছেলের উত্তরের অপেক্ষা করলেন না ভবেশ। সমস্যার সহজ একটা সমাধান করে ফেলেছেন এমনভাবে বললেন, 'এক কাজ করি, আজ রাতের মত আমার একটা পাঞ্জাবি আর পায়জামা পাঠিয়ে দিচ্ছি। একটু ঢোলা ঢোলা হবে; তা হোক। একটা তো মোটে রাত; কাল তোর জামা-কাপড়ের যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে'খন। বলতে বলতে দরজা পার হয়ে বাইরের করিডরে পা বাড়ালেন।

আর সেই মুহূর্তে নিজের অজ্ঞাতসারেই যেন রাজেশ ডাকল, 'শুনুন—' ডেকেই চমকে উঠল। রানীপুরে পা দেবার পর থেকে আজ একবারও ভবেশকে 'বাবা' বলেনি সে। শুধু কি আজই, দশ বছর আগে কবে কোনদিন 'বাবা' বলে ডাকত, স্মৃতির নেপথ্যে হাজার হাতড়ালেও আজ আর তা খুঁজে পাবে না রাজেশ।

রাজেশের স্বরে এমন কিছু ছিল, তীক্ষ্ণতা অথবা কর্কশ কাঠিন্য, যা ঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না, তবে হৃৎপিণ্ডের গভীরে সেটা ধারাল ফলার মত বিঁধে যায়। চকিত হয়ে ফিরে দাঁড়ালেন ভবেশ। তারপর ছেলের চোখে চোখ রেখে সম্মোহিত জীবের মত পায়ে পায়ে ঘরে ফিরে এলেন। রাজেশের কাছাকাছি এসে স্খলিত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী বলছিস?'

একটু ইতস্তত করল রাজেশ। মুহূর্তে দেহমনের সমস্ত শক্তি সংহত করে নিয়ে সে বলল, 'আপনার কথাগুলো আগে সেরে নিন।'

বিমূঢ় গলায় ভবেশ বললেন, 'আমার কথা।'

'হ্যাঁ। যে জন্যে দশ বছর পর আমাকে রানীপুরে ফিরিয়ে এনেছেন তা আমি জানতে চাই।'

ভবেশ বললেন, 'কাল শুনিস।'

'কাল আমার সময় হবে না।' আগের সুরেই রাজেশ বলে গেল।

'সময় হবে না। কেন?'

'স্টেশনে তো আপনাকে বলেছি, আজকের রাতটুকু এখানে থাকব। সকালে উঠেই চাঁপদানিতে ফিরে যাব।'

নির্নিমেষ স্থির দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন ভবেশ। অনেকক্ষণ পর কাঁপা জড়ানো গলায় বললেন, 'দশ বছর পরে আমার কাছে এলি সে কি একটা রাত্তির থাকবার জন্যে? আমি যে বড় আশা করে ছিলাম রাজু—' শেষদিকে তাঁর স্বরটা অভিমান এবং ক্ষোভে রুদ্ধ হয়ে এল।

রাজেশ কিন্তু অবিচলিত। অটুট স্বরে বলল, 'কালই আমাকে যেতে হবে।'

একটুক্ষণ কি যেন ভেবে নিয়ে ভবেশ বললেন, 'যে জন্যে তোকে রানীপুরে এনেছি সেটা হট্ করে বলা যাবে না। আর বললেও বুঝতে পারবি না। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অনেক কিছু তোকে দেখাতে হবে। অন্তত তিন চারটে দিন সময় তো লাগবেই।'

'চারদিনই আমি থাকব। তারপর কিন্তু চলে যাব।' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল রাজেশ।

ভবেশ বললেন, 'বেশ; সব দেখেশুনে চারদিন পর তোর যদি থাকতে ইচ্ছে না হয়, চলে যাস। আমি আটকাব না।'

চার

একটা বয় এসে বাথরুমে গরম জল দিয়ে গেল। আরেকজন নিয়ে এল ধবধবে পায়জামা, পাঞ্জাবি আর একখানা শাল। ওগুলো ভবেশের।

বাথরুমে ঢুকে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল রাজেশ। স্নানের এই ঘরখানার মেঝে নক্সা-করা ইটালিয়ান টাইলে আবৃত। একধারে শুভ্র বাথটাব, মোঘল হারেমের অনুকরণে ধারা স্নানের ব্যবস্থাও আছে আরেক প্রান্তে। উত্তরের দেওয়াল জুড়ে বিশাল আয়না। দক্ষিণের দেওয়াল ঘেঁষে মার্বেল উড্ডের সারি সারি র‍্যাক। তার ওপর অনেকগুলো সাবান। আর আছে শ্যাম্পু, হেয়ার টনিক ক্রীম, চিরুনি। সব নতুন। সারি সারি সাজানো নানারঙের ক'টা তোয়ালেও চোখে পড়ল। অনুমান করা যায়, এই অভাবনীয় আয়োজন রাজেশের জন্যই।

বিস্ময় কিছুটা থিতোলে, দ্রুত স্নান সেরে নিল রাজেশ। তারপর ভবেশের পাজামা-পাঞ্জাবি পরে, তার ওপর শালখানা জড়িয়ে ঘরে ফিরে দেখল, তৃতীয়

আরেকটি বয় দাঁড়িয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই সে বলল, 'বড় সাহেব আপনাকে ডাকছেন।'

বড় সাহেব যে ভবেশ, সেটুকু অনুমান করতে অসুবিধা হল না। রাজেশ বলল, 'তিনি কোথায় ?'

'ডাইনিং রুমে।'

ডাইনিং রুম থেকে যখন তলব এসেছে তখন নিশ্চয়ই খাবার ব্যাপার। চকিতের জন্য সেই মহিলাটির কথা আবার মনে পড়ে গেল রাজেশের। সঙ্গে সঙ্গে ফিক ব্যথার মত আড়ষ্ট একটা যন্ত্রণা বুকের অতলে নড়াচড়া শুরু করল।

এতক্ষণ মহিলাটির সঙ্গে দেখা হয় নি। খেতে গিয়ে যদি দেখা হয়ে যায়! এক মুহূর্ত ইতস্তত করল রাজেশ। তারপর চাপা রুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'খাবার ঘরে কে-কে আছেন ?'

'বড় সাহেব একা।' বয়টা বলল।

একা জেনেও নিঃসংশয় হতে পারল না রাজেশ। আবার প্রশ্ন করল, 'বড়সাহেব আমাকেই শুধু ডাকছেন ?'

'আজ্ঞে—'

'ঠিক বলছ ?'

এতক্ষণে রাজেশের বুকের ভেতরকার আবদ্ধ বাতাস সহজ নিঃশ্বাসে বেরিয়ে এল। আস্তে আস্তে সে বলল, 'চল—'

দোতলার দক্ষিণ প্রান্তের শেষ ঘরখানা রাজেশের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। বিপরীত প্রান্তে অর্থাৎ উত্তরের শেষ ঘরখানা ডাইনিং রুম।

ভিক্টোরীয় যুগের ক্যাসেলের মত এই বিশাল বাড়িটার সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে ডাইনিং রুমটা চমৎকার সাজানো। ডিম্বাকৃতি বিরাট একটা টেবিলকে ঘিরে সারি সারি ফ্যাশনেবল চেয়ার। টেবিলের ঠিক মাঝখানে প্যাগোডার আকারে আপেল, মুসম্বি আর টোমাটোর স্তূপ।

একটা চেয়ারে ভবেশ উন্মুখ হয়ে বসে ছিলেন। বয়ের সঙ্গে রাজেশ ভেতরে ঢোকামাত্র নিজের পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে বললেন, 'এখানে আয়—'

নিঃশব্দে বসে পড়ল রাজেশ। চীনা পুতুলের মত দুটো বয় দাঁড়িয়েছিল। ভবেশ তাদের দিকে ফিরে বললেন, 'খাবার দাও --'

পুবদিকের দেওয়ালে একটা পুশ-ডোর। নির্দেশ পাওয়ামাত্র বয়দুটো দ্বার ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেল। সম্ভবত ওদিকটায় কিচেন। খানিকটা পরেই ফুলপাতা-আঁকা সুদর্শন জাপানী প্লেটে সুপ নিয়ে ফিরে এল তারা। ভবেশ এবং

রাজেশের সামনে পাত্র দুটো সাজিয়ে দিয়েই আবার কিচেনে ফিরে গেল। কতবার যে বয়দুটো পুশ ডোরের ওপারে ছুটল আর কত প্লেট এনে যে টেবিলের ওপর রাখতে লাগল তার হিসেব রাখা দুরূহ।

রীতিমত একটা উৎসবেরই ব্যাপার। সুপ, পোলাও, রোস্ট, ফ্রাই, সসেজ, পুডিং—পৃথিবীর যাবতীয় সুখাদ্যই বুঝি বয়গুলো সামনে সাজিয়ে দিয়েছে।

দূরমনস্কের মত খেয়ে যাচ্ছিল রাজেশ। লোভনীয় সব ভোজ্য—তবু ইন্দ্রিয়গুলো সে-সবের আস্বাদ ঠিকমত বুঝতে পারছিল না। সেই মহিলাটির কথাই সে শুধু ভাবছিল। তিনি কোথায়? কোথায়? কোথায়?

খেতে খেতে হঠাৎ ভবেশ ডেকে উঠলেন, 'রাজু—'

ভাবনাটা এলোমেলো হয়ে গেল রাজেশের। চমকে বাবার দিকে তাকাল সে।

ভবেশ বললেন, 'আমাদের ভাগ্য যে ফিরেছে, নিশ্চয়ই তা বুঝতে পারছিস। কিন্তু এমন দিনে তোর মা নেই। কোনদিন তাকে একটু সুখ দিতে পারিনি। আজ যদি সে বেঁচে থাকত—' স্বরটা বুঝি বা অনুশোচনায় বুজে এল তাঁর।

রানীপুরে আসার পর এই প্রথম ভবেশের মুখে মায়ের নাম শুনল রাজেশ। শোনামাত্র বুকের ভেতর বাতাস আটকে আসতে লাগল তার।

একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে ভবেশ আবার বললেন, 'তোর মায়ের—'

কথাটা শেষ হল না। তার আগেই শরবিদ্ধ পশুর মত চিৎকার করে উঠল রাজেশ, 'মায়ের কথা থাক—'

ভবেশ চকিত হয়ে উঠলেন। ছেলের মুখের রেখায় কী পড়লেন তিনিই জানেন; ধীরে ধীরে ঘাড়টা ভেঙে যেন ঝুলে পড়ল তাঁর।

খাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নিস্পন্দ মমির মত দু-জনে কতক্ষণ যে বসে ছিল, খেয়াল নেই। এক সময় খানিকটা আত্মস্থ হলেন ভবেশ। ধীরে ধীরে মাথাটা নেড়ে বললেন, 'ইউ আর রাইট রাজু। তোর মায়ের নাম উচ্চারণ করার অধিকার আমার নেই। রীয়ালি আই ওয়াজ ব্রুট দোজ ডে'জ। নিদারুণ এক পশু।'

নিজের সম্বন্ধে এমন একটা স্বীকারোক্তি যে ভবেশ করে বসবেন, এ ছিল রাজেশের প্রত্যাশার বাইরে। তবে কি দশ বছর আগের দিনগুলোর জন্য সত্যিই অনুতাপ বহন করে চলেছেন ভবেশ?

রাজেশ হাত গুটিয়ে বসে ছিল। ছেলের দিকে চোখ পড়তেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ভবেশ, 'এ কি, কিছুই যে খাচ্ছিস না!'

খাওয়ার মত এতটুকু উৎসাহও আর অবশিষ্ট ছিল না। না খেলে ভবেশ পীড়াপীড়ি শুরু করবেন। সেটুকু এড়াবার জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্লেটে হাত দিয়ে খাবার ছলনাটুকু করতে লাগল রাজেশ।

অনেকক্ষণ আর কিছু বললেন না ভবেশ। ধ্যান-জ্ঞান সব খাবারের মধ্যে সঁপে রাখলেন। তারপর হঠাৎ মুখ তুলে একেবারে ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেলেন, 'আচ্ছা রাজু, তুই তো মার্চেণ্ট নেভিতে চাকরি করিস।'

নিরাসক্ত গলায় রাজেশ বলল, 'হ্যাঁ।'

'কি কাজ করতে হয়?'

'আমি ডেপুটি চীফ মেকানিক।'

'কি রকম মাইনে দেয়?'

রাজেশের চাকুরী সম্বন্ধে ভবেশের কৌতূহল অবান্তর, তা অবোধ্য নয়। নিতান্ত আলাপটাকে চালু রাখার জন্যেই ভবেশ প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যাচ্ছেন। বুঝেও রাজেশ উত্তর দিয়ে যেতে লাগল, 'সাড়ে তিন শ টাকা মাইনে। তা ছাড়া জাহাজে থাকলে খাওয়া এবং পোশাক।'

একটু কি ভেবে ভবেশ বললেন, 'তোদের অফিসটা কোথায়?'

'কেন?' সরাসরি বাবার চোখের দিকে তাকাল রাজেশ।

'এমনি।'

রাজেশ বলল, 'কলকাতায়, ডালহৌসি স্কোয়ারে।'

প্রশ্নোত্তর সমাপ্ত। এদিকে খাওয়াও শেষ হয়ে গিয়েছিল। খাবার ঘরের এক কোণে বেসিনে আঁচিয়ে দু-জন বাইরের করিডরে বেরিয়ে এল।

ভবেশ বললেন, 'চল, তোকে তোর ঘরে দিয়ে আসি।'

রাজেশ নিশ্চুপ। যেতে যেতে ভবেশ বললেন, 'একটা কথা বলছিলাম রাজু। তোকে পৌঁছে দিয়ে আমাকে একটু বেরুতে হবে। আজ রাত্রিতে আর হয়তো ফেরা হবে না। বয়দের আমি বলে যাব; তোর যদি কিছু দরকার হয় ওদের ডাকিস। খাটের বাজুতে কলিং বেল্ আছে।'

ডাইনিং রুম আর রাজেশের ঘর—এই দুয়ের মাঝামাঝি একটা জায়গায় এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন ভবেশ। দেখাদেখি রাজেশও থামল। এখান থেকে বাড়িটার পেছন দিকের বিস্তৃত পথটা চোখে পড়ে। অবশ্য মাঘের এই রাতটিতে কুয়াশার জন্য কিছুই স্পষ্ট নয়। তবু অনুমান করা যায়, ওদিকে খানিকটা জঙ্গলমত। নাকি রূপসি বাগান? বাগান বা জঙ্গল যা-ই থাক, তার সীমানা পার হলেই খুব সম্ভব একখানা একতলা বাড়ি।

অন্ধকারে আঙুল বাড়িয়ে ভবেশ বললেন, 'এ দিকটা পশ্চিম, আমাদের

বাড়ির পেছন দিক। তোকে বলে রাখছি, ভুলেও কিন্তু ওখানে যাবি না।'

নিজের অজ্ঞাতসারে হঠাৎ রাজেশ বলে ফেলল, 'কেন?'

যদিও প্রশ্নটা খুবই স্বাভাবিক তবু যেন প্রত্যাশা করেন নি ভবেশ। মুহূর্তের জন্য তিনি থতিয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন, 'মানে ওদিকটায় ঝোপ-ঝাড় রয়েছে। মাঝে মাঝেই বিষাক্ত সাপ বেরোয়। তাই যাওয়াটা ঠিক হবে না। চল—'

নিরুত্তরে চলতে শুরু করল রাজেশ। একটু আগে ভবেশের থতিয়ে যাওয়া, তার প্রশ্নের জবাবে ব্যস্ততা—সব মিলিয়ে রাজেশের সমস্ত চেতনা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে। বাড়ির পেছন দিকে যেতে না দেবার ব্যাপারে সাপের জুজু খাড়া করাটা কেমন যেন ছেলেমানুষি আর অবিশ্বাস্য মনে হল তার।

রাজেশ ভাবল পেছনের বাগানে এমন কিছু আছে যা ছেলের কাছে উন্মোচিত হতে দিতে চান না ভবেশ। কী তা? কী-কী? রাজেশের সমস্ত কৌতুহল উন্মুখ হয়ে উঠল।

একসময় দক্ষিণের শেষ ঘরখানার সামনে এসে পড়ল তারা। ভবেশ ভেতরে ঢুকলেন না। বাইরে থেকেই বললেন, 'ট্রেন জার্নি করে এসেছিস; তাড়াতাড়িই শুয়ে পড়িস। রাত জাগলে শরীর খারাপ হবে। আচ্ছা আমি এখন চলি। কাল দেখা হবে।'

পাঁচ

নরম নির্ভাঁজ বিছানা। এত নরম যে শোওয়ামাত্র অতলে ডুবে গেল রাজেশ। তার ওপর আছে জাপানী কম্বলের আরামদায়ক উষ্ণতা। চারপাশে ছড়ানো বিশাল নীলাভ মশারিটা বাতাসে দোল খাচ্ছিল। তা ছাড়া এককোণে একটা নীল বাল্ব জ্বলছে। স্নিগ্ধ আলো ঘরময় ছড়ানো। রাজেশের মনে হল, সমুদ্রের মাঝখানে শুয়ে আছে।

দেহে সারাদিনের ক্লান্তি মাখানো ছিল; ঘুমকে ত্বরান্বিত করার জন্য চারপাশে আরামের অজস্র উপকরণ ছড়ানো ছিল তবু দু-চোখ বুজে এল না রাজেশের। মনে হচ্ছে আজ আর ঘুম আসবে না। শিয়রের জানালাটা খোলা রয়েছে। দৃষ্টিটাকে তার বাইরে মেলে দিয়ে আত্মবিস্মৃতের মত তাকিয়ে রইল রাজেশ।

বাইরে কোন বিস্ময়ই নেই। শীতশেষের রাত আরও একটু ঝাপসা হয়েছে। আর ঘন কুয়াশার একটা যবনিকা আকাশ থেকে থাড়া নেমে এসে সব কিছু আড়াল করে দাঁড়িয়েছে।

তাকিয়েই ছিল রাজেশ। শিয়রের জানালা আর শীতের গাঢ় কুয়াশা পার হয়ে তার স্মৃতি দশ বছর আগের একটা বন্ধ দুয়ারে করাঘাত হেনে যাচ্ছিল। আঘাত খেতে খেতে একসময় ঝনাৎ করে তার পাল্লাদুটো খুলে গেল। আর তার মধ্য দিয়ে এক যুগ আগের সেই দিনগুলো মিছিল করে সামনে এসে দাঁড়াল।

রানীপুরের দক্ষিণে তাদের সেই পুরনো ভাঙা একতলা বাড়িখানা প্রথমেই চোখের সামনে ভেসে উঠল।

সংসারে সেদিন ক'জন মানুষ? ঠাকুরদা, মা, এক অবিবাহিতা তরুণী পিসি, বাবা আর রাজেশ নিজে।

প্রথমে মায়ের কথাই ধরা যাক। জাপানী পুতুলের মত ছোট খাট মানুষটি। চুল ছিল অজস্র; প্রায় সর্বক্ষণই পিঠময় সেগুলো ছড়িয়ে থাকত। যখন খোঁপা বাঁধতেন মাথার ওপর স্তূপের মত দেখাত। চোখদুটি বিশাল, কিন্তু সে দুটির ওপর তুলিতে টানা নরম ভুরু। যখন তাকাতেন পাখির উপমা মনে পড়ে যেত। চিবুকের খাঁজটি মনোরম; গলায় শাঁখের মত তিনটি ভাঁজ। ছোট্ট কপালে সিঁদুরের প্রকাণ্ড টিপ। চলাফেরা ওঠাবসা সব মৃদু, নিঃশব্দ। তাঁর সব কিছুই স্নিগ্ধতা দিয়ে ঘেরা।

পুতুলের মত মানুষটি সারাদিনই ঘুরে ঘুরে সংসারের কাজ করতেন। তাঁর হাত-পা নাড়ানো, ঘুরে ঘুরে কাজ করা—সব কেমন যেন অবিশ্রান্ত মনে

কথা বলতেন তিনি খুব কম। কিছু বলার থাকলে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকতেন শুধু। আর এই তাকানোর মধ্যেই তাঁর সব বলা হয়ে যেত।

একেবারে ছেলেবেলার কথা মনে নেই রাজেশের। তবে জ্ঞান হবার পর থেকে মাকে কোনদিন হাসতে দেখেনি সে। মুখখানা করুণ আর উদাস। বিচিত্র এক বিষাদ সব সময় তাঁকে ঘিরে থাকত। ছুটে ছুটে সংসারের সমস্ত কাজ করতেন ঠিকই কিন্তু চোখ দুটি সর্বক্ষণই রাজেশের দিকে ফেরানো থাকত।

রাজেশ বলত, 'আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে থাক কেন মা?'

গাঢ় গভীর গলায় মা বলতেন, 'তুই ছাড়া আর কার দিকে তাকাব বাবা!

সংসারে কে আছে আমার।' বলতে বলতে স্বরটা রুদ্ধ হয়ে আসত। একটু পর কি যেন ভেবে আবার বলতেন, 'তাড়াতাড়ি বড় হ খোকা। তুই বড় হলে আমার কষ্ট ঘুচবে। আমি সেই সুখের দিনের আশায় তোর দিকে তাকিয়ে আছি।'

সব কথা বোঝার বয়স সেদিন নয়। বড় হয়ে রাজেশ বুঝতে পেরেছিল, মায়ের সব দুঃখ সব বিষাদের কেন্দ্রে যিনি বসে আছেন তিনি বাবা। বাবা অর্থাৎ ভবেশ…

কিন্তু ভবেশের কথা এখন নয় পরে।

মায়ের পরই যে মুখটা সব চাইতে বেশী মনে পড়ছে সেটা পিসির। নাম তার লতিকা। ছাব্বিশ সাতাশ বছরের সেই মেয়েটা রূপের দিক থেকে তার কুলের সব লক্ষণই পেয়েছিল। পিসি শাস্ত্র-সুলক্ষণা। ঘন পালকে-ঘেরা আয়ত চোখ, তীক্ষ্ণ নাসা। হাত-পা এবং আঙুল দীর্ঘ। রাজহাঁসের মত গ্রীবা ; ঘন কুঞ্চিত চুল। 'তপ্ত কাঞ্চনবর্ণা' বলে একটা প্রবাদ আছে। পিসির দিকে তাকালে সেই কথাটা মনে পড়ে যেত।

ছাব্বিশ সাতাশ বছর বয়স তবু সে সুবর্ণা, সুকেশা। সুদেহিনী পিসির সুন্দর শরীরটিকে ঢাকবার মত পর্যাপ্ত আচ্ছাদন ছিল না। দীন সংসার থেকে ছেঁড়া সায়া, তালি-দেওয়া ব্লাউজ আর শাড়ি ছাড়া আর কিছুই পেত না সে। সুরূপা মেয়েটিকে সেই বেশে ভিখারিনী মনে হত।

পিসি মানুষটা ছিল স্বভাব-উচ্ছলা। রাজেশ ছাড়া আর কোন বন্ধু ছিল না তার ; এমন কি সমবয়সী একটা সখীও না। তার যত কিছু খেলা, অভিমান, রাগ—সব রাজেশকে ঘিরে। দিনরাত তার সঙ্গে ছুটোছুটি হুটোপাটি করে বেড়াত। তার সঙ্গে লুকোচুরি খেলত। পেছনের বাগানে গিয়ে গাছে উঠে পেয়ারা কি কুল পাড়ত। হঠাৎ হঠাৎ তার প্রাণে দুরন্ত জোয়ার এসে যেত বুঝি। আর তখন সে যে কি করে বসবে ঠিক করতে পারত না। হয়ত রাজেশকে কোলে তুলেই ছুট লাগাল। নয়ত দু-হাত ধরে বাঁই বাঁই করে খানিকটা পাক খাইয়ে দিল।

উচ্ছ্বাসে ভাসার জন্য যে মেয়ে সর্বক্ষণ উন্মুখ, মাঝে মাঝে তার কি যেন হয়ে যেত। বাড়ির পেছন দিকের ঝুপসি বাগানে একটা জামরুল গাছ ছিল। একা একা তার তলায় গিয়ে চুপচাপ বসে থাকত।

খুঁজতে খুঁজতে পেছনের বাগানে এসে শেষ পর্যন্ত পিসিকে আবিষ্কার করে ফেলত রাজেশ। বলত, 'তুমি এইখানে বসে আছ! আর কখন থেকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি!

পিসি নিশ্চুপ।

পিসির নীরবতা রাজেশকে অসহিষ্ণু করে তুলত। তার একটা হাত ধরে সে বলতে থাকত, 'চুপ করে আছ কেন, ও পিসি! কথা বল না!'

এতক্ষণে পিসির চেতনা ফিরে আসত যেন। রাজেশকে টেনে নিজের পাশটিতে বসিয়ে দিত। তারপর খুব আস্তে বলে উঠত, 'আচ্ছা খোকা—'

অবাক চোখে পিসির মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করত, 'কী বলছ—?'

'একটা কথা তোকে জিজ্ঞেস করব।'

'কী কথা?'

'আগে বল ঠিক জবাবটা দিবি। আমার গা ছুঁয়ে বল—'

পিসিকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করত রাজেশ। তারপর বলত, 'হল তো? এবার জিজ্ঞেস কর—'

পিসি এবার তার চোখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলত, 'আমাকে কেমন দেখতে রে?'

'সুন্দর।'

পিসি আবার প্রশ্ন করত, 'কেমন সুন্দর রে?'

'খুব—খুব সুন্দর; রানীর মতন।'

পিসির চোখদু'টো ঝিকমিকিয়ে উঠত, 'রানীর মতন, তাই না রে! সবাই ঐ এক কথা বলে। আরো কি বলে জানিস?'

'কী?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিত না পিসি। জামরুল গাছটার ওপাশে উঁচু ছাইগাদা। তার মাথায় দুটো পেঁপে গাছ। পেঁপে গাছের পর স্রোতহীন একটা খাল খালটাকে বেষ্টন করে বেতবনের দুর্ভেদ্য প্রাচীর। উদাস চোখে সেদিকে তাকিয়ে থাকত পিসি।

যে পিসি দুরন্ত আর স্বভাব-উচ্ছলা তাকে তবু চেনা যায়। কিন্তু এই উদাসিনী দূরমনস্ক মেয়েটি একেবারেই দুর্বোধ্য।

রাজেশ অস্থির হয়ে উঠত, 'ও পিসি চুপ করে রইলে কেন? সবাই আর কী বলে, বল।'

বেতবনের দিক থেকে চোখ না ফিরিয়ে পিসি ফিসফিসিয়ে উঠত, 'সবাই বলে আমার যা রূপ তাতে রাজার ঘরে যাওয়া উচিত। কিন্তু—'

'কী?'

'তা হবার নয়। ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়েস হল। বিয়ে আমার হবে না। চিরটা কাল আইবুড়ো হয়েই মুখ গুঁজরে থাকতে হবে।'

সেই বয়সেও পিসিকে প্রায় সবটুকুই বুঝতে পেরেছিল রাজেশ। মেয়েটা মধ্যে জটিলতার অবকাশ নেই। সাধারণ একটি মেয়ে যে স্বপ্ন ছাখে তা বাইরে কোন অসঙ্গত উচ্চাশা তার ছিল না। সুখী সচ্ছল একটি সংসার অনুগত স্বামী, কোলজোড়া শিশু—তার পৃথিবীর রূপটা ছিল এইরকম। এই নিয়েই পিসী পরিতৃপ্ত হতে চেয়েছিল।

বেতবনের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে একসময় পিসি বলে উঠত, 'জানি খোকা—' বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে যেত সে।

রুদ্ধস্বরে রাজেশ জিজ্ঞেস করত, 'কী—'

'এই তোর বাবা—' হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠত পিসি। ঘনশ্বসিত নিটো বুকে ঝড় ভেঙে পড়ত যেন। আর গলার স্বরে দোলা লাগত, 'তোর বাবা য আমার দিকে একটু ফিরে তাকাত তা হলে এই ধ্বসা, ভাঙা বাড়িতে পেত্নী মত চরে বেড়াতে হত না। আইবুড়ো বোনটার দিকে তার একটু নজরও নেই।

তার বাবা অর্থাৎ ভবেশ। মায়ের মত পিসিরও সকল দুঃখের কেন্দ্রে ভবেশ বসে আছে সে কেমন? ভবেশের কথা এখনও নয়, যথাসময়ে।

মা আর পিসি ছাড়া জরাগ্রস্ত একতলা বাড়িটায় আরেকটি মানুষ ছিলেন তিনি ঠাকুরদা। ঠাকুরদার মুখটা ভাবতে গেলেই চালচিত্রের মত বংশের ইতিহাস মনে পড়ে যায়।

রাজেশদের বংশটা ছিল যজন-যাজন এবং অধ্যাপনার জন্য বিখ্যাত প্রপিতামহ ছিলেন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত—নৈয়ায়িক এবং স্মার্ত। নিজের বাড়িতেই চতুষ্পাঠী খুলেছিলেন তিনি। ছাত্ররা গুরুর কাছে থেকেই শাস্ত্র শিক্ষ করত।

ঠাকুরদার আমলে অবশ্য চতুষ্পাঠী উঠে গিয়েছিল। চতুষ্পাঠী উঠলে অধ্যাপনা তিনি ছাড়েন নি। প্রপিতামহের মত না হলেও ব্যাকরণ এবং কা তাঁর অসাধারণ দখল ছিল। রানীপুর হাইস্কুলের হেড পণ্ডিত ছিল ঠাকুরদা। তা-ছাড়া যজমানিও করতেন; বেশ কিছু শিষ্য-সেবক ছিল

মোটকথা, যজমানি আর অধ্যাপনা, এই দুটিই ছিল রাজেশদের বং প্রধান জীবিকা। আর বাগান, বাড়ি, ধানজমি, পুকুর—এসব তো ছিলই জমি থেকে যে ধান আসত সংসারের পক্ষে তা পর্যাপ্ত। সারা বছর খে বিক্রি হত। তা ছাড়া স্কুলের মাইনে, যজমানির আয়—সব মিলিয়ে মোটামুটি সচ্ছলই।

অবশ্য সেই সচ্ছল দিনের রূপ নিজের চোখে ছাখেনি রাজেশ। সম্ভবও ছিল না। তখন সে কোথায়?

কিন্তু ঠাকুরদার বয়স যখন পঞ্চাশের সীমান্তে, সমস্ত সংসারটা প্রবল এক ধাক্কায় থমকে গিয়েছিল। এতদিনের শৃঙ্খলাবদ্ধ সুখী জীবনে সেই প্রথম অনিয়মের ছায়া পড়েছিল।

ঠাকুরদা পঞ্চাশের সীমান্তে। অর্থাৎ অনায়াসে আরো পাঁচ সাতটা বছর হাইস্কুলে ছেলে পড়িয়ে যেতে পারতেন। তারপর রিয়াটার করার প্রশ্ন।

কিন্তু শেষ ক'টা বছর চাকবি আর সম্ভব হল না। চোখের দৃষ্টি দ্রুত ক্ষীণ হতে হতে হঠাৎ একেবারে অন্ধ হয়ে গেলেন ঠাকুরদা। হাজার চিকিৎসা করিয়েও কোন লাভ হল না।

ঠাকুরদা অন্ধ হবার পর তাঁর যাবতীয় উত্তরাধিকার গিয়ে পড়ল ভবেশের হাতে। তারই ফলে···কিন্তু ভবেশের প্রসঙ্গ থাক। সে কথা পরে।

রাজেশ শুনেছে ঠাকুরদা ছিলেন পুরোপুরি মজলিশী মানুষ। শুধু মজলিশীই নন, বড় বেশী পরিমাণে সামাজিক আর বহির্মুখী। তাঁর আতিথেয়তার নাকি তুলনা ছিল না।

রবিবার সকাল থেকেই পাশার আসর বসত। খেলা শেষ হতে হতে রাতের গোটা দুই প্রহর কাবার। দুপুরবেলা স্নান-খাওয়ার জন্য শুধু ঘণ্টাখানেক বিরতি। অলিখিত একটা চুক্তি ছিল যেন, ছুটির দিনে যারা খেলতে আসবে তাদের খাবার ব্যবস্থা এ-বাড়িতেই।

শুধু কি পাশার আসরেই, নানা দিকে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন ঠাকুরদা। এই রানীপুরে এমন একটি মানুষ নেই যার নাম তিনি জানতেন না। এমন কোন বাড়ি ছিল না যেখানে সপ্তাহে অন্তত একবারও হানা দিয়ে তাদের খবর নিতেন না।

ঠাকুরদার এই সামাজিক মজলিশী চেহারাটা রাজেশের চোখে দেখা নয়, কানে শোনা। আশৈশব ঠাকুরদাকে কী রূপে দেখে আসছে সে?

অন্ধ হবার পর রানীপুরের দক্ষিণ মেরুতে তাদের সেই একতলা ভাঙা বাড়িটার সব চাইতে ছোট ঘরখানা তিনি বেছে নিয়েছিলেন। ঘর না বলে তাকে বিবর বলাই সঙ্গত।

ঠাকুরদা দখল নেবার আগে সেই ঘরটা কেউ কোনদিন ব্যবহার করেনি। বাতিল-আসবাব, ভাঙা বালতি, ছেঁড়া তোষক, পুতুল আর খেলনার ধ্বংসাবশেষ, হ্যাণ্ডেলহীন সাইকেল—এসব ঠাসাঠাসি করে রাখা হত তার ভেতর। ঘরখানাকে রাজেশদের পারিবারিক যাদুঘর বলাই সঙ্গত। এক-কোণে কয়লাঘুঁটেও থাকত।

ঠাকুরদাকে সবাই বারণ করেছিল, 'ওই অন্ধকার ঘুপচিতে আপনার থাকতে হবে না। বাড়িতে কি ঘরের অভাব নাকি?'

ঠাকুরদা জেদ ধরেছিলেন, 'আমি ওখানেই থাকব।'

'ওখানে বাতাস ঢোকে না, আলো নেই—'

ঠাকুরদা বলেছিলেন, 'আমার চোখে কি-বা আলো কি-বা অন্ধকার।'

ছেলেবেলা থেকেই রাজেশ দেখে এসেছে সেই নিরালোক বাতাস-বর্জিত ঘরখানায় ঠাকুরদা সারাদিন পায়চারি করে বেড়াতেন।

সমস্ত দিনে মাত্র বারতিনেক সেই ঘরটা থেকে বেরিয়ে আসতেন ঠাকুরদা। স্নানের সময় একবার। দুপুর আর রাতের খাবার সময় একবার একবার দু-বার। তা-ও স্বেচ্ছায় নয়। রাজেশের মা-ই জোর করে বাইরে আনতেন।

ঠাকুরদা বলতেন, 'রোজ রোজ আমাকে নিয়ে টানাটানি কর কেন?'

রাজেশের মা বলতেন, 'না করলে বাঁচবেন কেমন করে?'

'এমনভাবে পরের ওপর নির্ভর করে' বেঁচে কী লাভ?'

'এসব বলতে নেই বাবা।'

ঠাকুরদা অসহিষ্ণু হয়ে উঠতেন, 'কেন বলব না বউমা। যেদিন চোখ খেয়েছি সেদিন থেকেই বাঁচামরা সমান হয়ে গেছে। তার ওপর ভবেশটা—'

কথা আর শেষ করতে পারতেন না তিনি। বাধা দিয়ে মা বলে উঠতেন, 'ও-কথা থাক বাবা।'

রাজেশ লক্ষ্য করেছে, বাবার প্রসঙ্গ উঠলেই ঠাকুরদাকে থামিয়ে দিতেন মা।

যে মজলিশী সামাজিক মানুষটির কিংবদন্তী রাজেশ শুনেছে, সে যেন অন্য কেউ। এই স্বেচ্ছা-নির্বাসিত ঠাকুরদা নন।

ছেলেবেলায় রাজেশের মনে হত, ঠাকুরদার সব দুঃখের মূলে রয়েছে অন্ধত্ব। দৃষ্টি হারানোর বেদনা তাঁর প্রাণে অসহনীয় হয়ে বেজেছিল। ফলে পৃথিবীর সব কিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন।

একটু বড় হয়ে কিন্তু ছেলেবেলার সেই ধারণাটা অনেকখানি বদলে গিয়েছিল রাজেশের।

ঠাকুরদার একটা ইন্দ্রিয় খোয়া গেছে। সে ক্ষতি পূরণ করেছিল বাকি চারটে ইন্দ্রিয়। অতিরিক্ত তীক্ষ্ণ এবং সজাগ হয়ে উঠেছিল সেগুলো।

সমস্ত দিনই নিজের ঘরখানায় পায়চারি করে বেড়াতেন ঠাকুরদা। পারতপক্ষে রাজেশ তাঁর কাছে ঘেঁষত না। ঠাকুরদার ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় পা টিপে টিপে রুদ্ধশ্বাসে হেঁটে যেত।

যত চুপিসাড়েই যাক ঠাকুরদা কিন্তু ঠিক টের পেয়ে যেতেন। অন্ধ হবার

পর শব্দ দিয়ে, ঘ্রাণ দিয়ে, জগতের সব কিছু ধরতে শুরু করেছিলেন। তিনি ডেকে উঠতেন, 'কে, দাদাভাই নাকি?'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ত রাজেশ। ভয়ে ভয়ে সাড়া দিত, 'হ্যাঁ।'

'অমন চুপি চুপি পালাচ্ছিস কেন?'

রাজেশ চুপ।

ঠাকুরদা হাতছানি দিয়ে ডাকতেন, 'আয়, আমার কাছে আয়।' বলে অন্ধ চোখে এমন করে তাকিয়ে থাকতেন, রাজেশের মনে হত, তাকে সম্মোহিত করে ফেলছেন।

নিজের অজ্ঞাতে পায়ে পায়ে এগিয়ে যেত রাজেশ। কাছাকাছি এলেই খপ করে একখানা হাত ধরে একেবারে বুকের ভেতর টেনে নিতেন ঠাকুরদা। তার গায়ে হাত বুলোতে, বুলোতে বলতেন 'তোর জামা-প্যান্টে এত তালি কেন? যা, এগুলো ছেড়ে ভাল জামা-প্যান্ট পরে আয়।'

'ভাল জামা-প্যান্ট আমার নেই। সবগুলোই তো ছেঁড়া।'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলতেন না ঠাকুরদা। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠতেন, 'সবগুলো ছেঁড়া! তোর মা আর পিসিরও তো একখানা আস্ত কাপড় নেই। তাই না?'

ঠাকুরদার আকস্মিক উত্তেজনা রাজেশকে চকিত, সন্ত্রস্ত করে তুলত। ভীত গলায় সে বলত, 'হ্যাঁ।'

'আর তোর বাবার?' ঠাকুরদার গলা এবার আরো তীব্র, আরো প্রখর।

বৃদ্ধ কী জানতে চান, বুঝতে না পেরে চুপ করে থাকত রাজেশ।

ঠাকুরদা বলে যেতেন, 'তোর বাপ তো প্রতি মাসেই ফুরফুরে ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবি আর সাহেব বাড়ির জুতো কিনে আনছে। না?'

ভয়ে ভয়ে রাজেশ বলত, 'হ্যাঁ।'

'আর এদিকে নিজের স্ত্রী, বোন আর একটা মাত্র ছেলে—সবার ভিখিরির হাল করে রেখেছে।' ঠাকুরদার স্বর পর্দায় পর্দায় চড়তে থাকত, 'মনে করে আমি অন্ধ, চোখে দেখতে পাই না। সব টের পাই আমি, সব বুঝতে পারি।'

কোনদিন বা ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, 'আজ সকালবেলা কী খেয়েছিস দাদুভাই?'

'কিছু না।'

'কিছু না!' ঠাকুরদা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন। পরক্ষণেই হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মত চিৎকার করে মাকে ডাকতেন, 'বউমা—বউমা—'

মা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসতেন, 'ডাকছেন কেন বাবা ?'

'ডাকছি কেন ? তোমাদের মনের কথাটা আমাকে পরিষ্কার করে বল দেখি।'

'কী হয়েছে ?' মৃদুস্বরে মা জানতে চাইতেন।

'কী হয় নি ! তোমরা দুদিন না খেয়ে থাকো, আমি কিছু বলতে যাব না। থাকবে কি, না খেয়ে থাকছই তো। আমি কি তা বুঝতে পারি না। সে যাক, দুধের ছেলেটাকে সকালবেলা কিছু খেতে দাও নি কেন ?'

মা নীরব। নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকতেন তিনি।

ঠাকুরদা চেঁচাতে থাকতেন, 'কি, চুপ করে রইলে কেন ?'

অসহ্য অবরুদ্ধ এক আবেগে মায়ের ছোটখাটো শরীরটা থরথর করতে থাকত। সেই থরথরানি ঠেকাবার জন্যই বোধ হয় ওপরের দাঁতগুলো নীচের ঠোঁটে গেঁথে দিয়ে অস্ফুটে বলতেন, 'আমি কী করব ?'

'তার মানে ?'

'ঘরে কিছু না থাকলে—' বলতে বলতে মায়ের গলা বুজে আসত।

'ঘরে কিছু নেই ! কেন থাকে না ? সে উল্লুকটা দিন রাত কী করে ? একটা মাত্র ছেলে, তাকেও পেট ভরে চারবেলা খেতে দিতে পারে না ! গলায় দেবার দড়ি জোটে না তার ?'

ঠাকুরদা সমানে চিৎকার করতে থাকতেন, 'এ সব চলবে না, চলবে না, চলবে না। কিছুতেই আমি চলতে দেব না।' অনেকক্ষণ চেঁচামেচির পর গলা নামিয়ে হঠাৎ বলে উঠতেন, 'আচ্ছা বউমা—'

শিথিল স্বরে মা সাড়া দিতেন, 'কি বলছেন ?'

'ক'দিন ধরেই একটা কথা তোমাকে বলব বলব ভাবছি।'

মায়ের চোখে মুখে শঙ্কার ছায়া নেমে আসত। শ্বশুরের দিকে চকিত দৃষ্টিক্ষেপ করে রুদ্ধ কাঁপা গলায় বলতেন, 'কী কথা ?'

'ভবেশ নাকি আমাদের বসত বাড়িটা মাড়োয়ারীর কাছে বাঁধা দিয়েছে ?'

রাজেশ লক্ষ্য করত, মায়ের মুখখানা রক্তহীন পাংশু হয়ে গেছে। তাঁর গলার ভেতর থেকে অর্ধস্ফুট গোঙানির মত শব্দ বেরিয়ে আসত, 'আপনি যা শুনেছেন তা হয়ত ঠিক না বাবা।'

আলোহীন স্তিমিত চোখ দুটো ধারাল ফলার মত মায়ের বুকের গভীরে বিঁধিয়ে দিয়ে ঠাকুরদা বলতেন, 'ঠিক, ঠিক, একশ বার ঠিক।'

'আপনি বিশ্বাস করুন—' মা গোঙাতে থাকতেন।

ঠাকুরদা বলতেন, 'দেখ মা, সত্যিকারের স্ত্রী স্বামীর দোষ ঢেকেই রাখে

কিন্তু তারও একটা মাত্রা আছে। তোমার স্বামীটি এমন একটি বস্তু আর এমন সব ধরনের অন্যায় করে যাচ্ছে যেগুলো চাপাচুপি দিয়ে রাখা পাপ।'

মনে পড়ে, একদিন খুব ভোরে ঠাকুরদার চিৎকারে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল রাজেশের। প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল সে। তারপর ছুটে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল।

নিজের ঘরে যাতায়াতের যে সুড়ঙ্গটা আছে তার ওপর দাঁড়িয়ে ঠাকুরদা তখন গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছিলেন, 'বল, বল এসব সত্যি কি না?'

তাঁর সামনে মুখখানা কাঁচুমাচু করে দাঁড়িয়ে ছিলেন মা!

একস্বরে টেনে টেনে ঠাকুরদা বলে যাচ্ছিলেন, 'জানোয়ারটা ধানজমিগুলো যে বিক্রি করে দিল; এবার সংসার চলবে কী করে? সবাই খাবে কী? বল—বল, উত্তর দাও—'

দুর্বোধ্য স্বরে কি যেন বলেছিলেন মা, বোঝা যায় নি।

দুই হাত নেড়ে পা ছুঁড়ে ঠাকুরদা আবার বলে উঠেছিলেন, 'এখন কী হবে! কী করে দিন কাটবে, হে ভগবান!'

মা উত্তর দেন নি। কী-ই বা দেবেন!

ঠাকুরদা থামেন নি। বলেছিলেন, 'জমিবিক্রির টাকাগুলো কোথায় বউমা?'

নির্জীব গলায় মা বলেছিলেন, 'আমি জানি না।'

'জানো, জানো, নিশ্চয়ই জানো। টাকাগুলোর সপিণ্ডকরণ যে হয়ে গেছে তোমার চাইতে তা আর ভাল করে কে জানে!'

'আপনি বিশ্বাস করুন—'

'আমাকে তুমি বিশ্বাস করাতে পারবে না বউমা। তোমার স্বামী হলেও আমারই তো ছেলে। সাত আট বছর তুমি ওর সঙ্গে ঘর করছ। আর আমি?' বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে গিয়েছিলেন ঠাকুরদা। বুকের গভীর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস অসংখ্য স্তর ঠেলে কেঁপে কেঁপে বেরিয়ে এসেছিল। কিছুক্ষণ কি ভেবে আবার বলেছিলেন, 'আমি ওর বাপ। ওকে আমার চাইতে কে আর বেশি চেনে বল। মোটামুটি আন্দাজ করেছি টাকাগুলো দিয়ে ও কী করেছে। তবু তুমিই বল! তোমার মুখ থেকেই আমি শুনতে চাই।'

রাজেশ লক্ষ্য করেছে, মায়ের স্নিগ্ধ করুণ চোখদুটির ওপর দিয়ে বিদ্যুৎ-চমকের মত কি যেন খেলে গিয়েছিল। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছিল। শরবিদ্ধ একটা পশুর মত মা চিৎকার করে উঠেছিলেন, 'বাবা!'

'বুঝেছি, তোমার পক্ষে বলা সম্ভব না।' ঠাকুরদা হঠাৎ অনেকখানি শান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। আস্তে আস্তে বলেছিলেন, 'কিন্তু মা, জমি-জমা বেচে

বসত বাড়ি বাঁধা দিয়ে বদমাইসটা যে বাজারের মেয়েমানুষদের পায়ে নৈবেদ্য সাজাচ্ছে, এর পরিণাম ভেবে দেখেছ ?'

ঠাকুরদা যা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন সেদিন তা বোঝার বয়স রাজেশের নয়। বিভ্রান্তের মত সে শুধু ঠাকুরদার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল।

ঠাকুরদা বলে যাচ্ছিলেন, 'আমার কথা ভাবি না। কিন্তু তোমার ? লতিকার ? আর এই দাদাভাইটার ? কি হবে তোমাদের ? সবাই যে ভেসে যাবে বউমা। হে ভগবান, আমাদের এখন কুল এমন বংশ, সেখানে এ কি পাপ এসে ঢুকেছে ! হে ঈশ্বর, আমি মরতে চাই, মরতে চাই।'

মা উতলা হয়ে উঠেছিলেন, 'অমন অস্থির হবেন না বাবা। আপনি ধৈর্য হারালে আমরা কার মুখের দিকে তাকিয়ে ভরসা পাব ?'

ঠাকুরদা সে কথা যেন শুনতেই পাননি। বিচিত্র এক ঘোরের মধ্যে বলে গিয়েছিলেন, 'সন্তান যদি কু হয় বাপ-মায়ের পক্ষে প্রাণধারণ যে কি কষ্টকর আর গ্লানির প্রতি মুহূর্তে আমি তা বুঝতে পারছি।'

একটু বড় হয়ে রাজেশ বুঝতে পেরেছিল, অন্ধত্বই নয়, ঠাকুরদার অন্তহীন অপার দুঃখের মূলেও ভবেশ।

সংসারের সব ক'টি মানুষ—মা, পিসি, ঠাকুরদা, এমনকি সে নিজে—এদের প্রাণের যত কষ্ট যত আক্ষেপ যত যন্ত্রণা সব বাবাকে ঘিরে।

সবার শেষে রাজেশের স্মৃতিতে ভবেশের মুখটা ভেসে উঠল।

আজকের পরিণত রাজেশ বাবার জীবনটাকে বিশ্লেষণ করে মোটামুটি চার পর্বে ভাগ করে নিয়েছে। প্রথম, দ্বিতীয় এবং শেষাংশটি সে দেখেনি। প্রথম আর দ্বিতীয়টা না দেখলেও জেনে নিয়েছে। শেষ অধ্যায়টা যুগপৎ অশ্রুত এবং অজ্ঞাত; সেটা জানবে বলেই দশ বছর পর রানীপুরে ফিরে এসেছে রাজেশ। মাঝখানের একটা পর্ব অবশ্য নিজের চোখে তার দেখা।

রাজেশ শুনেছে ঠাকুরদা পর্যন্ত বংশের প্রতিটি মানুষ শিক্ষার জন্য টোল অথবা চতুষ্পাঠীতে গিয়েছিলেন। বংশের ধারাটা কিন্তু পুরুষানুক্রমে বয়ে আসতে আসতে ভবেশের মধ্যে থমকে গিয়েছিল। ভবেশ টোলে যান নি, গিয়েছিলেন হাইস্কুলে।

ছাত্র হিসেবে ভবেশ অসাধারণ তীক্ষ্ণ। রানীপুরের স্তিমিত জীবনকে সচকিত করে দিয়া ম্যাট্রিকুলেশন আর ইন্টারমিডিয়েটে স্কলারশিপ পেয়েছিলেন। ফোর্থ ইয়ার পর্যন্ত পড়েও ছিলেন। তারপরেই নির্মম হাতে অমন উজ্জ্বল ছাত্র-জীবনটার ওপর যবনিকা টেনে দিয়েছেন। ঠাকুরদা অনেক বুঝিয়েছেন। রাগ-অভিমান, এমনকি ছেলের হাত ধরে কাকুতি-মিনতি-কান্নাকাটি, কিছু করতেই

বাকি রাখেন নি। কিন্তু বি. এ. ফাইনাল পরীক্ষাটা আর ছেলেকে দিয়ে দেওয়ানো সম্ভব হয় নি।

থার্ড ইয়ারে পড়তে পড়তে আনুরসের সন্ধান পেয়ে গিয়েছিলেন ভবেশ। পুরনো স্থবির রানীপুরের পুব দিক ঘিরে একটা নিষিদ্ধ জগৎ ছিল। দিনের আলোয় পারত পক্ষে ওদিকে কেউ যেত না। যাদের যাবার বড় গরজ তারা যেত রাতের অন্ধকারে।

অথচ দিনের বেলায় কি আর! রানীপুরের আর পাঁচটা পাড়ার সঙ্গে পুবের পাড়ার এতটুকু অমিল নেই। পথ ভুলে কেউ যদি এ-সময় এখানে এসে পড়ত আজন্মের পরিচিত ঘর-সংসারের ছবিটাই চোখে পড়ত তার। কোন বাড়ির ছাদে হয়তো একখানা রঙীন শাড়ী শুকোচ্ছে, কোথাও টুকরো টুকরো কিছু কথা, হাসি, কোথাও ঝগড়া, কোন জানালায় কৌতূহলী একখানা মুখ।

দিনের বেলাটা একরকম কেটে যেত কিন্তু বিকেল থেকেই পুবের পাড়ায় তারে ভিন্ন রাগিণী বাজতে শুরু করত। গা ধুয়ে আয়নাখানি সামনে রেখে মেয়েরা সাজতে বসত তখন। চোখে দিত সূক্ষ্ম রেখায় কাজলের টান। কেউ বাঁধত আঁটো খোঁপা, কারো বা দীর্ঘ বেণী। চুল বেঁধে কুঁচি দিয়ে চড়া রঙের উলঙ্গবাহার শাড়ি পরে নিত। মুখে পাউডার বুলিয়ে দুই ভুরুর মাঝখানে কাঁচপোকার টিপ দিত। ঘরে ঘরে পরিপাটি বাসর সাজিয়ে তারপর শুরু হত প্রতীক্ষা।

সন্ধ্যে নামার সঙ্গে সঙ্গে পুবের পাড়াটা যেন এক জাদুকরীর জগৎ।

রানীপুরের এই প্রতিদিনের নিশিবাসর রাতের একটা যাম পার হতে না হতেই জমে উঠত। প্রথমে অর্থাৎ সন্ধ্যের ঠিক পরেই আসত সাধুখাঁদের বাড়ির কার্তিক-মার্কা ছেলেগুলো, তারপর লাহাদের চার নাতি। এমনি অনেকে। এই রানীপুরে যাদের ঘরে যত পয়সা পুবের নিশিবাসরে তাদের যাবার তত তাড়া।

তারা যেত কুঁচনো ধুতির প্রান্ত লুটিয়ে, গিলে করা পাঞ্জাবি উড়িয়ে পরিপাটি বাবুটি সেজে। বোতাম আর আংটির হীরে থেকে তাদের দীপ্তি ঠিকরে পড়ত। চুলটি থাকত নিপুণ ঢেউ-খেলানো। ঠোঁটদুটি পানের রসে টুকটুকে। আর চোখে নেশা-লাগা ঘোরের আভাস। কাছে গেলে মুখ থেকে উগ্র মিষ্টি একটা গন্ধ বেরিয়ে আসত। গন্ধটা যে কিসের, প্রশ্ন না করেও অনায়াসেই টের পাওয়া যেত। তাদের কেউ যেত পুরনো মডেলের ফোর্ড গাড়িতে চড়ে, কেউ রিক্সায়, কেউ বা ফীটন হাঁকিয়ে।

রানীপুরে যাদের ঘরে অঢেল পয়সা তারা পুব পাড়ায় আসত সবার চোখের

ওপর দিয়ে। সবাইকে জানান দিয়ে নিশিবাসরে আসাটা ছিল তাদের বড়-মানুষির প্রকাশ।

আরেক দল আসত রানীপুরের আনাচ-কানাচ দিয়ে, বুকে হেঁটে, চুপিসাড়ে। তাদের ঘরে তেমন পয়সা নেই। পুবের পাড়ার সামনে এসে তারা থমকে দাঁড়াত। চারদিক সতর্ক চোখে দেখে নিয়ে এক ছুটে ভেতরে ঢুকে পড়ত।

থার্ড ইয়ারে পড়তে পড়তেই এখানে হানা দিতে শুরু করেছিলেন ভবেশ। তাঁর এই আনাগোনাটা শুরু হয়েছিল লুকিয়ে চুরিয়ে। কিন্তু রানীপুর তো কলকাতার মত বিশাল মহারণ্য নয় যে তার কোন গোপন বিবরে বসে কে কী করে গেল সে খোঁজ কেউ রাখবে না। বত্রিশ মাইল দূরের সেই মহানগরীটার মত রানীপুর উদাসীনও নয়। গোপনতা বলতেও তার কিছু নেই। সদর-অন্দর সব হাট করে মেলে দিয়ে সজাগ চোখে সে তাকিয়ে আছে। কে কী করল, কী-ভাবে চলল, কী-ভাবে ফিরল—সব ব্যাপারেই তার নিদারুণ কৌতূহল।

সুতরাং লুকোচুরিটা বেশী দিন চলল না। ভবেশ ধরা পড়ে গেলেন। পুবের পাড়ায় তাঁর অভিসার মহা সমারোহে ঠাকুরদার কানেও পৌঁছে গেল। স্মৃতিশাস্ত্রী বাড়ির ছেলে ম্যাট্রিকুলেশন এবং ইণ্টারমিডিয়েটে স্কলারশিপ পেয়ে রানীপুরে তরঙ্গ তুলেছিলেন। আকারে প্রকারে ঢেউটা এবার আরো বড় রকমের উঠল।

প্রথমটা বিশ্বাস করেন নি ঠাকুরদা। যারা খবরটা দিতে এসেছিল তাদের দিকে তাকিয়ে গর্জে উঠেছিলেন, 'মিথ্যে! সব মিথ্যে!'

লোকগুলো বলেছিল, 'মিথ্যে নয়, সত্যি।'

'সত্যি যে প্রমাণ দিতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই।'

'যদি না পার?'

'রানীপুরের বাজারে সবার সামনে দশ হাত করে নাকখত খাব।'

ঠাকুরদা বলেছিলেন, 'অত সহজে পার পাবে না। এত বড় অপবাদটার শাস্তি মাত্র দশ হাত নাকখত? কক্ষনো না। আমার ছেলের একপাটি করে জুতো মুখে নিয়ে বাড়ি যাবে। কি, রাজী?'

'রাজী।'

'বেশ, তা হলে কবে প্রমাণ দেবে?'

'যেদিন বলবেন।'

'আজ, আজই চাই। কোন টালবাহানা চলবে না।'

'বেশ, আজই দেব। তবে আমাদের সঙ্গে আপনাকে একবার যেতে হবে।'

'কখন?'

'সন্ধ্যেবেলা।'

সন্ধ্যেবেলা সেই লোকগুলো পুবের পাড়ার গায়ে একটা ঝোপের ভেতর ঠাকুরদাকে এনে দাঁড় করিয়েছিল। বিস্মিত ঠাকুরদা বলেছিলেন, 'এখানে কেন? চল, রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াই।'

লোকগুলো জানিয়েছিল, 'আজ্ঞে না; আপনাকে দেখলে ভবেশ এদিক ঘেঁষবে না। প্রমাণ দেব কি করে?'

'বেশ, এখানেই দাঁড়াচ্ছি। মুখে জুতো নেবার কথাটা যেন মনে থাকে।'

এরপর শুরু হয়েছিল প্রতীক্ষা। বাইরের দিকটা যতই অটুট থাক, ঠাকুরদার বুকের গভীরে ভবেশের পুব পাড়ায় আসার খবরটা শোনার পর থেকেই তুরু তুরু কাঁপুনি শুরু হয়েছিল। ঝোপের ভেতর দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল তাঁর। মনে মনে প্রার্থনা করেছিলেন, হে ঈশ্বর, ভবেশ যেন এদিকে না আসে।

কিন্তু ঠাকুরদার প্রাণের সব অস্থিরতা আর উদ্বেগকে প্রচণ্ড একটা ঠাট্টা করার জন্যই যেন শেষ পর্যন্ত ভবেশ এসেছিলেন এবং পুবের পাড়ার ভেতরে ঢুকে গিয়েছিলেন।

সেদিন কি-ভাবে যে সেই ঝোপের ভেতর থেকে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন, ঠাকুরদাই জানেন। তখনও ঠাকুমা বেঁচে আর ঠাকুরদা অন্ধ হন নি। ছেলের অধঃপতন আবিষ্কার করে গ্লানি ও ধিক্কারে জীবন বিস্বাদ হয়ে গিয়েছিল তাঁদের।

ছেলের এই অধঃপাত সব চাইতে বেশী বেজেছিল ঠাকুমাকে। তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। ঠাকুরদা অবশ্য অতটা পারেন নি। তবে বেঁচে থেকেও মৃত্যুর যন্ত্রণা প্রতি মুহূর্তেই অনুভব করেছেন। চোখ তুলে কারো দিকে তাকাতে পারতেন না। মুখ নীচু করে চোরের মত স্কুলে যাওয়া-আসা করতেন।

ঠাকুমার আত্মহত্যার আগে এবং পরে ছেলেকে ফেরাবার জন্য ঠাকুরদা না করেছেন কি। শুরু হয়েছিল শাসন দিয়ে। প্রতিদিনই তিনি শাসাতেন, 'এই শাস্ত্রী বাড়িতে এ লুচ্চামি চলবে না, এই শেষ কথা বলে দিলুম।'

প্রথমে শাসন-গর্জন, পরে অনুনয়-বিনয়—কিন্তু কোন অস্ত্রেই ভবেশকে ফেরাতে পারলেন না ঠাকুরদা। কতবার বুঝিয়েছেন, 'তুমি মেধাবী ছাত্র, অন্য দিকে মন না দিয়ে পড়াশুনো করে যাও। জীবনে যদি কৃতী হতে পার, যেটুকু কালি গায়ে লেগেছে মুছে যেতে কতক্ষণ।'

ঠাকুরদার এত চেষ্টা, সব নিষ্ফল হল। সন্ধ্যে হলেই পুবের পাড়াটা দূর থেকে ভবেশের দিকে সম্মোহন-মন্ত্র ছুঁড়ে মারত। আর আচ্ছন্নের মত পায়ে পায়ে সেদিকে হাঁটতে শুরু করতেন তিনি।

এদিকে থার্ড ইয়ার থেকে ফোর্থ ইয়ারে উঠেছিলেন ভবেশ। ফাইনাল পরীক্ষার মাস কয়েক আগে কলেজ বন্ধ করে দিলেন। পুবের পাড়া একেবারে গ্রাস করে ফেলল তাঁকে। আরো একটা উপসর্গ দেখা দিল এ-সময়। ধরা পড়ার আগে তবু কিছুটা লুকোচুরি ছিল। ধরাপড়ার পর সঙ্কোচের শেষ খোলসটা ঝেড়ে ফেললেন ভবেশ। আগে আগে চুপিসাড়ে লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে পুবের পাড়ায় যেতেন। পরে আর প্রয়োজন ছিল না। বাড়ি ফিরতেন ভোরের দিকে, ঢুলুঢুলু আরক্ত চোখে, অবসন্ন পায়ে টলতে টলতে।

কিন্তু শূন্যহাতে তো পুবের পাড়ায় যাওয়া যায় না। সেটা বিকিকিনির হাট। সেখানে আজ নগদ কাল ধার। প্রত্যহ টাকা তিনি কোথায় পাবেন? নিজের ঘড়ি আংটি সবই বিক্রি হয়ে গেছে। তা ছাড়া ঠাকুমার পুরনো আমলের ভারী ভারী তাল তাল গয়না ছিল। সেগুলো থাকত ঠাকুরদার ঘরে, লোহার সিন্দুকে। আর সিন্দুকের চাবি থাকত ঠাকুরদার কোমরের কষিতে বাঁধা। ভবেশ করলেন কি, মোম দিয়ে চাবির গর্তের ছাঁচ তুলে কলকাতা থেকে নতুন চাবি করিয়ে আনলেন। তারপর সুযোগ বুঝে সিন্দুক খুলে গয়না বার করে নিলেন ; সে সব বেচে যা পেলেন তার আয়ুই বা ক'দিন!

সুতরাং পুবের পাড়ার বাইরের মহল থেকে এবার ভবেশের দৃষ্টি ফিরল উত্তর-দক্ষিণ আর পশ্চিম পাড়ায়। অর্থাৎ রানীপুরের অন্তঃপুরে যেখানে গৃহস্থ ঘরের বউ-মেয়েদের মেল সাজানো।

কিন্তু দৃষ্টি পড়লেই তো আর সেখানে যাওয়া যায় না। কেন না ইতিমধ্যেই ভবেশ দাগী হয়ে গেছেন ; তাঁর গায়ে লাম্পট্যের শীলমোহর ছাপ মেরে দিয়েছে। সমস্ত রানীপুরে তখন একটা দুয়ারও আর তাঁর জন্যে খোলা নেই।

সুতরাং এক কৌশলের আশ্রয় নিলেন ভবেশ। হঠাৎ বিনা ভূমিকায় একদিন মদ ছাড়লেন, পুবের পাড়ার সংস্রব বর্জন করলেন। সব ছেড়েছুড়ে বাড়িতে এসে দরজায় খিল তুলে দিলেন।

একদিন দু-দিন করে পুরো একটা মাস বাড়ি থেকে এক পাও বেরুলেন না ভবেশ। ঘরে দুয়ার দিয়ে কী করতেন, তিনিই জানেন। যাই করুন, ঠাকুরদার বুকের আটকানো শ্বাসটা আবার সহজ হল। ছেলে যে সর্বনাশের শেষ কূল থেকে ফিরে এসেছে এতেই খুশী হয়ে উঠলেন ঠাকুরদা। আবার

লোকের কাছে মাথা তুলতে পারলেন। পাশার আড্ডাটা নতুন করে জমিয়ে তুলে তার ভেতর আবার নিজেকে ছড়িয়ে দিলেন।

রানীপুরের ঘরে ঘরে গুঞ্জন উঠল, 'শাস্ত্রী বাড়ির ছেলেটার মতিগতি তা'হলে ফিরল।'

ভাল ছেলে, সদ্বংশ—কুসঙ্গে পড়ে ক'দিন বিগড়ে গিয়েছিল। ও কিছু না; বয়েসের দোষ। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'যাবে কি, হয়ে গেছেই তো।'

রানীপুর অনায়াসেই ভবেশের সেই স্খলন ক্ষমা করে নিয়েছিল। ভবেশের ওপর তার বিশ্বাস ফিরে এসেছিল।

এক মাস পেরিয়ে দু-মাস পার হতে চলল। ছেলে ঘর থেকে বেরোয় না। ঠাকুরদা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ভবেশের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'দিনরাত ঘরে থাকলে অসুখ-বিসুখ করতে পারে। তার চাইতে বাইরে একটু ঘুরে এলেই তো পারিস ভব।'

দরজার ওপার থেকে ভবেশ বলেছেন, 'কোথায় যাব? লোকের কাছে মুখ দেখাতে আমি পারব না।'

ঠাকুরদা হয়ত কিছু একটা উত্তর, দিতেন। তার আগেই তাঁর পাশাখেলার সঙ্গী গোলোক বাঁড়ুজ্জে বলে উঠেছেন, 'আর কোথাও যেতে না পার, তুমি আমাদের বাড়ি যেও বাবা। তোমার কাকিমা বার বার করে তোমায় যেতে বলে দিয়েছে।'

'কিন্তু কাকা বাবু—'কুণ্ঠিত স্বরে মাত্র এইটুকুই বলতে পেরেছেন ভবেশ।

উদার সস্নেহ হাসিতে গোলোক বাঁড়ুজ্জের মুখ ভরে গিয়েছিল, 'আমার ওখানে তোমার কোন সঙ্কোচ নেই বাবা। যে জন্যে তোমার লজ্জা তা আমরা মনে করে রাখি নি।'

শুধু গোলোক বাঁড়ুজ্জেরই না, রানীপুরের সব অন্তঃপুরের দেউড়িই একে একে আবার খুলে গিয়েছিল।

কিছুদিন বেশ ভালই কাটল। এই শহরেরই ছেলে ভবেশ; আশৈশব সব বাড়িতেই তাঁর আনাগোনা। রানীপুরের ছোট্ট সংক্ষিপ্ত বৃত্তের মধ্যে সবার সঙ্গেই তাঁর প্রায় আত্মীয়তার সম্পর্ক। মাঝখানের ক'টা দিন অর্থাৎ পুবের পাড়ায় হানা দেবার সময়টা সুর কেটে গিয়েছিল। আবার সুরটা স্বাভাবিক ভাবে বাজতে শুরু করল।

কিন্তু বেশী দিন নয়। আবার তাল কাটল। পশ্চিম পাড়া, উত্তর পাড়া, দক্ষিণ পাড়ায় আবার গুঞ্জন উঠল। রমণী চাটুজ্জের মেয়েদের নাকি কি বলেছেন

ভবেশ। নন্দ মিস্ত্রিরের বউর হাত ধরে নাকি টানাটানি করেছেন। রানীপুরের সব প্রান্ত থেকেই এমনি অগণিত অভিযোগ ধূমায়িত হতে লাগল।

ফল হল এই, রাণীপুরের অন্দরমহলের দরজাগুলি আবার ঝপাঝপ বন্ধ হয়ে যেতে লাগল।

যথানিয়মে সমস্ত খবরই ঠাকুরদার কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। শুনে এবার আর তিনি কাঁদেন নি। ছেলেকে শাসন করেন নি, গালাগাল দেন নি এমন কি এ প্রসঙ্গে একটা কথা পর্যন্ত বলেন নি। দুদিন শুধু বিমূঢ় স্তম্ভিতের মত বসে ছিলেন। তারপর তৃতীয় দিন ভোরে আলপাকার কোট পরে বিদ্যাসাগরী চটি পায়ে দিয়ে বগলে একখানা হাল সনের পঞ্জিকা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন।

সেই যে ভোরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন যতক্ষণ আকাশে সূর্য ছিল, ফেরেন নি। এসেছিলেন সন্ধ্যের অনেক পর। ভবেশ তখন বাড়িতেই ছিলেন। ছেলের দিকে তাকিয়ে ঠাকুরদা বলেছিলেন, 'চাঁপদানিতে তোমার বিয়ে ঠিক করে এলাম।'

'বিয়ে।' ভবেশ চমকে উঠেছিলেন।

'অঘ্রান মাসের আজ পাঁচ তারিখ। সতেরই তোমার বিয়ে। তারিখটা ভুলে যেও না। ঐদিনটা কোথাও বেরুবে না; বাড়িতেই থাকবে।'

দুর্বিনীত ঘাড় বাঁকিয়ে ভবেশ বলেছিলেন, 'আমি বিয়ে করব না।'

'করবে, হাজার বার করবে। আমি পাকা কথা দিয়ে এসেছি। আমার কথার নড়চড় হবে না।' ঠাকুরদা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন।

'আপনি কি জোর করেই আমার বিয়ে দিতে চান নাকি?'

'তুমি যদি জোর করতে বাধ্য কর, তা-ই করতে হবে। আর যদি আমার কথা শুনে চল, জোরের প্রশ্নই ওঠে না।'

ঠাকুরদার কণ্ঠস্বরে, চোখের দৃষ্টিতে এবং সম্পূর্ণ অবয়ব ঘিরে অনমনীয় এমন কিছু ছিল যাতে আর কোন দুর্বিনয়ের সাহস করেন নি ভবেশ। স্থির দৃষ্টিতে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু বলেছিলেন, 'বেশ আপনার যা ইচ্ছা তাই হবে। তবে—'

'কী?'

একটু ইতস্তত: করে ভবেশ অবশেষে বলেছিলেন, 'না, কিছু না।' বলে আর দাঁড়ান নি। সামনে থেকে সরে গিয়েছিলেন।

তখনই শুধু না, পরেও আর কোন প্রতিবাদ করেন নি ভবেশ। অনুগত বাধ্য ছেলের মত ঠাকুরদার পিছু পিছু চাঁপদানিতে গিয়ে বিয়ে করে

এসেছিলেন। জাপানী পুতুলের মত ছোটখাটো একটি মানুষ অর্থাৎ রাজেশের মা এসেছিলেন তাঁর জীবনে।

বিয়ের পর থেকে ভবেশের জীবনে দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয়েছিল। এবার কিছুটা স্বস্তি পেয়েছিলেন ঠাকুরদা। হয়ত ভেবেছিলেন ছেলের চরিত্র সংশোধনের জন্য বিয়েই হচ্ছে একমাত্র অমোঘ মুষ্টিযোগ।

কিন্তু ঠাকুরদা এই ধারণাটা যে কতখানি ভ্রান্ত কিছুদিনের মধ্যেই তা টের পাওয়া গিয়েছিল। তখন বুঝেছিলেন, একটি মেয়ের জীবন মুঠিতে পুরে নিদারুণ এক জুয়ায় তিনি বাজি ধরেছেন এবং তাতে হেরে একেবারে ফতুর হয়ে গেছেন। কিন্তু সে-কথা পরের।

বিয়ের পর দিনকয়েক স্ত্রীর ঘন নিবিড় সান্নিধ্যের মধ্যে বুঁদ হয়ে রইলেন ভবেশ। বাড়ি থেকে বিশেষ বেরুতেন না। মনে হচ্ছিল গাঢ়, গভীর, সুখস্বাদ দাম্পত্য জীবন তাঁকে একটু একটু করে বিচিত্র এক বেষ্টনীর মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে আর ক'টা দিন!

এদিকে আরও একটা ব্যাপার ঘটছিল, ঠাকুরদা তাঁর দৃষ্টি হারিয়ে ফেলতে শুরু করেছিলেন।

তখনও স্কুলে চাকরি করতেন ঠাকুরদা। একদিন ক্লাস নিতে নিতে কি লিখবার জন্য ব্ল্যাক বোর্ডে যাচ্ছিলেন। যেতে যেতে হঠাৎ মনে হয়েছিল পায়ের তলায় সমস্ত সৌরলোক দুলে উঠেছে। আর অন্ধকার ঘরে হাজার পাওয়ারের বাতি নিভে যাবার মত ফস্ করে দিনের আলো যেন নিভে গেছে। চোখে হাত দিয়ে চিৎকার করে পড়ে গিয়েছিলেন ঠাকুরদা, 'আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

ক্লাসের ছেলেরা ধরাধরি করে তাঁকে অফিস ঘরে নিয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে বাড়ি। তারপর ডাক্তার, ওষুধ, স্পেসালিষ্ট, কলকাতা, হাসপাতাল। কিন্তু না, দৃষ্টি আর ফিরে পাননি ঠাকুরদা।

স্পেসালিষ্ট যেদিন শেষ রায় দিল তাঁর চোখে নতুন করে আলো জ্বলবে না, আর তিনি দেখতে পাবেন না, সব চিকিৎসার বাইরে তিনি চলে গেছেন, সেইদিন কলকাতা থেকে ফিরে সেই যে দরজায় খিল দিলেন ঠাকুরদা চারদিনের মধ্যে আর খুললেন না।

খুললেন তো না-ই; খেলেনও না; ঘুমোলেন না। এককোণে বসে দু-হাতে চোখ ঢেকে অবুঝ শিশুর মত শুধু কাঁদলেন। রাজেশের মা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বারবার বললেন, 'বাবা কাঁদবেন না, কাঁদবেন না—দরজা খুলুন।'

ভবেশও বোধহয় অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বলেছেন, 'ভাগোব

ওপর তো হাত নেই বাবা। চোখ হারিয়েছেন তার জন্যে কষ্ট পাবেন না আমরা তো আছি।'

পঞ্চমদিন সকালে দরজা খুলে বাইরে বেরুলেন ঠাকুরদা। দৃষ্টিহীন চোখদুটি ফোলা, আরক্ত। তবে চারদিনের অবিরত কান্নায় বুকের অনেক যন্ত্রণা বেরিয়ে গেছে, বোঝা গেল। দুঃখের তীব্রতা আর নেই। কিন্তু অদ্ভুত এক বিষাদ তাঁকে বেষ্টন করে ছিল। গভীর বিমর্ষ স্বরে বলেছিলেন, 'পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল চোখ। তাকেই আমি খোয়ালাম। আমার মত হতভাগা আর কে আছে! কিন্তু—'

ভবেশ কাছেই ছিলেন। বলেছিলেন, 'কী?'

'ভাবছি আমি তো অন্ধ হয়ে ঘরে বসলাম। সংসার চলবে কেমন করে?'

'আমি চালাব। দেখি একটা চাকরি বাকরির চেষ্টা করি।'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন নি ঠাকুরদা। অনেকক্ষণ পর বলেছিলেন, 'না, তোমার চাকরি করতে হবে না।'

রীতিমত অবাকই হয়েছিলেন ভবেশ, 'তা হলে সংসার চলবে কেমন করে?'

ঠাকুরদা কোমরের কষি থেকে সিন্দুকের চাবি খুলে ছেলের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন! বলেছিলেন, 'এটা রাখ।'

ভবেশ বোধহয় মনে মনে কিছুটা বিব্রতই হয়েছেন; বিশ্বাস করে সিন্দুকের চাবি ঠাকুরদা কোনদিনই তাঁর হাতে দেন নি। আগে চাবি সম্বন্ধে ঠাকুরদার বিশেষ সতর্কতা ছিল না। এখানে-সেখানে ফেলে রাখতেন। কিন্তু ভবেশ যেদিন থেকে পুবের পাড়ায় যেতে আরম্ভ করলেন এবং সেখানে যাবার কড়ি যোগাড় করতে লাগলেন গোপনে ক্যাশ বাক্স হাতড়ে আর চুরিচামারি করে, সেদিন থেকেই সিন্দুকের চাবি গিয়ে উঠেছিল ঠাকুরদার কোমরে।

ঠাকুরদা যে এত অনায়াসে সিন্দুকের চাবি তাঁর হাতে তুলে দেবেন এ ছিল ভবেশের পক্ষে অভাবনীয়। কুণ্ঠিতমুখে তিনি বলেছিলেন, 'ওটা আপনার সিন্দুকের চাবি, আপনার কাছেই থাক।'

'আমার কাছে থাকা না থাকা এখন সমান কথা। চোখ খুইয়েছি, সংসারের সব হিসাব থেকে এখন আমি বাতিল। সমস্ত দায়িত্ব এখন তোমাকেই নিতে হবে।' বলতে বলতে ঠাকুরদা থেমেছিলেন। পরক্ষণেই আবার শুরু করেছিলেন, 'তোমার মায়ের যা গয়নাগাটি ছিল সবই তো প্রায় নষ্ট করেছ। সে যাক, এখনও কিছু পড়ে আছে। আছে আমার বাবার আমলের দেড়শখানা গিনি আর নবাবী আমলের তিরিশটা সোনার মোহর। হাজার পাঁচেক টাকা আমি জমিয়েছি। সব ঐ সিন্দুকের ভেতরেই পাবে। এসব নেড়েচেড়ে

তোমাকে সংসার চালাতে হবে। লতিকার বিয়ে দিতে হবে।'

'কিন্তু চাকরি না নিলে কি চলবে? সিন্দুকে যা আছে তাতে আর ক'দিন।'

শান্ত দৃঢ় স্বরে ঠাকুরদা বলেছিলেন, 'হিসেব করে চললে অনেকদিন। নইলে দু-দণ্ডও না। তা ছাড়া শুধু ঐ ক'টা টাকা-গিনি-মোহরই নাকি, ধান জমি আছে বিঘে পঁচিশেক। সেখান থেকে যে ধান পাবে ফেলে ছড়িয়ে খেয়েও হাজার টাকার মতন বেচা যায়। খালি ধানই? শীতে আলু পাবে। ফাল্গুন-চোত মাসে পাবে মুগ, অড়র, মটর। মাছের জন্য পুকুর আছে। আনাজের জন্যে আছে বাগান। চারদিক রক্ষণাবেক্ষণ করে বুঝে শুনে যদি চল, অভাব কিসের? তুমি আমায় অনেক কষ্ট দিয়েছ ভবেশ। এখন অন্ধ হয়েছি, বয়েসও হয়েছে। বেশী দিন আর বাঁচব না। যে ক'টা দিন বাঁচি আমার কথামত চলে একটু শান্তি দাও। আমি পরলোক মানি। সেখানে গিয়ে যেন না দেখতে হয়, তোমার হাতে আমি সংসারটাকে ভাসিয়ে দিয়ে এসেছি।'

ভবেশ আর কিছু বলেন নি। হাত বাড়িয়ে ঠাকুরদার হাত থেকে সিন্দুকের চাবিটা নিয়েছিলেন।

এই চাবি হস্তান্তরের মধ্যে ঠাকুরদার মনোভাব যেন ধরা পড়েছে। এর মধ্যে কিছুটা কৌশলও আছে। অবশ্য সেটা ছেলের মঙ্গলের জন্যেই। আগেই ভবেশের বিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। এবার সংসারের দায়িত্ব সিন্দুকের চাবি সঁপে দিয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, এ সবের চাপে ছেলে অন্যদিকে চোখ ফেরাতে পারবে না।

কিন্তু কোন কৌশলই কাজে লাগল না। অবশ্য ঠাকুরদার আকস্মিক অন্ধত্ব, সিন্দুকের চাবি হাতে পাওয়া—সব মিলিয়ে সাময়িক কিছুদিনের জন্য অভিভূত হয়ে ছিলেন ভবেশ। কিন্তু সেই ভাবটা যেতে খুব বেশী সময় লাগল না। এই সংসারের সমস্ত স্বর্ণ, অর্থ আর সঞ্চয় তাঁর মুঠোর মধ্যে। ভিতরের গহন বিবরে পুরনো অভ্যাসের দৈত্যগুলোকে দিন কয়েকের জন্য ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলেন ভবেশ। মন্ত্র পড়ে আবার তিনি তাদের জাগালেন। আর জেগেই ভবেশের দু হাত ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে তারা ছুটিয়ে নিয়ে চলল।

আর ঠিক এই সময়ে রাজেশের জন্ম। বড় হয়ে জ্ঞান হবার পর কী দেখেছে রাজেশ? সেটাকে বোধ হয় ভবেশের জীবনের তৃতীয় অধ্যায় বলা যেতে পারে।

রাজেশ দেখেছে, ঠাকুরদা আলো বাতাস-বর্জিত দমবন্ধ একখানা ঘরে

নির্বাসন বেছে নিয়েছেন। মাকে ঘিরে পৃথিবীর অনন্ত বিষাদ ঘন হয়ে আছে হাসিতে খুশিতে প্রাণোচ্ছলা পিসি প্রায়ই পেছনের বাগানে গিয়ে একট উদাস স্তব্ধ মূর্তির মত বসে থাকত।

তার জন্মের পর মায়ের নাকি এ্যানিমিয়া হয়েছিল। দেহে সারবস্তু কি ছিল না, একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। মায়ের বুকের যে উৎে মুখ রেখে শিশু বাঁচে, তার শরীর পুষ্ট হয়, সেই অমৃত থেকে বঞ্চিত হবে হয়েছিল রাজেশকে। ডাক্তারের বারণ ছিল।

মায়ের দুধের বিকল্প হিসাবে গরুর দুধও তার জোটেনি। পিসি তাকে বার্লি খাইয়ে খাইয়ে রাখত। তাই প্রথম সাত আটটা বছর পর্যন্ত সে ছিল ভয়ানক রকমের নির্জীব। শরীর ছিল অপুষ্ট, রুগ্ন। ভাল করে হাঁটতে পারত না, কথাও স্পষ্ট হত না; উচ্চারণে জড়তা ছিল।

জীবনের প্রথম আট-দশটা বছর ক'টা দিন পেট ভরে খেতে পেয়েছে রাজেশ গুনে বলে দিতে পারে। শুধু কি সে-ই, সংসারের সবাই দিনের প দিন অভুক্ত কি অর্ধভুক্ত অবস্থায় কাটিয়েছে।

এ তো গেল খাবার কথা। জামা কাপড়? মাকে, পিসিকে কি ঠাকুর দাকে কোনদিন আস্ত কাপড় পরতে দেখেছে কি-না রাজেশের মনে নেই তাঁরা যা পরতেন হয় সেগুলো তালি মারা, নয় সেলাই কিংবা রিফু করা। তা নিজের প্যাণ্ট-জামাগুলোরও একই হাল।

অথচ ভবেশ? প্রায় প্রতিমাসেই তাঁর জন্য ফরাসডাঙার ধুতি, তসরে পাঞ্জাবি আর সাহেব বাড়ির পাম্প শু আসত।

কদাচিৎ বাড়িতে খেতেন ভবেশ। বেশীর ভাগ দিনই বাইরে খে আসতেন। যেদিন বাড়িতে খাবার ইচ্ছে হত, নিজেই যেতেন বাজারে মাছ আনতেন দু-তিন রকমের, মাংস আনতেন, ফল-মিষ্টি-দই-আনাজ স এমন মাপে আনতেন যাতে একজনের বেশী দু জনের হত না।

রাজেশের মায়ের রান্না শেষ হতে না হতে ভবেশ স্নান সেরে খেতে বসে যেতেন। খাবার সময় মা ছাড়া তাঁর কাছাকাছি কেউ ঘুরঘুর করলে তিনি বিরক্ত হতেন। মুখে অবশ্য কিছু বলতেন না কিন্তু রুষ্ট অসন্তুষ্ট চোখে এমন ভাবে তাকাতেন যা বলার চাইতে অনেক বেশী তীব্র আর মারাত্মক। কাজেই রাজেশ আর তার পিসি লতিকা দূরে দূরেই থাকত। দক্ষিণ প্রান্তে শেষ ঘরখানার জানালায় চোখ রাখলে রান্নাঘরের ভেতরটা পরিষ্কার দেখা যেত। রান্নাঘরেই খেতে বসতেন ভবেশ। মনে আছে, যতক্ষণ বাবা খাওয়া না হত, জানালায় চোখ রেখে পিসি আর রাজেশ দাঁড়িয়ে থাকত।

ভবেশের থালা আর থরে থরে চারপাশে সাজানো বাটিগুলো যতই নিঃশেষ হয়ে আসত, দক্ষিণের ঘরের জানালায় রাজেশ আর তার পিসির চোখ ক্রমশঃ করুণ আর বিমর্ষ হয়ে উঠত।

রাজেশের মনে পড়ে, যে বয়সে ছেলেরা প্রথম স্কুলে যায় সেই সময় অপুষ্ট নির্জীব শরীরে ধুলো-কাদা মেখে সে পিসির পিছু পিছু খেলে বেড়াত।

ঠাকুরদা মাঝে মাঝে চিৎকার করতেন, 'হে ভগবান, কেন যে জানোয়ারটার বিয়ে দিয়েছিলাম আর সর্বস্ব হাতে তুলে দিয়েছিলাম! নিজে কষ্ট পেলাম, পেলাম। পরের একটা মেয়ে এনে সারা জীবনের মত সর্বনাশ করে দিলাম। একটা মাত্র নাতি, তাকেও স্কুলে দিলে না। ভবিষ্যৎ যে ওর কী হবে! মানুষ নয়, একটা পশু, পশু।'

রাজেশের বয়স যখন আট নয়, রানীপুর হাইস্কুলের হেডমাস্টার একদিন তাদের বাড়ি এসেছিলেন। তাঁর স্কুলেই ঠাকুরদা কাজ করতেন। পৃথিবীর প্রায় সবার সঙ্গেই সংযোগ ছিন্ন করে ফেলেছিলেন ঠাকুরদা। শুধু ঐ মানুষটি ছাড়া। মাঝে মাঝে হেডমাস্টার মশাই এসে তাঁর অন্ধ সহকর্মীর খোঁজ খবর নিয়ে যেতেন।

হঠাৎ সেদিন হেডমাস্টার মশায়ের নজর পড়েছিল রাজেশের ওপর। জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ওটি আপনার নাতি না?'

'হ্যাঁ।' ঠাকুরদা মাথা নেড়েছিলেন।

'এত রোগা কেন?'

কেন যে রাজেশ রোগা আর অপুষ্ট, ঠাকুরদার চাইতে কে আর ভাল জানে! রুদ্ধশ্বাসে তিনি বসে ছিলেন। উত্তর দেন নি।

হেডমাস্টার মশায় রাজেশের শারীরিক রুগ্নতা নিয়ে আর কোন প্রশ্ন করেন নি। শুধু জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'বয়েস কত হল নাতির?'

'আট পেরিয়ে ন'য়ে পড়েছে।' ঠাকুরদা বলেছিলেন।

'স্কুলে দিয়েছেন?'

'না।'

'এখনও দেননি, সে কি!' রীতিমত অবাকই হয়েছেন হেডমাস্টার মশায়।

রাজেশের শিক্ষা-দীক্ষা এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্পর্শকাতর একটা জায়গা ছিল ঠাকুরদার প্রাণে। শ্বাস রুদ্ধ করে অনেকক্ষণ নিজেকে সংযত রেখেছিলেন তিনি। এবার তাঁর সমস্ত বাঁধ ভেঙে পড়েছে। কেন যে এত বেশী বয়সেও রাজেশকে স্কুলে পাঠানো সম্ভব হয়নি, অকপটে সমস্ত বলে গেছেন। কোন কিছু গোপন করেন নি, আড়াল করেন নি। রাজেশের পড়াশোনার কথায় সংসারের

কথা এসেছে।

নিজের পরিবারে যে গ্লানিকর পালাটা চলছে সে-সব কথা বাইরের লোককে বলতে কোনকালেই উৎসাহ বোধ করতেন না ঠাকুরদা। কিন্তু সেদিন কি যেন হয়ে গিয়েছিল তাঁর। চারদিকের সমস্ত যবনিকা একটানে তুলে দিয়ে সংসারের আসল চেহারাটা হেডমাস্টার মশায়ের সামনে মেলে ধরেছিলেন।

এই ছোট্ট সংক্ষিপ্ত ভবানীপুরে রাজেশ যে কিভাবে দিন কাটাচ্ছে, সে খবর মোটামুটি সবার কাছেই পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু ব্যাপারটা যে এত করুণ, এত মর্মান্তিক আর দুঃসহ, তা হেডমাস্টার মশায় জানতেন না। কিছুক্ষণ ব্যথিত বিস্ময়ে স্তব্ধের মত বসে ছিলেন তিনি। তারপর বলেছিলেন, 'আপনি আমাকে একটা অনুমতি দিন পণ্ডিত মশাই।'

'কী?'

'আপনাদের সংসার সম্বন্ধে আমি কোনরকম মন্তব্য করব না। তবে এই ছেলেটির শিক্ষার দায়িত্ব আমি নিতে চাই। আপনি না বললেও শুনব না।'

ঠাকুরদা কিছু বলেন নি। শুধু তাঁর অন্ধ চোখে কৃতজ্ঞ দৃষ্টি ফুটে উঠেছিল। কাঁপা ব্যগ্র দুটি হাত বাড়িয়ে হেডমাস্টার মশায়ের কাঁধটা আঁকড়ে ধরেছিলেন।

স্কুলে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল রাজেশ। ফ্রী-শিপও পেয়েছিল। বই-খাতা হেডমাস্টার মশাই কিনে দিতেন। ম্যাট্রিকটা যে পাস করতে পেরেছিল, সে তাঁরই অনুগ্রহে।

শৈশবেই রাজেশ বুঝতে পেরেছিল, তাদের সংসারের প্রতিটি মানুষের দুঃখের কেন্দ্রে বসে আছেন ভবেশ। রাজেশদের সংসারের প্রতিটি মানুষের জীবনী শক্তি প্রত্যহ তিলে তিলে ক্ষয় করে এনেছেন তিনি।

জ্ঞান হবার পর থেকেই বোধ হয় বাপকে ঘৃণা করতে শিখেছিল রাজেশ। অবচেতনে একটু একটু করে আক্রোশের বিষ জমা হচ্ছিল। যত সে বড় হয়েছে, বাপ সম্পর্কে মনোভাব স্পষ্ট একটা আকার নিচ্ছিল।

অন্যের সঙ্গে ভবেশ কী ব্যবহার করেছেন, তা নিয়ে সেই বয়সে দুশ্চিন্তা ছিল না রাজেশের। তার প্রতি বাবার যে নিদারুণ উদাসীনতা, অনাদর আর উপেক্ষা—সেটুকু সে বুঝতে পারত। তার সমবয়সী দু-চারটে ছেলের বাড়ি ছিল কাছাকাছি। মাঝে মাঝে রাজেশ তাদের বাড়ি খেলতে যেত। সেখানে দেখেছে তার বন্ধুরা তাদের বাপেদের স্নেহের ভাণ্ডার লুট করত। মণ্টু বলে একটা ছেলে ছিল। তার বাবা ছেলের সঙ্গে চোর-পুলিস খেলতেন। দেখতে দেখতে রাজেশের চোখ চকচকিয়ে উঠত। পরক্ষণেই নিজের বাবার

কথা মনে পড়তেই বিচিত্র ব্যথায় ম্লান হয়ে যেত সে।

কোনদিন বাবা তাকে আদর করেছেন এমন ঘটনা রাজেশের স্মৃতিতে একান্তই দুর্লভ। অথচ একটু আদর আর একটু স্নেহের জন্য কতদিন কাঙালের মত ভবেশের দিকে তাকিয়ে থেকেছে সে। ভবেশ ফিরেও দেখেন নি।

ক'টা দিন ভবেশ তার সঙ্গে কথা বলেছেন? বোধহয় আঙুলের কড় গুনে বলে দিতে পারে রাজেশ।

যাই হোক, প্রথম জীবনে রানীপুরের পুবপাড়ায় হানা দিতেন ভবেশ। দ্বিতীয় পর্বে উত্তর-পশ্চিম-দক্ষিণ—রানীপুরের অন্তঃপুরে সিঁদ চালিয়েছিলেন। তার পরের অধ্যায়ে ঠাকুরদার সিন্দুকের চাবি মুঠোয় পাবার পর কলকাতায় ছুটতেন। রাতের কলকাতা আনন্দের ভিয়েন চড়িয়ে রেখেছে। নরম পাক, কড়া পাক—সেখানে হাজার আনন্দ।

ভবেশ কলকাতায় গেলে দু-চারদিনের আগে ফিরতেন না। যেদিন আসতেন ক্লান্ত, অবসন্ন, মথিত দেখাত। আনন্দটা যে অতিরিক্ত চড়া রকমেরই হয়েছে সেটা অনুমান করতে কষ্ট হত না।

এই ভাবেই চলছিল। সংসারের জীবনী-শক্তিকে মুঠোয় পুরে কলকাতার গনগনে ফুর্তির আগুনে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিয়ে আসতেন ভবেশ। এই নিয়ে ঠাকুরদার সঙ্গে আগে-আগে খুবই ঝগড়া হত। ঠাকুরদা কাঁদতেন। অভিসম্পাত আর গালাগাল—যুগপৎ এক সঙ্গে দিতেন। দেওয়ালে কপাল ঠুকতে ঠুকতে গুঙিয়ে গুঙিয়ে বলতেন, 'তুই মর, মর—'

ভবেশ গ্রাহ্যও করতেন না। নিজের লক্ষপথে তিনি ছুটে যাচ্ছিলেন।

এই নিয়মে দিন কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু ঠাকুরদা যে চাবিটা ভবেশের হাতে তুলে দিয়েছিলেন তা দিয়ে ছোট একটা সিন্দুকই খোলা যায়। তার ভেতরে আর কুবেরের ভাণ্ডার ছিল না। হাজার কয়েক টাকা, কিছু গিনি আর খান কয়েক মোহর—পারিবারিক এই সঞ্চয়টুকু ভবেশের আনন্দ-সন্ধানের পেছনে দেখতে দেখতে ডানা মেলে উড়ে গেল।

তখন ভবেশ করলেন কি, মাড়োয়ারীর কাছে বাড়িটা বাঁধা দিলেন, ধানজমি বিক্রি করতে লাগলেন। সেগুলো যখন শেষ হল, হুণ্ডি কেটে ধার করতে লাগলেন। এমন একটা সময় এল ধার আর মেলে না। সেই সময় তাঁর ফুর্তির কর যোগান দেবার জন্য রাতের অন্ধকারে চুপিসাড়ে একদল বিচিত্র নাম-ধাম-না-জানা মানুষ বাড়িতে আসত। ফিস ফিস করে অনুচ্চ চাপা গলায় ভবেশের সঙ্গে তাদের কী কথা হত কে বলবে। তবে প্রতিবারই যাবার সময় লরী বোঝাই করে ত্রিপল চাপা দিয়ে তারা কিছু না কিছু নিয়ে যেত।

কোনবার নিত পুরনো আমলের নক্সাকাটা খাট, কোনবার আলমারি-টেবিল।

লোকগুলো এলেই দেওয়ালে মুখ চেপে ধরে গুমরে গুমরে মা কাঁদতে থাকতেন। তাঁর কান্নার সরু সর্পিল স্বর আস্তর-খসা নোনা ধরা ইটের অরণ্যে হারিয়ে যেত।

এরই মধ্যে একদিন ঠাকুরদা পরম বিবেচনার কাজটি করে বসলেন। চ দিনের জ্বরে চোখ বুজলেন। আর ঠাকুরদার মৃত্যুর মাসখানেক পর কুণ্ডুদের একটা ছেলের সঙ্গে পিসি কলকাতা পালিয়ে গেল। নিষ্ঠাবান শাস্ত্রী বংশের মেয়ের পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে ঘিরে সারা রানীপুর তোলপাড় হল।

কলকাতা থেকে রাজেশের মাকে একটা চিঠি লিখেছিল পিসি। সে বিয়ে করে সংসার পেতেছে ; সুখের সংসার। বৌদি যেন আশীর্বাদ করেন।

ঠাকুরদা মারা গেছেন। পিসি কলকাতায় পালিয়েছে। বাড়িতে তখন রাজেশ, তার মা আর ভবেশ। যাই হোক, এদিকে তো বাড়ি গেছে, জমি গেছে, আসবাব বাসন-কোসন—কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। তার ওপরে আছে পর্বত প্রমাণ ঋণ। ভবেশের আনন্দ-সন্ধানে ভাটার টান ধরল। ঘাড় গুঁজে মুখ থুবড়ে বাড়ি এসে বসলেন তিনি। কিন্তু সে আর ক'টা দিন ?

যৌবনের শুরু থেকে যে অভ্যাসের সাধনা তিনি করে বেড়িয়েছেন সেগুলো তাঁকে স্থির থাকতে দিল না। অতএব আবার বেরিয়ে পড়লেন ভবেশ। এবার আর দূরের কলকাতায় নয়। কিংবা কাছের পুবপাড়াতেও না। সে সব জায়গায় যেতে হলে যে চড়া দাম লাগে, ভবেশের তা নেই।

কাজেই আঁস্তাকুড়ে অভিসার শুরু হল। অর্থাৎ রানীপুরের পশ্চিম প্রান্তে একদল ইরাণী যাযাবর তাঁবু গেড়েছিল। সেখানে সস্তায় স্বৈরিণী পাওয়া যেত। ভবেশ নিয়মিত হানা দিতে লাগলেন।

এই যাযাবরী দেহপণ্যাদের নিয়েই একদিন সংসার জীবনে নিদারুণ ব্যাপার ঘটে গেল। ঠাকুরদা নেই ; বাড়িতে ভবেশের রাজত্ব একেবারে নিরঙ্কুশ। বৃদ্ধ বেঁচে থাকতে বাইরে যা-খুশি করে বেড়াতেন ভবেশ কিন্তু বাড়ির ভেতরে মাত্রাছাড়া বেলেল্লাপনা চলত না। মদে চুর চুর হয়ে ফিরে এসে মারধোর চেঁচামেচি করতেন বটে, কিন্তু ঠাকুরদা হুঙ্কার দিলে থেমে যেতেন।

কিন্তু সে বাধা আর নেই। সুতরাং কি এক মর্মান্তিক খেয়াল হল ভবেশের। একদিন দুপুরে একটা যাযাবরীকে বাড়িতে এনে তুলেছিলেন। বাজার থেকে মাছ-মাংস এনে রাজেশের মায়ের হাতে দিয়ে বলেছিলেন, 'ভাল করে রান্নাবান্না কর, আসমানী আজ এখানে থাকবে।'

রাজেশের মা কিছু বলেন নি। শুধু তাঁর চোখ দুটো চকিতের জন্য জলে

উঠেছিল। আর জাপানী পুতুলের মত ছোট-খাটো দেহখানি ঘিরে সাংঘাতিক এক কাঠিন্য নেমে এসেছিল। সমস্ত বাড়িটার ওপর কি এক দুর্যোগ ক্রমাগত ঘন হচ্ছিল যেন। রাজেশের মনে আছে, সারাটা দিন ভবেশ সেই ইরাণী স্বৈরিণীটার সঙ্গে গুজ গুজ করে গল্প করেছেন, থেকে থেকে কি যেন রসের কথায় জোরে জোরে গলা ফাটিয়ে হেসে উঠেছেন।

আর মা সবাইকে খাইয়ে নিজে স্নান করে এসে নিজের ঘরে পাথরের একটা মূর্তির মত বসে ছিলেন। সকাল থেকে এক ফোঁটা জল পর্যন্ত তিনি স্পর্শ করেন নি। ভয়ে ভয়ে দুরু দুরু বুকে রাজেশ বলেছিল, 'মা, তুমি খেলে না ?'

হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন মা, 'খাব, খাব, সবাইকে খাব। ঘর-বাড়ি-সংসার—সবাইকে। সবার আগে খাব তোকে। আয়—'বলেই অন্ধের মত রাজেশকে মারতে শুরু করেছিলেন।

মার খেয়ে রাজেশ কাঁদে নি। স্তম্ভিত বিস্ময়ে সে শুধু বোবা হয়ে গিয়েছিল। চিরদিনই মাকে দেখেছে শান্ত, স্বল্পভাষিণী, সহিষ্ণু আর নিঃশব্দচারিণী। আগে আর কোনদিন তিনি তার গায়ে হাত তোলেন নি। হাত তুলতে যে তিনি পারেন সেটাই এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

মারতে মারতে এক সময় চেতনা ফিরে এসেছিল মায়ের। দু হাতে রাজেশকে বুকের ভিতর নিয়ে এসে পাগলের মত মাথায়-গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে ফুঁপিয়ে উঠেছিলেন, 'এ আমি কি করলাম, কি করলাম আমি!'

যাই হোক রাত্রিবেলা মা এবং রাজেশ এক বিছানাতেই শুয়েছিল। ভবেশ একই ঘরে শুয়েছিলেন ; তবে আলাদা বিছানায়। আর বেদেনী ছিল পাশের ঘরে।

বেদেনী যখন এসেছিল, তখন থেকেই রাজেশের স্নায়ুগুলো অস্পষ্টভাবে জানান দিচ্ছিল, কি একটা অনিবার্য সংঘাত যেন আসন্ন। সমস্ত বাড়িটা ঘিরে কোথায় যেন বিস্ফোরক জমা হচ্ছিল। যে কোন মুহূর্তে সেটা বিদীর্ণ হতে পারে।

চরম পরিণতিটার জন্য রুদ্ধশ্বাসে সারাদিন মায়ের কাছে কাছে থেকেছে রাজেশ। রাত্রে শুয়েও জেগে থাকতে চেয়েছে। কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে খেয়াল ছিল না।

হঠাৎ দ্রুত শ্বাস টানা আর বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ার মত একটানা আওয়াজে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল রাজেশের। চকিতের জন্য মায়ের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল তার। ক্ষিপ্র হাতটা পাশের দিকে ছুঁড়ে দিতেই টের পেয়েছিল, মা বিছানায় নেই।

লাফ দিয়ে উঠে বসেছিল রাজেশ। আর উঠেই তার চোখে পড়েছিল ভবেশের বিছানাটাও শূন্য। মা এবং বাবা কোথায় গেছেন? ঘুমের চোখ দুটো ভাল করে রগড়ে এদিক সেদিক তাকাতেই মাকে দেখতে পেয়েছিল রাজেশ। শিয়রের দিকে অর্থাৎ দক্ষিণের দেওয়ালে কালীর প্রকাণ্ড একটা ফোটো টাঙানো ছিল। তারই সামনে চোখ বুজে বসে ছিলেন মা। বন্ধ চোখের ফাঁক দিয়ে স্রোত নেমে এসেছিল। আর শরীরটা অস্বাভাবিক কাঁপছিল। মানুষ যে ভাবে জপ করে সে রকম অস্বচ্ছ চাপা স্বরে মা সমানে বলে যাচ্ছিলেন, 'আমাকে শক্তি দাও, হে ঈশ্বর, শক্তি দাও। হে মা কালী, আমি যে আর পারছি না।'

মাকে ডাকে নি রাজেশ। বিহ্বলের মত তাঁর পেছনে গিয়ে বসেছিল। আর বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ তার খেয়াল হয়েছে, মাকে তো দেখল, কিন্তু ভবেশ কোথায়?

ভবেশ কোথায় গেছেন, পরের দিন সকালে তা টের পাওয়া গিয়েছিল। সারা রাত কালীর ফোটোর সামনে কাটিয়ে ভোরবেলা উঠে পড়েছিলেন মা। পাশের ঘরে যেখানে যাযাবরী ছিল, তার দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিয়েছিলেন। রাজেশও তাঁর পিছু পিছু উঠে গিয়েছিল।

ঘরের ভেতর থেকে ভবেশের গলা শোনা গিয়েছিল, 'কে?'

ভবেশ তা হলে এখানে! রাত্রিবেলা বিছানা ছেড়ে এ ঘরে এসে ঢুকেছিলেন?

অসংযত কাঁপা গলায় মা বলেছিলেন, 'আমি, দোর খোল।'

দরজা খুলে একটু পর ভবেশ বেরিয়ে এসেছিলেন। ঈষৎ স্খলিত স্বরে বলেছিলেন, 'কি ব্যাপার কী?'

চিরদিনের শান্ত সহিষ্ণু নির্বাক মা চিৎকার করে উঠেছিলেন, 'বাড়িতে এ-সব চলবে না। বেশ্যাটাকে এই মুহূর্তে বার করে দাও, আর নিজেও দূর হয়ে যাও।'

মায়ের চুল ছিল খোলা। খোঁপা বা বেণীর বন্ধন ছিল না। সেই মুহূর্তে সেগুলো উড়ছিল। চোখ দুটো আগুনের শিখার মত দপ দপ করছিল।

মায়ের এমন মূর্তি ভবেশের অপরিচিত। সে দিকে তাকিয়ে তিন পা পিছিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। সাহস সঞ্চয় করে রুখে দাঁড়াতে অনেকক্ষণ সময় লেগেছিল। গর্জে উঠে বলেছিলেন, 'কি, এত বড় আস্পর্ধা। এ আমার বাড়ি, আমি যা খুশি করব। তোর থাকতে ইচ্ছে না হলে তুই বেরো।'

'যা খুশি করবে?' মা উন্মত্তের মত তাকিয়েছিলেন।

'নিশ্চয়ই, এ আমার বাড়ি।'

মা এবার ছুটে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকেছিলেন। একটা দা বার করে এনে বলেছিলেন, 'এই নাও, এটা দিয়ে আগে আমাকে বলি দাও। তারপর তোমার প্রাণে যা আছে তাই কোরো। আমাকে না মেরে কিছুই করতে পারবে না।'

এরপর ভবেশ চিৎকার-গর্জন, সবই করেছিলেন কিন্তু মনে মনে কিছুটা থতিয়েও গিয়েছিলেন বোধ হয়। বেদেনীকে বার করে দিয়েছিলেন। আর কোনদিন কোন ছলেই তাকে বাড়িতে এনে তোলেন নি।

আর শৈশব থেকেই বাপের বিরুদ্ধে একটু একটু করে যত ঘৃণা আর বিদ্বেষ রাজেশের বুকে জমা হচ্ছিল সেই মুহূর্তে ফুলে ফেঁপে সমুদ্রের মত সেগুলো উত্তাল হয়ে উঠেছিল। ভবেশ সম্বন্ধে তার আক্রোশ শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছিল সে দিন।

যাই হোক, এমন একটা সময় এল যখন সস্তার স্বৈরিণীদের কাছে যাবার কড়িও আর নেই। এদিকে ভবেশ যাদের কাছে হ্যাণ্ডনোট আর হুণ্ডিতে টাকা ধার নিয়েছিলেন তারা একে একে হানা দিতে লাগল। সংখ্যায় কি তারা একজন দু-জন? কত যে তার লেখাজোখা নেই। আর ধারের ব্যাপারে ভবেশের কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। কাবলিওলা থেকে শুরু করে মাংসের দোকানের কসাই শ্মশানের ডোম পর্যন্ত তাঁর পাওনাদার।

প্রথম প্রথম ভাল কথায় পাওনাদারদের ফিরিয়েছেন ভবেশ। যখন তারা বুঝল, ঋণ পরিশোধ ভবেশের চরিত্র-বিরুদ্ধ তখন শুরু হল কথা কাটাকাটি, ঝগড়া। পাওনাদারেরা সে সময় একসঙ্গে একঝাঁকে আসত, বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে অশ্রাব্য গালাগাল করত। ভবেশও গলা ফাটিয়ে সে-সবের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতেন। একেক দিন মারামারিও হয়ে যেত। সে এক কুৎসিত জঘন্য আবহাওয়া।

ওদিকে ঘরের ভেতর ভয়ে দু-হাত দিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে থাকত রাজেশ। মা কিছু বলতেন না; স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। তাঁর মুখখানা অনুভূতি-শূন্য পাথর দিয়ে তৈরি মনে হত সে-সময়।

শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন দাঁড়াল, পাওনাদারের সম্মিলিত আক্রমণের সামনে দাঁড়াতে সাহস পেতেন না ভবেশ। ঘর থেকেই আর বেরুতেন না তিনি। পাওনাদার ঠেকাবার জন্য কৌশল বার করেছিলেন। তারা এলেই মাকে বলতেন, 'যাও, ওদের বলে এসো আমি বাড়ি নেই।'

কঠিন স্বরে মা বলতেন, 'আমি পারব না।'

'কেন, কেন পারবে না?' ভবেশ উত্তেজিত হয়ে উঠতেন।

স্থির দৃষ্টিতে ভবেশের চোখের দিকে তাকিয়ে মা জিজ্ঞেস করতেন, 'কেন পারব ? তোমার কোন গুণের জন্যে ?'

একটু থতিয়ে থেকে ভবেশ গর্জে উঠতেন, 'শোন মাগী, আমার খাস-পরিস। সেই জন্যেই তোকে পারতে হবে।'

'তোমার থাই পরি,না !' বিচিত্র হাসতেন মা। সে হাসিতে রাগ, বিদ্বেষ, ঘৃণা, বিতৃষ্ণা—কী যে থাকত কে বলবে।

'নিশ্চয়ই,—হাজারবার। স্বামী বিপদে পড়লে কোন মেয়েমানুষটা না তাকে বাঁচায় ?' ভবেশ চেঁচাতেন।

তুমি যদি ন্যায়ের জন্যে বিপদে পড়তে আমি প্রাণ দিতাম। কিন্তু যে কাজে আমাকে পাঠাতে চাইছ মনে প্রাণে আমি তা ঘৃণা করি।'

'ও-ও, খুব ন্যায়উলী দেখছি ! আচ্ছা, তেল আমি তোর মেরে ছাড়ব।'

মা আর কোন উত্তর দিতেন না। চেঁচাতে চেঁচাতে হঠাৎ ভবেশের নজর এসে পড়ত রাজেশের দিকে। মুস্কিলের আসানটা যেন হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছেন এমনভাবে বলে উঠতেন, 'এই যে রাজু, যা তো বাবা ওদের বলে আয়, আমি বাড়ি নেই।' তাঁর স্বরে পৃথিবীর সবটুকু সুধা ঢালা থাকত এ-সময়।

রাজেশ কিছু বলার বা বাপের নির্দেশ পালন করার আগেই শরীরের সমস্ত শক্তিটুকু গলায় ঢেলে দিয়ে মা চিৎকার করে উঠতেন, 'না--না—'

ভবেশ চকিত হয়ে উঠতেন, 'কী, না ?'

'রাজু যাবে না।'

'যাবে না, তার মানে ?'

তুমি যা করেছ, কর। তার মধ্যে আর ছেলেটাকে ডুবিয়ে দিও না।'

'চোপরাও হারামজাদী।' হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মত ভবেশ তেড়ে আসতেন, 'তুই যাবি না, যাবি না। আমার ছেলে হাজার বার যাবে। বাপকে সে বাঁচাবে।'

রাজেশকে বুকের ভেতর পুরে দু-হাতে আগলাতে আগলাতে মা বলতেন, 'আমার ছেলে ! বলতে লজ্জা করল না ! বাপের কোন কর্তব্যটা তুমি করেছ ?'

'কি, এত বড় সাহস তোর ! বাপের সম্বন্ধে ছেলের মন বিষিয়ে দিচ্ছিস ! জুতো মেরে বার করে দেব তোকে। দূর করে দেব।' বলেই দৌড়ে এসে রাজেশের হাত ধরে টান লাগাতেন।

টানাটানি ধস্তাধস্তি কোন কিছুতেই মায়ের বুকের আশ্রয় থেকে রাজেশকে ছিনিয়ে আনতে পারতেন না ভবেশ।

এই ভাবেই চলছিল।

একদিনের কথা পরিষ্কার মনে আছে রাজেশের। সেদিন আর আগের দু-দিন তাদের রান্না হয় নি। মাঝে মাঝে এক-আধবেলা রান্না না হওয়াটা তাদের সংসারে বিস্ময়কর কিছু নয়।

কিন্তু একসঙ্গে পুরো তিনটে দিন নির্জলা উপোষ—এ ছিল অস্বাভাবিক ব্যাপার। তৃতীয় দিন সকাল থেকেই মাথা ঝিম ঝিম শুরু হয়েছিল রাজেশের। কানের কাছে পৃথিবীর সব ঝিঁঝি একসঙ্গে কনসার্ট শুরু করেছিল। দুর্বল টলমলে পা-দুটো টেনে টেনে মায়ের কাছে গিয়ে রাজেশ বলেছিল, 'বড্ড খিদে পেয়েছে।'

মা চিৎকার করে উঠেছিলেন, 'খিদে পেয়েছে তো আমি কি করব? যা সামনে থেকে। দূর হ।'

তখনকার মত সরে গিয়েছিল রাজেশ। কিছুক্ষণ পর টলতে টলতে আবার এসে বলেছিল, 'আমি আর পারছি না মা।'

'আবার জ্বালাতে এসেছিস শয়তান ছেলে? খা, আমাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খা।'

রাজেশ এবারও চলে গিয়েছিল। কিন্তু যত বেলা বেড়েছে কানের কাছের সেই ঝিঁঝিগুলোর চিৎকার আরো বাড়ছিল। ক্ষীণ গলায় বলেছিল, 'আমি মরে যাব মা।'

'মর, মর, মর। এ সংসারে কেন এসেছিলি হতভাগা?' বলতে বলতে লাফ দিয়ে উঠে রাজেশের একটা হাত ধরে টানতে টানতে একেবারে ভবেশের কাছে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর খুঁজে পেতে একখানা দা নিয়ে এসেছিলেন। দা-টা ভবেশের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'এ-ভাবে ছেলেটাকে একটু একটু করে না মেরে একেবারে শেষ করে ফেল। মরে ও বাঁচুক।'

'এক কায়দা পেয়ে গেছ, না? কথায় কথায় খালি দা এনে দাও! মারব, দুটোকেই একদিন রাগের মাথায় জবাই করে ফেলব। সেদিন বুঝবে।' চিৎকার-গর্জন—সবই করেছেন ভবেশ। কিন্তু ওই পর্যন্তই।

রাজেশের মা বলেছেন, 'শুধু কথায় বললে হবে না। আজ মারতেই হবে। নাও, দা ধর।'

মায়ের ভয়াবহ চেহারার দিকে চেয়ে ভয়ই বোধ হয় পেয়ে গেছেন ভবেশ।

রাজেশের মা সমানে বলে গেছেন, 'তুমি কি মানুষ! দশটা না, বিশটা না, একটা মাত্র ছেলে। তাকেও খেতে-পরতে দিতে পার না। তোমার একার জন্যে সংসারটা ছন্নছাড়া হয়ে গেল। নিজের মাকে মেরেছ, বাপকে মেরেছ,

বোনটা কোন রকমে পালিয়ে বেঁচেছে। এবার আমাদের পালা। মার, নিজের হাতে আমাদের মেরে ফেল।'

ভবেশ উত্তর দেন নি। নিষ্ঠুর ক্রূর দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ছিলেন শুধু।

একটু চুপ করে থেকে রাজেশের মা আবার বলেছেন, 'তুমি কী! জীবনে একটা পয়সা কোনদিন রোজগার করলে না। বাপ-ঠাকুরদা যা রেখে গিয়েছিলেন তাই শুধু বদ খেয়ালে উড়িয়ে দিলে!' প্রবল ধিক্কার এবং ঘৃণায় ঠোঁট দুটো কুঁচকে গিয়েছিল তাঁর।

হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে পড়েছিলেন ভবেশ. 'বুঝেছি—এতদিনে বুঝেছি, কী চাস তুই?'

'কী চাই?'

'টাকা। কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা। টাকার ওপর শুয়ে পা নাচাতে চাস তুই।'

একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে রাজেশের মা বলেছেন, 'ঠিকই বুঝেছ। বেশ টাকাই আন ; দেখি তোমার ক্ষমতা।'

'ক্ষমতা দেখতে চাস? তা হলে দেখিস। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকাই আনব।'

'টাকা আনবে তা-ই তো চাই। জীবনে কোন সাধ তো আর মেটাও নি। টাকার ওপর শুয়ে পা নাচাবার শখটা না হয় তখন মিটিয়েই নেব।'

এরপর একেবারে বিপরীত মানুষ হয়ে গেলেন ভবেশ। কোন গুপ্তধনের খোঁজ পেয়ে গিয়েছিলেন কি-না, কে জানে। একে একে পাওনাদারদের দেনা শোধ করে দিলেন। দগদগে ক্ষতের মত ইঁট-বার-করা বাড়িটার গায়ে পলেস্তারা পড়ল। চুনকাম করিয়ে কলি ফেরানো হল। ভেতর দিকের দেওয়ালগুলো ডিস্টেম্পার করিয়ে সুদৃশ্য করে তোলা হল। পানা আর ঝাঁঝিতে শ্বাসরুদ্ধ পুকুরটাকে নতুন করে কাটানো হল। পেছনের যে বাগানটা নিবিড় জঙ্গলের দখলে চলে গিয়েছিল সেটাকে পরিষ্কার করে অসংখ্য ফুলগাছের সমারোহে ভরিয়ে তুললেন ভবেশ।

রাতের অন্ধকারে ত্রিপলে ঢেকে লরী বোঝাই হয়ে ঘরের যত পুরনো আসবাব, বাসন-কোসন এবং ঠাকুরদার শখের সেই ঝড়লণ্ঠন একদিন বেরিয়ে গিয়েছিল, রাতের অন্ধকারেই আবার সে সব ফিরে এল। শুধু সেগুলোই না, নতুন ফ্যাসনের চেয়ার-টেবিল-সোফা-খাটও আসতে লাগল। পুরনো আসবাব বাড়ির একপ্রান্তে স্তূপাকার করে নতুনগুলো দিয়ে নতুন রুচিতে ঘর সাজালেন ভবেশ।

যাই হোক, ঘরের জিনিসপত্র যখন রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে যেত নোনাধরা

ভাঙা দেয়ালে মুখ চেপে রাজেশের মা তখন গুমরে গুমরে কাঁদতেন। আবার যখন সেগুলো ফিরে এল, সুখ এবং সচ্ছলতা সাসারের চারদিকে উছলে পড়তে লাগল, তখনও কাঁদতেন। আগে শুধু কাঁদতেনই। এবার কান্নার সঙ্গে খাওয়াও বন্ধ করলেন।

রাজেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করত, 'মা এখন তো আমাদের কোন দুঃখ নেই; তবু তুমি কাঁদ কেন?'

মৃদু স্বরে মা বলতেন, 'কে বললে দুঃখ নেই বাবা!'

'কে আবার বলবে, নিজেই তো বুঝতে পারছি। আগে দু-বেলা খেতে পেতাম না। এখন ভাল ভাল খাচ্ছি। বাবা কত জামা-প্যান্ট কিনে দিয়েছে। আগে তুমি কাপড় সেলাই করে পরতে। এখন তোমার কত কাপড়। টাকা আদায় করবার জন্যে আগে সেই লোকগুলো সকাল থেকে দোরগোড়ায় বসে থাকত। আজকাল আর তারা আসে না। আমাদের ঘরে এখন নতুন নতুন চেয়ার-টেবিল-খাট। তবু তুমি কাঁদ কেন মা?'

বিচিত্র হাসতেন মা, 'ভাল খাওয়া ভাল পরাতেই কি দুঃখ ঘুচে যায় পাগল।'

মায়ের কথা বুঝতে পারত না রাজেশ। বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে থাকত শুধু।

মা যে খান না, দিন রাত কাঁদেন, সে কথাটা ভবেশের কানেও পৌঁছেছিল। চোখ কুঁচকে বিরক্ত স্বরে তিনি বলেছিলেন, 'টাকা তো চেয়েছিলে, দু-হাত ভরে তা এনেছি। কোনদিকে কোন অভাব রাখিনি। তবে আবার প্যানপ্যানিয়ে কাঁদা কেন? খাও না নাকি?'

মা নিশ্চুপ।

ভবেশ আবার বলেছিলেন, 'এর চাইতে লোকে আবার কেমন করে সুখে রাখে?'

'এমন সুখ তো আমি চাই নি।' এবার গলায় স্বর ফুটেছিল মায়ের।

'তবে কেমন চেয়েছিলে? কোন স্বর্গসুখ?'

'আমি কী চাই আর কী চেয়েছিলাম, নিজেকেই জিজ্ঞেস করে দেখ।'

'অত হেঁয়ালি আমি বুঝি না। যা বলতে চাও স্পষ্টাস্পষ্টি বল।'

মা বলেছিলেন, 'হেঁয়ালি আমি করিনি। যা বলার চিরদিন আমি স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছি। তবে ব্যাপারটা কী, জান?'

'অনুগ্রহ করে জানিয়ে দিলে বাধিত হব।' ভবেশ বিদ্রূপ করে উঠেছিলেন।

একটুক্ষণ কি ভেবে মা হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আচ্ছা আমাদের কোন বছর কত তারিখে বিয়ে হয়েছিল বল দেখি।'

প্রশ্নের আকস্মিকতায় প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিলেন ভবেশ। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছিলেন, 'সেটা এমন কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা ন যে মনে করে রাখতে হবে। তা ছাড়া এতকাল পর সেই সাল তারিখে দরকারই বা কী?'

'দরকার আছে বলেই তো জিজ্ঞেস করছি। বলই না।'

'তা বছর তের চোদ্দ বিয়ে হয়েছে।'

'তের চোদ্দ বছর বিয়ে হয়েছে আমাদের। একসঙ্গে এক বাড়িতে এতগুলো বছর কাটিয়ে কিসে আমার সুখ কিসে দুঃখ—স্বামী হয়েও যখ বুঝলে না তখন ওটা না বোঝাই থাক।'

মায়ের মনোভাব সেদিন স্পষ্ট করে বুঝতে পারেনি রাজেশ। বুঝব বয়সও সেটা নয়। তবে আজকের বয়স্ক, অভিজ্ঞ, সাত-সাগর-পাড়ি-দিয়ে-ফি আসা পরিণত রাজেশ মায়ের সেদিনের কথাগুলো অনায়াসেই বিশ্লেষণ কর পারে।

ভবেশ সেদিন আর কিছু জিজ্ঞেস করেন নি। তীব্র বিরক্ত একটা ভ্রূ হেনে চলে গিয়েছিলেন।

এই ভাবেই দিনের পর দিন আসছিল, যাচ্ছিল। কিছু না খেয়ে খেয়ে ক্রমশঃ শীর্ণ এবং দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন মা।

মায়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অবশেষে অস্থির হয়ে উঠেছিল রাজেশ অবুঝের মত বলেছিল, 'তুমি যদি এমন করে না খেয়ে থাকো আজ থেকে আমিও তা হলে খাব না।'

মা বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন, 'না না, তুই কেন না খেয়ে থাকবি খাবি, নিশ্চয়ই খাবি।'

রাজেশ জেদ ধরেছিল, 'তুমি না খেলে আমি খাব না, খাব না, খাব না কিছুতেই না।'

নিতান্ত অনিচ্ছায় অবশেষে ভাত নিয়ে বসেছিলেন মা। কিন্তু সে গ্লানির অন্ন দু-চার গ্রাসের বেশী খেতে পারেন নি। রাজেশের মনে হচ্ছি পৃথিবীর সব চাইতে খারাপ পাপটা সে করেছে। এমন ভাবে জেদ ধরে মাকে কষ্ট দেওয়া উচিত হয় নি। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল রাজে আর কোনদিনই মাকে খেতে বলবে না।

যাই হোক, যৌবনের প্রথম দিকে ভবেশের যে প্রমত্ততা তার কেন্দ্রে ছি মেয়েমানুষ। পৃথিবীর তাবৎ নারীকে যে কোন কৌশলে পেতে চেয়েছিলে তিনি।

পরবর্তী অধ্যায়ে ভবেশের জীবনে এসেছিল অর্থের তৃষ্ণা। অর্থ-অর্থ-অর্থ! অর্থকে প্রদক্ষিণ করেই দুরন্ত দুর্বার গতিতে উল্কার মত তিনি ছুটতে শুরু করেছিলেন।

তখন কত আর বয়েস রাজেশের? আজকের পরিণত অভিজ্ঞ রাজেশ অনায়াসেই তা স্মরণ করতে পারে। কৈশোরের মাঝামাঝি একটা জায়গায় তখন সে পৌঁছেছে। খুব স্পষ্ট ভাবে না হলেও মায়ের না খেয়ে থাকার মধ্যে যে ইঙ্গিতটা আছে, সেটা তাকে দোলা দিয়েছিল। বার বার তার মনে হচ্ছিল পৃথিবীর আর দশটা সৎ মানুষ যে ভাবে উপার্জন করে তার সঙ্গে ভবেশের হঠাৎ রাজা হওয়ার বিন্দুমাত্র মিল নেই। ভবেশ চাকরি নেন নি, ব্যবসা ফেঁদে বসেন নি তবু জলোচ্ছ্বাসের স্রোতের মত টাকা আসছিল—অজস্র অফুরন্ত টাকা। এর পেছনে জটিল গভীর দুর্বোধ্য কি যেন একটা আছে!

অর্থের পেছনে ছুটলেও মেয়েমানুষের আকর্ষণ তাঁর এতটুকুও যায় নি। সময় পেলেই ভবেশ কলকাতায় ছুটতেন। দু-এক নিশি সেখানে পালন করে কলকাতার ভাঁড়ারে যত আনন্দ আছে সব লুটে তবে রানীপুরে ফিরতেন।

এদিকে না খেয়ে বাঁচার শক্তি ক্রমাগত ক্ষীণ হয়ে আসছিল মায়ের! শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন তিনি। মামারা কেমন করে এ খবর পেয়েছিলেন, রাজেশের মনে নেই। শুধু এটুকু মনে আছে শীতের এক বিকেলে চাঁপদানি থেকে তিন মামা দল বেঁধে রানীপুর এসেছিলেন। মায়ের দিকে তাকিয়ে তাঁরা ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন, 'এ কি চেহারা করেছিস কল্যাণী?'

রাজেশের মা মৃদু হেসেছিলেন। নির্জীব ক্লান্ত সুরে বলেছিলেন, 'তোমরা আবার কাজকর্ম ফেলে অতদূর থেকে ছুটে এলে কেন দাদা?'

'আনন্দে রে, আনন্দে।'

'আনন্দে!'

'নিশ্চয়ই। তুই মরতে বসেছিস, সে খবরটা পেয়ে এত আনন্দ হল যে ছুটতে ছুটতে চলে এলাম।'

মা করেছিলেন কি, শীর্ণ হাত বাড়িয়ে তিন ভাইকে বিছানায় নিজের পাশটিতে বসিয়ে ছিলেন। মুখে সেই মৃদু শব্দহীন হাসিটি লেগেই ছিল। সেই হাসি যার মধ্যে আসন্ন মৃত্যুর স্বাদ ঘনানো।

মামারা বসেছিলেন বটে, বোনের দিকে তাকান নি কিন্তু। মা বলেছিলেন, 'রাগ করে কতক্ষণ মুখ ফিরিয়ে থাকবে? না তাকিয়ে কি পারবে?'

গাঢ় ভাঙা স্বরে মামারা বলেছিলেন, 'তোর এমন হাল হয়েছে কেমন করে, সেই কথাটা আগে বল।'

'কি হয়েছে আমার! তোমরা যেন খুব ভাবনায় পড়েছ?' সমস্ত ব্যাপারটাকে হেসে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন মা।

রাজেশ পাশে দাঁড়িয়েছিল। সে বলেছিল, 'জান মামা, মা কিছু খায় না একেবারে না খেয়ে থাকে। আর সেই জন্যেই—'

মামারা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বোনের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'খাস না, কি রে?'

'কি করে খাই বল।' শান্ত নিস্তেজ স্বরে মা বলেছিলেন, 'যে খাওয়ার ভিতর সম্মান নেই মর্যাদা নেই, শুধু গ্লানিই আছে তেমন খাওয়া কেমন করে খাই বল!'

অনেকক্ষণ চুপ করে ছিলেন মামারা। তারপর যখন কথা বলেছিলেন গলার স্বর থেকে শুরু করে মুখের চেহারা পর্যন্ত সমস্ত কিছুই বদলে গিয়েছিল।

দাঁতে দাঁতে চেপে তাঁরা বলেছিলেন, 'বুঝেছি। ভবেশ কোথায়?'

'সারা দুপুরই তো বাড়ি ছিলো। তোমরা আসার খানিকটা আগে বেরিয়েছে।'

'ফিরবে কখন?'

'তার কি কিছু ঠিক আছে। এখুনি আসতে পারে; আবার হয়তো কোথাও কাটিয়ে দু-চারদিন পর ফিরতে পারে।'

তীব্র চাপা গলায় মামারা বলেছিলেন, 'তোর বিয়ের পর যখন ভবেশের গুণের সব খবর কানে এল তখনই জানি তোকে বিসর্জন দিয়েছি। আগেই বুঝতে পেরেছিলাম এ ভাবে অপঘাতেই তুই মরবি। খালি ভাবি সেই বুড়োটা কি পরিমাণ শয়তান আর জোচ্চোর। ছেলের স্বভাবের কথা লুকিয়ে সম্বন্ধ করে এসেছিল। তখন যদি ঘুণাক্ষরেও জানতাম—'

মামারা যে বৃদ্ধের উল্লেখ করেছেন তিনি যে কে, তা বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয়নি রাজেশের। বৃদ্ধটি তারই ঠাকুরদা।

এদিকে মামাদের কথা শেষ হতে না হতেই মা বলে উঠেছিলেন, 'ছিঃ দাদা! যাদের সম্বন্ধে তোমরা অমন করে বলছ, হাজার হোক তাঁরা আমার স্বামী আর শ্বশুর। ছিঃ!'

মামাদের তোপের মুখে পড়বার জন্যেই বোধহয় সন্ধ্যের একটু পরে ভবেশ সেদিন বাড়ি ফিরেছিলেন। শ্বশুরকুলের বাহিনীকে দলবদ্ধ হয়ে বাড়ি চড়াও হতে দেখে প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। একটা মাত্র মুহূর্ত। তারপরেই সামলে নিয়েছিলেন নিজেকে।

এদিকে মামারা ভবেশের কাছে সরাসরি কৈফিয়ত দাবি করেছিলেন,

'কল্যাণীর এমন অবস্থা হল কেমন করে?'

ভবেশ পাল্টা প্রশ্ন করেছেন, 'আপনারা কখন এসেছেন?

'বিকেলে। কেন?'

'সেই বিকেলে এসেছেন, এখন তো রাত সাতটা। এর ভেতর বোনের অবস্থা কেন এমন হয়েছে, সে খবরটাই নিয়ে উঠতে পারেন নি! কেমন ভাই আপনারা!'

'আমরা তোমার তামাশার কথা শুনতে আসিনি ভবেশ।'

পরস্পর যুযুধান পশুর মত মামারা ভবেশের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'কল্যাণী নাকি খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে?'

'ও প্রশ্নটা আপনাদের বোনের কাছেই পেশ করতে হবে।' নির্বিকার উদাসীন স্বরে ভবেশ বলেছিলেন। তাঁর সমস্ত ভঙ্গিটার মধ্যেই কঠিন শীতল একটা উপেক্ষা ছিল।

মামারা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেননি। একটুক্ষণ থতিয়ে থেকে বলেছিলেন, 'কল্যাণীকে যে অবস্থায় নিয়ে তুলেছ তাতে মরবার আর বাকি নেই। ওকে আমাদের সঙ্গে চাঁপদানিতে নিয়ে যেতে চাই।'

এক মুহূর্ত না ভেবে তৎক্ষণাৎ ভবেশ বলেছিলেন, 'স্বচ্ছন্দে, স্বচ্ছন্দে—'

মায়ের বিছানার কাছে দাঁড়িয়েই মামাদের সঙ্গে ভবেশের স্নায়ুর লড়াই চলছিল। ভবেশ যখন মায়ের চাঁপদানি যাবার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আপত্তি জানালেন না, বরং সানন্দে সাগ্রহে মামাদের প্রস্তাবে সায় দিয়ে গেলেন ঠিক সেই মুহূর্তে ব্যাপারটা ঘটে গেল। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত তীব্র গতিতে উঠে বসলেন মা। প্রবল বেগে দু-হাত আর মাথা নেড়ে তীক্ষ্ণ অবুঝ স্বরে বলতে লাগলেন, 'না-না-না, আমি যাব না। তোমরা চাঁপদানিতে ফিরে যাও দাদা।'

মামারা বোঝালেন, 'এখানে থাকলে যে মরে যাবি কল্যাণী।'

'মরতেই তো চাই।'

হাজার বুঝিয়েও কিছুই হল না। নিজের সিদ্ধান্তে অনড় হয়ে রইলেন মা। বার বার বললেন, 'আমার ওপর তোমরা রাগ কোর না দাদা। এখন তোমরা উত্তেজিত হয়ে আছ। উত্তেজনা কমলে ভেবে দেখো কেন আমার চাঁপদানিতে যাওয়া এখন সম্ভব নয়; কেন আমি এই বাড়িতেই মরতে চাই।'

'থাক—থাক, ভেবে আর আমাদের দরকার নেই।' পাহাড়-প্রমাণ রাগ, দুঃখ আর অভিমান নিয়ে মামারা চাঁপদানি ফিরে গিয়েছিলেন।

আর মা? চোরা বানের মত মৃত্যু অনেক আগেই অদৃশ্য গোপন পথে শরীরের ভেতরে ভেতরে ধস্ নামিয়ে যাচ্ছিল। আয়োজনটা পুরোপুরি নিখুঁতই

ছিল। অতএব যা স্বাভাবিক যা প্রতীক্ষিত একদিন তা ঘটে গেল। মামারা যেদিন এসেছিলেন তার দিন পনের পর মা মারা গেলেন।

জাপানী পুতুলের মত ছোটখাটো স্বল্পভাষিণী মা তাঁর বিপরীত স্বভাবের স্বামীর সঙ্গে বিচিত্র এক যুদ্ধে নেমেছিলেন। সেটা সম্মুখ-সমর নয়। তাঁর হয়তো ধারণা ছিল, তিলে তিলে আত্মপীড়ন করেই নিদারুণ চরিত্রের স্বামীকে ফেরাতে পারবেন। হায় রে অবোধ মন, তেমন যুদ্ধ কার সঙ্গে সম্ভব, তাই তুমি জান না।

আজকের রাজেশ ভাবে স্বামীর জন্য এমন অবুঝের মত আত্মহত্যা না করে মা যদি মামাদের সঙ্গে চাঁপদানি চলে যেতেন তাতে আর কার কি হত, বলা যায় না। মা বেঁচে থাকলে রাজেশ অন্তত বেঁচে যেত। সাত সাগরে ঘুরে আজ তার জীবন আর যেখানেই যাক, এখানে এসে পৌঁছুত না।

মায়ের মৃত্যুর পর ঠিক কি-কি ঘটেছিল শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সব মনে পড়ে না। এলোমেলো কিছু ছবির মত সেগুলো স্মৃতিতে দোলা দিয়ে যায়। মনে আছে, চাঁপদানি থেকে মামারা এসেছিলেন। মাকে নিয়ে তাঁরাই শ্মশানে গিয়েছিলেন। অবশ্য ভবেশ তাঁদের নিঃশব্দে অনুসরণ করেছিলেন।

শ্মশান থেকে ফিরে মামারা বলেছিলেন, 'এগার দিনের মাথায় শ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধের পর আমরা রাজুকে চাঁপদানি নিয়ে যাব।'

রাজু অর্থাৎ রাজেশ। বিমূঢ়ের মত ভবেশ বলেছিলেন, 'কেন?'

'কেন আবার। কল্যাণী আমাদের একটা মাত্র বোন। সে তো চলে গেল। রাজু তার একমাত্র চিহ্ন। তাকে কাছে রেখে বোনকে হারানোর দুঃখ ভুলতে পারব।'

'না।'

'কী, না!'

'রাজুকে আমি ছাড়তে পারব না। ও আমার একমাত্র ছেলে।' বিষণ্ণ গম্ভীর-স্বরে ভবেশ বলেছিলেন।

মামারা বলেছিলেন, 'আজকের দিন তোমার সঙ্গে ঝগড়া করার ইচ্ছে আমাদের নেই। তবু একটা রূঢ় কথা তোমায় না বলে পারব না ভবেশ।'

বিকারহীন শান্ত মুখে ভবেশ বলেছিলেন, 'স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন।'

'তুমি স্বামী বা বাপ হবার উপযুক্ত না। কল্যাণীকে তো মেরেছ, রাজুর সর্বনাশ না-ই করলে। ওকে অন্তত বাঁচতে দাও।'

ভবেশের মুখ অন্ধ রাগে কঠিন এবং আরক্ত হয়ে উঠেছিল। তীব্র চাপা গলায় আস্তে আস্তে তিনি বলেছিলেন, 'আপনাদের রূঢ় কথাটা নিশ্চয়ই শেষ হয়েছে—'

মামারা থতিয়ে গিয়েছিলেন, 'হ্যা, মানে—'

'এবার তা হলে আমি একটা রূঢ় কথা বলি। রাজু আমার কাছেই রবে। কোনদিনই চাঁপদানিতে যাবে না। তা ছাড়া—'

'কী ?' দাঁতে দাঁত চেপে মামারা জানতে চেয়েছিলেন।

তিন মামার মুখে চকিত দৃষ্টিক্ষেপ করে ভবেশ বলেছিলেন, 'তা ড়া আপনাদের বোন মারা গেছে। এ-বাড়ির সঙ্গে আপনাদের যা কিছু ম্পর্ক সবই ছিল তার জন্যে। তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আশা করি সে ম্পর্কটা শেষ হয়ে গেছে। আমি চাই না—' অর্থময় একটা ইঙ্গিত দিয়ে মে গিয়েছিলেন তিনি।

আর তিন মামা নিরুপায় আক্রোশে লাফ দিয়ে উঠে পড়েছিলেন, 'তুমি ওনা, আমরা এ-বাড়ির সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখি। এই তো ?'

ভবেশ নিশ্চুপ থেকেছেন। তাঁর নীরবতার মধ্যেই অবশ্য উত্তরটা ছিল।

মামারা চলে গিয়েছিলেন। তারপর কয়েকটা দিন, বোধ হয় মায়ের শ্রাদ্ধ র্যন্ত, ভবেশের মনোযোগ এসে পড়েছিল ছেলের ওপর। রাজেশের ওঠা-বসা, বিশ্ব, ঘুম—সব কিছুই ভবেশের সস্নেহ তত্ত্বাবধানে চলেছিল।

ভবেশের সঙ্গে এতকাল তার জীবনের প্রত্যক্ষ কোন যোগাযোগ ছিল । অপরিচিত উদাসীন মানুষের মত মাঝে মাঝে তিনি রাজেশের দিকে কাতেন বটে কিন্তু সে তাকানোর মধ্যে কোন অনুভূতিই থাকত না।

মায়ের মৃত্যুর পর ভবেশ অনেকখানি কাছেই যেন এসে পড়েছিলেন। ন্তু সে আর ক'দিন ? শ্রাদ্ধ চুকে যাওয়ার পরই আবার তাঁর নিজের ক্ষপথে ফিরে যেতে শুরু করেছিলেন।

মানুষ নাকি জন্মের পর থেকে ক্রমাগত পেতে পেতেই এগোয়। নিরঙ্কুশ ওয়া অবশ্য ঘটে না। পাওয়া এবং হারানো—এই দুয়ের মধ্য দিয়েই তার া। সেদিক থেকে রাজেশের জীবন বিচিত্র। শৈশব থেকে সে শুধু রিয়েই চলেছে। প্রথমে হারিয়েছে ঠাকুরদাকে, তারপর পিসিকে। বশেষে মাকে। চাঁপদানিতে থাকেন মামারা। সুদূর রানীপুরে থেকেও দের স্নেহের উত্তাপ অনুভব করত রাজেশ। মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জীবন তাঁরাও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেন।

শূন্যতা—অসীম, অপরিমেয় শূন্যতা। মায়ের শ্রাদ্ধের পর একেবারে নিঃসঙ্গ পড়েছিল রাজেশ। স্কুলে যে সময়টুকু কাটাত, তখনই যা সঙ্গী পাওয়া নইলে এতবড় বাড়িটায় সে একা। অবশ্য রান্নার জন্য একজন রেখেছিলেন ভবেশ। জন দুই চাকরও ছিল। তাদের সঙ্গে কি

আলাপই বা করা যায়!

ছাদে ছোট্ট একখানা ঘর ছিল। স্কুলের সময়টুকু ছাড়া সেখানেই স্বেচ্ছা-নির্বাসন বেছে নিয়েছিল রাজেশ। পড়ার বই সামনে মেলে রেখে আচ্ছন্নের মত আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকত সে।

ছাদের সেই নির্বাসনে সঙ্গীহীন নিরুৎসব দিন কেটে যাচ্ছিল রাজেশের। কিন্তু চিরদিন তেমনভাবে কাটল না।

রাজেশদের বাড়ির দক্ষিণে একখানা ভাঙা দোতলা বাড়ি ছিল। আশৈশব বাড়িটাকে একইভাবে পড়ে থাকতে দেখেছে সে। মায়ের মৃত্যুর সময় রাজেশের বয়স ছিল পনের। তার পনের বছরের জীবনে একদিনের জন্যও কোন মানুষকে সেই বাড়িটায় এসে থাকতে দেখা যায় নি। ছেলেবেলাতেই রাজেশ শুনেছে বাড়িটা কে এক নগেন বসুর। ভদ্রলোক জীবিত নেই। তাঁর একমাত্র ছেলে ইউ, পি-তে চাকরি করেন। স্ত্রী-ছেলেমেয়ে নিয়ে সেখানেই কোয়ার্টারে থাকেন। চাকরির কল্যাণে বাংলা দেশের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। অতএব নগেন বসুর আর কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় বাড়িখানা মহাকালের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে দিনে দিনে জীর্ণ হয়ে গেছে।

কিন্তু মৃত্যুর আগে মা যখন শয্যাশায়ী সেই সময়ে হঠাৎ একদিন লরী বোঝাই হয়ে চুন-সুরকি আর সিমেন্টের বস্তা এসেছিল। সে-সব স্তূপাকার করে রাখা হয়েছিল সেই বাড়িটার সামনে। সঙ্গে এসেছিলেন মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক। গায়ের রঙখানি তাঁর টকটকে ফর্সা। মাথার চুল এলোমেলো, বিশৃঙ্খল। মুখময় তিন-চারদিনের দাড়ি-গোঁফ। পরনের ধুতিটা কত যুগ আগে পরেছিলেন তিনিই জানেন। তার ওপর যে ধপধপে পাঞ্জাবিটা ঝুলছে সেটা পাট ভেঙে সেদিনই বোধ হয় গায়ে দিয়েছিলেন। চোখের দৃষ্টি কেমন যেন উদাস। বেশভূষা, চলাফেরা—নিজের কোন ব্যাপারেই যেন ভদ্রলোবে বিন্দুমাত্র মনোযোগ নেই। অন্যমনস্ক অসাবধানী কি এক সুদূর জগতে সর্বক্ষণ বাস করেছেন তিনি।

রাজেশ পরে জেনেছিল সেই ভদ্রলোকটির নাম প্রণব বসু। ইনিই নগেন বসুর প্রবাসী ছেলে।

যাই হোক, জঙ্গল সাফ করে ফেলা হয়েছিল দু-দিনেই। মাস-খানেকের ভেতরেই নতুন দরজা-জানলা লাগিয়ে, মেঝে আর দেওয়ালে প্লাস্টারের পোষাক পরিয়ে বাড়িখানাকে বাসের যোগ্য করে ফেলা হয়েছিল। রাজেশের মনে আছে, মায়ের মৃত্যুর দিন তিনেক পরেই প্রণব বসু সপরিবারে সেখানে

বাস করতে এসেছিলেন।

সেই বাড়িটার কথা ভাবতে গেলে বিদ্যুৎ-চমকের মত আজও দোলনের কথা মনে পড়ে যায়। মায়ের মৃত্যুটা ঘন গাঢ় বিষাদের মত চারদিক থেকে যখন বেষ্টন করতে শুরু করেছিল সেই সময় সেই মেয়েটি উচ্ছল ঝর্নার মত তার জীবনে কলস্বরে বয়ে গিয়েছিল।

মায়ের শ্রাদ্ধ চুকে গেলে অনেক দিন স্কুলে যাওয়া বন্ধ রেখেছিল রাজেশ। তখন ছাদের ঘরখানায় জানালার পাশটিতে চুপচাপ বসে থাকত সে।'

সেই সময় একদিন দোলন প্রথম ছাদে এসেছিল। কত আর বয়েস মেয়েটির? 'সাত আট বছরের বেশী নয়। গায়ের রং টুকটুকে। কোঁকড়া কোঁকড়া একমাথা চুলের পটে মুখখানা নতুন ফোটা গন্ধরাজের মত মনে হয়েছিল।

পা টিপে টিপে ছাদের ঘরে উঠে এসেছিল মেয়েটি। আর এসেই সরাসরি জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমিই তো রাজুদা, না?'

জানালার বাইরে থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে অবাক হয়ে গিয়েছিল রাজেশ। বলেছিল, 'তুমি কে?'

'আমাকে চেন না। কি রে!' সারা শরীর নাড়িয়ে চোখ ঘুরিয়ে এমন-ভাবে কথাগুলো বলেছিল মেয়েটি, যেন তাকে না চেনাটা গুরুতর অন্যায়।

কথা বলার ভঙ্গি দেখে রাজেশ কিন্তু হেসে ফেলেছিল। মায়ের মৃত্যুর পর সেই তার প্রথম হাসি। বলেছিল, 'সত্যি চিনি না। বল না তুমি কে?'

'আমার নাম দোলন; বাবার নাম শ্রীপ্রণবকুমার বসু; তোমাদের পাশের ঐ দোতলা বাড়িটায় আমরা থাকি। এত কাছে থাকি তবু আমাকে চেন না! ই-ই-ই—' এক নিঃশ্বাসে নিজের তাবৎ পরিচয় দিয়ে ভেংচি কেটেছিল দোলন।

চলতে চলতে যেমন করে মানুষ গাছপালা কি পাখি দেখে ঠিক তেমন-ভাবেই মাঝে মাঝে প্রণব বসুদের বাড়িটার দিকে তাকাত রাজেশ। সে তাকানোর পেছনে বিন্দুমাত্র কৌতূহল থাকত না। সুতরাং প্রতিবেশীদের কোন খবরই তার জানা হয়নি। তাছাড়া মায়ের মৃত্যুটা এমনভাবে তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যাতে অন্য কোনদিকে তাকাবার ইচ্ছাই হত না। হাসতে হাসতে রাজেশ বলেছিল, 'তোমার নাম তা হলে দোলন। বোসো—'

'বসবার সময় এখন নেই। আমার বলে কত কাজ।'

'কী কাজ?'

'দশটা অঙ্ক কষতে হবে। তিন পাতা হাতের লেখা বাকি আছে।'

'তুমি বুঝি লেখাপড়া খুব ভালবাস?'

'হুঁ।' ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলেছিল 'দোলন, খুব ভালবাসি। আচ্ছা আমি এখন যাই।' দু-পা গিয়ে তৎক্ষণাৎ ফিরে এসে জিভ কেটে আবার বলেছিল, 'ঐ দেখ আসল কথাটা বলতেই ভুলে গেছি। মা তোমায় আমাদের বাড়ি যেতে বলেছে।'

'তোমার মা!' একটু অবাক সুরেই জিজ্ঞেস করেছিল রাজেশ।

'হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। আমার মা না তো আবার কার। আচ্ছা আমি এখন যাচ্ছি। তুমি যেও কিন্তু।' যাবার জন্যে আবার বাইরের দিকে পা বাড়িয়েছিল দোলন।

রাজেশ ডেকেছিল 'শোন—'

মুখ ফিরিয়ে দোলন বলেছিল, 'আবার ডাকলে কেন? আমার বলে কত কাজ! খালি বার বার ডাকছে! ই-ই-ই—', বলেই জিভ বার করে ভেংচি কেটেছিল দোলন।

কথায় কথায় ভেংচানো যে দোলনের স্বভাব—স্বল্পক্ষণের পরিচয়েই তা বোঝা গিয়েছিল। তার কাছে এগিয়ে গিয়ে রাজেশ বলেছিল, 'তোমার মা তো আমাকে চেনেন না; তবে যেতে বললেন কেমন করে?'

'চেনে না! তোমায় বলেছে যেন! মা তোমার সব কথা জানে।'

'সব!' খুব কৌতুক বোধ করেছিল রাজেশ।

হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। দিনরাত তুমি ছাদে বসে থাক; আকাশের দিকে চেয়ে কি ভাব। মা কি বলে জান?'

'কী?'

'বলে, আহা বেচারার মা মরে গেছে। দিনরাত মন খারাপ করে বসে থাকে। বাড়িতে একটা লোকও নেই যার সঙ্গে কথা কইবে। অমন করে থেকে থেকে একটা অসুখ বাধিয়ে বসবে। যা না দোলন, ওকে ডেকে নিয়ে আয়। আমার, আমার বলে কত কাজ। সে সব ফেলে তোমায় ডাকতে এলাম।' বলেই আর দাঁড়ায় নি দোলন। ছোট্ট একটা ঝর্নার মত সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

রাজেশ অবশ্য তখনই দোলনদের বাড়ি ছোটে নি। দোলন চলে গেলে রাজেশ আবার জানালার কাছে গিয়ে বসেছিল। তারপর এদিক-ওদিক তাকাতেই প্রতিবেশীদের উঠোনটা চোখে পড়েছিল। এক-প্রান্তে বাতাবী লেবু গাছের তলায় সিলভারের ছোট ছোট হাঁড়ি-কড়া-ডেকচি আর রাশি রাশি পুতুলের সংসার

সাজিয়ে দোলন একেবারে মেতে উঠেছে। সেই বিচিত্র খেলাঘরে আরও কয়েকটি সখী জুটেছে তার। সবাই মিলে সংসার সামলাতে ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে।

এতক্ষণে দোলনের জরুরী কাজটা যে কী, বুঝতে পেরেছিল রাজেশ। পাঠানুরাগিণী মেয়েটা বাতাবীলেবু গাছের তলায় অঙ্ক আর হাতের লেখার মহড়াটা ভালই দিচ্ছিল।

সেদিন দোলনদের বাড়ি যায়নি রাজেশ। পরের দিন সকালেই সিঁড়ি বেয়ে দোলন আবার উঠে এসেছিল ছাদে। বলেছিল, 'তুমি কিগো, কাল যেতে বলে গেলাম না! গেলে না কেন?'

রাজেশ বলেছিল, 'যাব-যাব, তাড়া কি?'

'না, আজই চল। তুমি না গেলে মা আমায় বকবে।' বলেই রাজেশের হাত ধরে টানতে টানতে একেবারে তাদের বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল দোলন।

মায়ের মৃত্যুর পর অন্যের বাড়ি যাওয়া রাজেশের সেই প্রথম। লজ্জায় সঙ্কোচে জড়সড় হয়ে নতমুখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল সে।

ওদিকে একতলার বিস্তৃত দালানে একটি মহিলা আনাজ কুটছিলেন। বয়স তাঁর কত, সে এক জটিল রহস্য। তিরিশও হতে পারে, পঁয়ত্রিশ হওয়াও বিচিত্র নয়। দু-চারটে চুলের রঙ বদলে দেওয়া ছাড়া সময় যেন তাঁর কাছে হার মেনে ফিরে গেছে। মহিলা অটুট-শরীরা। যৌবন তাঁর দেহে ঋতু বিশেষের খেলা নয় যে এলাম, ফুটলাম, তারপরে ঝরে গেলাম। যৌবনের সঙ্গে তাঁর নিয়তকালের সম্পর্ক। পরনে ফরাসডাঙ্গার পাটভাঙ্গা শাড়ি, রেশমী ব্লাউজ। তিনি যে দোলনের মা, সে কথা বলে দিতে হয় না।

বাড়িতে ঢুকেই দোলন রাজেশের হাত ছেড়ে দিয়ে তার মায়ের দিকে ছুটে গিয়েছিল। বলেছিল, 'এবার জিজ্ঞেস কর, কাল আমি গেছলাম কিনা?'

ব্যাপারটা এ-রকম। দোলনের মা আগের দিন রাজেশকে ডেকে আনার জন্য মেয়েকে পাঠিয়েছিলেন। রাজেশ আসেনি দেখে তাঁর সংশয় হয়েছিল, মেয়ে আদৌ ডাকতে গিয়েছিল, না, খেলায় মেতে যাবার কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিল? সে সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করাতে প্রমাণ দেবার জন্য রাজেশকে সেদিন একেবারে টেনে এনে মায়ের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল দোলন।

'ওমা, কি ঝগড়াটি মেয়ে রে!' দোলনের মায়ের চোখের কোণে, ঠোঁটের প্রান্তে অবরুদ্ধ হাসির একটা নির্ঝর আছে। কারণে অকারণে উচ্ছ্বসিত কলস্রোতে সেটা বোধ হয় বেরিয়ে আসে। অতএব মেয়ের দিকে ভ্রূকুটি হেনে খিলখিলিয়ে হেসে উঠেছিলেন তিনি। তারপর আনাজ আর বঁটি একপাশে

সরিয়ে রেখে রাজেশের একখানা হাত ধরে ওপরে নিয়ে গিয়েছিলেন। নিজের পাশে বেতের একটা মোড়া পেতে দিয়ে বলেছিলেন, 'বোসো বাবা।'

আড়ষ্টের মত মোড়াটার ওপর নিজেকে সঁপে দিয়েছিল রাজেশ। দোলনের মা-ও একখানা পিঁড়ি পেতে কাছে বসেছিলেন। আর দোলন এক ছুটে উঠোনের দূর প্রান্তে সেই বাতাবীলেবু গাছটার তলায় ছুটে গিয়েছিল। সেখানে রাশি রাশি পুতুল আর ক'টি সহচরী নিয়ে তার খেলাঘর নিয়ত পাতা রয়েছে।

কি যেন একটু ভেবে দোলনের মা হঠাৎ বলেছিলেন, 'সারাদিনই দেখি ছাদের ঘরখানায় চুপ করে বসে থাকো। অমন মন গুমরে থাকা তো ভাল নয়। আমি শুনেছি তোমার মা নেই। মা কারো চিরদিন থাকে না বাবা।' বলতে বলতে একটু থেমেছিলেন দোলনের মা। পরক্ষণেই আবার শুরু করেছিলেন, 'সারাদিন ঘরে বসে থাকলে অসুখ করবে যে।'

বিমূঢ়ের মত রাজেশ বলেছিল, 'কোথায় যাব ?'

'কেন, বন্ধু-টন্ধুদের বাড়ি। তাদের সঙ্গে খেলবে, গল্প করবে, বেড়াবে।'

ছাদের নির্বাসন থেকে দোলনের মা কেন তাকে বার করে আনতে চেয়েছিলেন, সেদিনের রাজেশ না বুঝলেও আজকের রাজেশ পুরোপুরিই বুঝতে পারে। মায়ের মৃত্যু তাকে বিষাদময় এক আচ্ছন্নতার অতলে একটু একটু করে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। সেই সর্বব্যাপী আচ্ছন্নতা থেকে রাজেশকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন দোলনের মা। সে জন্য দরকার অন্যমনস্কতা।

বিষণ্ণ গলায় রাজেশ বলেছিল, 'আমার কোন বন্ধু নেই।'

'বন্ধু নেই !' একটুক্ষণ থতিয়ে থেকে দোলনের মা বলেছিলেন, 'না-ই বা রইল বন্ধু। তুমি রোজ আমাদের বাড়ি চলে আসবে। আমাদের সঙ্গে গল্প করবে। আসবে তো ?'

রাজেশ উত্তর দেয়নি। আশৈশব কারও বাড়ি না যাওয়ার অভ্যাস তার। একা একা এখানে আসতে হবে ভেবেই নিদারুণ এক সঙ্কোচ বোধ করছিল সে। কিন্তু দোলনের মা এমন জেদ ধরেছিলেন যাতে তাঁদের বাড়ি যাবার প্রতিশ্রুতি দিতেই হয়েছে।

অঙ্গীকার-বদ্ধ হলে হবে কি, পরের দিন যখন দোলনদের বাড়ি যাবার কথা রাজেশ ভেবেছে, চিরদিনের সেই সঙ্কোচটা পা দু-খানি আটকে ধরেছে যেন।

কাজেই দোলনকে আবার আসতে হল। এসেই বিরক্ত ভারিক্কি চালে বলেছিল, 'রোজ রোজ এসে নিয়ে যেতে হবে নাকি ? শিগ্‌গির চল, মা ডাকছে।'

মনে আছে, অনেকদিন পর্যন্ত একা একা দোলনদের বাড়ি যেতে পারেনি

সে। দোলনই তাকে ডেকে নিয়ে গেছে। রোজ সকালে এসে দোলন বলত, 'এই আমার এক কাজ হয়েছে। বাবুকে ডেকে না নিয়ে গেলে একা একা যেতে পারে না!'

রাজেশ হাসত। তার মুখের দিকে তাকিয়ে দোলন ঝঙ্কার দিয়ে উঠত, 'হাসবে না বলছি। মাকে বলি রাজুদা নিজে নিজে আসে না, ডেকে আনতে হয়। রোজ রোজ আমি সাধতে পারব না।'

রাজেশ বলত, 'শুনে মাসিমা কি বলেন?'

'কি আবার বলবে! চুলের মুঠি ধরে দুমদুম কিল বসায় আর হাসে।'

প্রথম দিনেই সদর-অন্দরের সবগুলি দরজা মেলে দিয়ে দোলনরা রাজেশকে ডাক দিয়েছিল। তারপর প্রত্যহের আসা-যাওয়ায় সে বাড়ির অন্ধ-বন্ধের কোন দিকই আর অজানা ছিল না তার। প্রথম দিনই জানা গিয়েছিল, দোলনরা এক ভাই এক বোন। দোলন আর তোতন। দোলন বড়, তোতনের বয়স মাত্র দুই।

দোলনের মাকে প্রথম দিন রাজেশ যেটুকু দেখেছিল তাতেই সবটুকু জানা হয়ে গিয়েছিল। বেশির ভাগ মানুষই নিজেকে অনেকখানি আড়াল করে সামান্য একটুখানি বাইরে মেলে দেয়! দোলনের মা কিন্তু এদের বিপরীত। নিজেকে ঢেকে রাখার কোন কৌশলই তাঁর আয়ত্তে নেই।

কথায় কথায় ভদ্রমহিলা অজস্র হাসতে পারতেন। আর দু-চোখ, দু-হাত— বোধহয় সমস্ত অবয়ব ঘিরেই ছিল তাঁর অপরিমিত স্নেহ। হাসির উচ্ছ্বাস আর স্নেহের অফুরন্ত স্রোতে নিমেষেই ভেসে গিয়েছিল রাজেশ।

দোলনের বাবার সঙ্গেও স্বাভাবিক নিয়মেই পরিচয় হয়েছিল। সরকারী চাকরি করতেন ভদ্রলোক। সেই চাকরির কল্যাণে যৌবনের প্রায় শুরু থেকেই ইউ.পি-তে প্রবাসী হয়েছিলেন। তারপর কলকাতায় বদলী হয়ে বাড়ি ভাড়া করে থাকেন নি। রানীপুরে পৈতৃক বাড়ি সারিয়ে নিয়েছিলেন। সেখান থেকেই রোজ কলকাতায় যাওয়া-আসা করতেন।

বাড়ি মেরামত করার সময়েই ভদ্রলোককে প্রথম দেখেছিল রাজেশ। তিনি যে দূরমনস্ক আত্মমগ্ন মানুষ—সেটা প্রথম দেখাতেই জানা হয়ে গিয়েছিল। দিনের অধিকাংশ সময়ই ট্রেনে আর কলকাতার আফিসে কেটে যেত তাঁর। যেটুকু সময় বাড়িতে কাটাতেন বিস্তৃত দালানে একখানা ইজিচেয়ার পেতে, তার ওপর আধশোয়া ভঙ্গিতে চোখ বুজে ভাবনার গভীরে ডুবে থাকতেন। নতুবা দেশ-বিদেশের ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি আর দর্শনের বই পড়তেন। আর পড়তে পড়তে তন্ময় হয়ে যেতেন।

মনে আছে সেটা ছিল উনিশ শ বেয়াল্লিশ তেতাল্লিশ। অর্থাৎ পঞ্চাশের মন্বন্তরের বছর। দুই গোলার্ধ জুড়ে উন্মাদ গর্জনে তখন মহাযুদ্ধের দামামা বাজছে। বাঙলা দেশের দিক্‌দিগন্তে তার প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সব চাইতে যেটা ভয়াবহ এবং প্রত্যক্ষ ঘটনা, সেটা হল গ্রাম-জনপদ-শহর-বন্দর জুড়ে দুর্ভিক্ষের নিষ্ঠুর নিশ্চিত পদক্ষেপ। বিনা প্রতিবাদে নিঃশব্দে হাজার হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে।

মনে পড়ে ইজিচেয়ার থেকে একেক দিন সেই আত্মমগ্ন মানুষটি উঠে পড়তেন। তারপর অস্থির ভাবে দালানময় পায়চারি করতে করতে হঠাৎ থমকে যেতেন। রাজেশ, দোলনের মা বা অন্য কেউ কাছাকাছি থাকলে বলে উঠতেন, 'কি-ভাবে মানুষ মরছে দেখছ। লাইক ডগস্ এ্যাণ্ড ক্যাটস্।' জোরে জোরে মাথা নাড়তে নাড়তে বলতেন, 'অথচ—অথচ কোথাও একটা প্রতিবাদ নেই। একটা লোকও ইতিহাসের এই নিষ্ঠুরতম হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে আঙুল পর্যন্ত তুলছে না। আশ্চর্য—আশ্চর্য!'

ইজিচেয়ারটার কাছে একখানা বড় মাপের টী-পয় টেবিল। তার ওপর প্রায় সব সময়ই মোটা মোটা অগণিত বই স্তূপীকৃত থাকত। কথা বলতে বলতে বইয়ের সেই স্তূপ থেকে দু-চারখানা তুলে আনতেন দোলনের বাবা। তারপর উত্তেজিতভাবে আবার শুরু করতেন, 'এগুলো পড়ে দেখ, আমাদের দেশে যে ভাবে হত্যা চলছে তার চাইতে অনেক সামান্য কারণে পৃথিবীর অন্য জায়গায় বিপ্লব ঘটে গেছে। অথচ—অথচ, এখানে—'

রাজেশ লক্ষ্য করেছে সমাজনীতি আর রাষ্ট্রনীতির যেখানে যত অসঙ্গতি আছে, সে সব নিয়ে মাঝে মাঝেই উত্তেজিত হয়ে উঠতেন ভদ্রলোক। আরো একটা ব্যাপার জেনেছিল রাজেশ, যৌবনের শুরু থেকেই রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধ লিখে আসছেন দোলনের বাবা। তখন ইংরেজ রাজত্ব। দোলনের বাবার প্রবন্ধে এমন কিছু ভয়ানক সত্য থাকত যাতে কয়েকবারই চাকরিটা যেতে বসেছিল। চাকরিটা গেলে ছেলেমেয়ে সংসার নিয়ে কী করবেন—সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র শঙ্কা বা দুশ্চিন্তা ছিল না তাঁর। নিজের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার মাপে যে সত্যকে তিনি ধরতেন সেটা প্রকাশ করতে তাঁর হাতের একটা আঙুলও কাঁপত না।

যাই হোক ধীরে ধীরে সব আড়ষ্টতা কেটে গেছে রাজেশের। মনে পড়ে মাস খানেকের মধ্যেই একা একা দোলনদের বাড়ি যাবার অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল রাজেশ। কিন্তু তা সত্ত্বেও দোলন রোজ তাকে ডাকতে আসত।

রাজেশ বলত, 'তোমার আর আসতে হবে না। আমি একাই যেতে পারব।'

'উঁহু—' জোরে জোরে প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়ে দোলন বলত, 'তা হবে না। তোমার যা লজ্জা, শেষে যদি না যাও আমার পিঠে মায়ের কিল পড়বে গুম গুম। তুমি তো এখন মা'র আদরের ছেলে হয়ে উঠেছ।'

'তাই নাকি! তোমার চাইতেও বেশী আদর করেন আমাকে?'

'হুঁ-উ-উ-উ—'

'কেমন করে বুঝলে?'

'আহা, বুঝতে আবার পারা যায় না যেন! ই-ই-ই--' ভেংচি কেটে উঠত দোলন।

দোলনের মায়ের স্নেহের ভাগ নিয়ে রাজেশ আর দোলনের মধ্যে খেলাটা জমেছিল ভাল। প্রায় রোজই এ ব্যাপারে তাদের খুনসুড়ি লেগে থাকত।

মনে আছে, প্রতিদিনই দোলনের মা কিছু না খাইয়ে ছাড়তেন না রাজেশকে। আর রাজেশকে কিছু খেতে দিলেই দোলন চেঁচিয়ে উঠত, 'রাজুদাকে বড়টা দিয়েছে, আমারটা ছোট। এত ছোট আমি খাব না—খাব না—'

'ও মা, রাক্ষুসী কি বলে গো! ওকে নাকি ছোটটা দিয়েছি!' বলেই গালে হাত দিয়ে দোলনের মা খিলখিলিয়ে হেসে উঠতেন।

'দিয়েছই তো। রাজুদাকে তুমি বেশী ভালবাস।' নাকে সুর টেনে টেনে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে দোলন বলত।

'দাঁড়া পোড়ারমুখী, হিংসে তোর বার করছি।' মেয়েকে মারতে গিয়ে আবার নতুন উদ্যমে হেসে উঠতেন দোলনের মা।

এই ভাবে দোলনের মায়ের অকুণ্ঠ অযাচিত স্নেহে ভাগ বসিয়ে দিন কেটে যাচ্ছিল রাজেশের। এর মধ্যে কবে যেন একদিন পুতুল খেলার বয়সটা পার করে দিয়েছিল দোলন। ফল হয়েছিল এই, উঠোনের এক প্রান্তে বাতাবী লেবু গাছটার তলায় সেই খেলাঘরটা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

উঠোনের সেই খেলাঘরটা না থাকলেও রাজেশকে নিয়ে দোলনের যে দ্বিতীয় খেলাঘর, সেখানে জীবনের আরেকটা বিচিত্র খেলা শুরু হয়ে গিয়েছিল।

রাজেশের শৈশবটা কেটেছে পিসির পায়ে পায়ে ঘুরে। পিসিই ছিল তার সর্বক্ষণের সঙ্গিনী। পিসি কলকাতায় পালিয়ে গেলে একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিল রাজেশ। বহুকাল পর কৈশোরের সীমান্তে পৌঁছে দোলনকে পেয়েছিল সে। পিসির শূন্যতার প্রায় সবটুকু ভরিয়ে দিয়ে আরো কিছু দিয়েছিল মেয়েটা।

মা, পিসি, ঠাকুরদা আর মামাদের হারানোর ক্ষতিটা অনেকখানিই পূরণ করে দিয়েছিল দোলনরা।

দোলনদের সঙ্গে পরিচয়ের পর তিনটে বছর পলক ফেলতে না ফেলতেই যেন শেষ হয়ে গিয়েছিল। মনে পড়ে, তিন বছর পরে তার বয়স যখন আঠার —ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়েছিল রাজেশ। আর পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুবার ঠিক আগে আগে রানীপুরের হাওয়ায় হাওয়ায় গুঞ্জনটা শোনা যাচ্ছিল। ভবেশ নাকি আবার বিয়ে করবেন।

খবরটা শোনামাত্র রাজেশের বুকের ভেতর ফিক ব্যথার মত অসহ্য এক যন্ত্রণা শুরু হয়ে গিয়েছিল যেন। মনে আছে, সেই সময় ভবেশ একদিন তাকে বলেছিলেন, 'তোর তো ম্যাট্রিক পরীক্ষা হয়ে গেল রাজু। দিন পনেরোর ভেতরে রেজাল্ট বেরুবে। আমি জানি পাস তুই নিশ্চয়ই করবি। রেজাল্ট বেরুলে ভাবছি তোকে দার্জিলিং-এ হস্টেলে রেখে কলেজে পড়াব। তোর স্বাস্থ্য তো বরাবরই খারাপ। দার্জিলিং-এ ভালই থাকবি। তা হলে ঐ কথাই রইল।' একটু ভেবে আবার বলেছিলেন, 'রেজাল্ট তো বেরুবে পনের দিন পর। তুই বরং এক কাজ কর। আসছে সপ্তাহেই দার্জিলিং চলে যা।'

হঠাৎ অবরুদ্ধ স্বরে গুঙিয়ে উঠেছিল রাজেশ, 'না।'

প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিলেন ভবেশ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'না কেন, দার্জিলিং তো চমৎকার জায়গা।'

রাজেশ উত্তর দেয় নি। দাঁতে দাঁত চেপে আড়ষ্টের মত দাঁড়িয়ে ছিল শুধু।

কি একটু ভেবে ভবেশ আবার বলেছিলেন, 'দার্জিলিং-এ যদি যেতে না চাস, চাঁপদানিতে তোর মামাবাড়ি গিয়ে না হয় থাক।'

রাজেশ এবারও নিশ্চুপ। রানীপুর থেকে তাকে সরিয়ে দেবার জন্য ভবেশের কেন যে এত বাগতা সেটুকু বুঝতে অসুবিধে নেই। বয়স্ক ছেলের সামনে দ্বিতীয়বার বরবেশ ধারণ করতে হয়তো চক্ষুলজ্জায় বাধছিল ভবেশের।

যাই হোক, রাজেশের সব চাইতে চমক লেগেছিল চাঁপদানির উল্লেখে। মায়ের মৃত্যুর পর মামারা যখন তাকে নিতে এসেছিলেন, ভবেশ তাঁদের ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। সেই ভবেশই আবার তাকে চাঁপদানি যেতে বলছেন। আশ্চর্য!

রাজেশ অবশ্য ভবেশের নির্দেশ অনুযায়ী চাঁপদানি যায় নি। একদিন রাত্রে সবার অলক্ষ্যে, চুপিসাড়ে, কারুকে কিছু না বলে, চোখের জলে বুক ভাসিয়ে সে নিজেই চাঁপদানির ট্রেন ধরেছিল। যাবার সময় যে দোলনরা তার সব হারানোর শূন্যতা অনেকখানি পুরণ করেছে, তাদের সঙ্গেও দেখা করে আসে

নি। রাজেশ বুঝতে পেরেছিল, রানীপুরে তার থাকাটা ভবেশের কাছে বাঞ্ছনীয় নয়। পৃথিবীতে চাঁপদানি ছাড়া আর কোন আশ্রয়ের কথা সেদিন তার মনে পড়ে নি।

দশ-দশটা বছর। অর্থাৎ প্রায় একযুগ। একযুগ আগের সেই মানুষগুলি আর অগণিত ঘটনা মিছিলের মত চোখের ওপর দিয়ে ভেসে ভেসে গেছে।

এখন কত রাত কে জানে? নরম নির্ভাঁজ বিছানায় অপরিমিত আরামে ডুবে থাকতে থাকতে রাজেশের মনে হল, স্নায়ুর ওপর লক্ষ ডানায় ঘুম নামতে শুরু করেছে। তার চেতনা দেখতে দেখতে ঘুমের আরকে নিমজ্জিত হতে লাগল।

ছয়

সব রূপকথার গল্পেই একটি চরিত্র থাকে যার মুখে একবার না একবার সেই কথাটি শোনা যাবেই। সে বলে, 'উত্তরে যেও, পশ্চিমে যেও, ইচ্ছে হলে পুবেও যেতে পার কিন্তু দক্ষিণে কদাচ যেও না।' রূপকথার সেই চরিত্রটির মত কাল রাত্রে পশ্চিম দিকটায় কাঁটা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন ভবেশ।

আজ খুব সকালে ঘুম ভেঙেছিল রাজেশের। তখনও রোদ ওঠে নি। চিরদিনের অনভ্যস্ত পটে ঘুম ভেঙে প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল সে। চারপাশে বিলাসের অজস্র উপকরণ ছড়ানো। মনে হয়েছিল ঘুমের ঘোরে কেউ তাকে এই অপরিচিত পরিবেশে শুইয়ে রেখে গেছে।

খুব বেশীক্ষণ দিশেহারা হয়ে থাকে নি রাজেশ। একটু একটু করে দশ বছর পর কাল তার প্রথম রানীপুরে আসা থেকে শুরু করে ভিক্টোরীয় যুগের ক্যাসেলের মত লাহাবাবুদের সুবিশাল বাড়িখানা—সমস্তই মনে পড়ে গিয়েছিল। তারপর সমস্ত স্মৃতির ভিড় ঠেলে বাড়ির পশ্চিম দিকটা সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

কাল রাত্রে ভবেশ পশ্চিমে যেতে নিষেধ করে দিয়েছেন। পাছে রাজেশ যায়, সেজন্য জুজুর ভয় দেখিয়েছেন। ওখানে নাকি সাপের আস্তানা আছে।

সাপের ভয়ে খুব যে একটা বিচলিত হয়ে পড়েছিল রাজেশ, তা নয়। বরং তার মনে হয়েছিল, ভবেশের নিষেধের পেছনে কি যেন একটা রহস্যময়তা আছে। কাল রাত্রেই সে স্থির করেছিল, সেই রহস্যটা যে ভাবেই হোক আবিষ্কার করবে।

এই সকাল বেলায় সেই নিষিদ্ধ দিকটা তাকে ক্রমাগত হাতছানি দিতে লাগল। সেই দুরন্ত আকর্ষণকে খুব বেশীক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারল না রাজেশ।

নিজের ঘরখানা থেকে বাইরের বিস্তৃত করিডরে বেরিয়ে চারদিক একবার দেখে নিল রাজেশ। কাল রাত্রে এক অক্ষৌহিণী বয়-বেয়ারা দেখেছিল সে। আজ তাদের কারুকেই দেখা গেল না।

নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল রাজেশ। তারপর কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা পশ্চিমে পা বাড়িয়ে দিল।

পশ্চিমে অর্থাৎ বাড়িটার পেছন দিকে কোন বিস্ময়ই নেই। হাঁটু-সমান বুনো ঘাসের নিরবচ্ছিন্ন জঙ্গল, ফাঁকে ফাঁকে ইতস্তত পেয়ারা আর লকেট ফলের গাছ। আর আছে বনতুলসীর উদ্দাম সমারোহ।

কতক্ষণ যে এই নির্জন বুনো ঘাসের অরণ্যে ঘুরে বেড়িয়েছিল, রাজেশের মনে নেই। বার বার তার মনে হচ্ছিল, এখানে কি এমন রহস্য থাকতে পারে যে জন্য ভবেশের অত রুদ্ধশ্বাস সাবধানতা?

ঘুরতে ঘুরতে কখন যে একেবারে শেষ সীমান্তে এসে পড়েছিল, রাজেশের খেয়াল নেই।

বাড়ির পশ্চিম দিকের সীমানা তারকাঁটার বেড়া দিয়ে ঘেরা। বেড়াটার কাছে গিয়ে এদিক-সেদিক তাকাতেই রাজেশের দৃষ্টি হঠাৎ দুটি নিষ্পলক দীর্ঘ চোখে আটকে গেল।

কাল রাত্রেই কুয়াশা আর অন্ধকারে অস্পষ্টভাবে এদিকে একখানা একতলা বাড়ি চোখে পড়েছিল রাজেশের। মিটমিটে দু-চারটে আলোর বিন্দুও দেখা গিয়েছিল। আজ বাড়িটা স্পষ্টই দেখা গেল।

তারকাঁটার বেড়া যেখানে শেষ হয়েছে তারপর থেকেই বাড়িটার সীমানা শুরু। এক নজরেই বোঝা যায়, সেটা বহুকালের পুরনো। সামনের দিকে ঝকঝকে উঠোন। আর সেই উঠোনটা অর্ধবৃত্তাকারে ঘিরে রাশি রাশি মরসুমী ফুল ফুটে আছে। এ বাড়ির আর্থিক অবস্থা যে সচ্ছল নয় অনায়াসেই তা অনুমান করে নেওয়া যায়।

ফুলবাগানটার পটে ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে ছিলেন। রাজেশের মনে হল অনেকক্ষণ ধরে ঐ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে নির্নিমেষে তারই দিকে তাকিয়ে রয়েছেন তিনি। রাজেশ আগে খেয়াল করে নি।

ভদ্রমহিলা মধ্যবয়সিনী। সাড়ে পাঁচ ফুটের ওপর দীর্ঘ চেহারা। গায়ের রঙ রৌদ্রঝলকের মতো। তীক্ষ্ণ নাকের দু-পাশে প্রতিমার মত আয়ত চোখ

কপালের মাঝখানে সিঁদুরের গোলাকার মস্ত টিপটা জ্বলছে যেন। পরনে তাঁতের লাল পাড় শাড়ি আর সাদা ব্লাউজ। ভদ্রমহিলার সমস্ত অবয়ব ঘিরে এমন একটা ব্যক্তিত্ব আছে যাতে তাঁকে দেখা মাত্র সমস্ত স্নায়ু সতর্ক হয়ে ওঠে। শ্রদ্ধা আর ভক্তি ছাড়া তাঁর সম্বন্ধে আর সব অনুভূতিই স্তব্ধ হয়ে যায়।

নিশ্চল একটা মূর্তির মত তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। আর সম্মোহিতের মত তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছে রাজেশ। তাঁর দৃষ্টি থেকে যে চোখ ফিরিয়ে আনবে, সাধ্য কি!

বিচিত্র কুহকমন্ত্রে আচ্ছন্ন করে ভদ্রমহিলা হয়তো তাকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে যেতেন। আর সেই টানে নিশ্চেতনের মত তারকাঁটার বেড়া ডিঙিয়ে ওপারে চলে যেত রাজেশ।

কিন্তু যাওয়াটা আর শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠল না। কার ডাকে যেন সেই আচ্ছন্নতা ছিন্ন হয়ে গেল। চকিত হয়ে পেছন ফিরতেই রাজেশ দেখল, একটা বয় দাঁড়িয়ে রয়েছে। বলল, 'কী ব্যাপার?'

লম্বা মাপের একটা সেলাম ঠুকে বয়টা বলল, 'বড়া সাব একটু আগে ফিরে এসেছেন। আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে বলেছেন।'

রাজেশের মনে পড়ল, কাল রাত্রে বাড়ি ছিলেন না ভবেশ। তার সমস্ত ভাবনাটা হঠাৎ ভবেশের দিকে ঘুরে গেল। কাল রাত্রে কোথায় ছিলেন তিনি? সেই মহিলাটির কাছেই কি? সেই মহিলাটি—যাঁকে ভিক্টোরীয় যুগের কাসেলের মত সুবিশাল বাড়িটার কোথাও কাল পাওয়া যায় নি। সেই মহিলাটি—যাঁর জন্য একদিন দুরন্ত অভিমানে রানীপুর ছেড়ে চলে গিয়েছিল সে। রাজেশ আসবে বলেই কি সঙ্কোচে তাঁকে অন্য কোথাও সরিয়ে রেখেছেন ভবেশ?

বয়টা আবার ডাকল, 'ছোটা সাব—'

রাজেশ বলল, 'তুমি যাও আমি আসছি।'

বয়টা চলে গেলে তারকাঁটার ওপারের সেই মহিলার কথা আবার মনে পড়ল। চকিতে পেছন ফিরে একতলা বাড়িটার দিকে তাকাল রাজেশ। আশ্চর্য, ফুলবাগানের সেই পট থেকে ভদ্রমহিলা অদৃশ্য হয়ে গেছেন। কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইল রাজেশ।

বিমূঢ়তা কাটলে আঁতিপাতি করে চারদিক দেখেও মহিলাটিকে যখন পাওয়া গেল না, তখন এলোমেলো পা ফেলে বিভ্রান্তের মত বাড়ির দিকে ফিরে চলল সে।

বাড়িতে ঢুকে সোজা দোতলায় উঠে এল রাজেশ। সোজা নিজের ঘরে

গিয়ে দেখল, পেছনে হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ করে পায়চারি করছেন ভবেশ. ছেলেকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। কি যেন ভেবে বললেন, 'খানিকটা আগে আমি ফিরেছি। ফিরে দেখি তুই ঘরে নেই। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন দেখলাম ফিরলি না তখন একটা বয়কে পাঠালাম তোকে ডেকে নিয়ে আসতে। তা হ্যাঁরে রাজু, তুই গিয়েছিলি কোথায়?'

সে কোথায় গিয়েছিল, সে খবরটা যে ভবেশ খুব ভালভাবেই জানেন, অন্তত বয়টার মুখে যে শুনেছেন—এ ব্যাপারে রাজেশ নিঃসন্দেহ। সব জেনেশুনেও তার গতিবিধি সম্বন্ধে কেন প্রশ্ন করলেন ভবেশ? রাজেশ সত্যি বলে কি-না, সেটাই কি যাচাই করতে চান তিনি? না অন্য কোন গূঢ় গভীর উদ্দেশ্য আছে?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভবেশের দিকে তাকিয়ে অর্ধস্ফুট স্বরে রাজেশ বলল, 'বাড়ির পেছন দিকে বেড়াতে গেছলাম।'

রীতিমত ক্ষুব্ধ স্বরে ভবেশ এবার বললেন, 'কাল রাত্রে ওদিকে যেতে তোকে বারণ করে দিলাম। তা আমার কথাটা শুনলি না!'

রাজেশ উত্তর দিল না।

ভবেশ আবার বললেন, 'তা ছাড়া—' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন।

ভবেশের স্বরে এমন একটা চড়াই-উৎরাই ছিল যাতে চকিত হয়ে উঠল রাজেশ। সমস্ত স্নায়ুকে সজাগ রেখে আস্তে আস্তে সে বলল, 'তা ছাড়া কী?'

'না-না, তেমন কিছু না।' জোরে জোরে মাথা নেড়ে ভবেশ বলতে লাগলেন, 'সাবধানে থাকতে আপত্তি কি। শুধু শুধু ওদিকে গিয়ে একটা বিপদ বাধাবার দরকার তো কিছু নেই।'

ভবেশের মুখ-চোখের ভাব, কণ্ঠস্বর—সব বুঝিয়ে দিল, কাল রাতের মত আজও কী যেন গোপন করে গেলেন তিনি। বিদ্যুৎ-চমকের মত হঠাৎ রাজেশের মনে হল, তবে কি পেছনের ঐ একতলা বাড়িটার সঙ্গে এমন কোন সম্পর্ক তাঁর আছে যা ছেলের কাছে ব্যক্ত করতে চান না ভবেশ?

বাড়িটার প্রসঙ্গে সেই মধ্যবয়সিনী ভদ্রমহিলার মুখখানা চোখের ওপর ভেসে উঠল। কে তিনি?

ভবেশ আবার বলে উঠলেন, 'যাক গে। মুখ-টুখ ধুয়েছিস?'

'না।' রাজেশ মাথা নাড়ল।

'তাড়াতাড়ি ধুয়ে নে। আজকে আমার একখানা ধুতি, পাঞ্জাবি আর শাল পাঠিয়ে দিচ্ছি। বাসি জামাটামা ছেড়ে তাড়াতাড়ি ডাইনিং রুমে চলে

আয়। ব্রেকফাস্ট সেরেই তোকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ব। সারা রানীপুরটা ঘুরতে হবে। তারপর যাব কলকাতায়।' বলেই ব্যস্তভাবে চলে গেলেন ভবেশ।

ভবেশের নির্দেশমত খানিকটা পরে খাবার ঘরে চলে এল রাজেশ। ভবেশ সেখানে অপেক্ষা করছিলেন।

দ্রুত খাওয়া সেরে দুজনে বেরিয়ে পড়লেন। অবশ্য পায়ে হেঁটে নয়। কালকের সুইস মডেলের সেই সুদর্শন মোটরটায় করে। নিজেই গাড়ি চালাতে লাগলেন ভবেশ।

প্রথমেই ভবেশ ছেলেকে নিয়ে এলেন রানীপুরের পুবদিকে স্টেশনগামিনী রাস্তাটার ধারে। কাল রাত্রেই রাজেশ দেখে গেছে, গত দশ বছরে ময়দানবের ছোঁয়া লেগে এ অঞ্চলটার জন্মান্তর ঘটে গেছে। দশ বছর আগে যেখানে ছিল যোজন যোজন হোগলা-বন, ধানক্ষেত, সেখানে অগণিত কারখানার চিমনি আজ আকাশ বিদ্ধ করে রেখেছে।

কারখানার এই অরণ্যে তার জন্য এমন একটা বিস্ময় যে অপেক্ষা করছিল, তা কি জানত রাজেশ! রাস্তাটার ধারে কিছু দূর এগুতেই পনের বিশ একর জমি নিয়ে বিশাল একটা চাল কল। সামনে কাঠের ফলকে নাম লেখা আছে কল্যাণী রাইস মিল।

নামটা ভাল করে দেখতে না দেখতেই গাড়ি ঘুরিয়ে চালকলের ভেতরে নিয়ে এলেন ভবেশ। শীতের এই সকালে মিলের কাজ এখনও শুরু হয় নি। তিন চারটে হিন্দুস্থানী দারোয়ান রোদে বসে গা সেঁকছিল। গাড়ি দেখে ঊর্ধ্বশ্বাসে তারা ছুটে এল। ভবেশ কিন্তু ফিরেও তাদের দেখলেন না। রাজেশের দিকে তাকিয়ে বললেন,-'আয় রাজু—' বলতে বলতে তিনি নেমে পড়লেন। কথামত রাজেশও নামল।

তারপর রাইস মিলের বিস্তৃত এলাকা, অফিসবাড়ি, গুদামঘর—ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছেলেকে সমস্ত দেখালেন ভবেশ। তারপর গাড়িতে ফিরে এসে বললেন, 'এই রাইস মিলটা আমাদের'।

রাজেশ কী উত্তর দিল, বোঝা গেল না।

ভবেশ আবার বললেন, 'রাইস মিলের নামটা লক্ষ্য করেছিস? তোর মায়ের নামে চাল-কলটার নামকরণ করেছি।'

ভবেশের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত স্নায়ু উচ্চকিত হয়ে উঠল রাজেশের। 'কল্যাণী রাইস মিলের' কল্যাণী যে তাঁরই মায়ের নাম, প্রথমটা

খেয়াল করে নি সে। তার মায়ের নামটাকে ভবেশ যে এভাবে স্মরণীয় করে রেখেছেন, কে ভেবেছিল।

ভবেশের মুখে মায়ের প্রসঙ্গটা উঠতেই পেশীগুলো কঠিন হয়ে উঠেছে রাজেশের।

শুধু রাইস মিলটাই না, সেটার পাশে একটা মাঝারি কেমিক্যাল ফ্যাক্টরি তার অধীশ্বরও ভবেশই। এবং সেটার নামও তার মায়ের নামে—কল্যাণী কেমিক্যালস্।

রাইস মিল থেকে বেরিয়ে কেমিকাল ফাক্টরিটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন ভবেশ। তারপর ছুটলেন রানীপুরের দিকে।

রানীপুরের দক্ষিণে মেয়েদের একটা হাইস্কুল করে দিয়েছেন ভবেশ। নাম : কল্যাণী মেমোরিয়াল গার্লস্ হাইস্কুল। রানীপুরের উত্তরে একটা দাতব্য চিকিৎসালয় খুলেছেন। নাম : কল্যাণী চ্যারিটেব্‌ল্ ডিস্‌পেন্সারি। সমস্ত রানীপুর জুড়ে তার মায়ের নামে অসংখ্য স্মৃতিসৌধ ছড়িয়ে রেখেছেন ভবেশ।

কেমিক্যাল ফ্যাক্টরি, রাইস মিল, স্কুল, ডিসপেন্সারি—সব দেখানো হলে গাঢ় গভীর সুরে ভবেশ বললেন, 'সারাজীবন তোর মায়ের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করি নি। জানি সেজন্যে ক্ষমা নেই। বেঁচে থাকতে তো কষ্টই দিয়েছি তাকে ; এই সব স্কুল-ডিসপেন্সারির সঙ্গে তার নামটা জুড়ে দিয়ে একটু সান্ত্বনা পাই বাবা। ভাবি হয়তো সে—' বলতে বলতে তাঁর স্বর রুদ্ধ হয়ে এল।

রাজেশ উত্তর দিল না। দৃঢ়বদ্ধ আঁটা ঠোঁটে নতচোখে নিশ্চুপ রইল।

মায়ের নামের সেই স্মৃতিসৌধগুলো দেখানো হলে প্রদর্শনীর দ্বিতীয় পর্ব শুরু করলেন ভবেশ। উত্তর-দক্ষিণে-পুবে-পশ্চিমে – সারা রানীপুরে লাহাবাবুদের সেই ক্যাসলটার মত আট দশখানা বাড়ি দেখালেন ভবেশ। এবং জানালেন এ-সবই তাঁর। বাড়িগুলো ভাড়া দিয়েছেন তিনি।

ভবেশ আরো জানালেন, রানীপুরের ক'খানা বাড়ি আর কল-কারখানাই না—দূর গ্রামের দিকে বিঘে পঞ্চাশেক ধানের জমিও কিনেছেন। দেখতে দেখতে আর শুনতে শুনতে রাজেশের মনে হল, দশ বছরে সসাগরা পৃথিবীকে করায়ত্ত করে রেখেছেন ভদ্রলোক।

নিজ ঐশ্বর্যের প্রায় সকল দিক দেখানো হলে ভবেশ বললেন, 'আমাদের সেই পুরনো বাড়িতে যাবি নাকি রাজু ?'

জীবনের প্রথম আঠারোটা বছর সেখানে কেটেছে রাজেশের। তা ছাড়া মা, ঠাকুরদা আর পিসির হাজার স্মৃতি সেই বাড়িটার সঙ্গে জড়িত। সেখানে

যাবার নামে প্রাণের ভেতর তরঙ্গ উথলে উঠল যেন। রাজেশ বলল, 'হ্যাঁ যাব।'

রানীপুরের দক্ষিণে তাদের সেই বাড়িটায় এসে অবাক হয়ে গেল রাজেশ। পুরনো একতলা বাড়িটার চিহ্নমাত্র নেই। তার জায়গায় আধুনিক স্থাপত্য-রীতির একখানা তিনতলা প্রাসাদ উঠেছে। এ বাড়িটাও ভাড়া দেওয়া।

ভবেশ বললেন, 'আগের বাড়িটা এত পুরনো হয়ে গিয়েছিল যে মেরামত করে আর চলছিল না। আজ এখান দিয়ে দেওয়াল ভেঙে পড়ে, কাল ছাদ ফুটো হয়ে যায়। কাজেই একেবারে ভেঙেচুরে নতুন বাড়িই তুলে ফেললাম।'

কতক্ষণ বাড়িটার দিকে রাজেশ তাকিয়েছিল, মনে নেই। হঠাৎ দোলনদের কথা মনে পড়ে গেল তার। সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটি নিজের অজান্তে বাঁ দিকে ফিরে গেল।

দশ বছর আগে তাদের বাড়ি আর দোলনদের বাড়ির মাঝখানে একটা নীচু প্রাচীরের সীমানা ছিল। দোলন আর সে সেটা ডিঙিয়ে যাওয়া-আসা করত। আশ্চর্য। সেই প্রাচীরটার চিহ্নমাত্র নেই। সবিস্ময়ে রাজেশ দেখল, তাদের বাড়ি আর দোলনদের বাড়িটাকে একসঙ্গে ঘিরে প্রাচীর টানা হয়েছে। বাড়ি দুটো যেন আলাদা নয়, একই বাড়ির দুটো আলাদা অংশ।

ভবেশ পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। চকিতে তাঁর দিকে ফিরে রাজেশ জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, ঐ বাড়িটায় প্রণব বসু বলে এক ভদ্রলোক থাকতেন না?'

'হ্যাঁ।' ভবেশ বললেন, 'তবে এখন আর থাকেন না।'

রাজেশ বলল, 'কোথায় আছেন তাঁরা?'

এক মুহূর্ত থতিয়ে রইলেন ভবেশ। মনে হল, রাজেশের প্রশ্নে তিনি বুঝি বিব্রতই বোধ করছেন। পরক্ষণেই সে ভাবটা সামলে নিয়ে বললেন, 'বছর চারেক আগে আমার কাছে বাড়িটা বিক্রি করে ওরা কোথায় চলে গেছে, ঠিক জানি না।' বলতে বলতে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনি, 'চল রাজু, অনেক বেলা হয়ে গেল।'

রাজেশের মনে হল, ব্যস্ততার ছদ্মবেশে দোলনদের ব্যাপারে কি যেন গোপন করতে চাইছেন ভবেশ। রাজেশ যেমন ছিল, তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। দশ বছর আগের সেই দিনগুলো দোলনদের বাড়ির দিকটা থেকে তাকে ক্রমাগত হাতছানি দিতে লাগল যেন।

অস্থির স্বরে রাজেশ বলল, 'আচ্ছা ওঁরা কি রানীপুর থেকেই চলে গেছেন?'

কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন ভবেশ। অবশেষে ভাসা-ভাসা জবাব দিলেন, 'তা কেমন করে জানব! আমার কাছে বাড়ি বিক্রি করেছে; সম্পর্ক চুকে

গেছে। তারপর রানীপুরে আছে কি রোম-প্যারিসে গিয়ে উঠেছে, সে খবরে আমার দরকার কি! তবে মাস দুয়েক আগে রানীপুর বাজারের কাছে প্রণব বোসকে একবার দেখেছিলাম মনে হচ্ছে।'

তৎক্ষণাৎ আর কিছু বলল না রাজেশ। এক যুগ আগে সাত আট বছরের সেই মেয়েটা, তার নিয়ত-হাসিনী মা, তাঁর অফুরন্ত অপার স্নেহ—একাকার হয়ে রাজেশের সমস্ত শূন্যতা প্রায় ভরিয়ে দিয়েছিল। অন্যমনস্কর মতো রাজেশ বলল, 'আচ্ছা প্রণববাবুদের বাড়িটায়—'

কথাটা আর শেষ করতে পারল না রাজেশ। তার আগেই ভবেশ সংশোধন করে দিলেন, 'ওটা এখন আমাদের বাড়ি।'

'ও হ্যাঁ; ওটা তো এখন আপনার বাড়ি।' একটুক্ষণ থমকে থেকে রাজেশ বলল, 'তা ঐ বাড়িটায় এখন কারা থাকেন?'

'ওটা ভাড়া দিয়েছি।'

'আমি একবার ওখানটায় যাব।'

'কেন?'

রাজেশ বলল, 'দশবছর আগে রোজই ও বাড়িটায় যেতাম। দেখে আসি বাড়িটা তেমনই আছে কিনা!'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, হুবহু তেমনই আছে।' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন ভবেশ, 'মাঝখানের পাঁচিলটা ভেঙে দেওয়া ছাড়া ওখানে হাতই দিই নি আমি।'

'তবু একবার যাই, যদি ভাড়াটেরা প্রণববাবুদের কোন খবর টবর দিতে পারে।'

'আরে না, না, ভাড়াটেরা নতুন এসেছে। ওরা কোত্থেকে প্রণববাবুদের খবর দেবে!' একরকম টানতে টানতেই রাজেশকে নিয়ে গাড়িতে উঠলেন ভবেশ।

ভবেশ কেন তাকে দোলনদের বাড়ি যেতে দিলেন না? কেন? রাজেশের মনে হল, কি যেন জটিলতা আছে এর ভেতর। রাজেশ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, আজই হোক কালই হোক, একবার সে দোলনদের বাড়ি আসবে।

কাল রানীপুরে আসার পর থেকেই লুকোচুরি শুরু করেছেন ভবেশ। সেই সুবিশাল বাড়িটার পশ্চিমে রাজেশের পা বাড়ানো নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। তা ছাড়া দোলনদের বাড়িও আজ যেতে দিলেন না। রাজেশের বার বার মনে হতে লাগল, নিজের কিছুটা উন্মুক্ত করে অনেকখানি অংশই গোপন করে রাখতে চাইছেন ভবেশ। কিন্তু কেন? কেন?

রানীপুরের দক্ষিণে তাদের সেই আদি বাড়িটা থেকে রাজেশকে নিয়ে

সোজা কলকাতায় এসেছিলেন ভবেশ। উদ্দেশ্য, রাজেশের জন্য কয়েক প্রস্থ পোশাক কেনা। রাজেশ আপত্তি জানিয়েছিল। বলেছিল, 'চারদিন তো মোটে থাকব। এর জন্যে আর জামাকাপড় কিনতে হবে না।'

ভবেশ কিন্তু শোনেন নি। পোশাক কিনে একটা দামী হোটেলে খেয়ে ছেলেকে নিয়ে বিকেলে আবার রানীপুরের দিকে রওনা হলেন।

সাত

কলকাতা থেকে রানীপুর ফিরে সোজা বাড়ি চলে এলেন ভবেশ। তবে গাড়ি থেকে নিজে নামলেন না। রাজেশকে নামিয়ে দিয়ে বললেন, 'সারাদিন ঘুরে ঘুরে নিশ্চয়ই খুব টায়ার্ড হয়ে পড়েছিস।'

'না, টায়ার্ড আর কি।' স্বরহীন গলায় রাজেশ বলল।

ভবেশ বললেন, 'ঘোরাঘুরিতে স্নান হয় নি। এক কাজ কর। স্নান-টান সেরে একটু রেস্ট নে। আজ আবার রাইস মিলের পে-ডে। আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে। ওয়ার্কারদের মাইনে-টাইনে চুকিয়ে আমার ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। তুই আবার কোথাও বেরুস-টেরুস নি। ফিরে এসে তোর সঙ্গে জরুরী একটা পরামর্শ আছে। আচ্ছা আমি এখন চলি।'

ভবেশ চলে যাবার পর একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল রাজেশ। তারপর আস্তে আস্তে নিজের ঘরখানায় এসে স্নান সেরে নিল। আজকের কেনা একটা নতুন ট্রাউজার আর শার্ট পরতে পরতে সেই মহিলাটির কথা আবার মনে পড়ে গেল। সেই মহিলাটি, যাঁর জন্য একদিন রানীপুর ছেড়ে চলে গিয়েছিল সে আর আইনত যাঁকে মা বলাই উচিত।

মা! শব্দটা মনে মনে উচ্চারণ করতে গিয়েই বুকের ভেতরটা স্তব্ধ হয়ে গেল যেন। মুখের পেশীগুলো নিষ্ঠুর কঠিন হয়ে উঠল।

কাল রাত্রে রাজেশ স্থির করেছিল, ভবেশ যখন বাড়ি থাকবেন না সেই সুযোগে এই বিশাল ক্যাসেলের প্রতিটি অন্ধি-সন্ধি আঁতিপাতি করে খুঁজবে সে। দেখবে, সেই মহিলা কোথায় আত্মগোপন করে আছেন।

যে মহিলাটির জন্য একযুগ ধরে রানীপুর থেকে সে পলাতক ছিল তাঁকে একবার চোখের দেখা দেখতে রাজেশের এত ব্যগ্রতা কেন? নিছকই কৌতূহল, না গভীরতর অন্য কিছু? ঠিক যে কী, ব্যাখ্যা করে বলতে পারবে না রাজেশ।

জামা টামা পরা হয়ে গিয়েছিল। দ্রুত চিরুনি চালিয়ে চুল আঁচড়ে নিল রাজেশ। তারপর ঘরের বাইরের বিস্তৃত করিডরে এসে দাঁড়াল।

কোথা থেকে খোঁজাখুঁজি শুরু করবে সে? তার পাশের ঘরটি থেকেই কী? হঠাৎ তার চোখে পড়ল, একটা বয় দোতলায় সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছে। একমুহূর্ত কি ভেবে তাকে কাছে ডাকল রাজেশ।

একরকম ছুটেই এল বয়টা। সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলল না রাজেশ। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কী নাম?'

'সীয়াশরণ।'

'দেশ কোথায়?'

'জী, বিহার। আরা জিলা। গাঁও হরচন্দপুর।'

'এ বাড়িতে কতদিন কাজ করছ?'

'জী, চার বরষ।'

একটুক্ষণ ভেবে রাজেশ প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, এ বাড়িতে সবশুদ্ধ ক'খানা ঘর?'

চোখ কুঁচকে মনে মনে গুনে নিয়ে বয়টা বলল, 'জী, একতলায় সাতখানা। দোতলাতেও সাতখানা। আর ছাদে একখানা।'

রাজেশ বলল, 'তাহলে সাত আর সাতে চোদ্দ, আর এক—মোট পনের খানা।'

এর পর অনেকক্ষণ চুপচাপ। রাজেশই একসময় স্তব্ধতা ভাঙল, 'আচ্ছা সীয়াশরণ, এ বাড়িতে কত জন লোক আছে?'

'জী, আমরা চাকর-বাকর বারোজন। দু-জন রাঁধুনী, দু-জন ড্রাইভার। আমরা নীচে একতলায় থাকি। আর দোতলায় থাকেন বড়া সাব।'

'এ ছাড়া আর কেউ নেই?'

'জী নহী।'

'আচ্ছা, তুমি তো চার বছর কাজ করছ এ বাড়িতে, এর ভেতর মালী-রাঁধুনী বয়-ড্রাইভার ছাড়া আর কারুকে দেখনি?'

'জী নহী।'

'ভাল করে ভেবে বল।'

'জী, তেমন কারুকে তো দেখিনি—'

রাজেশ এবার কাছাকাছি এগিয়ে এল। ঈষৎ ঝুঁকে বয়টার চোখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ব্যগ্র স্বরে বলল, 'এই ধর বড়সাহেবের কোন আত্মীয়—কোন আউরত—'

'আউরত—আউরত—' বিড় বিড় করতে করতে আকাশ-পাতাল হাতড়াল বয়টা। তারপর অসহায় ভঙ্গিতে বলল, 'জী, আউরত-টাউরত তো—'

যে দৃষ্টিটা বয়টার চোখে স্থির করে রেখেছিল রাজেশ, ধীরে ধীরে সেটা তীক্ষ্ণ সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। একবার তার মনে হল, বয়-বেয়ারা—এ বাড়িতে যে এক ডজন চাকর-বাকর আছে তাদের সবাইকে বোধ হয় ভবেশ শিখিয়ে পড়িয়ে রেখেছেন। রাজেশ যদি আকার-ইঙ্গিতে সেই মহিলাটির সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করে, তারা যেন সরাসরি 'জানি না' বলে দেয়।

হঠাৎ রাজেশের মস্তিষ্কের ভেতর কি এক বিশৃঙ্খলা ঘটে গেল যেন। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল সে, 'চার বছর এখানে কাজ করছ। এর ভেতর এ-বাড়িতে কোন আউরত দেখনি! দিল্লেগি পেয়েছ! উল্লু কাঁহাকা। ভাগো—'

নবাগত ছোট সাহেবের মেজাজের গতিবিধি বুঝতে না পেরে প্রথমে হকচকিয়ে গেল বয়টা। তারপর বিভ্রান্ত দিশেহারার মত ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগাল।

বয়টা চলে যাবার পর একটু সময় দাঁড়িয়ে রইল রাজেশ। তারপর অপরিমিত উদ্যমে খোঁজা শুরু করল। একতলা, দোতলা এবং ছাদের মোট পনেরখানা ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজল সে। কিন্তু না, ভিক্টোরীয় যুগের কাসেলের মত এই সুবিশাল বাড়িখানার কোন গোপন অস্থি সন্ধিতেই সেই মহিলাটিকে আবিষ্কার করা গেল না।

সন্ধ্যের খানিকটা পরেই রাইস মিল থেকে ফিরে এলেন ভবেশ।

সমস্ত বাড়িটা খোঁজার পর ক্লান্ত ব্যর্থ হতাশ রাজেশ নিজের ঘরে শরীর এলিয়ে শুয়ে ছিল। চোখ দুটি ছিল জানালার বাইরে ছড়ানো। সেখানে ইতিমধ্যেই সমারোহ করে কুয়াশা আর অন্ধকার নেমে গেছে। এদিকটা রানীপুরের উত্তর প্রান্ত। সাহাবাবুদের, বর্তমানে ভবেশের। এই কাসেলটাই এ-প্রান্তের শেষ বাড়ি। এর পর একটানা ধানের খেত, একেবারে দিগন্ত পর্যন্ত।

অন্ধকারে দৃষ্টিটাকে হারিয়ে দিয়ে রাজেশ ভাবছিল, সেই মহিলাটিকে ভবেশ নিশ্চয়ই অন্য কোথাও সরিয়ে রেখেছেন। কিন্তু কেন?

নানা দিক থেকে ব্যাখ্যা করেও প্রশ্নটার কোন সদুত্তর পাচ্ছিল না রাজেশ। ফলে বিভ্রান্ত অস্থির হয়ে পড়েছিল। আর তার এই অস্থিরতার মধ্যে ভবেশ এসে ঘরে ঢুকলেন। ঈষৎ উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, 'কিরে, শুয়ে আছিস যে? শরীরটরীর খারাপ লাগছে নাকি?'

'না, এমনিই শুয়ে আছি।' ধড়মড় করে উঠে বসল রাজেশ।

'বিকেলে চা খেয়েছিস ?'

'না।'

ভবেশ বললেন, 'তুই খাস নি। রাইস মিলের পেমেন্টের ঝামেলায় আমারও খাওয়া হয় নি। এখন তা হলে দু-জনে একটু খাওয়া যাক। চা দিতে বলি ?'

রাজেশ উত্তর দিল না। ছেলের নীরবতা যে সম্মতি সেটুকু বুঝে তৎক্ষণাৎ একটা বয়কে ডেকে চা এবং কিছু খাবার আনতে বললেন ভবেশ। সে সব এলে খেতে খেতে রাজেশের একটা কথা মনে পড়ে গেল। সে বলল, 'রাইস মিলে যাবার আগে আপনি বলেছিলেন, ফিরে এসে কি একটা জরুরী কথা বলবেন—'

ভবেশ আস্তে আস্তে বললেন, 'আজ থাক...'

একটু চুপ করে থেকে রাজেশ বলল, 'চারদিন আমার এখানে থাকার কথা। তার মধ্যে একটা দিন শেষ হয়ে গেল। আপনার যা বলার বাকি তিনদিনের ভেতর বলে ফেলবেন। নইলে আমার আর শোনা হবে না।'

চকিত হয়ে উঠলেন ভবেশ। শিথিল স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ, তাই বলব।'

এর পর কেউ আর কিছু বলল না।

কাল রাতের মতো আজও খাওয়া-দাওয়া সেরে বাইরে কোথায় যেন চলে গেলেন ভবেশ। যাবার আগে বলে গেলেন, আজ আর ফিরবেন না।

আট

পরের দিনও ভোরেই ঘুম ভাঙল রাজেশের। সঙ্গে সঙ্গে নিষিদ্ধ পশ্চিম দিকটা দুর্বার আকর্ষণে তাকে টানতে লাগল। আত্মবিস্মৃত এক ঘোরের মধ্যে পোশাক বদলে বাড়ির পেছন দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল রাজেশ।

সাহা বাবুদের সুবিশাল ক্যাসেল আর পশ্চিম দিকের সেই একতলা পুরনো বাড়িখানা—এর মাঝখানে তারকাঁটার বেড়ার যে সীমানা টানা সোজা সেখানে এসে থামল রাজেশ।

আশ্চর্য। একতলা বাড়িটার সামনের সেই ফুলবাগানে আজও দাঁড়িয়ে আছেন সেই মহিলাটি—ঠিক সেই ভাবেই, তেমনই স্তব্ধ নিশ্চল একটা মূর্তির মত।

পরশু সন্ধ্যায় রানীপুর এসেছে রাজেশ। অর্থাৎ দুটো রাত আর পুরো একটা দিন পার হয়েছে মাত্র। এর মধ্যে জীবনের দৃশ্যে এবং অদৃশ্যে থেকে দুটি নারী তার প্রাণের অতলে আলোড়ন তুলেছে। অবশ্য যিনি অদৃশ্যচারিণী তাঁর খেলা শুরু হয়েছিল দশ বছর আগে। তাঁরই জন্য রানীপুর থেকে পলাতক হয়েছিল রাজেশ।

যিনি অদৃশ্যে আছেন তাঁর পরিচয় অবশ্য রাজেশের জানা। তিনি ভবেশের দ্বিতীয়া স্ত্রী। কিন্তু যিনি প্রত্যক্ষ, বেড়াতে বেড়াতে নিষিদ্ধ পশ্চিম দিকে কালই যাঁকে প্রথম আবিষ্কার করেছে রাজেশ এবং এই মুহূর্তে চোখের সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন যিনি, তিনি কে ?

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে রাজেশের খেয়াল ছিল না। একসময় সেই মহিলাটি আস্তে আস্তে তারকাঁটার বেড়ার ওপারে এসে দাঁড়ালেন। কাছাকাছি আসতেই টের পাওয়া গেল, দু-চোখে তাঁর অপার অসীম স্নেহও।

রাজেশের দিকে তাকিয়েই ছিলেন তিনি। চোখ না ফিরিয়ে গাঢ় কোমল সস্নেহ স্বরে বললেন, 'তোমার নামই তো রাজেশ, তাই না ?'

অপরিসীম বিস্ময়ে প্রথমটা কিছু বলতে পারল না রাজেশ। সে ভাবটা থিতিয়ে এলে আধফোটা স্বরে উত্তর দিল, 'হাঁা। কিন্তু আপনি আমার নাম জানলেন কেমন করে ?'

মহিলা হাসলেন, 'কে কার নাম কখন কি-ভাবে জানে, তা কি সবসময় বলা যায় বাবা। সে যাকগে, তুমি আসবে বলে সেই ভোর থেকে দাঁড়িয়ে আছি। কাল তো তোমার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয় নি। একটা বয় এসে তোমাকে ডেকে নিয়ে গেল। আজ কিন্তু অনেক কথা বলব। তোমার কাছে বলব বলে কত কথা যে বুকের ভেতর জমিয়ে রেখেছি।'

বিমূঢ়ের মত রাজেশ বলল, 'আপনি জানতেন, আমি আজও আসব ?'

'নিশ্চয়ই জানতাম। কাল তোমার চোখদুটি দেখেই বুঝেছি, তুমি না এসে পারবে না। সেই জন্যেই তো এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছি বাবা।' বলতে বলতে মহিলা থামলেন। একটু পর যখন আবার আরম্ভ করলেন, 'শুধু কি কাল আর আজই, কতদিন যে তোমার আশায় পথ চেয়ে আছি বাব—'

রাজেশ কি উত্তর দেবে, ভেবে পেল না।

মহিলা থামেন নি, 'দশ বছর আগে বুকের ভেতর অনেকখানি অভিমান নিয়ে রানীপুর থেকে তুমি চলে গিয়েছিলে বাবা। যেদিন সে-কথা শুনেছি সেদিন থেকে কি যন্ত্রণার ভেতর যে আমার দিন কাটছে! খেয়েছি, শুয়েছি, হেঁটেছি চলেছি, লোকের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলেছি। সবই করেছি কিন্তু

তার মধ্যে তোমার কথা যখনই মনে পড়েছে বুকের ভেতর কাঁটার মত খচখচ করে উঠেছে। জানো রাজেশ, তোমাকে অনেক খুঁজেছি আমি। কারুকে না জানিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে তোমার মামাবাড়ি চাঁপদানিতে লোক পাঠিয়েছি। কিন্তু সেই লোক ফিরে এসে জানিয়েছে, তুমি নাকি নেভির চাকরি নিয়ে সমুদ্রে চলে গেছ। তুমি আসবে বলে তারপর থেকে একটা একটা করে দিন গুনে গেছি। এত দিনে আমার দিন গোনা সার্থক হয়েছে বাবা।'

রাজেশ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। বিমূঢ়ের মত বলল, 'আপনি আমার সব কথাই জানেন দেখছি। কিন্তু --'

'কী?'

'আপনার পরিচয়টা এখনও আমার জানা হয় নি।'

'আমার পরিচয়—' বলতে বলতে থমকে গেলেন মহিলা। কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। রাজেশের চোখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে দূরে একটা ডুমুর গাছের দিকে তাকালেন। তারপর উদাস সুরে বলতে লাগলেন, 'আমার কী পরিচয় দেব! একটা পরিচয় অবশ্য আছে কিন্তু তার ভেতর কোন মর্যাদাই যে নেই রাজেশ। তবে—'

'কী'? সবিস্ময়ে রাজেশ জিজ্ঞেস করল।

ডুমুর গাছটা থেকে চকিতে চোখ সরিয়ে এনে রাজেশের মুখে আবার নিবদ্ধ করলেন মহিলা। ব্যগ্র স্বরে বললেন, 'আমার নতুন একটা পরিচয় হতে পারে। সেটা তোমার ওপর নির্ভর করছে।'

'আমার ওপর?'

'হাঁ রাজেশ, তোমারই ওপর।' তারকাঁটার বেড়ার ওপাশ থেকে কাঁপা কাঁপা অস্থির দু-খানি হাত বাড়িয়ে রাজেশের একখানি হাত আঁকড়ে ধরলেন মহিলা। বললেন, 'পৃথিবীর সবখানি সম্মান দিয়ে একমাত্র তুমিই আমাকে নতুন পরিচয়ে তুলে আনতে পার। আর সেইজন্যেই কতকাল ধরে যে অপেক্ষা করছি।'

মহিলার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সংশয় হতে লাগল রাজেশের। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল সে। তার আগেই কালকের মত সেই বয়টা আজও ডাকতে এল। সবিনয়ে সে জানাল ভবেশ এইমাত্র ফিরে এসেছেন। এবং এসেই রাজেশকে খুঁজতে শুরু করেছেন।

রাজেশ বয়টার উদ্দেশে বলল, 'তুমি যাও, আমি খানিকটা পরে যাচ্ছি।'

বেড়ার ও প্রান্ত থেকে ব্যস্তভাবে মহিলা বলে উঠলেন, 'না—না বাবা, তোমাকে যখন ডাকতে পাঠিয়েছেন তখন যাওয়াই উচিত।'

উন্মুখ স্বরে রাজেশ বলল, 'কিন্তু আপনার কোন কথাই তো জানা হল না। মানে আপনি কোথায় থাকেন—'

রাজেশের বক্তব্য শেষ হবার আগেই মহিলা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'রানীপুরে সত্যিই যখন ফিরে এসেছো, আমার সব কথা নিশ্চয়ই জানতে পারবে।'

একটু ভেবে রাজেশ বলল, 'কাল সকালে এখানে যদি আসি আপনার সঙ্গে দেখা হবে?'

'কাল সকালে?' কি যেন চিন্তা করে মহিলা উত্তর দিলেন, 'কাল সকালে আমাকে একবার রানীপুরের বাইরে যেতে হবে।'

'পরশু?'

'পরশুও দেখা হবে না। কাল সকালে যাব, ফিরতে ফিরতে দু-তিন দিন।'

রাজেশ হাসল, 'তা হলে আর আপনার সঙ্গে দেখা হবে না।'

'কেন!' মহিলা চমকে উঠলেন যেন।

'আর দু-দিন মাত্র আমি রানীপুরে আছি।'

'তারপর?'

'আপনি তো জানেন, আমি নেভিতে চাকরি করি। দু-দিন পর একবার আমার বাড়ি চাঁপদানিতে যাব। সেখান থেকে আবার জাহাজে।'

তৎক্ষণাৎ কিছু বলতে পারলেন না মহিলা। অনেকক্ষণ পর অবরুদ্ধ স্বরে তিনি বললেন, 'এতকাল পর রানীপুর এসেছিলে, সে কি মাত্র চারটে দিন থাকবার জন্যে? এমন আসা তোমাকে কে আসতে বলেছিল?'

তার এখানে থাকা না থাকার সঙ্গে এই অপরিচিতা মহিলাটির কী সম্পর্ক? রাজেশ অবাক হয়ে যাচ্ছিল, 'খানিকটা বিমূঢ়ও। সে বলল, চারদিনের বেশি থাকব কেমন করে? ছুটিই যে পাওনা নেই।'

'কিন্তু তোমাকে অনেক কিছুই যে জানাবার আছে রাজেশ। তোমার কাছে অনেক কিছু জানবার আছে। তার আগে তো রানীপুর থেকে তোমার যাওয়া হতে পারে না।'

'কিন্তু এখানে দু-দিনের বেশি থাকার উপায় নেই আমার।'

এরপর কি এক ভাবনার গভীরে হারিয়ে গেলেন মহিলা। কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে বললেন, 'কাল সকালে যাবার কথা দেওয়া আছে। আমাকে যেতেই হবে। ভাবছি গিয়েই ফিরে আসব। তুমি এক কাজ করো, রানীপুরের পশ্চিম দিকে নতুন পাড়ায় বারো নম্বর রজনী লাহা রোডে কাল বিকেলে একবার এসো। তোমার জন্যে আমি অপেক্ষা করব।'

রাজেশ জানাল, যাবে। তারপর ক্যাসেলের মত বিশাল বাড়িটায় ফিরে চলল।

একতলার ড্রইং রুমে ভবেশ বসে ছিলেন। ড্রইং রুমটার মাঝখান দিয়েই দোতলায় যাবার সিঁড়ি। রাজেশ সেখানে ঢোকামাত্র ভবেশ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'আজও নিশ্চয়ই পশ্চিম দিকের জঙ্গলে গিয়েছিলি?'

চোখ নামিয়ে রাজেশ বলল, 'হ্যাঁ।'

আশ্চর্য! আজ আর ক্ষোভ, অভিমান বা দুঃখ—কিছুই প্রকাশ করলেন না ভবেশ। এমন কি পশ্চিমে যাবার প্রসঙ্গটা নিয়ে দ্বিতীয় প্রশ্নও করলেন না। ছেলের মুখে একবার চকিত দৃষ্টিক্ষেপ করে বললেন, 'বিশেষ একটা দরকারে এখনই আমাকে কলকাতায় যেতে হচ্ছে। ফিরব সন্ধ্যেবেলা। দুপুরে তুই কিন্তু খেয়ে নিস।' একটু থেমে আবার বললেন, 'সন্ধ্যাবেলা বাড়িতেই থাকিস। কাল যে কথাটা বলতে চেয়েছিলাম, কলকাতা থেকে ফিরে আজ তা বলব।'

নয়

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর কিছুক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকল রাজেশ। পরশু সন্ধ্যেয় রানীপুর এসেছে। তারপর প্রায় দুটো দিন পার হতে চলল। এর মধ্যে অনেক কিছুই দেখেছে সে। রানীপুরের এক প্রান্ত থেকে আরেক দিগন্ত পর্যন্ত ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়ে নিয়ে নিজের বিপুল ঐশ্বর্য দেখিয়েছেন ভবেশ। শুধু কি ভবেশের ঐশ্বর্যই, কুলবাগানের পাটে সেই বিচিত্র মহিলাটি, যিনি তার সব খবরই রাখেন অথচ নিজের অপার রহস্যের বিন্দুমাত্রও উন্মোচন করেন নি—তাঁকেও দেখেছে রাজেশ।

দেখেছে সে অনেক কিছুই, অল্পস্বল্প শুনেছেও। কিন্তু কিছুই প্রায় বোঝেনি।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে রাজেশ যতই এ-সব ভাবল, মাথার ভেতর স্নায়ুগুলো ততই জট পাকিয়ে যেতে লাগল। কিছুক্ষণ ছটফট করে অবশেষে উঠে বসল সে।

শিয়রের দিকের জানালাটা খোলাই ছিল। তার ঠিক বাইরে থেকে আদিগন্ত ধানের খেত। শীতের এই শেষ প্রহরে সেখানে সীমাহীন রিক্ততা। মাঠের ঝাঁপি শূন্য করে কারা যেন সব ধান কেটে নিয়ে গেছে। এক ঝাঁক

ঘুরে বুনো টিয়া, ছোট ছোট ঠোঁট চালিয়ে বৃথাই দু-চার দানা ধান খুঁজে মরছে। নেই নেই, তাদের জন্যে কেউ কিছু ফেলে যায় নি।

বাইরে তাকিয়ে নিজেকে অন্যমনস্ক করে রাখতে চাইল রাজেশ। ভবেশ কোন প্রক্রিয়ায় অপরিমিত সৌভাগ্যের অধীশ্বর হয়েছেন, সেই মহিলাটির পরিচয় কী—কী প্রয়োজন এ-সব ব্যাপারে ভেবে ভেবে নিজের স্নায়ুগুলোকে পীড়িত ক্লান্ত করা ?

বাইরের দিকে তাকিয়ে খুব বেশিক্ষণ কিন্তু নিজেকে ভাবনাশূন্য রাখতে পারল না রাজেশ। নিজের অজ্ঞাতসারে ম্যাজিক লণ্ঠনের একটা ছবির মত চেতনায় দোলনের মুখটা ভেসে উঠল। সেদিনের বালিকা দোলন আজ কত বড় হয়েছে ; তেমনই স্বচ্ছন্দগামিনী আছে কি-না ; দেখা হলে দশ বছর আগের মতই কথায় কথায় ঝগড়া বাধিয়ে বসবে, না সলজ্জ আরক্ত মুখে চোখ নামিয়ে থাকবে—এসব জানবার জন্য সমস্ত অস্তিত্ব উন্মুখ উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল রাজেশের।

দোলন! দোলন! দোলন! একদিন রাজেশের জীবন যখন রুদ্ধশ্বাস গুমোটের মত, যখন বুকে টানবার মত এতটুকু হাওয়া কোথাও ছিল না, সেই সময় তার প্রাণে দক্ষিণা বাতাস বইয়ে দিয়েছিল দোলন। আজও কি দেখা হলে তেমন ভাবেই মেয়েটা তার হাত ধরে অসীম স্নিগ্ধতার ভেতর নিয়ে যাবে ?

ভবেশ কলকাতায় গেছেন। রাজেশ ভাবল রানীপুরের দক্ষিণে দোলনদের সেই পুরনো বাড়িতে একবার যাবে সে।

যদিও সেই বাড়িটা এখন আর দোলনদের নেই, ভবেশ কিনে নিয়ে ভাড়া দিয়েছেন এবং জানিয়েছেন নতুন ভাড়াটেরা দোলনদের কোন খবর রাখে না, তথাপি নিঃসংশয় হতে পারে নি রাজেশ। সেদিন ভবেশের হঠাৎ ব্যস্ততা, একরকম জোর করেই দোলনদের বাড়ি তাকে যেতে না দেওয়া এবং বিব্রত অস্থির ভাব—সব মিলিয়ে রাজেশকে নিদারুণ সংশয়ের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছে। রাজেশের বিশ্বাস, দোলনদের সেই বাড়িটায় গেলে নিশ্চয়ই তাদের একটা হদিস পাওয়া যাবে।

ভাবামাত্র আর দেরি করল না রাজেশ। রানীপুরের দক্ষিণে সেই বাড়িটার উদ্দেশে বেড়িয়ে পড়ল।

দোলনদের সেই বাড়িখানার প্রতিটি অন্ধি-সন্ধি রাজেশের জানা।

বাড়িটার পেছনের দিকে পুকুর। সামনে খানিকটা খোলা জায়গা।

দোলনরা থাকতে এখানে ফলের বাগান ছিল। এখন তার চিহ্নমাত্র নেই। তার বদলে সেখানে মেলা বসে গেছে যেন। এ বাড়ির যত ভাড়াটে—মেয়ে-পুরুষ-বৃদ্ধ-প্রৌঢ়—সবাই শীত-দুপুরের রোদে পিঠ মেলে দিয়ে মৌতাতে বুঁদ হয়ে আছে।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল রাজেশ। তারপর ডাকল, 'একটু শুনুন তো—'

অনেক জোড়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টি চকিতে রাজেশের দিকে ফিরে তাকাল। সবার মুখপাত্র হয়ে একজন বৃদ্ধ প্রশ্ন করলেন, 'কাকে চাই?'

রাজেশ বলল, 'দেখুন, প্রণববাবু বলে একটি ভদ্রলোক এখানে থাকতেন। শুনেছি তাঁরা এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। কোথায় গেছেন বলতে পারেন?'

স্মৃতি আর বিস্মৃতির আলোছায়ায় অনেকক্ষণ হাতড়ে ফিরলেন বৃদ্ধ। তারপর বললেন, 'আমি বছর ছয়েক এ বাড়িতে এসেছি। এখানকার সব চাইতে পুরনো ভাড়াটে আমিই। কিন্তু প্রণববাবু বলে কারুকে দেখেছি বলে তো মনে করতে পারছি না।' বলতে বলতে হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে গেল বৃদ্ধের। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরের ওপর দিয়ে অস্থির এক চমক খেলে গেল। সন্ত্রস্ত শিথিল স্বরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা প্রণববাবুর পদবীটা কী, জানেন?'

'জানি বৈকি—বসু। প্রণব বসু। তাঁর মেয়ের নাম দোলন—দোলন চাঁপা বসু। দশ বছর আগে এই বাড়িটা প্রণববাবুদেরই ছিল।'

রাজেশ লক্ষ্য করল, ভাড়াটেদের এই মেলাটার ওপর অতর্কিতে নিদারুণ স্তব্ধতা নেমে এসেছে। সবার মুখে চোখে কেমন যেন ভয়ের ভাব ফুটে বেরিয়েছে।

একদৃষ্টে রাজেশের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন বৃদ্ধটি। তারপর কাঁপা শিথিল স্বরে বললেন, 'কিছু মনে করো না বাবা, তুমি আমার ছেলের বয়সী। 'তুমি' করেই কিন্তু বলছি তোমাকে।'

রাজেশ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, 'তুমি' করেই তো বলবেন।

একটু দ্বিধা করে বৃদ্ধ বললেন, 'দেখ বাবা, যে ভদ্রলোকের খোঁজে তুমি এসেছ এ-বাড়িতে তাঁর নাম করা নিষিদ্ধ।'

'আজ্ঞে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।' বিমূঢ়ের মত রাজেশ বলল।

'তুমি খুব সম্ভব রানীপুরে নতুন এসেছ। কিছুদিন থাকলে জানতে পারবে এ-বাড়ির বর্তমান মালিক ভবেশ বাঁড়ুজ্জের সঙ্গে প্রণব বসুর সম্পর্কটা খুব খারাপ। প্রণববাবু ভবেশ বাঁড়ুজ্জের বিরুদ্ধ পক্ষ। তুমি নিশ্চয়ই জান না,

একরকম জালিয়াতি করে এ-বাড়িটা প্রণববাবুর কাছ থেকে ভবেশ বাঁড়ুজ্জে নিজের নামে করে নিয়েছে।'

শুনতে শুনতে বুকের ভেতর শ্বাস আটকে আসতে লাগল রাজেশের। অবরুদ্ধ গলায় সে বলল, 'বলেন কি!'

'যা বলছি এতটুকু মিথ্যে না। রানীপুরের কে না—', বলতে বলতে বৃদ্ধ হঠাৎ চুপ করলেন। কিছুক্ষণ পর একেবারে ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেলেন তিনি, 'আচ্ছা, প্রণব বসু তোমার কে হন?'

প্রথমটা হকচকিয়ে গেল রাজেশ। তারপর মরিয়ার মত চোখকান বুজে বলে ফেলল, 'আজ্ঞে আমার আত্মীয়।'

'তুমি তো তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে চাও?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি বাঙলাদেশের বাইরে থাকি। দশ বছর আগে একবার রানীপুর এসেছিলাম। তারপর এই এলাম। আবার কবে আসা হ। আপনি কি ওঁদের ঠিকানা জানেন?'

'আমি একলা কেন, রানীপুরের তাবৎ বাসিন্দে ভবেশ বাঁড়ুজ্জের শত্রু ঐ প্রণব বসুর ঠিকানা জানে। যাকে জিজ্ঞেস করবে সে-ই বলে দেবে। ভবেশ বাঁড়ুজ্জের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গেলে কতখানি বুকের পাটার দরকার, তুমি নতুন মানুষ, তা বুঝবে না।' বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন বৃদ্ধ। আত্মগতের মত বলতে লাগলেন, 'বাড়িঘর, সব গেছে। একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছেন। তবু সত্যনিষ্ঠা থেকে এক চুল সরে দাঁড়ান নি প্রণববাবু।'

রাজেশ কিছু বলল না। স্তম্ভিত বিস্ময়ে সে শুধু ভাবতে লাগল, দশ বছর পর রানীপুর এসে ভবেশকে যেটুকু দেখেছে বোধ হয় সেটাই তার সমস্ত পরিচয় নয়।

বৃদ্ধটি বলতে লাগলেন, 'সে সব কথা থাক। প্রণব বসুর কাছে গেলেই সমস্ত জানতে পারবে। তাঁর ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি। আঠারো নম্বর অনাদি ঘোষাল রোড। রাস্তাটা রানীপুরের উত্তর-পশ্চিমে। দেখবে একতলা পুরনো বাড়ি, সামনে জোড়া তালগাছ আছে।'

দশ

বৃদ্ধের নির্দেশ অনুযায়ী রানীপুরের উত্তর-পশ্চিমে আঠারো নম্বর অনাদি ঘোষাল রোডে এসে পড়ল রাজেশ। বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে তার মনে হল, হৃদপিণ্ডের উত্থান-পতন হঠাৎ অস্বাভাবিক দ্রুত হয়ে উঠেছে।

আজ কি শুধু বারে বারে স্তম্ভিত বিস্মিত বিমূঢ় হবার দিন? শৈশবের সহচরী যে মেয়েটিকে খুঁজে বার করতে সমস্ত রানীপুর তোলপাড় করে ফেলেছে রাজেশ, সে কি-না এত কাছেই ছিল!

ভবেশ তাকে লাহাবাবুদের যে ক্যাসেলে নিয়ে তুলেছেন তার পেছন দিকে তারকাঁটার বেড়াটার ওপাশে যে একতলা জীর্ণ বাড়িখানা, কে জানত, সেটাই আঠারো নম্বর অনাদি ঘোষাল রোড। লাহাবাবুদের বাড়ির পেছন দিকে যে জঙ্গল সেখানে দাঁড়ালে এ-বাড়ির যে অংশটা চোখে পড়ে সেটা অন্তঃপুর। সদরটা বিপরীত দিকে; রাস্তার ওপর।

বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সমস্ত চেতনার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎচমকের মত ভবেশের মুখটা ঝলকে গেল। ভবেশ তার পশ্চিমে অর্থাৎ এই বাড়িটার দিকে পা বাড়ানো নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। সে কি প্রণব বসু এখানে থাকেন বলে?

বৃদ্ধের মুখে একটু আগে রাজেশ শুনে এসেছে, প্রণব বসু ভবেশের শত্রুপক্ষ। নিশ্চয়ই সেই কারণে পশ্চিমে তার জন্য গণ্ডি কেটে দিয়েছেন ভবেশ। রাজেশ বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে, এমন কোন সুযোগই দিতে চান নি তিনি।

রাজেশের ভাবনাটা একদিকে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ ঢলের মত আরেক দিকে বয়ে চলল। এ-বাড়িতে যদি প্রণব বসুরা থাকেন ফুলবাগানের রহস্যময়ী প্রৌঢ়াটি তবে কে।

যাই হোক দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। দশ বছর আগের অভ্যাসবশে দোলনের নাম ধরে ডাকতে যাচ্ছিল রাজেশ। কি মনে পড়তেই থমকে গেল সে। দশ বছর আগে দোলনের বয়স ছিল কত? দশ এগারোর বেশি অবশ্যই নয়। সময়ের হিসেবে এখন নিশ্চয়ই সে কুড়ি পেরিয়েছে। যে বালিকাকে এক যুগ আগে নাম ধরে ডাকা যেত আজ সেই ভাবেই কি তাকে ডাকা যায়?

দোলনের কথা ভাবতে ভাবতে আর একটা সম্ভাবনার কথা মনে পড়ল রাজেশের। রানীপুরে তার অনুপস্থিতির দশ বছরে বিয়ে হয়ে যায় নি তো মেয়েটার? হঠাৎ অদ্ভুত এক কষ্ট সারা অস্তিত্বের মধ্যে অনড় হয়ে রইল যেন।

সমস্ত অনুভবে সেই অর্থহীন অকারণ কষ্টটাকে ধরে রেখে নিস্পন্দের মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল রাজেশ। একবার ভাবল, ফিরে যায়। তারপর কি ভেবে এলোমেলো শিথিল পায়ে এক সময় সদর দরজাটার সামনে গিয়ে কড়া নাড়ল রাজেশ।

খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। দরজা খুলে যে তরুণীটি মুখোমুখি দাঁড়াল, নিমেষের দেখাতেই তার মধ্য থেকে একযুগ আগের দোলনকে অনায়াসে আবিষ্কার করে ফেলল রাজেশ। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সত্তার গভীরে দুরন্ত দ্রুতবহ এক স্রোত বয়ে গেল যেন।

কি আশ্চর্য, কোঁকড়া কোঁকড়া চুলের পটে ডিম্বাকৃতি মুখখানি দশ বছর আগের মতই আছে দোলনের; চিবুকটি তেমনই খাঁজ-খাওয়া। ঘন পালকে-ঘেরা চোখ দুটি তেমনই উজ্জ্বল এবং কালো। গায়ের রঙ সেদিনের মতই স্বর্ণাভ। তবে তার শরীরে সেদিন যে অপূর্ণতা ছিল, দশ বছরে সেটা ভরে গেছে।

কতক্ষণ দোলনের দিকে যে তাকিয়ে ছিল রাজেশ, খেয়াল নেই। দোলনের চোখ দুটিও ছিল তার মুখে নিবদ্ধ।

এক সময় দোলনই স্তব্ধতা ভাঙল। অসঙ্কোচ সহজ সুরে বলল, 'রাজুদা না?'

গলার ভেতর থেকে স্বরটাকে কোন রকমে মুক্ত করে সাগ্রহে রাজেশ বলল, 'হ্যাঁ। তুমি, তুমি দোলন তো?'

'হ্যাঁ।'

'অবিকল সেই ছেলেবেলার মতই আছ। বড় হওয়া ছাড়া চেহারা একেবারে বদলায় নি। দরজা খুলে দাঁড়ানোমাত্র তোমাকে চিনতে পেরেছিলাম।'

বালিকা দোলনকে তরুণী করে তোলা ছাড়া সময় আর কিছুই করতে পারে নি—এ-কথা ঠিক নয়। একটু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তার যে চোখ দুটি দশ বছর আগে খাঁচার পাখির মত ছটফটে ছিল এখন তারা স্থির, নিষ্পলক। তার চোখে বিচিত্র এক তীক্ষ্ণতা আছে যা সরাসরি বুকের গভীরে বিদ্ধ হয়ে যায়। তা ছাড়া দোলনের আরো একটা দিক লক্ষণীয়। একদা যে চপল দুরন্ত বালিকাকে রাজেশ চিনত তার বোধহয় জন্মান্তর ঘটে গেছে। দশ বছর পর ক্ষণিকের দেখাতেই রাজেশ অনুভব করতে পারছে, তরুণী দোলনকে বেষ্টন করে শামুকের খোলার মত কঠিন দুর্ভেদ্য এক ব্যক্তিত্ব রয়েছে যেন। সেটা ভেদ করে তার খুব কাছে পৌঁছুনো সহজসাধ্য নয়।

নিস্পৃহ সুরে দোলন বলল, 'ছেলেবেলার মতন আছি; তা হবে।'

রাজেশ এবার ঈষৎ উচ্ছল হবার চেষ্টা করল, 'লোকে বলে আমার চেহারা নাকি অনেক বদলে গেছে। তুমি কিন্তু দেখেই চিনতে পেরেছ। চিনলে কেমন করে?'

স্বরহীন গলায় দোলন বলল, 'চিনবার কথা অবশ্য নয়, সত্যিই তুমি অনেক বদলে গেছ। তবে দশ বছর পর পরশু সন্ধেবেলা যখন রানীপুর স্টেশনে এসে নামলে তখন আমি সেখানে ছিলাম।'

'তুমি স্টেশনে ছিলে!' বিমূঢ়ের মত প্রশ্ন করল রাজেশ।

'হ্যাঁ।' দোলন বলতে লাগল, 'শুধু আমিই না, আমার সঙ্গে আরো একজন ছিলেন।'

'কই তোমাদের দেখি নি তো? কোথায় ছিলে তোমরা?'

'চায়ের স্টলটার আড়ালে।' দোলন বলল, 'সে যাই হোক, আমার সঙ্গে যিনি ছিলেন তিনিই তোমাকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন।'

'কে ছিলেন তোমার সঙ্গে?'

একটুক্ষণ কি ভেবে দোলন বলল, 'তাঁর পরিচয় আমার মুখে না-ই শুনলে যদি কোনদিন সম্ভব হয় এই রানীপুর থেকে তাঁকে খুঁজে বার করো। শুধু খুঁজলেই চলবে না, তাঁকে বুঝতে চেষ্টা করো।'

দোলন যে কথাগুলো বলল, সজ্ঞানে সুস্থ মস্তিষ্কে বলল কি-না সে সম্বন্ধে সংশয়ের যথেষ্ট অবকাশ আছে। কেননা, যাঁর পরিচয়টা তার অজানা আজকের বিস্তৃত রানীপুরের পট থেকে তাঁকে খুঁজে বার করা প্রথমত অসাধ্য। খুঁজে বার করার পর তো তাঁকে বোঝার প্রশ্ন। রাজেশ বলল, 'আমাকে দেখে কাছে গেলে না কেন?' তার স্বরে ক্ষোভের আভাস রয়েছে যেন

দোলন বলল, 'অসুবিধে ছিল।'

'অসুবিধে! কিসের?'

'সে কথা বললে তোমার ভাল লাগবে না।'

'ভাল লাগবে না!' একটুক্ষণ থতিয়ে থেকে রাজেশ বলল, 'না লাগুক তবু বল।'

'তা হলে শোন।' উদাসীন মুখে দোলন বলল, 'তোমার বাবা স্টেশন থেকে তোমাকে আনতে গিয়েছিলেন। তাঁর সামনে আমি যদি তোমার সঙ্গে কথা বলতে যেতাম তিনি খুশি হতেন না। তা ছাড়া আমার সঙ্গে যিনি ছিলেন তাঁর পক্ষেও তোমার বাবার সামনে যাওয়া সম্ভব ছিল না।'

এর পর কিছুক্ষণ চুপচাপ। এক সময় একেবারে ভিন্ন প্রসঙ্গ দিয়ে আবার শুরু করল দোলন, 'আচ্ছা রাজুদা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব। কিছু মনে করবে না তো?'

'না-না, মনে করব কেন।' ব্যস্তভাবে রাজেশ বলে উঠল।

'তুমি যে আমাদের বাড়ি এসেছ, তোমার বাবা জানেন? তাঁর অনুমতি নিয়ে এসেছ?'

দোলনের প্রশ্নের মধ্যে খানিকটা বিদ্রূপ, না-কি শ্লেষই মেশানো ছিল রাজেশ চকিত হয়ে উঠল। থতমত খেয়ে বলল, 'না।'

'তা হলে তোমার এখানে আসা উচিত হয় নি।'

রুদ্ধস্বরে রাজেশ জিজ্ঞেস করল, 'কেন ?'

তীক্ষ্ণ শাণিত গলায় দোলন বলল, 'ভবেশ ব্যানার্জীর ছেলের পক্ষে বাপের অনুমতি না নিয়ে প্রণব বসুর বাড়িতে আসা অনিয়ম। আমার কথাটা সত্যি কি-না, রানীপুরের যে কোন লোককে জিজ্ঞেস করে দেখতে পার।'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলল না রাজেশ। একদৃষ্টে দোলনের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল, দশ বছর পর সমস্ত রানীপুর তোলপাড় করে যে এখানে এসেছে, সে কি শ্লেষ-বিদ্রূপময়ী উদাসীনা একটি তরুণীকে দেখবে বলে ?

অথচ, অথচ প্রাণের ভেতরে কোন প্রত্যাশা ছিল রাজেশের ? সে ভেবেছিল রানীপুরের আর কোথাও না হোক, দোলনের কাছে তার জন্য উদার আমন্ত্রণ নিশ্চয়ই মেলা রয়েছে। ভেবেছিল, দশ বছর আগের মত হাত ধরে দোলন তাকে জীবনের এক স্নিগ্ধ দিগন্তে নিয়ে যাবে।

অতর্কিতে রাজেশের খেয়াল হল, অনেকক্ষণ সদর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে সে। কিন্তু দোলন একবারও তাকে ভেতরে যাবার জন্য ডাকে নি। তবে কি, আভাসে ইঙ্গিতে তাকে ফিরে যাবারই নির্দেশ দিচ্ছে ? কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল রাজেশ ; তার আগেই দোলন বলে উঠল, 'তুমি আমাদের এখানে এসেছ—এ কথা যদি তোমার বাবা জানতে পারেন খুব অসন্তুষ্ট হবেন। তা ছাড়া আমরাও খুব বিব্রত বোধ করছি। তাই বলছিলাম—'

'কী ?'

'তুমি বরং ফিরেই যাও।'

আর কোন অস্পষ্টতা নেই। সমস্ত আবরণ সরিয়ে দিয়ে তাকে চলে যাবার স্পষ্ট নির্দেশ দিচ্ছে দোলন। তার আসাটা যে তাদের কাছে অবাঞ্ছিত, অস্বস্তিকর—সেটাও গোপন করেনি সে। শ্বাসবদ্ধ ডুবন্ত মানুষের মত ফিসফিসিয়ে উঠল রাজেশ, 'ফিরে যেতে বলছ ?'

দোলন বলল, 'হ্যাঁ রাজুদা, মানে—' কথাটা আর শেষ করতে পারল না সে। হঠাৎ বাড়ির অভ্যন্তর থেকে স্ত্রীকণ্ঠ শোনা গেল, 'এতক্ষণ ধরে সদরের কাছে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে কথা বলছিস রে দোলন ?'

দোলন বলল, 'রাজুদার সঙ্গে।'

সেই গলাটা আবার ভেসে এল, 'রাজুদা আবার কে রে ?'

এতক্ষণ দোলনের চোখদুটি ছিল রাজেশের দিকে। এবার বাড়ির ভেতর মুখ ফিরিয়ে সে বলল, 'ভবেশবাবুর ছেলে। সেই যে দক্ষিণ পাড়ায় পাশাপাশি বাড়িতে আমরা থাকতাম।'

'সেই রাজু!' স্ত্রীকণ্ঠটির মধ্য দিয়ে এবার [illegible] রয়ে গেল যেন, 'দাঁড়া আমি আসছি—'

একটু পর দোলনের পাশে এসে যিনি দাঁড়ালেন, তাঁকে চিনে নিতে বিন্দু-মাত্র অসুবিধে হল না রাজেশের। সিঁথির দুপাশে আরো কিছু চুলকে রুপোর তার করে দেওয়া ছাড়া সময় তাঁর চেহারায় আর কোন ছাপই রাখতে পারেনি। দীর্ঘ চোখ দুটি তেমনই স্নিগ্ধ; মুখখানি স্নেহের রসে ভাসো ভাসো।

তবে কিছু কিছু পরিবর্তনও চোখে পড়ল। সেদিনের সুবেশা সৌখিনা মহিলাটির যেন জন্মান্তর ঘটে গেছে। যাঁকে কোনদিন পাটভাঙা ফরাশডাঙার শাড়ি ছাড়া পরতে দেখেনি রাজেশ, তাঁর পরনে এই মুহূর্তে মিলের আধ-ময়লা লালপাড় শাড়ি আর হাতে সেলাই করা লংক্লথের ব্লাউজ। সর্বক্ষণ ঠোঁটদুটি থাকত পানের রসে টুকটুকে; চুলগুলো থাকত পরিপাটি একখানি খোঁপায় আবদ্ধ। ঠোঁটে আজ আর রঙ নেই। চুল এলোমেলো, রুক্ষ, বিশৃঙ্খল।

আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করল রাজেশ। দশ বছর আগে গয়নার ঝোঁক ছিল দোলনের মায়ের। হাতে থাকত গোছা গোছা সোনার চুড়ি, কানে মুক্তোবসানো দক্ষিণী দুল; গলায় চওড়া তেঁতুলপাতা হার। এখন দু-হাতের মণিবন্ধে দু-গাছি লোহা আর কড়ের তিনটি তিনটি ছ'টি চুড়ি ছাড়া আর কিছুই নেই।

প্রণব বসুর সংসার আর্থিক দুরবস্থার কোন স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে দোলনের মায়ের দিকে তাকিয়ে তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় যেন। শখ সৌখিনতা —সেদিনের অনেক কিছুই হারিয়েছেন মহিলা। কিন্তু চোখের কোণে আর দুই ঠোঁটের মাঝখানে সেদিনের সেই হাসিটি এখনও তেমনই আছে।

রাজেশ নীচু হয়ে প্রণাম করতে যাবে দোলনের মা দু-হাতে তাকে ধরে ফেললেন। তারপর চিবুক স্পর্শ করে সস্নেহে বললেন, 'বেঁচে থাকো বাবা।' একটু থেমে আবার বললেন, 'দালানে বসে বড়ি দিতে দিতে শুনতে পাচ্ছিলাম কার সঙ্গে যেন দোলন বকবক করছে। সে যে তুমি, বুঝতে পারি নি।' বলতে বলতে মেয়ের দিকে ফিরলেন দোলনের মা, 'হ্যাঁ রে মুখপুড়ী, ছেলেটাকে এতক্ষণ রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখেছিস অথচ বাড়িতে নিয়ে যাস নি। কবে তোর বুদ্ধি শুদ্ধি হবে?'

দোলন উত্তর দিল না।

মেয়ের মুখ থেকে চোখ ফিরিয়ে পরক্ষণেই আবার রাজেশের দিকে তাকালেন দোলনের মা। ব্যস্তভাবে বললেন, 'এস বাবা, ভেতরে এস।'

একটু আগে দ্বিধাহীন জড়তাশূন্য গলায় তাকে চলে যাওয়ার স্পষ্ট নির্দেশ

দিয়েছে দোলন। বিব্রতভাবে রাজেশ বলল, 'আজ আমি বরং যাই—'

'সে কি! এতকাল পর তোমাকে দেখলাম। দুটো কথা না বলে একেবারে রাস্তা থেকে ফিরে যাবে! তাই কখনো হয়! এস আমার সঙ্গে—'

বলামাত্র রাজেশ গেল না। যেমন ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইল আর রাজ্যের অস্বস্তি নিয়ে বার বার দোলনের দিকে তাকাতে লাগল।

দোলনের মা একবার মেয়ের দিকে, পরমুহূর্তে রাজেশের দিকে তাকিয়ে কিছু অনুমান করলেন। বললেন, 'হতচ্ছাড়ী বুঝি তোমায় কিছু বলেছে?'

চমকে জড়িত গলায় রাজেশ বলল, 'না-না. কি আবার বলবে!'

'নিশ্চয়ই বলেছে। তুমি ঢাকতে চাইলে কি হবে; পেটের মেয়ে, ওকে আমি চিনি না! যা ঝগড়াটি! রাক্ষসী স্বভাবটা যদি আর শোধরালো!' একরকম জোর করেই রাজেশকে বাড়ির ভেতর নিয়ে এলেন তিনি।

ভেতর দিকে ছড়ানো উঠোন। উঠোনটাকে ঘিরে খানচারেক মাঝারি মাপের ঘর। সংক্ষিপ্ত একটু দালান। এটা অন্দরমহল। খিড়কির দিকে সেই ফুলবাগানটা যেখানে পর পর দু-দিন সেই স্নেহময়ী অজ্ঞাতপরিচয় মহিলাটিকে দেখেছে রাজেশ।

দোলনের মা একখানা আসন পেতে আগে রাজেশকে বসালেন। তারপর আবার বড়ি দিতে বসলেন। খানিকটা দূরে দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল দোলন।

কেউ কিছু বলার আগে দোলনই প্রথম বলে উঠল, 'রাজুদাকে বাড়ি এনে তুমি কিন্তু ভাল করলে না মা।'

'ওমা, বলে কি দেখ রাক্ষুসী!' বলেই গালে হাত দিলেন দোলনের মা। তারপর স্বভাবের উচ্ছ্বসিত হাসিটি হেসে উঠলেন, 'ভাল করেছি কি মন্দ করেছি, সেটা নাকি নিজের মেয়ের কাছে জানতে হবে। তুই আমার পেটে হয়েছিস, না আমি তোর পেটে হয়েছি! কি রে মেয়ে?'

বিরস গলায় দোলন বলল, 'অত হেসো না তো মা। কোন কিছু বুঝবে না—'

দোলনের মা বললেন, 'তুই থাম তো। অত কর্তালি করতে হবে না।'

দোলন কিছু বলল না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। ডাল ফেটিয়ে নিবিষ্ট মনে বড়ি দিতে লাগলেন দোলনের মা। বড়ি দিতে দিতে একসময় আবার শুরু করলেন। একের পর এক প্রশ্ন করে রাজেশ এতকাল কোথায় ছিল, কি ভাবে ছিল, আজকাল কী করছে—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনে নিলেন। শেষে বললেন, 'দশ বছর আগে

কারুকে কিছু না বলে রানীপুর থেকে তুমি চলে গিয়েছিলে বাবা। আমরা বড় দুঃখ পেয়েছিলাম। অবশ্য জানি কতখানি কষ্ট বুকে পুরে সেদিন তুমি এ-জায়গা ছেড়ে গিয়েছিলে। কিন্তু—'

'কী ?' উন্মুখ স্বরে রাজেশ জিজ্ঞাসা করল।

'যাবার কোন দরকার ছিল না। থাকলে বুঝতে বিশেষ কিছু হারাও নি।'

দোলনের মায়ের কথাগুলো বিচিত্র কুহেলিকায় ঘেরা। কী সে হারাত না, বুঝতে না পেরে বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল রাজেশ।

আবার কিছুক্ষণ নীরবতা। এক সময় রাজেশই আরম্ভ করল। সমস্ত বাড়িটা দ্রুত একবার দেখে নিয়ে শুধলো, 'আচ্ছা মাসিমা, মেসোমশায়কে তো দেখছি না। অফিস গেছেন বুঝি ?'

'উঁহু—' বড়ির থালা থেকে মুখ তুলে দোলনের মা বললেন, 'অফিস যাবেন কি, বছর চারেক হল উনি তো রিটায়ার করেছেন! আজকাল—' বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করলেন তিনি।

'আজকাল কী ?' রাজেশ উদ্‌গ্রীব হল।

একটু ইতস্তত করে দোলনের মা বললেন, 'একখানা প্রেস কিনে বাজার পাড়ায় বসিয়েছেন। আর—আর একটি কাণ্ড করেছেন—'

'কী ?'

'একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা বার করেছেন। নাম 'রানীপুর সংবাদ'। দিন রাত ঐ পত্রিকা নিয়েই মেতে আছেন।'

দশ বছর আগে যে জায়গাটা ছিল ক্ষুদ্র নগণ্য আর সংক্ষিপ্ত, যেখানকার জীবন অতি মন্থর স্রোতে বয়ে যেত সেই রানীপুর আজ একখানা সংবাদপত্র প্রকাশের গৌরব লাভ করেছে। খবরটা চমকপ্রদ বটে। পরক্ষণেই তার মনে পড়ল একযুগ আগের মত রানীপুর আজ আর স্তিমিত সীমাবদ্ধ নেই। রানীপুরের ধমনীতে আজ দুরন্ত গতি। তাছাড়া আরো একটা কথা মনে পড়ল রাজেশের। দশ বছর আগে সে দেখে গেছে নানা পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতেন দোলনের বাবা। নিজস্ব একখানা পত্রিকা থাকলে মতামত প্রকাশের অনেক সুবিধা। সম্ভবত সেই প্রেরণা থেকেই 'রানীপুর সংবাদে'র জন্ম।

দোলনের মা আবার বললেন, 'ঐ কাগজ নিয়ে হয়েছে জ্বালা। ওটা বেরুবার পর তোমার মেসোমশায়ের কত শত্রু যে হয়েছে।'

'শত্রু!' সবিস্ময়ে রাজেশ জিজ্ঞেস করল, 'শত্রু হয়েছে কেন ?'

কি বলতে গিয়ে থেমে গেলেন দোলনের মা, 'সে সব কথা থাক বাবা। এসেছ যখন তখন নিজেই সব জানতে পারবে।'

এ প্রসঙ্গে আর কোন প্রশ্ন করা রাজেশের উচিত মনে হল না। একটু ভেবে সে বলল, 'নান্টু কোথায় মাসিমা ?'

নান্টু দোলনের ভাই। দোলনের মা বললেন, 'নান্টু আর পিণ্টু দিনচারেক হল ওদের মামাবাড়ি গেছে।'

সংসার সম্বন্ধে কিছুক্ষণ বিভিন্ন কথাবার্তার পর হঠাৎ এক সময় রাজেশ ডেকে উঠল, 'আচ্ছা মাসিমা—'

তার স্বরে এমন কিছু ছিল, উত্তেজনা অথবা তীক্ষ্ণতা—যাতে চকিত হয়ে উঠলেন দোলনের মা। স্থির দৃষ্টিতে রাজেশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি বাবা ?'

'আপনি আমার সব কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করছেন। শুধু একটা ছাড়া।'

'কোন কথা জিজ্ঞেস করিনি ?'

'কেমন করে আপনাদের এই ঠিকানা জোগাড় করেছি, সেই কথাটা।'

দোলনের মা ব্যস্তভাবে বললেন, 'তাই তো, তুমি এখানে এলে কেমন করে ?'

কি-ভাবে ঠিকানাটা সংগ্রহ করেছে, সংক্ষেপে জানাল রাজেশ। তারপর বলল, 'আপনাদের পুরনো বাড়িতে গিয়ে শুনলাম, বছর চারেক এখানে এসে আছেন। নিজেদের বাড়ি ছেড়ে এখানে ভাড়া বাড়িতে উঠে এলেন কেন ?'

উত্তর দিতে গিয়েও থেমে গেলেন দোলনের মা। তাঁকে অত্যন্ত বিব্রত আর বিচলিত দেখাল। শেষ পর্যন্ত কোনরকমে বললেন, 'এমনিই এসেছি বাবা।'

'উঁহু, এমনি নয়। নিশ্চয়ই কোন সাঙ্ঘাতিক কারণ আছে।'

'না-না, কারণ আবার কী থাকবে ?' জোরে জোরে অস্থিরভাবে মাথা নাড়তে লাগলেন দোলনের মা।

এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল দোলন। হঠাৎ সামনে এগিয়ে এসে সে বলল, 'এই তোমার এক দোষ মা, কিছুতেই সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে চাও না। এই জন্যেই বাবা আর আমার সঙ্গে তোমার বনে না।' বলতে বলতেই রাজেশের দিকে ফিরল সে। বলল, 'তুমি ঠিকই ধরেছ রাজুদা, আমাদের ভাড়া বাড়িতে উঠে আসার পেছনে যে কারণটা আছে তা খুবই সাঙ্ঘাতিক। তুমি তো জান, মা লোককে একেবারেই রূঢ় কথা বলতে পারে না। আর এ-ও জান, ও ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র সুনাম নেই। চিরদিনই আমি ঠোঁটকাটা, আর জিভখানা আমার চাঁছা-ছোলা। কাজেই—'

দোলনের মা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'দোলন!'

দোলন ভ্রূক্ষেপও করল না, 'কাজেই অপ্রিয় ব্যাপারটা আমিই তোমাকে শুনিয়ে দিচ্ছি।' আমরা যে ভাড়া বাড়িতে উঠে এসেছি, সে তোমারই বাবার জন্যে। তোমার বাবা জোচ্চুরি করে ঠকিয়ে আমাদের বাড়িটা আত্মসাৎ করেছে। তার জন্যে—'

বক্তব্য আর শেষ করতে পারল না দোলন। তার মা হঠাৎ ক্ষিপ্তের মত উঠে দাঁড়িয়ে শরীরের সমস্তটুকু শক্তি গলায় ঢেলে দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'হারামজাদী মেয়ে, আমি বারণ করলাম তবু গ্রাহ্য হল না। গলা টিপে তোমায় মেরে ফেলব।'

শান্ত স্নিগ্ধ নিয়তহাসিনী মাকে কোনদিন এত ক্রুদ্ধ, এত উত্তেজিত হতে দেখেনি দোলন। ফলে সে বিস্মিত হল যত ভয় পেল তার চাইতে বেশি। ভয়ে ভয়ে বলল, 'আমি মিথ্যে কিছু বলেছি নাকি?'

দোলনের মা উন্মত্তের মত তেড়ে গেলেন, 'ওর বাবা কী করেছে না করেছে, তার দায় কি ওর? এতদিন পর ছেলেটা এল। একটু সুস্থমত তাকে বসতে পর্যন্ত দিচ্ছে না! অসভ্য জানোয়ার মেয়ে কোথাকার।'

রাজেশ স্তব্ধ হয়ে বসে ছিল। ভবেশ সম্বন্ধে তার প্রাণে এতটুকু গৌরববোধ নেই। কিন্তু তবু তো বাবা! নিজে তাঁর সম্বন্ধে যা খুশি ভাবুক কিন্তু অন্যে যদি বিরূপ অসম্মানকর কোন মন্তব্য করে সেটা বোধহয় সহনীয় নয়। দোলনের কাছ থেকে এত স্পষ্ট উচ্চারণে এমন অপ্রিয় রূঢ় আঘাত পেতে হবে, কে ভেবেছিল। আহত অপমানিত রাজেশ মাথা তুলে কারো দিকে তাকাতে পারছিল না।

এদিকে মেয়েকে শাসন করে রাজেশের দিকে তাকালেন দোলনের মা। তার একটি হাত ধরে অনুনয়ের সুরে বললেন, 'তুমি কিছু মনে করো না বাবা। ওর জন্যে একদিন আমায় গলায় দড়ি দিতে হবে।'

আলাপের সুরটা কেটে গিয়েছিল। বিষণ্ন মুখে রাজেশ বলল, 'সত্যি কথাই তো বলেছে দোলন। মনে করার আর কী আছে! আচ্ছা আজ আমি চলি মাসিমা।'

'না, কখনো না। এখন কিছুতেই তোমার যাওয়া হবে না। যদি যাও, বুঝব আমাদের ওপর রাগ করে যাচ্ছ।'

রাজেশের তক্ষুণি যাওয়া হল না। বিকেল আর সন্ধ্যের মাঝামাঝি একটা সময় চা খেয়ে এবং রোজ একবার করে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাজেশ মুক্তি পেল। দালান থেকে নেমে সদরের দিকে পা বাড়াতে যাবে তখন অতর্কিতে

ফুলবাগানের পটে সেই মহিলাটির কথা মনে পড়ে গেল তার। থমকে দাঁড়িয়ে রাজেশ বলল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব মাসিমা, ঠিক ঠিক উত্তর দেবেন?'

'উত্তরটা যদি জানা থাকে, নিশ্চয়ই দেব।'

'আচ্ছা আপনাদের বাড়িতে দোলন-পিণ্টু-নাণ্টু-মেসোমশাই আর আপনি ছাড়া অন্য কেউ থাকে কি?'

'কই না।'

'কিন্তু আপনাদের বাড়ির পেছন দিকে যে ফুলবাগান সেখানে কাল আর আজ একটি মহিলাকে আমি দেখেছি। কাল তাঁর সঙ্গে কোন কথা হয় নি। আজ হয়েছে। তিনি কে মাসিমা?'

একটু ভেবে দোলনের মা বললেন, 'আমি আর তাঁর কতটুকু পরিচয় দিতে পারব। এতকাল পর যখন এসেছ, তাঁর কোন কথাই অজানা থাকবে না।'

বিভ্রান্তের মত কিছুক্ষণ দোলনের মায়ের দিকে তাকিয়ে এলোমেলো পায়ে সদরের দিকে এগিয়ে চলল রাজেশ।

এগার

সন্ধ্যের ঠিক আগে আগে বাড়ি ফিরে এল রাজেশ। সে আসার কিছুক্ষণের মধ্যেই কলকাতা থেকে ভবেশ ফিরে এলেন। আর ফিরেই ছেলেকে নিজের ঘরে ডাকিয়ে আনলেন।

রাজেশ যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছুলো, একটা সোফায় নিজেকে সঁপে দিয়ে চোখ বুজে খুব মগ্ন হয়ে কি যেন ভাবছিলেন ভবেশ।

একটু ইতস্তত করে রাজেশ বলল, 'আপনি আমাকে ডেকেছেন?'

ভবেশের মগ্নতা ছিন্ন হয়ে গেল। চোখ মেলে বললেন, 'হ্যাঁ।' তারপর মুখোমুখি একখানা সোফা দেখিয়ে বসতে নির্দেশ দিলেন।

রাজেশ বসলে ভবেশ আবার বললেন, 'কেন তোকে ডাকিয়ে এনেছি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিস।'

রাজেশের মনে পড়ল, আজ সকালে কলকাতা যাবার সময় ভবেশ জানিয়ে গিয়েছিলেন, সন্ধ্যেবেলা ফিরে এসে কি একটা জরুরী কথা তাকে বলবেন।

রাজেশ বলল, 'হ্যাঁ। কি একটা বলবেন বলে—'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বললেন না ভবেশ। কি এক অথৈ ভাবনার গভীরে ধীরে

ধীরে ডুবে গেলেন যেন। খুব সম্ভব নিজের বক্তব্যটাকে মনে মনে গুছিয়ে নিতে লাগলেন। কতক্ষণ পর, রাজেশের খেয়াল নেই, একসময় আস্তে আস্তে শুরু করলেন ভবেশ, 'গত এক বছরে তোর নামে চাঁপদানিতে পঞ্চাশ ষাটখানা চিঠি দিয়েছি। সব চিঠিতেই একটা কথা বার বার আমি তোকে জানিয়েছি। সেটা নিশ্চয়ই তোর মনে আছে।'

অনায়াসেই রাজেশ স্মরণ করতে পারল, এক বছরের চিঠির স্তূপে একটিমাত্র সুরই ছিল। সেটা বিষণ্ণ অনুতাপের সুর। ভবেশ তার কাছে অনুতপ্ত। অনুতাপের কথাটা মনে পড়লেও মুখ ফুটে কিছু বলল না রাজেশ।

ভবেশ বলতে লাগলেন, 'তোর আর তোর মায়ের কাছে যা অন্যায় করেছি জানি তার ক্ষমা নেই। আমায় একটু প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ দে বাবা। নইলে আমি শান্তি পাচ্ছি না।'

এতক্ষণে রাজেশের গলায় স্বর ফুটল। বিভ্রান্তের মত সে বলল, 'আপনি কী বলতে চাইছেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'সব তোকে বুঝিয়ে দেব। তার আগে আমায় একটা কথা দিতে হবে তোর।'

'কী কথা?'

'আমি যা বলব তোকে তা করতে হবে। না বলতে পারবি না।'

স্থির নিষ্পলকে ভবেশের দিকে তাকিয়ে রাজেশ আস্তে আস্তে অথচ দৃঢ়স্বরে বলল, 'আপনি কী বলবেন সেটা না জেনে কি করে কথা দিই?'

রাজেশের কথাগুলোর মধ্যে তীক্ষ্ণ একটা ইঙ্গিত ছিল। রীতিমত ক্ষুব্ধ হলেন ভবেশ। আহত স্বরে বললেন, 'তুই আমার ছেলে। বাপ হয়ে এমন অন্যায় কি তোকে করতে বলতে পারি যা করা সম্ভব নয়?'

দশটা বছর ভবেশের সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগ ছিল না রাজেশের। এই দীর্ঘ সময়ে তাঁর কোন পরিবর্তন হয়েছে কি-না, হলেও কোন দিকে তাঁর চরিত্র বাঁক নিয়েছে, কিছুই জানে না রাজেশ। তাঁর উদ্দেশ্য পুরোপুরি না জেনে সে কথা দেবে না।

ছেলের মনোভাব বোধহয় বুঝতে পারলেন ভবেশ। একটু আগের ক্ষুব্ধ অভিমানের জের টেনে বললেন, 'বুঝলাম এখনও তুই আমাকে অবিশ্বাস করিস। বেশ, সব কথা আগেই শুনে নে। তারপর যা ইচ্ছা করিস—'

রাজেশ এবারও কিছু বলল না। উদগ্রীব হয়ে বসে রইল।

একটু কি ভেবে ভবেশ শুরু করলেন, 'আমার যা কিছু আছে; বাড়ি-ঘর-ব্যবসা—কাল তোকে সবই দেখিয়েছি। গ্রামের দিকে বিঘে পঞ্চাশের মত

ধান জমিও করেছি। জমিটা অবশ্য তোকে দেখানো হয় নি। সে যাই হোক, এ-সব নিয়ে—'

'এ-সব নিয়ে কী?' রাজেশ প্রশ্ন করল।

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন না ভবেশ। কিছুক্ষণ পর উদাস স্বরে বললেন, 'অনেক দিন এ-সব নিয়ে তো কাটালাম। এবার আমি একটু মুক্তি চাই। আমার ইচ্ছে বাড়ি-ঘরগুলো তোর নামে লিখে দেব। ব্যবসাপত্তরও বুঝিয়ে দেব। নেভির চাকরি ছেড়ে দিয়ে এ-সব তুই দেখবি। এই জন্যই এত তাড়া দিয়ে এতকাল পর তোকে রানীপুরে আনিয়েছি রাজু।'

নিজের স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি আর আজীবনের সকল সঞ্চয় রাজেশের হাতে তুলে দিয়ে ভবেশ কি বানপ্রস্থে যেতে চান? বিমূঢ়ের মত রাজেশ তাকিয়ে রইল।

ভবেশ বলতে লাগলেন, 'তোর মায়ের জন্য আমি কিছুই করতে পারিনি। তাকে শুধু কষ্টই দিয়েছি। তোকে কিন্তু আমি জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে দেব রাজু। তা হলে আমার পাপের কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে।' একটু আগের উদাস ভাবটা এখন তাঁর স্বরে নেই। কাঁপা, অস্থির, আবেগরুদ্ধ স্বরে তিনি বলে গেলেন, 'কিছুতেই না বলতে পারবি না রাজু। এ-সব ঘরবাড়ি তোকে নিতেই হবে। জাহাজে জাহাজে ছন্নছাড়ার মতন ঘুরে বেড়াবি, তা আর চলবে না। নেভির চাকরি তুই ছেড়ে দে।'

আপাত দৃষ্টিতে বিশেষ কোন অসঙ্গত ব্যাপার নেই। উপযুক্ত বয়স্ক ছেলের হাতে বাপ তাঁর সব কিছু উত্তরাধিকার তুলে দিয়ে যাবেন—এটাই তো স্বাভাবিক ঘটনা। তবু বিভ্রান্তের মত রাজেশ শুধু বলতে পারল, 'কিন্তু—'

'কোন কিন্তু নয় বাবা। আমার কথা তোর রাখতেই হবে।' বলতে বলতে পকেট থেকে একতাড়া-টাইপ করা কাগজ বার করে ছেলের দিকে এগিয়ে দিলেন ভবেশ।

হাত বাড়িয়ে সেগুলো নিতে নিতে রাজেশ বলল, 'এ-সব কী?'

'দলিলের ড্রাফ্ট্। আজ সারাদিন সলিসিটরকে দিয়ে এগুলো করিয়েছি।' ভবেশ বলতে লাগলেন, 'তোর কাছে কাগজগুলো রাখ। এক্ষুনি পড়তে হবে না। রাত্তিরে খাওয়া দাওয়ার পর কি কাল সকালে- যখন হোক পড়িস। যদি কোথাও বদলাবার থাকে বলবি।'

এতক্ষণে বোঝা গেল, আজ সমস্ত দিন কলকাতায় কী করে কাটিয়েছেন ভবেশ। বিভ্রান্ত ভাবটা ক্রমাগত বেড়েই যাচ্ছিল রাজেশের। ড্রাফ্ট্গুলো হাতের মুঠোয় নিয়ে চুপ করে বসে রইল সে। কে জানত, দশ বছর পর

রানীপুরে পা দিয়ে এমন একটা জটিলতার মধ্যে এসে পড়বে সে! কে ভেবেছিল এরই জন্য ভবেশ তাকে এখানে ফিরিয়ে এনেছেন!

কিন্তু যে বাপ আশৈশব তার প্রতি ছিলেন নিষ্ঠুর এবং উদাসীন হঠাৎ তিনিই দশ বছর পর তাকে রানীপুরে এনে স্নেহের বান ডাকিয়ে দিচ্ছেন, নিজের তাবৎ ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকার দিতে চাইছেন। তাঁর স্নেহের স্রোতে ভেসে গিয়ে সম্পত্তিগুলো নেওয়া উচিত কি অনুচিত—এই মুহূর্তে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না রাজেশ। সে ভাবল, কালই একবার চাঁপদানি যাবে। এ ব্যাপারে কোন কিছু সিদ্ধান্ত নেবার আগে মামাদের সঙ্গে একবার পরামর্শ করা দরকার। কিন্তু কাল তো চাঁপদানি যাওয়া সম্ভব নয়। বিদ্যুৎচমকের মত ফুলবাগানের পটে সেই রহস্যময়ী প্রৌঢার মুখখানি মনে পড়ে গেল। কাল বিকেলে তার প্রতীক্ষায় থাকবেন তিনি। অতএব রাজেশ ঠিক করল, কাল না গিয়ে একেবারে পরশুই চাঁপদানি যাবে সে।

চারদিন এখানে থাকবে বলে ভবেশের সঙ্গে চুক্তি করেছিল রাজেশ। নাঃ, থাকার মেয়াদ বোধ হয় বাড়াতে হবে।

কতক্ষণ নিজের ভেতর মগ্ন হয়ে ছিল, রাজেশের খেয়াল নেই। হঠাৎ একসময় ভবেশ ডেকে উঠলেন, 'রাজু—'

চমকে মুখ তুলল রাজেশ।

ভবেশ বললেন, 'একটা কথা বলব তোকে। রানীপুরে আমার অনেক শত্রু আছে। আমার অবস্থা ফিরেছে বলে হারামজাদাদের চোখ টাটায়।' ভবেশ বলতে লাগলেন, 'এখানে থাকলে আমার সম্বন্ধে নানা গুজব শুনতে পাবি। সে-সব বিশ্বাস করিস নি যেন। যদি কিছু সন্দেহ জাগে সোজা আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করবি।'

এবার আর কিছু বলল না রাজেশ।

একটু চুপ করে থেকে ভবেশ আবার বললেন, 'অনেক রাত হল। ঘরে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে—না-না, তুই তো আবার রাত্তিরে স্নান করিস, স্নানটা সেরেই সোজা খাবার ঘরে চলে আয়। আমার কিন্তু বড্ড খিদে পেয়েছে।'

বলামাত্র রাজেশ উঠে দাঁড়াল। ভবেশের ঘর থেকে বেরিয়ে করিডরে আসতেই সেই মহিলাটির মুখ চকিতের জন্য মনে পড়ে গেল। সেই মহিলাটি অর্থাৎ ভবেশের দ্বিতীয়া স্ত্রী যাঁর জন্য একদা রানীপুর ছেড়ে গিয়েছিল সে। ভবেশ যদি তাঁর জীবনের সমস্ত সঞ্চয় তাকেই দিয়ে যান তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রীর কী হবে? তাঁর ভবিষ্যৎ কী?

বার

একরকম জোর করেই কাল দোলনের মা কথা আদায় করে নিয়েছিলেন, যে ক'দিন রাজেশ রানীপুর আছে রোজ একবার অন্তত তাঁদের বাড়ি যেতে হবে। যদিও রাজেশ প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ তবু দোলনদের বাড়ি আর কোনদিন যাবে কি-না, সে সম্বন্ধে কালই যথেষ্ট সংশয় ছিল তার।

সংশয় কেননা, দোলনের মা দু-হাত বাড়িয়ে তাকে যত কাছে টানতে চেয়েছেন দোলন ততই দূরে সরিয়ে দিয়েছে। যে ঝাঁকড়া-চুল ছোট্ট মেয়েটা একদিন ছাদের ঘরের ম্লান বিষণ্ণ নির্বাসন থেকে রাজেশের হাত ধরে জীবনের সজীব উৎসবে টেনে নিয়ে গিয়েছিল আজ আর তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। দশ বছরে রানীপুরের যত পরিবর্তন হয়েছে তার চাইতে অনেক বেশি বদলে গেছে দোলন।

দোলনদের বাড়ি যাবে কি যাবে না, এই আলোছায়ার মাঝখানে রাজেশের মন কাল থেকেই দোল খাচ্ছে। আজ সকালে ঘুম থেকে বিচিত্র অন্যমনস্কতার মধ্যে দলিলের ড্রাফট্‌গুলো পড়েছে সে, মুখ ধুয়েছে, ব্রেকফাস্ট সেরেছে। এই সবের মধ্যেই এক সময় সকালটা লম্বা পায়ে দুপুরের দিকে এগিয়ে গেছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর কখন যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল, রাজেশের খেয়াল নেই। আবার কখন যে পায়ে পায়ে দোলনদের পুরনো একতলা ভাড়াটে বাড়িটার সদরে এসে দাঁড়িয়েছিল, সে বলতে পারবে না।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাজেশ এক-বার ভাবল, কড়া নাড়বে কি নাড়বে না। দোলন তাকে ঠেলে দিতে চেয়েছে ঠিকই কিন্তু তার মা? সেই অপার স্নেহকে সে অমর্যাদা করবে কোন যুক্তিতে-? অতএব কড়ায় হাত রাখল রাজেশ।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। একটু পর সদর খুলে গেল। আজ আর দরজা খুলতে দোলন আসে নি। তার মা এসেছেন। দোলনের মাকে দেখে বুকের ভেতর থেকে নিঃশ্বাসটা সহজ স্রোতে বেরিয়ে এল যেন।

দোলনের মা রাজেশকে ভেতরে নিয়ে কালকের মতই দালানে বসালেন। তারপর গল্প শুরু করে দিলেন। কালকেই তার জীবনের মোটামুটি সমস্ত খবর জেনে নিয়েছিলেন। আজও আবার নতুন করে সে-সব সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। কাল খুঁটিনাটি যা-যা জানতে বাকি ছিল—যেমন সে বিয়ে করেছে কি-না, চাঁপদানিতে মামারা কি করেন—ইত্যাদি নানা বিষয় প্রশ্ন করে করে জেনে নিলেন।

কথায় কথায় রাজেশের চাকরির প্রসঙ্গ উঠল। দশ বছরের জলচর জীবনে সাত সাগরে ভেসে ভেসে পৃথিবীর সব দেশেই যে সে পাড়ি জমিয়েছে—এ-খবর শুনতে শুনতে বিস্মিত হয়ে গেলেন দোলনের মা।

দেশ বিদেশের নানা বিচিত্র কাহিনী বলতে বলতে নিজের অজান্তে কখন যে রাজেশের চোখ দুটি ভাঙাচোরা পুরনো বাড়িটার সব দিকে ঘুরে ঘুরে দোলনকে খুঁজতে শুরু করেছিল, খেয়াল নেই। আজ আসার পর থেকে দোলনকে একবারও দেখেনি রাজেশ। সে কি তবে বাড়ি নেই! না কি রাজেশ এসেছে বলে কোথাও আত্মগোপন করে আছে। কথাটা মনে হতেই নিজের মধ্যে কেমন যেন এক অস্থিরতা বোধ করল রাজেশ। একটু আগে সদর দরজার সামনে এসে যখন সে দাঁড়িয়েছিল তখন মনে মনে প্রার্থনা করেছিল, দোলন যেন বাড়ি না থাকে। এই মুহূর্তে সেই মেয়েটার জন্যই তার প্রাণে যত অস্থিরতা তত শূন্যতা।

গল্পের ফাঁকে হঠাৎ একসময় সে বলে ফেলল, 'বাড়িতে আর কারুকে তো দেখছি না মাসিমা—'

'কেউ নেই।'

'নান্টু, পিন্টু তো মামাবাড়ি গেছে। মেসোমশাই নিশ্চয়ই প্রেসে, আর—'

'আর কী?'

'দোলনও বুঝি বেরিয়েছে?'

'ওটার কথা আর বলো না। একদণ্ড কি বাড়িতে পা পেতে বসে রাক্ষুসী। দিনরাত টই টই করে সারা রানীপুর—শুধু রানীপুর কেন, আশপাশের যত গ্রাম আর শহর আছে—সব চষে বেড়াচ্ছে।'

'কেন?' রীতিমত অবাক হয়েই প্রশ্ন করল রাজেশ।

'কেন আবার—' ঈষৎ বিরক্ত স্বরে দোলনের মা বললেন, 'বাপ বেটিতে মিলে রাজত্ব উদ্ধার করবে বলে।'

কিছুই বুঝতে না পেরে বিমূঢ়ের মত রাজেশ আবার প্রশ্ন করল, 'মানে—'

এবার সমস্ত ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করলেন দোলনের মা। এ অঞ্চলের যেখানে যত দুর্নীতি আর অসাম্য, তা রাজনৈতিকই হোক সামাজিকই হোক আর অর্থনৈতিকই হোক—সব প্রকাশের জন্য 'রানীপুর সংবাদ' বার করেছেন প্রণব বসু। পত্রিকাটির তিনিই একাধারে সম্পাদক, প্রকাশক এবং মুদ্রক। আর দোলন হচ্ছে বার্তা সম্পাদক তথা প্রধান সংবাদ-দাতা। সারা অঞ্চল ঘুরে ঘুরে যাবতীয় তথ্য সে সংগ্রহ করে আনে এবং সে-সব 'রানীপুর সংবাদে' ছাপা হয়। অবশ্য খবর সংগ্রহের ব্যাপারে আরো কয়েকটি শিক্ষিত তরুণ-তরুণী আছে।

দোলনের মা বলতে লাগলেন, 'মেয়ে এত বড় হয়েছে। সেদিকে বাপের এতটুকু লক্ষ্য নেই। আমি দিনরাত বকে মরছি, ওগো মেয়েটার বিয়ে দাও, বিয়ে দাও। ওকে আর ধিঙ্গি বানিও না, কে কার কথা শোনে।'

শুনতে শুনতে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল রাজেশ। কিছু একটা বলতে চেয়েছিল সে। কিন্তু তার আগেই দোলনের মা আবার বলে উঠলেন, 'অবিশ্যি কাজটা কিছু খারাপ করছে না ওরা। যারা বদমাস শয়তান— তাদের আসল চেহারাটা চিনিয়ে দিচ্ছে। তাতে উপকারই হচ্ছে লোকের।'

রাজেশ কী বলবে, ভেবে পেল না।

এদিকে দোলনের মা থামেন নি। আত্মবিস্মৃত এক ঘোরের মধ্যেই তিনি বলে যেতে লাগলেন, 'এই দেখ না, ভবেশ বাঁড়ুজ্জে রানীপুরে কত কীর্তি করে যাচ্ছে। সে সব কথা লোকে—' বলতে বলতে থমকে গেলেন। এতক্ষণ যেন খেয়াল ছিল না, কার কাছে কী বলছেন। সচেতন হতেই তিনি চুপ করে গেলেন। তারপরেই জিভ কেটে দৌড়ে সামনের একটি ঘরে গিয়ে মুখ লুকোলেন। আর দালানের এক প্রান্তে বিভ্রান্তের মত বসে রইল রাজেশ।

শুধু বিভ্রান্তই না, সমস্ত স্নায়ুর মধ্যে দিয়ে অসহ্য তীক্ষ্ণ এক চমক বয়ে গেল রাজেশের। কী করেছেন ভবেশ? তার দশ বছরের অনুপস্থিতিতে ভবেশের জীবন কোন খাত ধরে ছুটেছে?

অনেকক্ষণ পর চিরদিনের উচ্ছল-স্বভাব দোলনের মা আড়ষ্টের মত ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। রাজেশের দিকে তিনি আর চোখ তুলে তাকাতে পারছিলেন না। কুণ্ঠিত নতমুখে শিথিল স্বরে বললেন, 'আমায় ক্ষমা করো বাবা।'

প্রথমটা হকচকিয়ে গেল রাজেশ। একটু পর সে ভাবটা থিতিয়ে গেলে ব্যস্তভাবে বলে উঠল, 'ছি-ছি, এ কি বলছেন মাসিমা। এ ভাবে আমাকে অপরাধী করবেন না।'

'তুমি কেন অপরাধী হবে, সব দোষ আমার। তোমার বাবার সম্বন্ধে লোকে নানা কথা বলে।' দোলনের মা বলতে লাগলেন, 'লোকে যা খুশি বলুক। কিন্তু তুমি আমার বাড়ি এসেছ। তোমার কাছে এ-সব বলা আমার একেবারেই উচিত নয়। অথচ মুখ ফসকে তা-ই বলতে যাচ্ছিলাম। ছি-ছি-ছি, আমার মরণ নেই।'

রাজেশ চুপ।

দোলনের মা আবার বললেন, 'তোমাকে বসতে বলার কি আসতে বলার মুখ আমার নেই। জানি তুমি আর আসবে না। তবু—'

রাজেশ এবার বলে উঠল, 'আমার বাবাকে আমি অনেকখানিই জানি মাসিমা। মুখ ফসকে আপনি যদি কিছু বলেও থাকেন তাতে লজ্জার কিছু নেই। আর আসার কথা বললেন না? যে ক'দিন রানীপুরে আছি দূরে সরিয়ে দিলেও আমি আসব। আসুন, আমার কাছে এসে বসুন।'

কুণ্ঠিতের মত সামনে এগিয়ে এলেন দোলনের মা। সুর আগেই কেটে গিয়েছিল। নিজের অনিচ্ছায় রাজেশকে যে আঘাত দিয়ে ফেলেছিলেন তার গ্লানি কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারলেন না তিনি। চিরদিনের সাবলীলা অকুণ্ঠহাসিনী মহিলাটি একেবারেই আড়ষ্ট আর ম্রিয়মাণ হয়ে গেছেন। নত চোখে চুপচাপ বসে রইলেন তিনি।

আশ্চর্য এক নীরবতার মধ্যে কতটা সময় কেটে গিয়েছে, রাজেশের খেয়াল নেই। এক সময় হঠাৎ তার লক্ষ্য পড়ল, পশ্চিম আকাশের ঢালু বেয়ে শীতের সূর্য অতি দ্রুত নীচে নেমে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ফুলবাগানের সেই রহস্যময়ী প্রৌঢ়াটির মুখ চেতনায় ভেসে উঠল। মনে পড়ল, মহিলা তার প্রতীক্ষায় থাকবেন। এবং তাঁরই জন্য আজ চাঁপদানিতে মামাদের কাছে যাওয়া স্থগিত রেখেছে সে। আকাশের দিক থেকে তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে দোলনের মায়ের দিকে তাকাল রাজেশ। বলল, 'আজ আমি উঠি মাসিমা। একটা খুব জরুরী কাজ আছে। কাল আবার আসব।'

রহস্যময়ী প্রৌঢ়াটি কালই ঠিকানা দিয়েছিলেন। খুঁজে খুঁজে রাজেশ যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছুল রানীপুরের আকাশে সূর্যটাকে তখন আর কোথাও আবিষ্কার করা যাবে না। পশ্চিম দিগন্তে দিনান্তের বিষণ্ণ একটু রক্তাভা লেগে আছে মাত্র।

জায়গাটার নাম নতুন পাড়া। রানীপুরের পশ্চিমে প্রান্তবাহিনী যে গেরুয়া নদীটি, পাড়াটা তারই পার ঘেঁষে।

নতুন পাড়াই বটে! দেশভাগের বছর চারেকের মধ্যেই মানুষে মানুষে রানীপুর ছেয়ে গিয়েছিল। তারপরও যখন জনস্রোত আসা থামল না তখন এই ক্ষুদ্র নগণ্য পুরনো শহরটার স্বাভাবিক কারণেই আত্মপ্রসারের প্রয়োজন দেখা দিল। আর সেই তাগিদেই নতুন পাড়ার জন্ম।

বাড়িটার সামনের দিকে সংক্ষিপ্ত একটু রোয়াক। সেখানে উন্মুখ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন মহিলা। রাজেশকে দেখামাত্র তাঁর চোখ দুটি আলোকিত হয়ে উঠল যেন। সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে এসে কাছে দাঁড়ালেন তিনি। কাঁপা গলায় বললেন, 'এত দেরি করলে যে?'

রাজেশ বলল, 'এদিকটা নতুন হয়েছে। আমার তো কিছুই জানাশোনা নেই। রাস্তার লোককে জিজ্ঞেস করে আসতে দেরি হয়ে গেল।'

'আমার কিন্তু বড্ড ভাবনা হচ্ছিল রাজেশ।'

'কেন?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল রাজেশ।

'ভাবছিলাম তুমি বুঝি আর এলে না।' প্রৌঢ়া বললেন, 'অথচ তুমি আমার কাছে আসবে—এই দিনটির জন্যে কত কাল ধরে অপেক্ষা করছি।' বলতে বলতে কেমন যেন আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়লেন প্রৌঢ়া, 'এই দিনটির জন্যে দশ বছর রানীপুরে পড়ে আছি রাজেশ। তুমি না এলে আমার এখানে থাকা যে মিথ্যে হয়ে যেত বাবা।'

'কিন্তু—'

'বল—'

একটু ইতস্তত করে রাজেশ বলল, 'একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারছি না। শুধু শুধু আমার জন্যে আপনি এত কাল এখানে অপেক্ষা করছেন কেন?'

প্রৌঢ়া বিচিত্র হাসলেন। নিজের বুকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'এর ভেতর যাঁর বাস তাঁরই ইচ্ছায়।' বলতে বলতে হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠলেন, 'ঐ দেখ, রাস্তাতেই তোমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছি। এস—এস—'

প্রৌঢ়ার পিছু-পিছু ভেতরে গিয়ে ঢুকল রাজেশ।

দুখানি মাত্র ঘর। সংক্ষিপ্ত একটু উঠোন। উঠোনের একপ্রান্তে পাতকুয়ো, আরেক প্রান্তে রান্নাঘর। সমস্ত বাড়িখানি ঝকঝকে, পরিচ্ছন্ন।

দক্ষিণমুখী বড় ঘরখানায় প্রৌঢ়া রাজেশকে এনে বসালেন। আসবাবের বাহুল্য নেই। এক কোণে সিঙ্গল-বেড খাটে ধবধবে নিভাঁজ বিছানা। দু-খানি চেয়ার; একটি টী-পয়। আর উত্তরের দেওয়াল ঘেঁষে বিরাট বিরাট দু-খানা আলমারিতে অসংখ্য বই। অধিকাংশই দর্শন এবং ধর্মগ্রন্থ। মহিলা যে শিক্ষিতা, মার্জিতা এবং রুচিশীলা—সে কথা মুখে বলে না দিলেও চলে।

ছোট্ট বাড়িখানি বড় বেশি নির্জন যেন। প্রৌঢ়া মহিলাটি ছাড়া আর কারুকে কোথাও আবিষ্কার করা যাচ্ছে না। মহিলার সিঁথিতে সিঁদুরের রেখা দেখে অনুমান করা যায় তাঁর স্বামী জীবিত। স্বামী ভদ্রলোক কি চাকরি বা অন্য কোন কাজে বেরিয়েছেন? ছেলে অথবা মেয়ে, কারুকেই দেখা যাচ্ছে না। মহিলা কি নিঃসন্তানা। কিংবা ছেলেমেয়ে থাকলেও তারা হয়ত স্কুল কলেজে বেরিয়ে গেছে।

এই ছোট্ট পরিচ্ছন্ন একতলা বাড়ি, সুরুচি দিয়ে সাজানো বিশাল ঘরখানা কি মহিলার স্বামী এবং সন্তানের ভাবনা—সব একত্র হয়েও রাজেশকে

বেশিক্ষণ অন্যমনস্ক রাখতে পারল না। সেই কথাটি আবার তার মনে পড়ে গেল। রাজেশ বলে উঠল, 'আমার প্রশ্নের উত্তরটা কিন্তু পাই নি।'

রাজেশকে একটা চেয়ারে বসিয়ে নিজে খাটে বসেছিলেন প্রৌঢ়া। বললেন, 'কোন প্রশ্নটার রাজেশ?'

'ঐ যে দশ বছর আমার জন্যে কেন অপেক্ষা করছেন?'

'বললামই তো, বুকের মধ্যে যাঁর বাস তাঁর ইচ্ছায়।'

'ওটা কি ঠিক উত্তর হল?'

'ওটাই ঠিক উত্তর বাবা।'

একটু ভেবে রাজেশ বলল, 'আপনি তো আমার সব কথা জানেন; তা হলে নিশ্চয়ই এ-ও জানেন, দশ বছর আগে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আর কোনদিন এখানে ফিরব না। ফেরার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। নেহাৎ—'

রাজেশের কথা শেষ হওয়ার আগেই কণ্ঠস্বরে অস্বাভাবিক জোর দিয়ে প্রৌঢ়া বলে উঠলেন, 'ফিরতে তোমাকে হতই রাজেশ।'

'ফিরতে হত!' অবাক না হয়ে রাজেশ পারল না।

'নিশ্চয়ই বাবা।' ভদ্রমহিলা বলতে লাগলেন, 'তুমি রানীপুরে না ফিরলে আমার সব কিছুই যে বৃথা হয়ে যেত।'

তাকে দিয়ে ভদ্রমহিলার কী প্রয়োজন সেই কথাটা পরিষ্কার করে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল রাজেশ। সেই সময় তিনি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'তুমি একটু বস রাজেশ। আমি আসছি।' বলেই বেরিয়ে গেলেন।

একটু পর মহিলা যখন আবার ফিরে এলেন তখন তাঁর ডান হাতে প্রকাণ্ড একখানা কাঁসার থালা, বাঁ হাতে জলের গেলাস। থালায় ছ-সাত রকমের পিঠে আর পায়েস। রাজেশের সামনে একখানা টেবিলে সে সব সাজিয়ে দিতে দিতে প্রৌঢ়া বললেন, 'খাও রাজেশ—'

খাবারের পরিমাণ দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠল রাজেশ। যুগপৎ হাত এবং মাথা নেড়ে সে বলল, 'ওরে বাবা, এতগুলো তো খেতে পারব না।'

'পারবে, নিশ্চয়ই পারবে। না পারলে চলবে কেন বাবা। কাল সারারাত জেগে এ-সব যে করেছি সে কি না পারার জন্যে?'

'তাই বলে এত—'

'মোটে তর্ক করবে না।' কপট রাগে চোখ পাকিয়ে প্রৌঢ়া বলে উঠলেন, 'যা দিয়েছি লক্ষ্মী ছেলের মত চটপট খেয়ে নাও।'

রাজেশ বুঝল সারারাত বসে যিনি এত সব খাবার তৈরি করেছেন, কাছে বসিয়ে সে-সব খাওয়াবার শক্তিও তিনি রাখেন। অতএব বুদ্ধিমানের মত

থালায় হাত দিল সে। খেতে খেতে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। মুখ তুলে রাজেশ বলল, 'আচ্ছা আমি যেদিন রানীপুর আসি সেদিন নাকি আমাকে দেখতে আপনি স্টেশনে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আপনি তো আগে আর কখনও আমাকে দেখেন নি। কাজেই স্টেশনে আমাকে চিনতে পারা তো সম্ভব ছিল না আপনার পক্ষে। তবু গিয়েছিলেন যে? তা ছাড়া সেদিন ঐ ট্রেনেই যে আমি রানীপুর আসব, তা-ই বা জানলেন কেমন করে?'

সঙ্গে সঙ্গে কোন উত্তর দিলেন না প্রৌঢ়া। স্থির দূরগামী চোখে অনেকক্ষণ রাজেশের দিকে তাকিয়ে থেকে একসময় আস্তে আস্তে বললেন, 'একটা একটা করে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। প্রথমে শেষ প্রশ্নটার জবাব শোন। তোমাদের বাড়িতে যে চাকরবাকরগুলো আছে তাদের একজনের নাম ভোলা। ভোলা প্রায়ই আমার এখানে আসে। তার কাছেই খবর পেয়েছিলাম, তুমি অমুক দিন আসছ। কোন ট্রেনে আসছ সেটা অবশ্য ভোলা বলতে পারে নি। তাই সেদিন যতবার রানীপুরে ট্রেন এসেছে ততবারই আমি ছুটে গেছি। এবার প্রথম প্রশ্নের উত্তর। তোমাকে আগে কখনও দেখিনি, সে-কথা ঠিক। তবে তোমার বাবা যে তোমাকে স্টেশন থেকে আনতে যাবেন সে কথা ভোলার মুখেই শুনেছিলাম। তোমার বাবা যাকে নিয়ে স্টেশন থেকে বাড়ি ফিরবেন সে যে তুমি মানে রাজেশ—এটুকু বুঝতে খুব বেশী বুদ্ধির দরকার হয় কি বাবা?'

এতক্ষণে ব্যাপারটা বোধগম্য হল। খাবারগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে রাজেশ বলল, 'স্টেশনেই যখন আমাকে চিনে ফেলেছিলেন তখন কাছে এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে তো আলাপ করেন নি।'

একমুহূর্ত থতিয়ে রইলেন প্রৌঢ়া। তারপর বললেন, 'এমনি যাইনি। ভেবেছিলাম ট্রেনে এসে ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। স্টেশনের ভিড়ে তাই আর বিরক্ত করিনি। তাছাড়া তোমার বাবা তোমাকে আনতে গিয়েছিলেন। আলাপ করার মত কতটুকু সময় আর পেতাম!'

'খুব বেশী কথা না হয় না-ই হত। আলাপটা তো করে রাখতে পারতেন।' একটু থেমে রাজেশ অতর্কিত প্রশ্ন করল, 'সময় না পাওয়ার অজুহাতটা কি সত্যি?'

প্রৌঢ়া এবার চকিত হয়ে উঠলেন, 'কী বলছ রাজেশ?'

রাজেশ প্রায় মরিয়ার মত বলে গেল, 'শুনেছি আপনি নাকি চায়ের স্টলের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু কেন?'

কিছু একটা বলতে চেষ্টা করলেন প্রৌঢ়া। কিন্তু ঠোঁটদুটো শুধু থরথর করতে লাগল।

রাজেশ আবার তাড়া লাগাল, 'কি, চুপ করে রইলেন কেন? বলুন।'

অনেকক্ষণ পর থেমে থেমে প্রৌঢ়া বললেন, 'আমার পক্ষে তোমাদের সামনে যাওয়া সম্ভব ছিল না রাজেশ।'

'আমার জন্যে নিশ্চয়ই আপনার অসুবিধে ছিল না। তবে কি বাবার জন্যে?' 'বাবা' শব্দটা সজ্ঞানেই উচ্চারণ করল রাজেশ।

প্রৌঢ়া তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'সে কথা এখন থাক।'

যদিও প্রসঙ্গটার ওপর প্রৌঢ়া যবনিকা নামিয়ে দিতে চাইলেন তবু রাজেশ বুঝে নিল, ভবেশের জন্যই সেদিন তিনি স্টেশনে আলাপ করতে এগিয়ে যান নি।

একটুক্ষণ চুপচাপ। কি ভেবে প্রৌঢ়াই আবার শুরু করলেন, 'আচ্ছা রাজেশ, আমি যে সেদিন স্টেশনে গিয়েছিলাম, সে-কথা তোমায় কে বলেছে?'

'একটি মেয়ে।'

'কে সে?'

'সেদিন আপনার সঙ্গে যে স্টেশনে গিয়েছিল।'

বিমূঢ়ের মত প্রৌঢ়া উচ্চারণ করলেন, 'তার মানে দোলন বলেছে! কিন্তু—'

তাঁর বিমূঢ়তার কারণ কিছুটা যেন অনুমান করতে পারল রাজেশ। বলল, 'আপনি আমার সব কথা যখন জানেন তখন এটা আপনার নিশ্চয়ই অজানা নয় যে দোলনদের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। দশ বছর আগে রানীপুরে—'

বাধা দিয়ে প্রৌঢ়া বলে উঠলেন, 'আমি তা জানি রাজেশ। তবে একটা কথা কিছুতেই আমি বুঝে উঠতে পারছি না, দোলনকে তুমি পেলে কোথায়?'

প্রৌঢ়ার কথা শেষ হবার আগেই রাজেশ বলে উঠল, 'দশ বছর আগে দোলনরা যেখানে ছিল সেখানে খোঁজ নিতে গিয়ে জানতে পেরেছি আমার বাবা ঠকিয়ে তাদের বাড়িখানা গ্রাস করে ফেলেছেন। শুধু তাই নয়, তাদের উচ্ছেদও করে দিয়েছেন। কাজেই দোলনরা রানীপুরের উত্তর দিকে একখানা ভাঙাবাড়িতে উঠে গেছে। সেই বাড়িটায়, যার পেছন দিকের ফুলবাগানে আপনাকে প্রথম দেখি—'

কেমন যেন এক শঙ্কামিশ্রিত উত্তেজনার স্বরে প্রৌঢ়া বললেন, 'তুমি কি দোলনদের বাড়ি গিয়েছিলে নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'দোলনদের বাড়ি যাবার কথা তোমার বাবা জানেন?'

ঠিক এই প্রশ্নটা কাল দোলনও করেছিল তাকে। রাজেশ বলল, 'না।'

'জানতে পারলে তিনি কিন্তু অসন্তুষ্ট হবেন।' প্রৌঢ়া বললেন।

রাজেশ বলতে যাচ্ছিল, অসন্তুষ্ট-ক্রুদ্ধ-ক্ষুব্ধ, যা ইচ্ছে তা হতে পারেন ভবেশ। তাতে তার কিছুই যায় আসে না। ভবেশের কাছে কোন ব্যাপারেই তার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কথাগুলো বলতে গিয়েও বলতে পারল না রাজেশ। তার বদলে হঠাৎ বলে বসল, 'দোলনদের বাড়ি গেছি জানলে বাবা অসন্তুষ্ট হবেন। আর আপনার এখানে এসেছি জানলে?'

প্রৌঢ়া একেবারে হকচকিয়ে গেলেন। অর্ধস্ফুট জড়িত স্বরে কি বললেন, বোঝা গেল না।

সামনের দিকে ঝুঁকে প্রৌঢ়ার চোখে চোখ রেখে রাজেশ ফিসফিসিয়ে উঠল, 'আপনার এখানে আসার পথেও বোধহয় বাবার নিষেধ আছে। তাই না?'

রাজেশের চোখ থেকে দৃষ্টিটাকে অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন প্রৌঢ়া। কিছুক্ষণ পর বললেন, 'রানীপুরে যখন এসেছ তখন আস্তে আস্তে সব জানতে পারবে।'

'আজই আমি জানতে চাই।' একরকম জেদই যেন ধরল রাজেশ।

জানালার বাইরে রানীপুরের দূর আকাশ থেকে বিকেলের বিষণ্ণ আলো দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে। সেদিকেই তাকিয়ে ছিলেন প্রৌঢ়া। কি ভেবে বললেন, 'বেশ, জানতে যখন চাও তখন শোন। আমার এখানে এসেছ জানলেও তোমার বাবা রাগ করবেন।'

'বাবা রাগ করবেন জেনেও আমাকে এখানে আসতে বলেছেন যে?'

বাইরের বিলীয়মান দিগন্ত থেকে চোখ দুটি ভেতরে নিয়ে এলেন প্রৌঢ়া। পৃথিবীর সবটুকু মিনতি চোখে মুখে ফুটিয়ে বললেন, 'না আসতে বলে যে পারিনি বাবা। আমার বাঁচা-মরা সব কিছু তোমার আসার ওপর নির্ভর করছে।'

ভদ্রমহিলা অনেক কথাই বলেছেন। কিন্তু রাজেশের সঙ্গে তাঁর কী প্রয়োজন সেই কথাটাই শুধু স্পষ্ট করে জানাচ্ছেন না। রীতিমত বিরক্তিই বোধ করল রাজেশ। নিজের মনোভাব গোপন না করে নীরস গলায় সে বলল, 'আমার ওপর আপনার বাঁচা-মরা কেন নির্ভর করছে, বুঝতে পারছি না।'

'আমার কথা তোমাকে সব বলব রাজেশ। তার আগে ক'টা প্রশ্নের উত্তর দাও।'

'কী প্রশ্ন?'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বললেন না প্রৌঢ়া। অনেকক্ষণ কি এক ভাবনার গভীরে মগ্ন হয়ে রইলেন যেন। একসময় বললেন, 'আচ্ছা রাজেশ, দশ বছর পর হঠাৎ তুমি রানীপুরে ফিরে এলে কেন ?'

'আমার বাবা'—রাজেশ বলতে লাগল, 'এখানে আসার জন্য গেল এক বছর ধরে ক্রমাগত চিঠি লিখে যাচ্ছিলেন। তাই এসেছি।'

'তোমার বাবা কি এমনিই, মানে তোমাকে অনেকদিন দেখেন নি বলে এখানে আনিয়েছেন, না অন্য কোন দরকারে ?'

একটু ইতস্তত করে রাজেশ বলল, 'বিশেষ একটা প্রয়োজনে বাবা আমাকে এখানে আনিয়েছেন।'

প্রৌঢ়া খাটের একটা বাজু ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এবার তিনি রাজেশের অনেকখানি কাছে এগিয়ে এলেন। উৎসুক উন্মুখ স্বরে বললেন, 'বুঝতে পারছি জিজ্ঞেস করা আমার উচিত হবে না, তবু না করেও পারছি না বাবা। দশ বছর পর হঠাৎ তোমাকে দিয়ে তোমার বাবার কী দরকার পড়ল ?'

দ্বিধান্বিত স্বরে রাজেশ বলে ফেলল, 'বাবার ইচ্ছে, নেভির চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে আমি রানীপুরে তাঁর কাছে এসে থাকি।'

'এ তো ভাল কথাই। কিন্তু রাজেশ, তোমার বাবা কী শুধু তোমাকে কাছে এনেই রাখতে চান ?'

'বাবার বয়েস হয়েছে। এবার একটু বিশ্রাম চান তিনি। এদিকে বাড়িঘর, জমিজমা, রাইস মিল, ফাউণ্ড্রি—অনেক কিছুই করে ফেলেছেন। তাঁর ইচ্ছে আমার হাতে সে-সব দায়িত্ব তুলে দেবেন।'

শুনতে শুনতে প্রৌঢ়ার চোখ দুটি আশ্চর্য তীক্ষ্ণ আর নিষ্পলক হয়ে গেল। আস্তে আস্তে তিনি বললেন, 'সে সব দায়িত্ব নিতে তুমি রাজী হয়েছ ?'

'এখনও কিছু ঠিক করি নি। ভাববার জন্যে ক'টা দিন সময় নিয়েছি।'

'তা হলে কাল যে বলেছিলে চারদিন মাত্র রানীপুরে থাকবে—'

'না। আরো কিছুদিন থাকতে হবে এখানে।'

রাজেশ লক্ষ্য করল, মহিলার কপালে কতকগুলো জটিল গভীর রেখা ফুটে উঠেছে। ওপরের দাঁতগুলো নীচের ঠোঁটে ধীরে ধীরে গেঁথে যেতে লাগল মহিলার। অনেকক্ষণ পর হঠাৎ তিনি বললেন, 'তোমার বাবা তাঁর সমস্ত কিছু তোমার হাতে তুলে দেবেন, আর তুমি তা নেবে, এ খুব আনন্দের কথা। কিন্তু—'

'কী ?'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে অকপটে দৃঢ়স্বরে প্রৌঢ়া বললেন, 'কোন কিছু

দেওয়া খুব বড় ব্যাপার, কিন্তু নেওয়া তার চাইতে কিছুমাত্র ছোট কথা নয়। নেওয়ার আগে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানা দরকার যেটা হাত পেতে নিতে যাচ্ছি, আদৌ সেটা গ্রহণের যোগ্য কি-না?'

সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে দিয়ে দুঃসহ এক তরঙ্গ খেলে গেল রাজেশের। সে বলল, 'আপনি কী বলছেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'এর বেশি কিছু বলবার অধিকার আপাতত আমার নেই রাজেশ। যদি বলতে যাই—আমার মুখ হয়তো তুমি আর দেখতে চাইবে না।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তার পর প্রৌঢ়াই আবার নীরবতা ভাঙলেন, 'যে গ্রহণের মধ্যে মর্যাদা নেই গৌরব নেই, তেমন গ্রহণ পাপ রাজেশ।'

রাজেশ কী বলবে ভেবে পেল না। প্রৌঢ়াও আর কিছু বললেন না। রাজেশের টেবিলের কাছ থেকে সরে গিয়ে আস্তে আস্তে খাটে গিয়ে বসলেন।

কাঁসার থালায় পিঠে আর পায়েস যথারীতি সাজানোই রয়েছে। এবার চামচে দিয়ে একটা পিঠে কেটে মুখে দিতে যাবে ঠিক সেইসময় কথাটা মনে পড়ে গেল। বলল, 'আমায় আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন?'

'না।' প্রৌঢ়া মাথা নাড়লেন।

'তা হলে এবার আমার একটা কথার উত্তর দিন।'

'কী কথা?'

'আপনার পরিচয়টা এখনও আমার জানা হয় নি।'

জানালার বাইরে শীতের গাঢ় অন্ধকারে দৃষ্টি ডুবিয়ে দিয়ে উদাস গলায় প্রৌঢ়া বললেন, 'আমার নাম বিভা বন্দ্যোপাধ্যায়।'

'ওটা তো নাম। আমি পরিচয় জানতে চাইছি।' রাজেশ বলল।

চোখ না ফিরিয়েই প্রৌঢ়া অর্থাৎ বিভা দেবী বললেন, 'তোমাকে তো কালই বলেছি রাজেশ, যে পরিচয়টা আমার আছে তার মধ্যে কোন গৌরব নেই।'

বিরক্ত স্বরে রাজেশ বলল, 'গৌরব না থাকলেও সেটা পরিচয় তো।'

রাজেশের মনোভাব কিছুটা যেন বুঝতে পারলেন বিভাদেবী। তাঁর পরিচয়ের মধ্যে মর্যাদা থাক বা না থাক, সেটা সে জানতে চায়। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই সেটা পরিচয়। কিন্তু বাবা, তোমার কাছে তা বলতে যে সাহস পাচ্ছি না। পাছে—'

'পাছে কী?'

'তোমাকে চিরদিনের মত হারাই!'

রাজেশ কী বলবে, ভেবে পেল না।

বিভাদেবী আবার বলে উঠলেন, 'কিন্তু বাবা, তোমার কাছে আমার পরিচয়টা না দিলেও নয়। রানীপুরে এখন তুমি থাকছ তো?'

'হ্যা।'

'এর মধ্যে একবার করে রোজ তোমাকে আমার কাছে আসতে হবে কিন্তু—'

রাজেশ বলল, 'শুধু শুধু এখানে রোজ আসব কেন? কোন দরকার আছে কি?'

'আছে বৈকি বাবা। কালই তোমাকে বলেছি দশ বছরের অনেক কথা আমার বুকে জমে আছে। আজ প্রথমদিনে কিছুই তো বলা হল না। অথচ সে সব তোমার জানা দরকার। তাছাড়া রোজ যাওয়া-আসার মধ্যে তোমার ভেতর আর বাইরের সবটুকু আমি জেনে নিতে পারব। তুমি আমাকে চিনতে পারবে—'

আজ তিন দিন ধরে রোজই এই ভদ্রমহিলাকে দেখছে রাজেশ। কিন্তু এখনও এত কথা বলার পরও তাঁর রহস্যের কোন দিক থেকেই এতটুকু যবনিকা তোলা গেল না।

তের

পরের দিন ভোরে চাঁপদানি রওনা হল রাজেশ।

ভবেশ তাঁর সসাগরা পৃথিবী ছেলের হাতে তুলে দিতে চান। সেটা নেবে কি নেবে না—সে সম্বন্ধে নিজে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারছিল না রাজেশ। সে ব্যাপারে মামাদের সঙ্গে পরামর্শ করতেই তার চাঁপদানি আসা।

প্রসঙ্গত মামাদের কথা বলা প্রয়োজন।

মামারা ভবেশের মত কুবের ভাণ্ডারের সন্ধান না পেলেও তাঁদের অবস্থা প্রয়োজনের অতিরিক্ত সচ্ছল। চাঁপদানির বাজারে তিন চারটে ধানচালের আড়ত। তা ছাড়া মুগ-মুসুরি-সর্ষে-কলাই এবং পাটের পাইকারি ব্যবসাও আছে। শুধু কি তা-ই, আট-দশখানা সাইকেল রিক্সা, দুটো লরী আর দশ-বারোখানা গরুর গাড়িও রয়েছে। সে-সব ভাড়া খাটিয়ে প্রচুর আয় হয়।

দশ বছর আগে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে রানীপুর থেকে রাজেশ যেদিন চাঁপদানি গিয়েছিল দু-হাত বাড়িয়ে মামারা বুকের ভেতর টেনে নিয়েছিলেন।

সেখানে অনাদর, উপেক্ষা বা অবজ্ঞা—কোনো কিছুরই আশঙ্কা ছিল না। মামাদের মাথার মণি হয়েই চাঁপদানিতে থাকতে পারত সে কিন্তু থাকে নি। সেদিন পরিচিত কোন মানুষের সঙ্গই তার ভাল লাগছিল না। মামাদের সান্ত্বনা আর সহানুভূতির কথাগুলো অসহ্য মনে হত। তা ছাড়া সত্তর বছরের দিদিমা মেয়ের মৃত্যুতে দিনরাত গুঙিয়ে গুঙিয়ে কাঁদতেন আর ভবেশকে অভিসম্পাত দিতে থাকতেন। অহরহ শোক প্রকাশের সেই বিচিত্র ধ্বনিটা রাজেশকে আচ্ছন্ন করে রাখত।

মায়ের মৃত্যু যে স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত নয় আর সে জন্য যে ভবেশই দায়ী—সে কথাটা মামারা বা দিদিমা, কেউই ভুলতে পারছিলেন না। সর্বক্ষণ সেই ব্যাপারটা নিয়ে তাঁরা আলোচনা করতেন। মায়ের মৃত্যুর জন্য ভবেশকে কোনক্রমেই তাঁরা ক্ষমা করতে পারছিলেন না।

এদিকে শোক-দুঃখ-সুখ বা আনন্দ, মানসিক কোন অবস্থাই দীর্ঘক্ষণ সহ্য করবার মত রাজেশের স্নায়ুগুলো ঘাতসহ বা দৃঢ় নয়। মায়ের মৃত্যু সে ভুলতে চাইছিল। মামারা কিন্তু ভুলতে দিচ্ছিলেন না। ফলে রাজেশের সমস্ত চেতনা বিচিত্র যন্ত্রণার ভারে সর্বক্ষণ জর্জরিত আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। সেই দুর্বিষহ অনুভূতির হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যেই না পরিচিত পৃথিবী থেকে পালিয়ে অজানা সাগরে পাড়ি জমিয়েছিল রাজেশ।

এবার রানীপুরে চারদিন কাটিয়ে রাজেশ যখন চাঁপদানি এসে পৌঁছল তখন দুপুর। সূর্যটা সরাসরি মাথার ওপর এসে উঠেছে।

মামারা বাড়ি ছিলেন না। এ-সময় থাকেনও না। সকালে স্নান সেরে কিছু খেয়ে আড়তে চলে যান। দুপুর বেলার খাওয়া যখন খেতে আসেন পশ্চিম আকাশের ঢালু বেয়ে সূর্যটা অনেকখানি নীচে নেমে যায়। খাবার পর কিছুক্ষণ জিরিয়ে সন্ধ্যের আগে আগে আবার আড়তে যান। এবার যখন ফেরেন রাতের একটা প্রহর নিঃশেষিত।

মামারা নেই, তাই বলে বিশাল তিনমহলা বাড়িখানা জনশূন্য নয়। বরং বড় বেশি মাত্রায় উচ্চকিত, সরগরম। চাকর-বাকর-ঝি-রাঁধুনী—সব মিলিয়ে এক অক্ষৌহিণী। শীতের শেষ। যদিও মামাদের ধানজমি নিঃস্ব করে অনেক আগেই ফসল উঠে গেছে তবু দিনকয়েকের মধ্যে রবিশস্যের মরসুম শুরু হয়ে যাবে। সে জন্য এখন থেকেই মামাবাড়িতে কৃষাণ আর মুনীষদের ভিড় লেগে গেছে। আর আছে আশ্রিত পরিজনেরা।

চাকর-বাকর ইত্যাদিদের বাদ দিলে এ বাড়িতে তিন মামী আছেন।

তাঁদের অস্তিত্ব বোঝা যায় না। মামীরা নিঃশব্দচারিণী। বাড়িময় চলছেন, ফিরছেন, ঘুরে ঘুরে সব সময় লোকজনের কাজকর্ম তদারক করছেন কিন্তু শব্দ নেই। কথাও বলেন অনুচ্চ মৃদু স্বরে। তিন মামী যেন তিনটি ছায়ামূর্তি।

মামীরা ছাড়াও তাঁদের ছেলেমেয়েরা আছে। এই মধ্যদুপুরে তাদের দেখা পাবার সম্ভাবনা নেই। যারা বড় তারা এ-সময় কলেজে, ছোটরা স্কুলে।

এত লোকজন তো আছে কিন্তু আরেকটি মানুষের কথা না বললে এ-বাড়ির পরিচয় অসম্পূর্ণই থেকে যায়। সেই একজন হচ্ছেন রাজেশের দিদিমা। দশ বছর আগে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে রাজেশ যখন চাঁপদানি এসেছিল তখন তাঁর বয়স সত্তর। তখনও শরীরে কিছু শক্তি অবশিষ্ট ছিল ; চলাফেরা করতে পারতেন।

অঙ্কের নির্ভুল হিসেবে দিদিমার বয়স এখন আশী। আজকাল আর হাঁটা-হাঁটি করতে পারেন না তিনি। কোমরটা বাতে নষ্ট হয়ে গেছে ; চোখদুটি পুরু ছানিতে আচ্ছন্ন। কাজেই অন্দর মহলের দোতলায় একখানি ঘরে তিনি বন্দী। বিশাল খাটের অনন্তশয্যায় সর্বক্ষণ শুয়ে আছেন।

রোগে চলে ফিরে বেড়াবার সামর্থ্য হারিয়েছেন। বয়স চোখের দৃষ্টি ছিনিয়ে নিয়েছে। কিন্তু জিভের বিরাম নেই। দিবারাত্রি বকছেনই। রোগে আর বয়সে ক'টা ইন্দ্রিয় খোয়া গেলেও জিভটা তার ক্ষতিপূরণ করে নিয়েছে।

নিজের ঘরখানিতে আবদ্ধ থেকে সর্বক্ষণ মামীদের নির্দেশ দিচ্ছেন। এই-ভাবে চল, ঐ ভাবে ফের। রোজ কী রান্না হবে, কে কী খাবে, কার অসুখ করেছে, কার জন্য ডাক্তার ডাকতে হবে, চাকর-বাকরেরা কে কোথায় ফাঁকি দিল --সব দিকেই দিদিমার তীক্ষ্ণ লক্ষ্য।

সেই যে এক যাদুকরী ছিল খড়ি পেতে ভূ-ভারতে কী হচ্ছে না হচ্ছে বলে দিতে পারত, দিদিমা যেন তা-ই। সংসারে কোথায় কী ঘটছে, কোথায় অনিয়মের ছায়া পড়ল, কোথায় তার স্বাভাবিক আহ্নিক গতিতে এতটুকু তাল কাটল—সব কিছুই নিজের ঘরখানিতে শুয়ে শুয়ে টের পান দিদিমা। পুতুল নাচের কুশলী খেলোয়াড়ের মত এ সংসারের প্রতিটি মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করছেন দিদিমা।

যাই হোক তিনমহলা বাড়িখানার বাইরের মহল পার হয়ে অন্তঃপুরে আসতেই মামীদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল রাজেশের। মামীরা তার জন্যেই যেন উৎকণ্ঠ হয়ে ছিলেন। দেখামাত্র ছুটে এসে ঘিরে ধরলেন। উৎসুক উদ্‌গ্রীব সুরে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখান থেকে বলে গেলে এক দিনের জন্যে রানীপুর যাচ্ছ। একদিনের জায়গায় চারদিন কাটিয়ে এলে। এদিকে আমরা ভেবে মরি। তা কী ব্যাপার ভাগ্নে?'

মামীরা তার নাম ধরে ডাকে না। বড় মামী বয়সে অবশ্য অনেক বড়, প্রায় পঞ্চাশের সীমান্তে। তবে মেজ মামীর সঙ্গে রাজেশের বয়সের তফাত বছর পাঁচেকের বেশি হবে না। ছোট মামী তো প্রায় সমবয়সিনীই। জন্মের সাল-তারিখ নিয়ে হিসেব কষতে বসলে হয়তো দেখা যাবে, এক-আধ বছরের ছোটই। অতএব পরিণত বয়স্ক ভাগ্নেকে নাম ধরে ডাকতে মামীরা খুব সঙ্কোচই বোধ করেন।

রাজেশ হাসল। বলল, 'সে অনেক ব্যাপার—'

মামীদের কৌতূহলটা আগে থেকেই শীর্ষবিন্দুতে উঠে ছিল। তাঁরা বললেন, 'বল না, বল না ভাগ্নে। এতকাল পর ঠাকুরজামাই হঠাৎ তোমায়—'

মামীদের কথার মধ্যেই দোতলা থেকে দিদিমার তীক্ষ্ণ কাঁপা গলা শোনা গেল, 'কে—কে, রাজু এসেছিস?'

সম্ভবত তার আসার খবরটা এর মধ্যেই কেউ দিদিমার কানে তুলে দিয়েছে। নীচের বারান্দা থেকে রাজেশ সাড়া দিল, 'হ্যাঁ—'

'ওখেনে দাঁড়িয়ে কী করছিস? ওপরে আয় দাদা—'

দিদিমার স্বরের উত্থান-পতনের মধ্যে বিচিত্র এক ব্যগ্রতা মেশানো রয়েছে। সেটুকু অনুভব করতে পারল রাজেশ। বলল, 'যাচ্ছি দিদিমা—'

এদিকে মামীদের চোখেমুখে এবার হতাশা ফুটে বেরুল। বড় মামী বললেন, 'নাঃ, আগে আর শোনা হল না। শাশুড়ী ঠাকরুনের কানে যখন একবার গেছে, তুমি এসেছ, ধরে রাখব সাধ্য কি। যাও ভাগ্নে. ওপরে যাও।'

একটু হেসে রাজেশ দোতলার সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল। সবে দু'পা ওপরে উঠেছে, ঠিক সেই সময় পেছন থেকে হঠাৎ মেজ মামী ডেকে উঠলেন 'ভাগ্নে—'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রাজেশ। মুখ ফিরিয়ে, জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

মেজ মামী বললেন, 'একটা কথা—'

'কী?'

'রানীপুরে ঠাকুরজামাই যে জন্যে ডাকিয়ে নিয়েছিল সেটা ভাল না খারাপ?'

একমুহূর্ত থতিয়ে রইল রাজেশ। তারপর কিছুটা অন্যমনস্কের মত বলল, 'ভাল না খারাপ, নিজে ঠিক বুঝতে পারছি না। সব শুনে তোমরাই বিচার কোরো।' বলেই আর অপেক্ষা করল না। এক এক লাফে দুটো করে সিঁড়ি পার হয়ে দ্রুত ওপরে উঠতে লাগল।

বাড়িটা পুব থেকে পশ্চিমে প্রসারিত। সামনের দিকে টানা বারান্দা আর বারান্দা ঘেঁষে সারিবদ্ধ অগণিত ঘর।

পুব প্রান্তের শেষ ঘরখানা দিদিমার জন্য নির্দিষ্ট। একরকম দৌড়ুতে দৌড়ুতেই সেখানে এসে পড়ল রাজেশ। দিদিমার বিশাল খাটটার একপাশে বসতে বসতে বলল, 'আমি এসেছি—'

কোনরকমে কনুই-এর ভরে উঠে বসলেন দিদিমা। তারপর দুটো ব্যগ্র কাঁপা হাত বাড়িয়ে দিয়ে রাজেশকে খুঁজতে লাগলেন।

রাজেশ নিজের হাত দিয়ে দিদিমাকে ছুঁল। বলল, 'এই যে আমি—'

ছোঁয়ামাত্র নাতিকে ধরে ফেললেন দিদিমা। তাঁর চোখে আলো নেই, দীপ্তি নেই। পুরু ছানির তলায় দৃষ্টি আচ্ছন্ন, অবরুদ্ধ। আলোহীন নিষ্প্রভ চোখে কিছুক্ষণ রাজেশের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। তাকিয়ে থাকতে থাকতে সমস্ত শরীরের ওপর দিয়ে দুরন্ত ঢেউএর মত অস্থির কাঁপুনির বেগ নেমে এল।

রাজেশের হাতদুটো নিজের মুঠিতে পুরে অনেকক্ষণ বসে রইলেন দিদিমা। তারপর করলেন কি, নাতিকে বুকের মধ্যে টেনে এনে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। ফোঁপানিটা প্রথমে ছিল মৃদু ; ধীরে ধীরে সেটা প্রবল আর উচ্ছ্বসিত হতে লাগল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে ভাঙা জড়িত স্বরে বলতে লাগলেন, 'আমি মরে যাব, মরে যাব। এত বছর বয়েস হল, চোখ খেয়েছি। রথ পড়ে গেছে তবু আমি বেঁচে আছি কেন গো ? বল্—বল্, এতকাল পর তোর বাপ কেন তোকে রানীপুরে ডেকে পাঠিয়েছিল ? তার মনের কথাটা খুলে বল্। তোর মাকে তো সে খেয়েছে। এ্যাদ্দিন পর তোর দিকে যখন তার চোখ পড়েছে, নিশ্চয়ই তোকে খাবে। বল্ তোকে খাবার কী ব্যবস্থা সে করেছে ?'

দশ বছর আগে আঠার বছরের রাজেশ যেদিন রানীপুর থেকে চাঁপদানি এসেছিল সেদিনও এমন ভাবেই উন্মত্তের মত কেঁদে ছিলেন দিদিমা।

অথচ দিদিমাকে যতটুকু রাজেশের জানা আছে তাতে তাঁর কাঁদার কথা নয়। তিন ছেলেকে নিয়ে তিনি বিধবা হয়েছিলেন। সেটা প্রায় চল্লিশ বছর আগের কাহিনী।

স্বামীর মৃত্যু তাঁর হৃৎপিণ্ড চুরমার করে দিয়েছিল ঠিকই কিন্তু তিনটি নাবালক ছেলে এবং একটি মেয়ের দিকে তাকিয়ে তাঁকে বুক বাঁধতে হয়েছিল। তিনি বুঝেছিলেন, স্বামী যা করে যেতে পারেন নি, তাঁকে তা-ই করতে হবে। অর্থাৎ ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব তাঁকেই নিতে হয়েছিল।

তিন চার যুগ আগে বাঙলাদেশের চেহারা কেমন ছিল ? যে সংসারে উপার্জনক্ষম একমাত্র পুরুষ মৃত হয় তার স্ত্রী-ছেলে-মেয়ের ভেসে যাবার কথা।

নতুবা আত্মীয়-স্বজনের কাছে ক্রীতদাসের মত আশ্রয় নেওয়া। দিদিমা কোনটাই করেন নি। যে প্রবল স্রোত তাঁদের ভাসিয়ে নেবার জন্য দুরন্ত গতিতে ছুটে এসেছিল মেরুদণ্ড সোজা রেখে দিদিমা তার বিপরীত দিকেই সাঁতার কেটেছেন। নিজেকে এবং সন্তানদের বাঁচাতে তিনি অন্যের মুখাপেক্ষী হন নি। আবার ভেসেও যান নি।

আশ্চর্য, জীবনের সকল যুদ্ধে যিনি বিজয়িনী সেই ব্যক্তিত্বময়ী সবলা দিদিমা একটা জায়গায় কিন্তু বিচিত্র রকমের অসহায়। মেয়ের বিয়ে দিয়ে তিনি সুখী হন নি। যত দিন রাজেশের মা জীবিত ছিলেন ততদিন সুদূর চাঁপদানিতে বসে শুধু কষ্টই পেয়েছেন। মেয়ের মৃত্যুর পর সেই কষ্টটা হাজারগুণ বেড়েছে।

দিদিমা যে কাঁদেন তার পেছনে মেয়ের মৃত্যুশোক অবশ্যই আছে। কিন্তু সেটাই একমাত্র কারণ নয়। রাজেশের ধারণা, যে দিদিমা জীবনের কোন যুদ্ধেই পরাভব মানেন নি, ভবেশের হাতে মেয়ে সঁপে দিয়ে তিনি হেরে একেবারে ফতুর হয়ে গেছেন। মেয়ের মৃত্যুজনিত শোকের সঙ্গে পরাজয়ের গ্লানিটা মিশে দিদিমার দুঃখ ফুলে ফুলে বুকের ভেতর পাহাড় প্রমাণ হয়ে আছে।

অভিভূতের মত অনেকক্ষণ বসে বসে দিদিমার কান্না শুনল রাজেশ। এক সময় বলল, 'কেঁদো না, কেঁদো না—'

দিদিমার কান্না তাতে থামল না, বরং আরো উত্তাল হয়ে উঠতে লাগল।

দিদিমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে রাজেশ আবার বলল, 'চুপ কর; শান্ত হও।'

'কি করে শান্ত হব।' দুর্বোধ্য জড়িত স্বরে দিদিমা এবার বললেন, 'আমি যে কল্যাণীর কথা এক মুহূর্ত ভুলতে পারি না রে। তোর বাবা তাকে মারল। একটা খুনী সে।' বলতে বলতে গলাটা কান্নায় রুদ্ধ হয়ে এল। একটু থেমে কেশে কেশে স্বরটাকে মুক্ত করে আবার শুরু করলেন, 'এতকাল পর সে তোকে রানীপুরে ডেকে পাঠাল। তুই যেতে চাইছিলি না; আমরাই জোর করে পাঠিয়েছি। একদিনের নাম করে গেলি। তারপর একে একে চারটে দিন গেল। এদিকে ভাবনায় চারটে দিন আমার চোখে ঘুম নেই। বল্, ভবেশের ইচ্ছেটা কী? এতকাল পর কেন তোকে ডাকিয়ে পাঠিয়েছে? তোর মাকে খেয়ে তার পেট ভরে নি? এবার কি তোকে খেতে চায়?'

দিদিমা অস্থির, বিচলিত, উত্তেজিত। তাঁকে শান্ত করার জন্য রাজেশ আবার বলল, 'চুপ কর; চুপ কর। এসেছি যখন সবই বলব। কেঁদো না।'

দিদিমার উত্তেজনা, অস্থিরতা বা কান্না কিছুই কমল না। বললেন, 'আগে বল্ তোর সঙ্গে ভবেশ ভালো ব্যবহার করেছে কি না?'

'হ্যাঁ, করেছে।' রাজেশ মাথা নাড়ল।

'সত্যি বলছিস, না আমার মন রাখার জন্যে বাপের দিক টানছিস?'

'সত্যি বলছি দিদিমা, এবার রানীপুর গিয়ে খুব যত্ন পেয়েছি।'

'আমার গা ছুঁয়ে বল্।'

'তোমার গা ছুঁয়েই তো আছি।'

এবার অনেকখানি শান্ত হলেন দিদিমা। কান্নার উচ্ছ্বাসটা কমে এল। কি একটু ভেবে তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'সে মাগীটা এখন কোথায়? ভবেশের কাছে আছে নাকি?'

রাজেশ চমকে উঠল। দিদিমা কার সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিয়েছেন সেটুকু বুঝতে অসুবিধে হল না। ভবেশের দ্বিতীয়া স্ত্রী সম্পর্কে তিনি কৌতূহলী। রাজেশ বলল, 'সব জানতে পারবে। মামাদের আগে আড়ত থেকে আসতে দাও।'

রাজেশের কথা শেষ হল কি হল না, দিদিমা তৎক্ষণাৎ গলা চড়িয়ে ডাকতে শুরু করলেন, 'কালোর মা, ও কালোর মা—'

একটু পরেই দরজার কাছে এক মধ্যবয়সিনীর মুখ ভেসে উঠল। কালোর মা এ সংসারে আশ্রিতা। দরজার সামনে থেকেই সে জানান দিল, 'আমি এসেছি পিসিমা—'

দিদিমা বললেন, 'এক্ষুনি আড়তে গিয়ে দাদাদের ডেকে নিয়ে এস। ডাকামাত্তর যেন চলে আসে। বলবে রানীপুর থেকে রাজু এসেছে।'

কালোর মা দিদিমাকে পিসি বলে। সেই সুবাদে মামারা তার ভাই। আর দাঁড়াল না সে। ঊর্ধ্বশ্বাসে বাজারের দিকে ছুটল।

একটু পরেই মামারা এসে পড়লেন। দিদিমা মামীদের ডাকিয়ে বললেন, 'এই ঘরেই ওদের জায়গা করে দাও। ঢের বেলা হয়ে গেছে। খেতে খেতে রানীপুরের কথা বলবে রাজু।' রাজেশের উদ্দেশে বললেন, 'তুই চান করে এসেছিস?'

রাজেশ বলল, 'না।'

'যা, তাড়াতাড়ি চান সেরে আয়।'

দ্রুত স্নান সেরে এল রাজেশ। তারপর খেতে খেতে রানীপুরের কথা শুরু হল।

রাজেশ লক্ষ্য করল, মামারা উদ্গ্রীব হয়ে আছেন। খাটের ওপর দিদিমা স্তব্ধ মূর্তির মত বসে। বড় মামী ছাড়া বাকি দু-জনের চিবুক পর্যন্ত ঘোমটা টানা। বড় মামী খেতে দিচ্ছেন। মেজ আর ছোট মামী দরজার বাইরে থেকে ভাত-ডাল-মাছ এগিয়ে এগিয়ে দিচ্ছে। রাজেশ দেখল, বড় মামীর

চোখদুটি তার ওপর নিবদ্ধ। ছোট মামী আর মেজ মামীর মুখ যদিও ঘোমটার ভেতর অদৃশ্য তবু অনুভব করা যায়, তাঁরাও উৎকণ্ঠ। রানীপুরের কথা শোনার জন্য সবাই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আছেন।

গত চারদিনে ভবেশ সম্পর্কে যা যা অভিজ্ঞতা হয়েছে, সব-বলে গেল রাজেশ। বোনের মৃত্যুর পর থেকে ভগ্নিপতির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছিলেন মামারা। দশটা বছর তাঁর কী ভাবে কেটেছে সে-সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র স্পৃহা বা কৌতূহল ছিল না মামাদের। রাজেশের মুখে যখন তাঁরা শুনলেন ভবেশ গত দশ বছরে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হয়ে বসেছেন তখন কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে রইলেন। বিস্ময়টা থিতোলে বড় মামা বললেন, 'বলিস কী!'

রাজেশ আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল।

মামারা চুপ করে রইলেন। বোধহয় ভবেশের বড়লোক হবার খবরটার মধ্যে যে চমক আছে সেটা সামলে নিতে সময় লাগছে। অনেকক্ষণ পর বড় মামা আবার শুরু করলেন, 'তা হ্যাঁ রে—'

'কী?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রাজেশ তাকাল।

'এতকাল পর ভবেশ তোর কাছে কী চায়?'

'আমাকে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দিতে চাইছেন। নেবার জন্যে খুব পীড়াপীড়ি করছেন।'

এতক্ষণ এ বাড়ির মুখপাত্র হিসেবে বড় মামাই প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন। এবার সবাই—দিদিমা, তিন মামা এবং মামীরা সমস্বরে সাগ্রহে বলে উঠলেন, 'তাই নাকি?'

অন্যমনস্কের মত রাজেশ বলল, 'হ্যাঁ।'

'তা তুই কী বলেছিস? রাজী হয়েছিস তো?'

'আমি কিছুই বলিনি। সম্পত্তি নেব কি নেব না—ঠিক করতে না পেরে তোমাদের কাছে চলে এসেছি। তোমরা কী বল?'

সবার হয়ে বড় মামা তৎক্ষণাৎ বললেন, 'নিবি বৈকি, নিশ্চয়ই নিবি। একশ'বার নিজের হিসেব বুঝে নিবি।'

রাজেশ লক্ষ্য করে দেখল এ-ঘরের প্রতিটি মানুষ নিঃশব্দে বড় মামার কথায় সায় দিচ্ছেন। একটু ইতস্তত করে রাজেশ বলল, 'কিন্তু—'

'কী!'

'দশ বছর পরে রানীপুর ফিরে ক'টা দিন তো রইলাম। এর মধ্যে একটা ব্যাপার খুব পরিষ্কার করে না হলেও মোটামুটি টের পেয়েছি।'

'সেটা কী?'

'যে সম্পত্তিগুলো বাবা আমাকে দিতে চাইছেন সেগুলো সৎপথে তিনি করেন নি। ওগুলো নেওয়া উচিত—'

বড় মামা এবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। ব্যবসাদার মানুষ। সংসারে মোটাদাগের হিসেবটাই বোঝেন ভাল। রাজেশকে বক্তব্য শেষ করতে না দিয়ে বলে উঠলেন, 'সৎ পথে করুক কি অসৎ পথে করুক তা নিয়ে তোর মাথা ব্যথা কেন? হাজার হোক বাপের সম্পত্তি। মাথা খুঁড়ে মরলেও ও জিনিস কোথায় পাবি!'

রাজেশ এবারও দেখল, ভবেশের সম্পত্তির ব্যাপারে বড় মামার এই ব্যাখ্যা সবার কাছেই সন্তোষজনক হয়েছে। এ সম্বন্ধে কারো কোন আপত্তি নেই।

রাজেশ কি বলতে যাচ্ছিল, খাটের ওপর থেকে দিদিমা হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলেন। সেই দিদিমা যিনি সবলা, ব্যক্তিত্বময়ী, জীবনের সকল যুদ্ধে বিজয়িনী। কান্নাজড়িত দুর্বোধ স্বরে কী যে তিনি বলতে লাগলেন প্রথমটা বুঝতে পারা গেল না। সমস্ত মনোযোগ কানের মধ্যে একাগ্র করতে যেটুকু বোঝা গেল তা এইরকম। 'আমি কী করব গো। মরে যাব, মরে যাব। ও হতভাগী ও কল্যাণী এমন দিনে তুই নেই। ভবেশ যে ভাল হয়ে গেছে গো। আমি কী করব, হে ভগবান কী করব?'

মায়ের জন্য অনেক কেঁদেছেন দিদিমা। সে-সব শোকের কান্না। সেগুলোর পেছনে নিরুপায় অক্ষম যন্ত্রণাই শুধু ছিল। কিন্তু আজকের এই কান্নাটার অন্য স্বাদ, অন্য গন্ধ, অন্য স্পর্শ। সুখের জোয়ারে ভাসতে ভাসতে দিদিমা আজ কাঁদছেন।

দিদিমার কান্নার একটানা বিচিত্র সুর শুনতে শুনতে হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে গেল বড় মামার। তিনি ডাকলেন, 'হ্যাঁ রে রাজু—'

রাজেশ মুখ তুলল, 'কী বলছ?'

'তা সেই মেয়েমানুষটা কোথায়? ভবেশের কাছেই আছে নাকি?'

মেয়েমানুষ অর্থাৎ ভবেশের দ্বিতীয়া স্ত্রী সম্বন্ধে দিদিমাও খানিকটা আগে প্রশ্ন করেছিলেন। রাজেশ লক্ষ্য করল, বড় মামা তাঁর নাম করতেই কান্না থামিয়ে দিদিমা উৎকর্ণ হলেন।

ভবেশের দ্বিতীয়া স্ত্রী সম্বন্ধে মামাদের এবং দিদিমার আক্রোশ বিপুল। তাঁর জন্যই যে রাজেশ ঘরছাড়া হয়ে ভেসে গেছে সেকথা তাঁরা একমুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হতে পারেন না।

রাজেশ বলল, 'কই তাঁকে তো দেখিনি।'

'কোথাও গেছে?'

'জানি না।'

'কিছু শুনিসও নি?'

'উঁহু—' রাজেশ মাথা নাড়ল।

হঠাৎ যেন উৎসাহিত হয়ে উঠলেন বড় মামা, 'তা সে আপদ যে চুলোয় খুশি যাক। এতদিনে ভবেশের মতিগতি যখন ফিরেছে তখন তাড়াতাড়ি সম্পত্তিগুলো নিজের নামে লিখিয়ে নে। কথায় বলে মানুষের মন। এখন দিতে চাইছে; তাড়াতাড়ি না নিলে ফের যদি বিগড়ে যায়! তা ছাড়া সে মেয়েমানুষটা এখন কাছে নেই যে বাগড়া দেবে। লিখিয়ে নেবার এই কিন্তু সুযোগ।'

মামাদের মনোভাবের মধ্যে কোন অস্পষ্টতা নেই। ভাগ্নের পৈতৃক সম্পত্তি পাওয়ার চাইতে সেই মহিলাটিকে নিঃস্ব করার জেদটাই যেন তাঁদের বেশী।

খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। আঁচিয়ে এসে বড় মামা বললেন, 'আজই তুই রানীপুর চলে যা।'

'আজই!' রাজেশ একটু অবাক হল।

'হ্যাঁ।'

'অত তাড়া কিসের?'

বড় মামা এবার রেগে উঠলেন, 'বুঝতে পারছিস না, কিসের তাড়া?'

রাজেশ চুপ করে রইল।

বড় মামা আবার বললেন, 'সারাজীবন ভবেশ তোকে নানাভাবে বঞ্চিত করেছে। এবার যখন তোর ওপর তার মন এসেছে তখন সুযোগটা নষ্ট করিস না।'

সেইদিনই সন্ধ্যার ট্রেনে মামারা রাজেশকে রানীপুর পাঠিয়ে দিলেন

চোদ্দ

মামাদের মনোভাবের মধ্যে কোনরকম জটিলতা ছিল না। তাঁদের হিসেবটা পুরোপুরি মোটা দাগের। সমস্ত জীবন তাঁদের ভাগ্নেটা ভবেশের দিক থেকে শুধু কষ্টই পেয়েছে। এতকাল পর ভবেশের মতিগতি যদি ফিরেই থাকে, ছেলেকে কাছে টেনে নিজের স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় কিছুর উত্তরাধিকার তার হাতে তুলে দিয়ে যদি প্রায়শ্চিত্তই তিনি করতে চান তা হলে পুরনো কথা স্মরণ করে অভিমানে এ সুযোগকে ঠেলে দেওয়া উচিত হবে না।

তা ছাড়া রাজেশের সম্পত্তি পাওয়ার মধ্যে মামাদের গোপন একটা প্রতি-হিংসাও রয়েছে। ভবেশের জন্য তাঁদের একমাত্র বোন তিলে তিলে মারা গেছেন। সে জন্য তাঁদের যত না আক্রোশ তার হাজারগুণ আক্রোশ ভবেশের দ্বিতীয়বার বিবাহে। ভগ্নীপতির এই দ্বিতীয়া স্ত্রীটির জন্যই না বাপের স্নেহ হারিয়ে একেবারে পথের কাঙাল হয়ে গিয়েছিল রাজেশ। ভবেশকে তবু একদিন না একদিন ক্ষমা করতে পারবেন মামারা কিন্তু তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রীটি তাঁদের ক্ষমার অযোগ্য। ভাগ্নে তার বাপের সমস্ত সম্পত্তি পেলে সেই মহিলাটি নিঃস্ব হয়ে রসাতলে গিয়ে ঠেকবে—এতেই মামাদের যত আনন্দ………

চাঁপদানিতে মামাদের সঙ্গে পরামর্শ করে রাজেশ যখন রানীপুর ফিরে এল তখন অনেক রাত। তার ধারণা ছিল সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু লাহাবাবুদের সেই সুবিশাল বাড়িটার ভেতর পা দিয়েই স্তম্ভিত হতে হল। নীচের তলার সুদৃশ্য ড্রইং রুমে একটা সোফায় হেলান দিয়ে আধশোয়ার মত করে বসে আছেন ভবেশ। রাজেশের মনে হল তার জন্যই কি এত রাতে ভবেশ প্রতীক্ষা করছেন ?

ছেলেকে দেখামাত্র সোজা হয়ে বসলেন ভবেশ। হেসে বললেন, 'এত রাত হল যে ? লাস্ট ট্রেনে এলি বুঝি ?'

স্খলিত স্বরে রাজেশ উত্তর দিল, 'হ্যাঁ।'

'আমি অবশ্য ভেবেছিলাম, সন্ধ্যের পরই ফিরে আসবি।'

রাজেশ হতবাক। ভবেশকে জানিয়েই সে চাঁপদানি গিয়েছিল: এমনও ইঙ্গিত দিয়েছিল, চাঁপদানিতে দু-তিন দিন না কাটিয়ে সে ফিরবে না। তবু কি-ভাবে ভবেশ অনুমান করলেন আজ ভোরের ট্রেনে চাঁপদানি গিয়ে তাঁর ছেলে রাতের ট্রেনেই রানীপুর ফিরে আসবে ? বিস্ময় কিছুটা থিতোলে রাজেশ বলল, 'আমার তো আজ ফেরার কথা ছিল না। তবু আপনি বুঝতে পেরে-ছিলেন, আজই আমি ফিরব !'

'তা না হলে এই ড্রইং রুমে বসে বসে অপেক্ষা করছি কেন ?' ভবেশ রহস্যময় একটু হাসলেন। হঠাৎ কি মনে পড়তে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'হ্যাঁরে, খাওয়া দাওয়া নিশ্চয়ই হয় নি তোর—'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ আমি খেয়ে এসেছি।' রাজেশ তাড়াতাড়ি বলে উঠল।

'কখন আবার খেলি ? চাঁপদানি থেকে ক'টার ট্রেন ধরেছিলি ?'

'সন্ধ্যে সাতটার।'

ভবেশ প্রায় জেরা শুরু করলেন, 'তার আগে নিশ্চয়ই খেয়েছিলি ? সেই সন্ধ্যেয় খেয়ে শীতের এত বড় রাতটা কাটানো যায় নাকি ? চল—'

আরো কি বলতে যাচ্ছিলেন তিনি। বাধা দিয়ে রাজেশ বলে উঠল, 'চাঁপদানিতে আমি খাই নি।'

'তবে?'

'চাঁপদানি থেকে কলকাতায় এসেছিলাম। বড় খিদে পেয়ে গিয়েছিল। তাই একটা হোটেলে ঢুকে খেয়ে নিয়েছিলাম।'

'সত্যি বলছিস তো? না কি ভদ্রতা।'

রাজেশ যেন এ বাড়ির ছেলে নয়, সম্মানিত কোন অতিথি। এখানে খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কে তার যেন অনেক সঙ্কোচ আর সেই সঙ্কোচের জন্যই ভবেশের যত অনুযোগ। রাজেশ ঘাড় কাত করে জানাল, সে ঠিকই বলেছে।

এতক্ষণে ভবেশ যেন আশ্বস্ত হলেন। রাজেশ ভেবেছিল, এবার হয়তো শুতে যাবার জন্য দোতলায় উঠবেন তিনি এবং তাকেও ঘুমোতে যেতে বলবেন। কিন্তু তার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। রাজেশকে দেখে সোজা হয়ে উঠে বসেছিলেন। আবার অলস শিথিল ভঙ্গিতে সোফায় দেহটা ছড়িয়ে দিলেন ভবেশ। রাজেশ দাঁড়িয়েই ছিল। মুখোমুখি একটা সোফা দেখিয়ে বললেন, 'বস।'

সেই সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই চাঁপদানি রওনা হয়েছিল রাজেশ। সেখানে কিছুক্ষণ থাকতে না থাকতেই জোর করে মামারা রানীপুর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সমস্তটা দিন একরকম ট্রেনে ট্রেনেই কেটে গেছে। বিছানায় নিজেকে সঁপে দেবার জন্য সমস্ত অস্তিত্ব যেন উন্মুখ হয়ে রয়েছে। কিন্তু ভবেশের ইচ্ছা অন্যরকম।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজেশকে বসতে হল। সম্ভবত ভবেশ তাকে কিছু বলতে চান।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। ভবেশই একসময় শুরু করলেন, 'হ্যাঁ রে রাজু, চাঁপদানির খবর কী?'

রাজেশ উত্তর দিল না। ভবেশ ঠিক কোন খবরটা চাইছেন বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

ভবেশ আবার বললেন, 'তোর মামারা ভাল আছে?'

মাথা নেড়ে রাজেশ জানাল, 'হ্যাঁ।'

'মামীরা?'

'হ্যাঁ।'

'দিদিমা?'

'ঐ একই রকম। চোখে ছানি পড়েছে। বাতে কোমরটা নষ্ট হয়ে গেছে। সারা দিনরাত বিছানায় পড়ে থাকতে হয়।'

'তোর মামাদের ছেলেমেয়েরা কেমন আছে?'

যে ভবেশ চিরদিনই শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে নিস্পৃহ উদাসীন, হঠাৎ তাঁকে সে ব্যাপারে এত বেশী পরিমাণে কৌতূহলী হয়ে উঠতে দেখে রীতিমত অবাক হয়ে গেল রাজেশ। আস্তে আস্তে সে বলল, 'তারাও ভালই আছে।'

একটুক্ষণ কি ভেবে আচমকা প্রশ্ন ছুঁড়লেন ভবেশ, 'হ্যাঁ রে, আমার শালাবাবুরা শেষ পর্যন্ত কী বুদ্ধি দিলে?' বলে বিচিত্র একটু হাসলেন।

শালাবাবু অর্থাৎ মামাদের কথাই যে ভবেশ বলছেন, সে সম্পর্কে অস্পষ্টতা নেই কিন্তু বিস্ময় আছে। সীমাহীন নিদারুণ বিস্ময়। কেননা ছেলের কাছে তার মামাদের সম্বন্ধে 'শালাবাবু' শব্দের ব্যবহার বিচিত্র বৈকি! স্ত্রীর ভাইদের সম্পর্কে বন্ধুবান্ধবের কাছে রসিকতা শাস্ত্র-সম্মত। কিন্তু ছেলের কাছে?

অবশ্য সেই বিখ্যাত প্রবাদটা আছে। কী যেন? 'প্রাপ্তে তু ষোড়শ বর্ষে—' ইত্যাদি ইত্যাদি। আজ যে হঠাৎ মামাদের ব্যাপারে এমন একটা অশাস্ত্রীয় শব্দ উচ্চারণ করে বসলেন ভবেশ—সে কি বয়স্ক, সাত সাগরে-পাড়ি-দিয়ে-ফিরে-আসা, অভিজ্ঞ ছেলেকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করার ভূমিকা? বিমূঢ়ের মত রাজেশ বলল, 'মামারা বুদ্ধি দিয়েছে?'

সামনে-পেছনে মাথা ঝুঁকিয়ে খুব আস্তে সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন ভবেশ, 'হুঁ—'

'কিসের বুদ্ধি?'

'যে জন্যে তুই চাঁপদানি গিয়েছিলি।'

নির্নিমেষ স্থির দৃষ্টিতে বাপের দিকে তাকাল রাজেশ। বলল, 'কী জন্যে গিয়েছিলাম?'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বললেন না ভবেশ। অনেকক্ষণ কি যেন ভেবে একসময় আরম্ভ করলেন, 'আমার বিষয়-আশয় নিবি কি-না সে সম্বন্ধে শালাবাবুদের সঙ্গে পরামর্শ করতে। তাই তো?'

ভবেশ কি অন্তর্যামী? কার মনোজগতে কখন কোন খেলা চলে আগে ভাগেই তিনি টের পেয়ে যান নাকি? রাজেশ তাকিয়েই রইল।

ভবেশ আবার বললেন, 'তা শালাবাবুরা কী পরামর্শ দিলে?'

রাজেশ নিশ্চুপ।

ভবেশ বললেন, 'তুই যখন মুখ খুলবিই না তখন আমিই বলি—'

এবার রাজেশ বলল, 'কী বলবেন?'

'এই তোর মামারা কী বুদ্ধি দিয়েছে?'

'কী বুদ্ধি?'

'তারা বলেছে বিষয় সম্পত্তি সব নিয়ে নিতে। বুদ্ধিমানের কাজই করেছে তারা।'

রাজেশ আবার হতবাক। রানীপুরে বসে সুদূর চাঁপদানিতে কে কী বলল, ঠিক ঠিক জেনে গেছেন ভবেশ। ভবেশ কি ভানুমতীর খেল জানেন? পরমুহূর্তেই রাজেশের খেয়াল হল, এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। আশৈশব ভবেশ তীক্ষ্ণধী। মামাদের চরিত্র তিনি ভালোভাবেই জানেন। তাঁরা পুরোপুরি বৈষয়িক; সংসারে লাভক্ষতির মোটা হিসেব সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান বিপুল। ভাগ্নেকে তাঁরা কী পরামর্শ দিতে পারেন সেটুকু বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় নি ভবেশের।

ভবেশ আবার বলে উঠলেন, 'আরেকটা কথা।'

রাজেশ বলল, 'কী?'

'আমি জানতাম তোর মামারা আজই তোকে রানীপুর পাঠিয়ে দেবে। সেই জন্যেই ড্রইং রুমে বসে তোর জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।'

রাজেশ চুপ। এত রাত পর্যন্ত ভবেশের জেগে থাকার কারণটা এতক্ষণে যেন বোধগম্য হল। ভবেশের কথার পিঠে তার কী বলা উচিত, রাজেশ ভেবে পেল না।

ভবেশ আবার বললেন, 'মামারা তো মত দিয়েছে। এবার নিশ্চয়ই তোর অমত হবে না।'

রাজেশ কিছু বলল না।

ভবেশ বলতে লাগলেন, 'তা হলে বাড়িটাড়িগুলো দু-চারদিনের ভেতরেই তোর নামে করে দেবার ব্যবস্থা করি। কি বলিস?'

রাজেশ যথারীতি নীরব। সম্পত্তি হস্তান্তরের ব্যাপারে চকিতের জন্য এই মুহূর্তে তার চোখের সামনে দোলনের মুখখানা কেন যে ভেসে উঠল, কে বলবে। শুধু কি দোলনই, নতুন পাড়ার সেই রহস্যময়ী প্রৌঢ়াটিও কোন অদৃশ্য থেকে কঠিন ভর্ৎসনাভরা চোখ নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন যেন।

পনের

চাঁপদানি থেকে ফেরার পর দুটো দিন পার হয়ে গেছে। দু-বেলা খাবার সময়টুকু ছাড়া ভবেশের সঙ্গে এর মধ্যে কদাচিৎ দেখা হয়েছে। তিনি এখন

খুবই ব্যস্ত। সম্পত্তি হস্তান্তরের ব্যাপারে সমস্ত দিনের বেশির ভাগ সময়টাই তাঁকে কলকাতায় সলিসিটরদের কাছে কাটাতে হচ্ছে।

অতএব রাজেশের হাতে এখন প্রচুর অবকাশ। খাওয়া-ঘুম-বেড়ানো—এ সব দিয়ে মেপে মেপে সময়ের কতটুকু ভগ্নাংশ আর খরচ করা যায়। অবশ্য দুপুরের পর শীতশেষের রোদ যখন দ্রুত রঙ বদলাতে শুরু করে দেয় সেই সময় দোলনদের বাড়ি একবার করে হানা দিয়েছে রাজেশ।

কিন্তু সেদিনের সেই ব্যাপারটার পর দোলনের মা কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছেন। নিজের অজ্ঞাতে ভবেশ সম্পর্কে একটা কথা তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল। সে জন্য লজ্জার আর শেষ নেই। একেবারে মরমে মরে আছেন তিনি।

রোজ গিয়ে তাঁর কুণ্ঠা ভেঙে দিতে চেয়েছে রাজেশ। পারে নি। এক পক্ষ যদি সর্বক্ষণ সঙ্কুচিত হয়ে থাকেন আরেকজন কতক্ষণই বা আলাপটাকে সচল রাখতে পারে? অতএব কিছুটা সময় একতরফা বকে বেরিয়ে পড়েছে রাজেশ।

চাঁপদানি থেকে ফেরার পর দোলনদের বাড়ি দু-বার গেছে রাজেশ। একবারও দোলনের সঙ্গে দেখা হয় নি। দোলনের মায়ের সস্নেহ হাস্যমুখর সান্নিধ্য অবশ্যই লোভনীয়। কিন্তু দোলনের আকর্ষণ আরো তীব্র। একদা তার জীবন যখন বৃষ্টিবিহীন বৈশাখী দিনের মত রুক্ষ শুষ্ক তৃষ্ণার্ত সেই সময় সজল মেঘের ছায়া নিয়ে এসেছিল দোলন। সেই দোলন অতীতের অবিশ্বাস্য এক রূপকথা যেন। আজকের তরুণী দোলন দূর আকাশের তারা। রাজেশের জীবনের সীমানার মধ্যে কোনদিন কোন ছলেই সে নেমে আসবে না। দোলনদের বাড়ি থেকে বুকের ভেতর অপার শূন্যতা নিয়ে দু-দিন তাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে।

দোলনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে রানীপুরের রাস্তায় দু-দিন অন্যমনস্কের মত ঘুরে বেড়িয়েছে রাজেশ। পশ্চিমপাড়ার সেই রহস্যময়ী প্রৌঢ়াটির কথা তার যে মনে পড়ে নি, এমন নয়। মনে অবশ্যই পড়েছে কিন্তু তাঁর কাছে যেতে ইচ্ছা করে নি।

চাঁপদানি যাবার আগে তিন দিন মহিলাটির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। এই তিন দিনেই তাঁর স্বভাব অনেকখানিই যেন বুঝে ফেলেছে রাজেশ। নিজের রহস্যের কোন দিক থেকেই একটি যবনিকা তিনি তুলবেন না। শুধু পৃথিবীর সমস্ত প্রহেলিকা দিয়ে নিজেকে দুর্জ্ঞেয় করে রাখবেন।

চাঁপদানি থেকে ফেরার পর দুটো দিন কেটে গিয়েছিল। আজ তৃতীয় দিন।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর আজ আর দোলনদের বাড়ি গেল না রাজেশ। একটি বিব্রত কুণ্ঠিত মুখ সে পথ থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রাখল। রাজেশ মনে মনে স্থির করল, আপাতত দিনকয়েক আর দোলনদের বাড়ি যাবে না। ব্যাপারটা দোলনের মাকে ভুলতে দেওয়া উচিত। ভুলে গেলে আবার তিনি সহজ সাবলীল হতে পারবেন।

কোন কালেই দুপুরে ঘুমোনোর অভ্যাস নেই রাজেশের। জাহাজে থাকতে এ-সময়টা ইঞ্জিন রুমেই কেটে যেত তার। ছুটি ছাটায় চাঁপদানি এলেও কি দিনে ঘুমোত ?

সুতরাং আজও তার শোয়া হল না। শীতের রোদে যখন হলুদ রঙ ধরল সেই সময় ভিক্টোরীয় যুগের ক্যাসেলের মত লাহাবাবুদের সুবিশাল বাড়িটা থেকে পায়ে পায়ে বেরিয়ে পড়ল রাজেশ। তারপর হাঁটতে হাঁটতে কখন যে রানীপুরের মাঝখানে বাজার পাড়ায় এসে পড়েছিল, খেয়াল নেই।

দুপুর আর বিকেলের মাঝামাঝি জায়গায় সময়টা এখন থমকানো। এখনই সিনেমা হলে ম্যাটিনী শো আরম্ভ হবে। তার আগে মফঃস্বল শহরের রীতি অনুযায়ী মাইকে চটকদার হিন্দী গান বাজতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই সিনেমা হল দুটোর সামনে ভনভনে মাছির মত একটা ভিড় জমে গেছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ভিড় দেখল রাজেশ। দেখতে দেখতে নিজের অজ্ঞাতসারে বিচিত্র এক আকর্ষণ অনুভব করল। মানুষের স্রোতে মিশে গিয়ে টিকিট কেটে হলে ঢুকে পড়ল সে।

বাঙলা ছবি। হাসি-কান্না-কৌতুক ;ধারাল সংলাপ.নাটক, নায়ক-নায়িকার সাময়িক বিরহ এবং অন্তে মিলন—দর্শকের সব প্রত্যাশাই পূরণ করা হয়েছে। কারো কোন ক্ষোভ বা খেদ থাকার কথা নয়। রাজেশেরও নেই।

তিনটে ঘণ্টা খারাপ কাটল না। তার চাইতে বড় কথা এতখানি সময় অনায়াসে সে নষ্ট করতে পারল।

হল থেকে বেরিয়ে রাজেশ দেখল শীতের সন্ধ্যে নেমে এসেছে। ভিড়ে নিওন আলোর ঝকমকানি আর কোলাহলে বাজারপাড়া সরগরম হয়ে উঠেছে।

রাজেশ অনুভব করল, একটু চা খাওয়া দরকার। এদিক সেদিক তাকাতেই একটা রেস্তোরাঁ চোখে পড়ল। সাইন বোর্ডের দিকে তাকিয়ে কৌতুক-মেশানো খানিকটা বিস্ময়ই অনুভব করল রাজেশ। কলকাতা থেকে পঁচিশ তিরিশ মাইল দূরে মফঃস্বল শহরের এই রেস্তোরাঁটার নাম বাঙলা বা ইংরেজিতে নয়, একেবারে ফরাসীতে। নাম তার 'লা গুর্মে'। কোথায় কার মুখে যেন রাজেশ শুনেছিল, 'ভাঙা ঘরে ঝাড়লণ্ঠন'। এ যেন তা-ই।

নামের মধ্যেই যা চমক। নইলে কি আর! সাধারণ ক'টি টেবিল-চেয়ার এদিকে-সেদিকে সাজানো রয়েছে। এক কোণে উঁচুমতন একটা কাউন্টার। সেখানে ম্যানেজার অথবা মালিক বসে আছে।

চার দেয়ালের চারটে টিউব লাইট থেকে আলোর ঢল নেমেছে। খদ্দেরদের মোটামুটি একটা ভিড় লেগে আছে। এক পা এক পা করে রেস্তোরাঁটার ভেতর ঢুকল রাজেশ এবং এক কোণে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল।

বসার শুধু অপেক্ষা। সঙ্গে সঙ্গে একটা বয় এসে খাবারের অর্ডার নিয়ে গেল।

টেবিলের একধারে সকাল বেলার বাসি একখানা খবরের কাগজ পড়ে ছিল। যতক্ষণ না বয়টা খাবার নিয়ে ফিরে আসে সময় কাটাবার জন্য টেবিল থেকে কাগজখানা তুলে নিল রাজেশ।

ঐ তোলা পর্যন্তই. পড়া আর হল না। প্রায় ঝড় তুলে দলটা রেস্তোরাঁয় এসে ঢুকল। চোখের সামনে থেকে কাগজখানা নামাতেই রাজেশ দেখতে পেল সাত আটটি যুবক আর চার পাঁচটি তরুণী। কি একটা বিষয় নিয়ে তাদের উত্তপ্ত আলোচনা চলছে। রেস্তোরাঁয় ঢুকেও তার জের কাটে নি।

রাজেশ যেখানে বসে ছিল দলটা তার বিপরীত প্রান্তে গিয়ে বসল। বসতে পেয়ে তর্কাতর্কিটা আরো তুমুল হয়ে উঠল। সবাই উত্তেজিত, সবারই স্বরগ্রাম শীর্ষবিন্দুতে।

বয়স্ক অবিবাহিত ছেলেমেয়েরা রানীপুরের সদর দেউড়িতে সবার চোখের ওপর একসঙ্গে বসে অসঙ্কোচে আড্ডা দিচ্ছে। চিৎকার করে আলোচনায় মেতেছে। দশ বছর আগে এমন দৃশ্য অভাবনীয়ই ছিল।

ওদিকে তর্কের ঢেউটা ক্রমশ আরো উত্তাল, আরো প্রবল হচ্ছে। ওদের উত্তেজনা আর চিৎকারের কেন্দ্রে কী আছে, জানবার জন্য কিছুটা কৌতূহল বোধ করল রাজেশ। একদৃষ্টে দূরের জটলাটার দিকে তাকিয়ে রইল সে।

এই মুহূর্তে রোগা লম্বা মতন একটা ছেলে চিৎকার করছে, 'এ হবে না, হবে না। হাই স্কুল থেকে হেডমাস্টার মশায়কে এমন অন্যায়ভাবে চলে যেতে হবে, এ আমরা কিছুতেই সহ্য করব না।'

চশমা চোখে ধারাল চেহারার একটি মেয়ে তৎক্ষণাৎ সায় দিল, 'নিশ্চয়ই, সারদাবাবু তিন বছর হেডমাস্টার হয়ে এসেছেন। এর মধ্যে স্কুলের চেহারাই পাল্টে গেছে। যেখানে স্কুল ফাইন্যাল পর্যন্ত পড়ানো হত সেটাকে হায়ার সেকেণ্ডারি স্ট্যাণ্ডার্ডে তুলেছেন সারদাবাবু। তা ছাড়া সারদাবাবু আসাতে রেজাল্ট কত ভাল হয়েছে। যেখানে ফরটি পার্সেন্টের বেশি পাশ করত না

এখন সেখানে এইট্টি ফাইভ নাইনটি পারসেন্ট উঠেছে। উনি চলে গেলে রানীপুরের দারুণ ক্ষতি হবে।'

আরেকটি ছেলে বলল, 'এ সবই সেক্রেটারি হারানিধি পালের ক্লিক। সারদাবাবু আসার পর থেকে খুবই অসুবিধে হচ্ছে তার। স্কুল-ফাণ্ডের টাকা লুটপাট করা যাচ্ছে না। সেই জন্যেই সারদাবাবুকে সরিয়ে দিয়ে নিজের পেটোয়া একজনকে হেডমাস্টার করতে চাইছে। কিন্তু আমরা কিছুতেই তা হতে দেব না।'

আরো ক'টি ছেলেমেয়ে টেবিল চাপড়ে চেঁচিয়ে সমর্থন জানাল, 'কিছুতেই না, কিছুতেই না।'

স্থানীয় রাজনীতির ব্যাপার। প্রথম প্রথম রাজেশের মনে হয়েছিল, পরস্পর-বিরুদ্ধ কোন ব্যাপার নিয়ে ছেলেমেয়েগুলো তর্কের ঝড় তুলেছে। এখন বোঝা গেল, তা নয়। যে জন্য তাদের এত উত্তেজনা তার মধ্যে দ্বিমতের অবকাশ নেই।

চিৎকার, টেবিল চাপড়ানি আর উত্তেজনা সকৌতুকেই উপভোগ করছিল রাজেশ। ইতিমধ্যে বয়টা খাবারের প্লেট সামনে সাজিয়ে দিয়ে গেছে। রাজেশ খাচ্ছিল ঠিকই কিন্তু তার দৃষ্টিটা ছিল দূর প্রান্তের জটলাটার দিকে। হঠাৎ সে লক্ষ্য করল, সমস্ত জটলাটা একটি মেয়ের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। ওদেরই মধ্যে এক কোণে মেয়েটি বসে আছে। মুখটা ঠিক দেখা যাচ্ছে না। সেটা উল্টো দিকে ফেরানো। হঠাৎ রাজেশের মনে হল, ঐ দলটার সবাই এতক্ষণ চেঁচামেচি করেছে, টেবিল থাপড়েছে। শুধু ঐ মেয়েটি ছাড়া।

এদিকে জটলাটা প্রায় সমস্বরে বলে উঠল, 'এ কি দোলনদি, তুমি তো কিছুই বলছ না?'

দোলন! নামটা কানে আসতেই রাজেশ চকিত হল। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি মুখ ফেরাল। হ্যাঁ দোলনই। কোঁকড়া কোঁকড়া চুলের পটে সেই মুখ, সেই সদ্যফোটা রজনীগন্ধা।

দোলন তার সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল, 'তোমরাই তো বলছ। এর সঙ্গে আমি যদি গলা মেলাই চিৎকারটা আরও একটু জোরদার হয় অবশ্য কিন্তু তাতে লাভ আছে? বরং এই রেস্তোরাঁর মালিকের ক্ষতিই হবে। যে ক'টি খদ্দের বসে আছে তোমাদের চেঁচামেচিতে উঠে তো যাবেই, নতুন যে কেউ ঢুকবে তারও আশা নেই। কখন ঢুকেছ খেয়াল আছে? এতগুলো চেয়ার দখল তো করে রয়েছ, এখন পর্যন্ত এক পয়সার খাবার অর্ডার দিয়েছ?'

জটলাটা এবার যেন অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি একটা

বয়কে ডেকে বলল, 'যা, চটপট বারো কাপ চা নিয়ে আয়।'

দোলন বলল, 'এক ঘণ্টা চেয়ার আটকে রেখে শেষে কি-না এক কাপ করে চা!'

জটলাটা এবার ম্রিয়মাণ হয়ে গেল যেন। তাদের মুখপাত্র হয়ে একজন অবশ্য অভয় দিল, 'আমাদের পকেটগুলোর স্বাস্থ্য তো তুমি ভাল করেই জান। বিলকুল বেকার। চাকরির দরখাস্ত সমানে করে যাচ্ছি। সেই সঙ্গে একখানা করে লটারির টিকিট কাটছি। যে কোন একটা যদি লেগে যায় দু-বেলা সবাই মিলে এসে মেনুতে যা-যা আছে সব খেয়ে যাব।' একটু থেমে মুখখানা কাঁচুমাচু করে আবার বলল, 'যতদিন লটারি বা চাকরিটা না পাচ্ছি ততদিন এক কাপ চায়ের বেশি লোভ করা চলবে না কিন্তু।'

ছেলেটির মুখচোখের চেহারা দেখে সবাই হেসে উঠল।

এদিকে বয়টা চা নিয়ে এসেছে। পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে একটি মেয়ে বলল, 'তারপর দোলনদি, সারদাবাবুর ব্যাপারে তুমি কী বল?'

দোলন বলল, 'আপাতত কিছুই বলি না।'

'আমরা কিন্তু ঠিক করেছি যেমন করে পারি সারদাবাবুকে স্কুলে রাখব।'

'কী ভাবে রাখবে? স্কুল কমিটির আটজন মেম্বারের মধ্যে ছ জনই সারদাবাবুকে সরিয়ে দেবার পক্ষপাতী। এ অবস্থায় তাঁকে কেমন করে রাখা সম্ভব আমি তো বুঝতে পারছি না।'

মেয়েটি এবার উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'কিন্তু ঐ ছ জন মেম্বার তো হারানিধির লোক। শয়তানি করে নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে ওদের কমিটিতে ঢুকিয়েছে। ওরা তো হারানিধি যা বলবে পুতুলের মতন তাতেই ঘাড় নাড়বে।'

'সে তো বুঝলাম।' মেয়েটির মুখে দৃষ্টি রেখে দোলন বলল, 'কিন্তু তুমি আমি বাইরের লোক। কী ভাবে স্কুল কমিটির সিদ্ধান্ত বানচাল করব?'

মেয়েটি এবার বিব্রত বোধ করল। সত্যিই তো, বাইরে থেকে তারা বড় জোর ক্ষিপ্ত হতে পারে, ক্রুদ্ধ হতে পারে। এর বেশি আর কী করা সম্ভব?

মেয়েটি কিছু বলতে পারল না। কিন্তু আরেকটি ছেলে বলে উঠল, 'সেই জন্যেই তো বলছি মুখ বুজে না থেকে তুমি একটা পরামর্শ দাও।'

আরেকটি মেয়ে বলল, 'শুধু পরামর্শ দিলে চলবে নাকি? তোমাকেই সামনে থেকে আমাদের চালাতে হবে। যেভাবে বলবে সে-ভাবেই আমরা চলব।'

দূর প্রান্তে বসে রাজেশ অনুভব করল, এই রানীপুরে যৌবরাজ্যের অধিশ্বরী

হচ্ছে দোলন—দোলনচাঁপা বসু। তার একটি অঙ্গুলি হেলনের জন্য এখানকার সমস্ত যৌবন উন্মুখ হয়ে আছে।

দোলন বলল, 'চল এবার ওঠা যাক। সেই সকালবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। আর দেরী করা উচিত হবে না। গিয়ে মায়ের মুখখানা যা দেখব! চল—চল' বলতে বলতে উঠে পড়ল।

দেখাদেখি অন্য ছেলেমেয়েরাও উঠল। বলল, 'তা হলে সারদাবাবুর ব্যাপারটা কী হবে?'

'একটু ভেবে দেখি।'

কাউন্টারে দাম দিয়ে দলটা বেরিয়ে গেছে। বসে থাকতে থাকতে বিচিত্র এক অস্থিরতা অনুভব করল রাজেশ। দ্রুত উঠে পড়ল সে। যে বয়টা তাকে খাবার দিয়েছে তার হাতে দাম চুকিয়ে তাড়াতাড়ি রাস্তায় এসে নামল।

রাস্তাটা উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত। রাজেশ লক্ষ্য করল দক্ষিণ প্রান্তে রাস্তাটা যেখানে বাঁকের মুখে ঘুরে গেছে দোলন আর তার বাহিনী হাঁটতে হাঁটতে সেইখানে পৌঁছে গেছে।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে রাজেশের সমস্ত চেতনার ওপর অতর্কিতে কি যেন একটা ভর করে বসল। সেটা যে কী, ভাল করে বুঝবার আগেই কিসের একটা স্রোত তাকে ভাসিয়ে নেবার জন্য দুরন্ত গতিতে ছুটে এল। আর সেই টানে বিচিত্র এক ঘোরের মধ্যে দোলনদের দিকে ভেসে চলল রাজেশ।

দলটা আগেই অনেকদূর চলে গিয়েছিল। দক্ষিণ প্রান্তের বাঁক ঘুরে এখন তারা অদৃশ্য হতে শুরু করেছে। জোরে জোরে প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে হাঁটতে লাগল রাজেশ। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাছাকাছি এসে পড়ল সে।

কাছে এসেও সামনে গেল না রাজেশ, এমন কি দোলনকে ডাকল না পর্যন্ত। কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে আগের সেই ঘোরের মধ্যেই দলটাকে অনুসরণ করতে লাগল। রাজেশের ইচ্ছা, অন্য ছেলেমেয়েগুলো যদি দোলনের সঙ্গ ছেড়ে চলে যায় আর দোলনকে যদি একা পাওয়া যায় সে সামনে এগিয়ে আসবে।

ছেলেমেয়েগুলো যে যার বাড়ির কাছে আসতেই একে একে বিদায় নিল। এখন দোলন একা, একেবারে একা।

রেস্তোরাঁতেই রাজেশ শুনে এসেছিল, দোলন এখন বাড়ি চলেছে। এখান থেকে রানীপুরের উত্তর মেরুতে সেই ভাঙা একতলা বাড়িখানা অনেক দূরের পথ। এতখানি রাস্তা দোলনের পাশাপাশি যাওয়া যাবে, ভাবতেই অস্তিত্বের গহন কেন্দ্রে দ্রুতবহ ঝঙ্কার খেলে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই সমস্ত উৎসাহ স্তিমিত

হয়ে এল রাজেশের। দশ বছর পর রানীপুরে ফিরে দোলনের সঙ্গে প্রথম যেদিন দেখা করতে যায় সেদিন কি-রকম অভ্যর্থনা পেয়েছিল, বিদ্যুৎ-চমকের মত সেই কথাটা মনে পড়ে গেল। সুতরাং দোলনকে ডাকতে গিয়েও থমকে গেল সে। ভীরু দ্বিধাগ্রস্তের মত তার পিছু পিছু শুধু হাঁটতেই লাগল।

আজ কী তিথি, কে জানে। ইতিমধ্যে কখন যেন একসময় দূর দিগন্ত থেকে মাথার ওপর গোলাকার একখানা চাঁদ উঠে এসেছে।

জমজমাট বাজার পাড়াটা পেছনে রেখে অনেকদূর চলে এসেছিল রাজেশরা। এ জায়গাটা বেশ নিরিবিলি। ইতস্তত দু-একটা বাড়ি, মাঝে মাঝে মিউনিসিপ্যালিটির লাইট পোস্ট। তবে সব চাইতে যা বেশি করে চোখে পড়ে তা হল দু-পাশে ঝাঁকড়া-মাথা অসংখ্য গাছ। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে জাফরি-কাটা চাঁদের আলো এসে পড়েছে পথের ওপর। মৃদু উত্তুরে বাতাসে গাছগুলো অল্প অল্প কাঁপছিল। আর তারই ফলে পথের ওপর সেই জ্যোৎস্নার টুকরোগুলো দুলছে। মনে হয়, একরাশ রুপোলি মাছ গাছের ছায়ায় খেলে বেড়াচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত প্রাণপণে সবলে দু-হাত দিয়ে যেখানে যত দ্বিধা আর সঙ্কোচ ছিল সরিয়ে ফেলল রাজেশ। কাঁপা শিথিল স্বরে ডেকে উঠল, 'দোলন—'

প্রথমটা খেয়াল করেনি দোলন। দূরমনস্কের মত কী যেন ভাবছিল। কাজেই দ্বিতীয়বার ডাকতে হল। এবার চকিত হয়ে দ্রুত ক্ষিপ্র গতিতে ঘুরে দাঁড়াল সে। ঈষৎ তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, 'কে ?'

বড়মতন ঝুপসি একটা গাছের তলায় রাজেশও দাঁড়িয়ে পড়েছিল। বলল, 'আমি।'

তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সতর্ক ভঙ্গিতে দোলন আবার জিজ্ঞেস করল, 'আমি কে ?'

দোলনের চোখে কেন যে এত তীব্রতা, ভঙ্গিতে কেন এত সতর্কতা—বুঝতে অসুবিধে হল না রাজেশের। গাছের ছায়ায় ছায়ায় আচ্ছন্ন এই নির্জন প্রায়ান্ধকার পথে অতর্কিতে কে তাকে ডাক দিয়েছে তা না বোঝা পর্যন্ত সে নিশ্চিন্ত হতে পারছে না।

গাছতলায় আর দাঁড়িয়ে থাকল না রাজেশ। পায়ে পায়ে সামনে এগিয়ে এসে বলল, 'আমি রাজেশ।'

এতক্ষণে মুখ চোখের রেখাগুলো স্বাভাবিক হল দোলনের। বুকের ভেতর নিঃশ্বাসটা যেন রুদ্ধ হয়ে ছিল। সহজ স্রোতে সেটা বেরিয়ে এল। আস্তে আস্তে দোলন বলল, 'তুমি ! আমি ভেবেছিলাম, কে না কে।'

'খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলে, না?'

কি একটু ভেবে দোলন বলল, 'ভয় বলতে পারি না। তবে চমকে উঠেছিলাম ঠিকই। বুঝতে পারছিলাম না, এই নিরিবিলি পথে কে আমায় ডাকতে পারে!'

কিছুটা প্রগলভ স্বরে রাজেশ এবার বলল, যাই বল, চমকে তুমি ওঠ নি! আসলে ভয়ই পেয়েছিলে। অথচ আমি কিন্তু জেনে ফেলেছি—'

রাজেশের চোখে চোখ রেখে দোলন বলল, 'কী?'

এই রানীপুরে যৌবরাজ্যের তুমি হচ্ছ নেত্রী। সমগ্র শহরটা তোমার ভয়ে থরথর করে কাঁপে। তা ছাড়া তোমার মুখ থেকে একটি কথার শুধু অপেক্ষা। তা হলেই নাকি এখানকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে 'কার আগে প্রাণ কে করিবে দান তার লাগি কাড়াকাড়ি' পড়ে যাবে। আর সেই তুমিই কি-না তুচ্ছ এক মানবের ডাকে ভয় পেয়ে গেলে!'

বেশ নাটকীয়ভাবে বাছা বাছা কিছু শব্দ আর রবীন্দ্রনাথের লাইন দিয়ে সাজিয়ে কথাগুলো বলা গেছে। দোলন কিন্তু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল না। উদাসীন স্বরে বলল, 'এখানকার ছেলেমেয়েরা আমার কথায় প্রাণ দেয়, এ খবর তুমি কার কাছে পেলে?'

'আমার একজোড়া চোখ আর একজোড়া কান আছে, এটা মানো তো? কয়েকদিন মাত্র এখানে এসেছি। এর ভেতরেই তোমার সম্বন্ধে কিছু শুনেছি, কিছু দেখেছি। আর দেখেশুনে—'

দোলন কিছু বলল না। রাজেশের কথাগুলো যে নিছক চাটুকারিতা সেটুকু ধরে নিয়ে চুপ করে রইল। তারপরেই সে শুরু করল, 'তা রাজুদা, তুমি এখানে।'

'এখানে মানে?'

মানে এই নিরালা রাস্তায়—'

কী বললে দোলন খুশী হবে, রাজেশ ভেবে পেল না। রহস্যময় একটু হেসে সে বলল, জগতে কত কিছুই তো হঠাৎই ঘটে যায়। ধরো না হঠাৎই এই নিরালা রাস্তাটায় আমি এসে পড়েছিলাম আর হঠাৎই তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে।'

স্থির নিষ্পলকে তাকিয়ে রইল দোলন। রাজেশের প্রকৃতিস্থতা সম্বন্ধে সে সন্দিহান নাকি? কয়েকটা মুহূর্ত। তারপরেই বলে উঠল, 'আচ্ছা রাজুদা—'

'বল—'

'এখন তুমি কোন দিকে যাবে? আমি কিন্তু আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। সেই সকালবেলা বেরিয়েছি। কয়েক কাপ চা ছাড়া পেটে কিছু পড়ে নি। স্নানও হয় নি। বড্ড টায়ার্ড লাগছে। খিদে-ঘুম—একসঙ্গে দুই-ই পাচ্ছে।' বলতে বলতে দোলন মুখের কাছে হাত নিয়ে হাই তুলল।

সামনেই মিউনিসিপ্যালিটির একটা লাইটপোস্ট। সেখান থেকে আলো এসে পড়েছে দোলনের ওপর। রাজেশ লক্ষ্য করল, দোলনের তেলবর্জিত কোঁকড়া চুলগুলো অযত্নে আর অবহেলায় রুক্ষ, অবিন্যস্ত। মুখে-চোখে-সর্বাঙ্গে ক্লান্তির ছাপ মারা। রাজেশ বলল, 'সারাদিন ছিলে কোথায়?'

'ঐ গ্রামের দিকে একটা কাজে গিয়েছিলাম।' নিস্পৃহ সুরে দোলন বলল, 'এখন চটপট বল, কোন দিকে যাবে?'

'তুমি কোন দিকে যাবে?'

'আমি বাড়ি যাব। তুমি?'

রাজেশ বলল, 'ভালই হল। আমিও বাড়িই ফিরছি। একা একা যেতাম। একসঙ্গে কথা বলতে বলতে যাওয়া যাবে।'

একটুক্ষণ চুপ করে রইল দোলন। তারপর ফস করে বলে বসল, 'আমার সঙ্গে গেলে তোমাকে তো অনেকখানি ঘুরপথে যেতে হবে। শুধু শুধু অত ঘুরতে যাবে কেন? তোমার বাবা লাহাদের যে বাড়িটা কিনেছেন, সেখানেই আছো তো?'

'হ্যাঁ।'

'এক কাজ কর তা হলে।'

বাঁ দিকে সরু একটা পথ দেখিয়ে দোলন বলল, 'এটা ধরে সোজা চলে যাও। চট করে তোমাদের বাড়ি পৌঁছে যেতে পারবে।'

বলামাত্রই রাজেশ গেল না। দোলনের মুখের দিকে তাকিয়ে যেমন ছিল তেমনই দাঁড়িয়ে রইল। শরীরের দূষিত অনাবশ্যক কোন অংশের মত তার সঙ্গ কি দোলনের কাম্য নয়? অনেকক্ষণ পর শিথিল সুরে সে বলল, 'তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার কোন তাড়া নেই আমার।' বলেই তার খেয়াল হল নিতান্ত কাঙালের মতই কথাগুলো বলেছে।

দোলন নিশ্চুপ।

রাজেশ আবার বলে উঠল, 'আমি যদি সঙ্গে যাই তোমার কি ভয়ের কোন কারণ আছে?'

এবার ক্ষিপ্র বেগে ঘাড় ঘুরিয়ে নিষ্পলক স্থির দৃষ্টিতে দোলন তাকাল। তীক্ষ্ণ উগ্র স্বরে বলল, 'ভয়?'

'হ্যাঁ।' রাজেশ মাথা নাড়ল।

'কিসের ভয়?'

'মানে আমি—' একটু থতিয়ে গিয়ে রাজেশ শিথিল স্বরে বলতে লাগল 'আমার সঙ্গে এই রাত্রিবেলা তুমি যাবে। কেউ যদি দেখে ফেলে? কিছু মনে করে?'

'পরনিন্দার ভয়!' গলার স্বরে বিচিত্র খানিকটা বিদ্রূপ মিশিয়ে টেনে টেনে কথা ক'টি উচ্চারণ করল দোলন। যেন লোকলজ্জার অনেক ঊর্ধ্বে কোন দর্পিতা সম্রাজ্ঞী সে। কথা ক'টি বলেই মফঃস্বল শহরের এই শব্দহীন নির্জন রাস্তাটাকে চমকে দিয়ে অতর্কিতে খিলখিল করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতেই সকৌতুকে বলল, 'আমি ভেবেছিলাম আর কিছু বুঝি।'

রাজেশ বিমূঢ়। দশ বছর পর রানীপুর ফিরে দু-বার মাত্র দোলনকে দেখেছে রাজেশ। এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই দোলন তার ব্যক্তিত্ব এবং স্বভাবের যে ছাপ তার মনের ওপর এঁকে দিয়েছে তাতে এমনভাবে তার পক্ষে হেসে ওঠা কিছুটা বিচিত্র বৈকি!

দোলনের হাসি থেমে এসেছিল। দু-হাত আর মাথা যুগপৎ একসঙ্গে নেড়ে আবার সে বলল, 'কে কী বলল, সে সব আমি গ্রাহ্য করি না। তা ছাড়া, কে কোথায় কার সঙ্গে যাচ্ছে, রানীপুরের মানুষের এত সময় নেই সে-সবের খবর রাখে।'

রাজেশ চুপ।

দোলন আবার বলে উঠল, 'আরেকটা কথা রাজুদা—'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল রাজেশ, 'বল।'

নিজের বুকে ডান হাতের তর্জনীটা রেখে দোলন বলল, 'রাত দুপুরেই হোক আর দিন দুপুরেই হোক দোলনচাঁপা বসু যার সঙ্গে যে পথেই হাঁটুক না, রানী-পুরের কারু বুকে এমন সাহস নেই যে কিছু বলে। আসল কথাটা কী জান?'

'কী?'

'রানীপুরের সব মানুষ বিশ্বাস করে দোলন বসে এই মেয়েটা এমন কিছু অন্যায় করবে না যাতে তার মাথা নীচু হয়ে যায়।'

'তা হলে তোমার সঙ্গে যদি যাই আপত্তি কিসের?'

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল না দোলন। একটু কি চিন্তা করে বলল, 'কিছু মনে করো না রাজুদা, তোমাকে একটা রূঢ় কথা বলছি। সেদিন আমাদের বাড়ি যখন গিয়েছিলে তখনই তো স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছি আমাদের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ রাখা উচিত নয়।'

প্রথমটা একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল রাজেশ। তারপর আহত ঝাপসা গলায় বলল, 'তোমার সে কথা আমার মনে আছে দোলন। বাবার জন্যেই তো তুমি আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাও না ?'

এতটুকু দ্বিধা না করে দোলন বলল, 'ঠিক তাই।'

'কিন্তু আমার অপরাধটা কী, বুঝিয়ে দাও। আমি কি কিছু অন্যায় করেছি ?'

রাজেশের স্বরের মধ্যে এমন একটা অদৃশ্য তরঙ্গ ছিল যা স্পর্শ করে। স্পষ্টভাষিণী দোলন থতিয়ে গেল যেন। কিছুক্ষণ পর বিব্রত মুখে সে বলল,

স্পষ্টভাষিণী দোলন থতিয়ে গেল যেন। কিছুক্ষণ পর বিব্রত মুখে সে বলল,

'না-না, তুমি তো রানীপুরে ছিলেই না। অন্যায়ের প্রশ্ন আসছে কিসে ?'

'তবে আমাকে দূরে সরিয়ে দিতে চাও কেন ?'

এ-কথার কোন উত্তর না দিয়ে দোলন তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'রাত হয়ে যাচ্ছে। আর দাঁড়িয়ে থেকে দরকার নেই। আমার সঙ্গেই চল।'

মিউনিসিপ্যালিটির নির্জন রাস্তাটা ধরে দু-জনে পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করল। পথটার যতদূর চোখ যায়, দু-পাশের গাছপালার ফাঁক দিয়ে জাফরি-কাটা চাঁদের আলোর অসংখ্য টুকরো জায়গায় জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে।

দু-জনে চলছে তো চলছেই। চলতে চলতে নিজের মধ্যে নিদারুণ অস্থিরতা অনুভব করল রাজেশ। এতটা পথ তারা পাশাপাশি এল। এখন পর্যন্ত একটা কথাও বলে নি দোলন। এমন কি তার দিকে একবার তাকায় নি পর্যন্ত।

রাজেশের সঙ্গে তার যেন অলিখিত একটা চুক্তি হয়েছে। সঙ্গটুকুই সে শুধু রাজেশকে দেবে। তার বেশি কিছু না।

পশ্চিম পাড়ার কাছাকাছি এসে পড়েছিল দু-জনে। রাজেশ আর পারল না। নিজের অজ্ঞাতসারে, বুঝি বা অবচেতনের অতল থেকে হঠাৎ ডেকে উঠল, 'দোলন—'

দূরমনস্কের মত কি যেন ভাবতে ভাবতে দোলন হেঁটে যাচ্ছিল। ডাকটা কানে যেতেই মুখ ফিরিয়ে সাড়া দিল, 'কী বলছ ?'

'একেবারে মুখ বুজে চলেছ, কিছুই বলছ না!'

'শুধু শুধু আবোল তাবোল বকে কী লাভ ?'

এ-জাতীয় উত্তরের পর কথা বলার উৎসাহ থাকে না। স্বাভাবিক নিয়মেই রাজেশ দমে গেল। অনুভব করল, শুধু তার কাঙালপনার জন্যই নিতান্ত করুণা করে সঙ্গদানে রাজী হয়েছে দোলন। আর কোন কারণে নয়।

অনেকক্ষণ পর ক্ষুব্ধ স্বরে রাজেশ বলল, 'তুমি একেবারে বদলে গেছ দোলন।'

দোলন বলল, 'তবে যে সেদিন বলেছিলে আমার এতটুকু পরিবর্তন হয় নি। হুবহু দশ বছর আগের মতনই আছি।'

'সেদিন তোমার চেহারার কথা বলেছিলাম।'

'আর আজ?'

রাজেশ উত্তর দিল না।

রাজেশের দিকে চোখ রেখে দোলন আবার প্রশ্ন করল, 'আজ কি আমার স্বভাবের কথা বললে রাজুদা?'

রাজেশ নিশ্চুপ।

দোলন এবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, 'মুখ বুজে থাকলে চলবে না রাজুদা। বল, বলতেই হবে।'

রাজেশ এবারও নীরব। তার নীরবতার মধ্যেই উত্তরটা ছিল। দোলন বলল, 'বুঝেছি, আমার স্বভাবের কথাই তুমি বলেছ।' একটু থেমে আবার শুরু করল, 'একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করব রাজুদা।'

এতক্ষণে মুখ খুলল রাজেশ, 'কী?'

'মনে আছে তুমি যখন রানীপুর ছেড়ে চলে গিয়েছিলে তখন আমার কত বয়েস?'

'কত আর, এগার বারো।'

'ঠিকই বলেছ। আচ্ছা, এখন আমার বয়েস কত বল তো।'

একটুও না ভেবে রাজেশ বলল, 'সেদিনের বয়েসটার সঙ্গে আর দশটা বছর যোগ করে দিলেই তোমার এখনকার বয়েস।'

দোলন বলল, 'অর্থাৎ কিনা একুশ বাইশ।'

রাজেশ মাথা নাড়ল, 'তাই তো হওয়া উচিত।'

'সেদিনের সেই বয়েসটাই যার নেই সেদিনের সেই স্বভাবটা তার থাকে কেমন করে? একটা মানুষের জীবনে দশ বছর তো কম কথা নয় রাজুদা।'

'সবই হয়তো বদলে যায়। কিন্তু একটা মানুষের জীবনে তার অতীতের তার ফেলে-আসা দিনের কিছুই কি অবশিষ্ট থাকে না?' কি এক প্রত্যাশা আর ব্যাকুলতায় রাজেশের গলার স্বর কাঁপতে লাগল যেন।

'হয়তো থাকে, হয়তো থাকে না।' নিস্পৃহ স্বরে দোলন বলতে লাগল, 'অন্য মানুষের জীবনে কী হয় বলতে পারব না। তবে আমার জীবনে অতীতের কিছুই নেই।'

এরপর কী বলবে, রাজেশ ভেবে পেল না। দুটো সমান্তরাল রেখার মত, যে রেখা দুটো চিরদিন পাশাপাশি থাকে অথচ মেলে না—তারা হাঁটতে লাগল।

মাথার ওপর চাঁদটা ষোলকলায় বেড়ে উঠেছে। তার স্নিগ্ধ আলো বিচিত্র মায়াবরণের মত রানীপুরের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে।

চলতে চলতে রাজেশ ডাকল, 'দোলন।'

সামনের রাস্তায় দোলনের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। মুখ না ফিরিয়ে মৃদুগলায় সে সাড়া দিল।

'সেদিনের কথা কি সবই ভুলে গেছ?'

'কোন দিনের?'

'সেই দশ বছর আগের।' রাজেশ বলতে লাগল, 'আমার মা মারা যাবার পর আমাদের ছাদের ঘরে চুপচাপ বসে থাকতাম। রোজ এসে টানতে টানতে তুমি আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যেতে। সেদিন তুমি আর তোমার মা ছিলেন বলেই আমি বেঁচে গিয়েছিলাম। মনে পড়ে, মনে পড়ে সে সব কথা?'

দোলন মাথা নাড়ল, 'পড়ে বৈকি। আমার স্মৃতিশক্তিটাকে খুব খারাপ ভাব নাকি?'

'মনে আছে তা হলে।' রাজেশের চোখ মুখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল।

'নিশ্চয়ই আছে।' অত্যন্ত সহজ সুরে দোলন বলতে লাগল, 'তাই বলে মনে করো না যেন পুরনো দিনের সে-সব কথা সব সময় ভেবে ভেবে আমি একেবারে তন্ময় হয়ে আছি। অত স্মৃতিবিলাস আমার নেই। তা ছাড়া সময় কোথায়?'

রাজেশ একেবারে বোবা হয়ে গেল। সেদিনের সেই মেয়েটা কি আশ্চর্য রূঢ়ভাষিণীই না হয়ে গেছে। আহত, ক্ষুব্ধ, সঙ্কুচিত রাজেশ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে এলোমেলো পায়ে হাঁটতে লাগল।

কিছুটা চলার পর দোলন বলল, 'খুব রাগ করেছ না?'

রাজেশ উত্তর দিল না।

দোলন বলতে লাগল, 'আমার স্বভাবটাই যেন কেমন হয়ে গেছে। কিছুতেই গুছিয়ে টুছিয়ে লোকের মনের মতন করে কথা বলতে পারি না।' একটু থেমে কি ভেবে আবার বলল, 'তুমি কিছু মনে করো না রাজুদা।'

রাজেশ বলল, 'না, মনে করবার আর কি আছে!' বলল বটে, তার স্বরে কিংবা চোখমুখের রেখায় ক্ষোভ আর অভিমান গোপন থাকল না।

হাঁটতে হাঁটতে কখন যে দু-জনে তারা পশ্চিম পাড়ার প্রান্তে এসে পড়েছিল, খেয়াল নেই। হঠাৎ সে সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল দোলন। বলল, 'আমরা বাড়ির কাছে এসে পড়েছি।'

এই মুহূর্তে তারা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেটা তিনটে রাস্তার মোড়। একটা পথ গেছে দক্ষিণ-পশ্চিমে, একটা পূর্ব-দক্ষিণে। আরেকটা একবারে পশ্চিম বাহিনী। দক্ষিণ-পশ্চিমের রাস্তাটা দেখিয়ে দোলন বলল, 'এটা ধরে চলে যাও রাজুদা। আমি সোজা যাব।' বলে পা বাড়িয়ে দিল।

রাজেশের হৃৎপিণ্ডে বিচিত্র দোলা লাগল যেন। একরকম দৌড়েই কাছে চলে এল সে। ব্যগ্র স্বরে বলল, 'একটা কথা দোলন—'

দোলন দাঁড়িয়ে পড়ল। রাজেশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আবার কী?' তার চোখে মুখে অপরিসীম বিরক্তি।

'তোমার কাছে একটা অনুমতি চাইছি।'

'অনুমতি!' রীতিমত বিস্ময় বোধ করল দোলন।

'হ্যাঁ —' রাজেশ মাথা নাড়ল।

'কী ব্যাপার বল তো?'

রাজেশ বলল, 'দেখ দোলন, অনেক কাল পর রানীপুরে ফিরেছি। মনে হচ্ছে কিছুদিন এ শহরে আমাকে থাকতে হবে। অথচ যে বাড়িতে আমার থাকতে হচ্ছে সেখানে কথা বলবার মতন একটা লোকও নেই। বাবার কথা যদি ধর, তাঁকে আর কতটুকু সময় বাড়িতে পাওয়া যায়! এখানে আমার আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব, কেউ নেই। আঠার বছর বয়েস পর্যন্ত এ শহরে আমি থেকে গেছি। তুমি তো জান, বাড়ি থেকে আদৌ আমি বেরুতাম না। তাই কারু সঙ্গে বন্ধুত্বও হয় নি। এমন কি সাধারণ পরিচয়টুকুও নয়।'

দোলন এবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, 'অত ভণিতা না করে যা বলবার চটপট বলে ফেল।'

রাজেশ বলতে লাগল, 'রানীপুরে তোমার ছাড়া আমার জানাশোনা আর কেউ নেই। সারাদিন একা একা মুখ বুজে ঘরে বসে থাকতে তো ভাল লাগে না। তোমাদের বাড়ি যদি যেতে চাই নিশ্চয়ই তোমার অনুমতি পাব।'

অকস্মাৎ খুবই গম্ভীর হয়ে গেল দোলন। বলল, 'এটা কি রকম কথা হল রাজুদা?'

'কোনটা?'

'আমার অনুমতির ব্যাপারটা।'

'কেন?'

'তুমি আমার অনুমতির জন্যে বসে আছ নাকি ? মায়ের মুখে শুনি, রোজ দুপুরবেলা একবার করে আমাদের বাড়ি যাচ্ছ। মা তোমার জন্যে দরজা খুলে বসেই আছে। তা আমার কাছে অনুমতি চাইবার ঘটা কেন ?'

রাজেশ থতমত খেয়ে গেল। বলল, 'তোমাদের বাড়ি রোজ যাই, সে সত্যি কথা। কিন্তু ভয়ে ভয়ে যেতে হয়।'

'ভয়ে ভয়ে ?'

'হাঁা। তুমি তো আবার আমার যাওয়া পছন্দ কর না।'

একটু ইতস্তত করল দোলন। কি একটু ভেবে শেষ পর্যন্ত বলল, 'বেশ, এবার থেকে নির্ভয়েই যেও।'

'আরেকটা কথা।'

'বল।'

'তোমাদের বাড়ি যাই। মাসিমার সঙ্গে অবশ্য রোজ দেখা হয় ; তোমাকে কিন্তু একদিনের বেশি বাড়িতে পেলাম না।' কিসের একটা আবেগ রাজেশের উপর ভর করল যেন।

দোলনের চোখের তারা দুটো চকিতের জন্য দপদপিয়ে উঠল যেন। কয়েকটা মাত্র মুহূর্ত। তারপরেই আশ্চর্য শান্তভাবে সে বলল, 'কথা বলার জন্যে একজন লোক দরকার। মা-ই তো আছে। আবার আমাকে কেন ? আমার সঙ্গে দেখা হলে তোমার লাভ হত না।'

রাজেশ বলল, 'হত কি না হত কেমন করে তা বোঝাব ? জীবনের সব লাভ-লোকসান কি অঙ্ক কষে বুঝতে পারা যায় না বোঝানো যায়।'

দোলন উত্তর দিল না।

রাজেশ আবার বলল, 'তোমাকে আর আটকে রাখব না। আবার কবে দেখা হচ্ছে বল।'

'বললামই তো, আমার সঙ্গে দেখা হয়ে তোমার কোন লাভ নেই।' দোলন বলতে লাগল, 'খুব সম্ভব তোমার জীবনের পথ আর আমার পথ একেবারে আলাদা। দু-জনের দেখা হলে শুধু শুধু কিছু জটিলতাই বাড়বে। দেখা হলে দুঃখ আর আঘাত ছাড়া তোমাকে কিছুই দিতে পারব না।'

রাজেশ হাসল, 'একদিন ছাদের ঘর থেকে তুমি আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে বাঁচিয়েছিলে। আজ দেখি না কতখানি আঘাত আর দুঃখ তুমি দিতে পার। একদিন যে হাত দিয়ে আনন্দ বিলিয়েছিলে আজ না হয় সেই হাতের দুঃখই নেব। আমার ভয় নেই।'

বিদ্রূপে ঠোঁট দুটি বুঝি বেঁকেই গেল দোলনের। শব্দহীন বিচিত্র একটু

হেসে সে বলল, 'সে দুঃখ সহ্য করার শক্তি তোমার আছে তো রাজুদা? না কি—'

'এখন কেমন করে বলি। আগে দুঃখটা তো আসুক।'

'বেশ, তাহলে শিগ্‌গিরই একদিন দেখা হয়ে যাবে।'

বাড়ি ফিরে রাজেশ দেখল, ভবেশ এখনও ফেরেন নি। আচ্ছন্নতার মধ্যে সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে দোতলায় নিজের ঘরে চলে এল সে। ঘরটা অন্ধকার। চাকর বাকরেরা কেউ আলো জেলে যায় নি। রাজেশও জ্বালল না। পায়ের জুতোটা কোনরকমে খুলে একপাশে ফেলে রেখে বিছানায় নিজেকে ছুঁড়ে দিল।

শিয়রের দিকের জানালাটা খোলা। সে-দিকে দৃষ্টিটাকে মেলে দিয়ে দূরমনস্কের মত আজকের সারাদিনের ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করতে শুরু করল রাজেশ। সব ঘটনা ঠিক নয়, বার বার দোলনের মুখটাই মনে পড়ছে তার।

দোলন তার প্রতি এমন বিরূপ কেন? বিরূপ বললে সঠিক বলা হয় না। শত্রুর প্রতি মানুষ যেমন বিদ্বেষ পোষণ করে রাজেশ সম্পর্কে দোলনের মনোভাব যেন তা-ই। কিংবা তার চাইতে বেশীই। কিন্তু কেন?

একটা কারণ অবশ্য জানা গেছে। কৌশলে প্রতারণা করে ভবেশ নাকি দোলনদের বাড়িটা আত্মসাৎ করেছেন। যদি করেই থাকেন সেই পাপে রাজেশের ভাগ কতটুকু? ভবেশের প্রতারণা ছাড়া দোলনের বিদ্বেষের পেছনে অন্য কোন কারণ আছে কি-না অবশ্য রাজেশ জানে না। রানীপুরে যদি থাকা হয় সেই কারণটা জানতে চেষ্টা করবে সে।

দোলনের কথা ভাবতে গিয়ে ভাবনাটা হঠাৎ নিজের দিকে ঘুরে গেল। নিজের একটা আচরণের কথা ভাবতে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল রাজেশ। অপরিসীম এক বিস্ময় আর লজ্জাবোধ তাকে ছেয়ে ফেলল যেন। প্রথম দিনই দোলন দ্বিধাহীন স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিয়েছিল রাজেশ তাদের কাছে যাক, এটা কাম্য নয়। যে মানুষের ব্যক্তিত্ব আছে, আত্মমর্যাদা আছে তার পক্ষে ঐটুকুই যথেষ্ট। চিরদিনের জন্য তার কাছে দোলনদের বাড়িটা নিষিদ্ধ দেশ হয়ে থাকার কথা। কিন্তু নিজের ব্যক্তিত্ব আর সম্মানবোধ দু পায়ে ঠেলে দিয়ে দোলনদের বাড়ি গেছে রাজেশ। শুধু কি তা-ই, বাজার-পাড়ায় আজ তাকে দেখার পর সম্মোহিতের মত তার পিছু নিয়েছে। তাতেও সন্তুষ্ট থাকে নি। দোলনের সামান্য একটু সঙ্গলাভের জন্য কী না করেছে সে! এখন এই নির্জন অন্ধকার ঘরে স্নায়ুগুলো যখন সম্পূর্ণ নিজের বশে সেই কথা ভেবে তার মাথা কাটা যেতে লাগল।

দোলনের কাছে কেন তার এই বিচারহীন মূঢ় আত্মসমর্পণ? কেন এই দীন কাঙালপনা? কেন? কেন? নিজের কাছেই স্পষ্ট একটা জবাব চেয়ে বসল রাজেশ। কিন্তু কোন সদুত্তর পাবার আগেই ঘরের ওপর কার যেন দীর্ঘ ছায়া পড়ল। সেই সঙ্গে মৃদু গলার ডাক শোনা গেল, 'ছোটবাবু—'

'কে?' চকিত রাজেশ ধড়মড় করে উঠে বসল। দেখল দরজার কাছে একটি লোক দাঁড়িয়ে।

লোকটা বলল, 'আমি ভোলা।'

বিছানা থেকে উঠে গিয়ে বোতাম টিপে আলো জ্বালাল রাজেশ। এবার বোঝা গেল, লোকটা মধ্যবয়সী। মুখময় দাঁড়িগোঁফের অর্ধেকই প্রায় পাকা; মাথার চুলও তাই। মাঝারি মাপের চেহারা। এতখানি বয়স হয়েছে, বাঁধুনি বিন্দুমাত্র শিথিল হয় নি। দেহটি বেশ অটুটই আছে। পরনে খাটো ধুতি আর ফতুয়া।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল রাজেশ। লোকটিকে আগে আর কোথাও দেখেছে বলে মনে করতে পারল না। হাতের ইঙ্গিতে তাকে ভেতরে আসতে নির্দেশ দিল। লোকটা ভেতরে এলে রাজেশ বলল, 'তোমাকে তো চিনতে পারলাম না।'

'আজ্ঞে, আমি এ-বাড়িতে কাজ করি।'

'কাজ কর? কই তোমাকে তো আগে দেখিনি।'

'আজ্ঞে আমি বাগানের কাজ করি। বাড়ির ভেতর আসার দরকার হয় না। তা-ই হয়তো নজর করেন নি।'

'আমার কাছে তোমার কিছু দরকার আছে?'

একটু ইতস্তত করে লোকটি বলল, 'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

'কী দরকার?'

'আজ্ঞে আপনাকে একবার নতুন পাড়ায় যেতে হবে।'

রীতিমত অবাকই হয়ে গেল রাজেশ। সবিস্ময়ে বলল, 'কেন। সেখানে কী?'

'আজ্ঞে, মা ঠাকরুণ আপনাকে অবিশ্যি করে যেতে বলে দিয়েছে।'

রহস্যটা পরিষ্কার হল না। রাজেশ বলল, 'কোন মা ঠাকরুণের কথা বলছ তুমি?'

'ঐ যে একতলা বাড়ি। আপনি একদিন গেছলেন তো।'

এতক্ষণে বুঝতে পারা গেল। দোলনদের ফুলবাগানে যাঁকে দেখেছিল সেই বর্ষীয়সী রহস্যময়ী। সঙ্গে সঙ্গে আরো একটি কথা মনে পড়ল। মহিলা এই লোকটি অর্থাৎ ভোলার নামও যেন বলেছিলেন। এরই সূত্রে এ বাড়ির

অনেক খবর তিনি সংগ্রহ করে থাকেন। সেদিন মনে মনে ঠিক করেছিল, বাড়ি ফিরে ভোলার খোঁজ করবে। বাড়ি ফেরার পর এমন সব ব্যাপার ঘটেছিল যাতে ভোলাকে খোঁজার কথা আর মনে ছিল না।

রাজেশ বলল, 'কবে যেতে বলেছেন ?'

ভোলা বলল, 'আজই। সেই বিকেল থেকে আপনাকে অনেকবার খুঁজে গেছি। পাই নি।'

'আমি একটু বেরিয়েছিলাম। কিন্তু আজ তো অনেক রাত হয়ে গেল। তা ছাড়া শরীরটাও খুব ভাল লাগছে না।'

ভোলা তৎক্ষণাৎ বলল, 'তা হলে কালই যাবেন। সকালবেলা যাবেন। অতি অবিশ্যি যাবেন কিন্তুন।'

'কী জন্যে আমাকে যেতে বলেছেন, তুমি কিছু জান ?'

'আজ্ঞে আমি কেমন করে জানব ?'

ভোলা যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে, হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে গেল রাজেশের। ব্যস্তভাবে তাকে ডাকল সে, 'এই শোন।' ভোলা ফিরে দাঁড়াতেই রাজেশ আবার বলল, 'কাছে এস।'

নির্দেশমত ভোলা কাছে এল।

সামনের একটা সোফা দেখিয়ে তার উদ্দেশে রাজেশ এবার বলল, 'ঐখানটায় বোসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

ভোলা বসল না। উৎকণ্ঠ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রাজেশের দিকে তাকিয়ে সে দাঁড়িয়েই রইল।

কি ভেবে রাজেশ বলে উঠল, 'এ বাড়িতে তুমি মালীর কাজ কর তো ?'

'আজ্ঞে হাঁ।' ভোলা মাথা নাড়ল।

'কত দিন কাজ করছ ?'

'আট ন' বছর।'

'এ বাড়িটা তো মোটে বছর পাঁচেক কেনা হয়েছে। আট ন' বছর কাজ করছ কি রকম ?'

ভোলা বলল, 'আজ্ঞে এ বাড়ি কেনার আগে বড় বাবু রানীপুরের দক্ষিণ দিকে আরেকটা বাড়িতে থাকতেন। আমি সেখানেও কাজ করেছি।'

রাজেশ বলল, 'আট ন' বছর যখন কাজ করছ তখন এ-বাড়ির লোকের মতনই হয়ে গেছ। না কি বল ?'

ভোলা মাথা নাড়ল।

রাজেশ আবার বলল, 'একটা খবর নিশ্চয়ই তোমার কাছে জানা যাবে—'

ভোলা একদৃষ্টে তাকিয়েই ছিল। তার চোখ দুটি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। মুখে অবশ্য কিছু বলল না সে।

রাজেশ বলতে লাগল, 'তুমি কি জানো, তোমার বড় বাবুর দুই বিয়ে?'

ভোলা চমকে উঠল। তারপরে অতি সন্তর্পণে ফিস ফিসিয়ে বলল, 'আজ্ঞে লোকের মুখে শুনেছি।'

রাজেশের খেয়াল রইল না, কার কাছে কী বলছে। বিচিত্র ঘোরের মধ্যে সে বলে যেতে লাগল, 'তোমার বড় বাবু প্রথমবার যাঁকে বিয়ে করেছিলেন তিনি আমার মা।'

'আমি জানি। তিনি স্বর্গে গেছেন।'

'জানো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল রাজেশ। তারপর খুব আস্তে আস্তে বলল, 'কিন্তু ভোলা, একটা খবর আমি জানি না।'

ভোলা জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

'আমার মা মারা যাবার পর তোমাদের বড় বাবু যাঁকে বিয়ে করেছিলেন তাঁকে আমি দেখিনি। এতদিন যখন এখানে কাজ করছ নিশ্চয়ই তুমি তাঁকে দেখেছ?'

ভোলা হকচকিয়ে গেল কিন্তু কিছু বলল না।

রাজেশ অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। হঠাৎ ধমক দিয়ে বলল, 'একেবারে বোবা হয়ে গেলে যে। আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না?'

ভয়ে ভয়ে ভোলা আবার বলল, 'আমায় ঐ সব কথা জিজ্ঞেস করবেন না ছোট বাবু।'

'কেন?'

'আমি চাকর-বাকর মানুষ।'

খানিকটা অবাকই হল রাজেশ। বলল, 'চাকর-বাকর বলে হয়েছে কী? জবাব দিতে তোমার এত ভয়টা কিসের? গর্দান যাবে নাকি?'

'আজ্ঞে তা নয়। আমরা চাকর-বাকর। আমাদের মতন লোকের মনিবের সব কথায় কি থাকতে আছে বাবু?'

রাজেশ বুঝল, ভোলার কাছ থেকে ভবেশের দ্বিতীয়া স্ত্রী সম্বন্ধে কোন খবর পাবার আশা নিতান্তই দুরাশা। তার সমস্ত উৎসাহটাই কেমন যেন স্তিমিত হয়ে এল। রানীপুরে আসার পর থেকে সেই মহিলাটিকে খুঁজে বার করার জন্য সে না করেছে কী। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে সামান্য একটু তথ্যও সে

সংগ্রহ করতে পারে নি। রাজেশের সমস্ত উদ্যম বার বার ব্যর্থ হয়ে গেছে।

একটু চুপ করে রইল রাজেশ। হঠাৎ নতুন পাড়ার সেই মহিলাটির কথা মনে পড়ে গেল তার। ডাকল, 'আচ্ছা ভোলা—'

ভোলা যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল। তৎক্ষণাৎ সাড়া দিয়ে বলল, 'আজ্ঞে ছোট বাবু—'

'নতুন পাড়ার ঐ মহিলাটিকে কত বছর ধরে তুমি চেন?'

এক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে রাজেশের দিকে তাকিয়ে রইল ভোলা। তারপর বলল, 'যেদিন থেকে বড় বাবুর কাছে কাজে লেগেছি সেদিন থেকেই চিনি।'

একটু ইতস্তত করে রাজেশ বলল, 'উনি কে, জানো?'

ভোলা বলল, 'আপনি যদি আমার অপরাধ না ধরেন একটা কথা কইব।'

'কী কথা?'

এবার ভোলা ভয়ে ভয়ে বলল, 'আপনি তো ওঁয়ার কাছে দু-দিন গেছেন। আরো যাবেন। নিজেই একটু কষ্ট করে ওঁয়ার পরিচয়টা জিজ্ঞেস করে নেবেন।'

দোলন, তার মা কিংবা ভোলা—সেই রহস্যময়ী প্রৌঢ়াটির পরিচয় রাজেশ যাকেই জিজ্ঞেস করেছে, সবাই এক উত্তর দিয়েছে। কেন এই লুকোচুরি, সে বুঝে উঠতে পারে না।

উত্তেজিত হয়ে উঠল রাজেশ, 'আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করব না। তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, উত্তর দাও। বল, উনি কে?'

ভোলা নিশ্চুপ। তার এই নীরবতা রাজেশকে ক্ষিপ্ত করে তুলল। সে বলল, 'মুখ বুজে থাকলে চলবে না। বল—'

ভোলা তবু নিরুত্তর। রাজেশ আরো উত্তেজিত হয়ে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'পরিচয় বলবে না, বুঝতে পারছি। কেন বলবে না? কেন?'

ভোলা যেন প্রতিজ্ঞা করেই মুখ বন্ধ করেছে, রাজেশর কথার উত্তর দেবে না।

ভোলা চুপ করে থাকার জন্য তো বটেই কারো কাছে ভদ্রমহিলার পরিচয় জানতে পারে নি, সে জন্যও রাজেশের সমস্ত ব্যর্থতা এই মুহূর্তে একটা আক্রোশের রূপ নিল। তার সবটুকু রাগ গিয়ে পড়ল ভোলার ওপর। হঠাৎ এক কাণ্ডই করে বসল সে। লাফ দিয়ে ভোলার কাছে গিয়ে ফতুয়াসুদ্ধ তার গলার কাছটা চেপে ধরল। বলল, 'পরিচয় লুকিয়ে রাখবে? কেন? বল, তোমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কী?'

ভোলা রীতিমত ভয় পেয়ে গেল। অবরুদ্ধ স্বরে সে গুঙিয়ে উঠল, 'কোন সম্পর্ক নেই ছোটবাবু।'

রাজেশের রানীপুর আসা প্রসঙ্গে কথায় কথায় সেই রহস্যময়ী একদিন জানিয়েছিলেন, ভোলা নামে একটি চাকরের মারফত এ খবর তিনি আগেই পেয়েছেন। মনে পড়ামাত্র রাজেশের আক্রোশ দপ্ করে উঠল যেন। সে বলল, 'নিশ্চয়ই আছে, হাজার বার আছে। আমি জানি এ বাড়িতে কে কী করছে, কী বলছে—সমস্ত খবর তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁর কাছে দিয়ে থাকো। দাও কি না?' ভোলা সন্ত্রস্ত। অস্ফুট ভীত স্বরে সে বলল, 'আজ্ঞে দিই।'

একটা লোক এ বাড়িতে চাকরি করে বলে বাইরের কারো সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারবে না—এমন কোন কথা নেই। শুধু দেখতে হবে, কাজে ফাঁকি দিচ্ছে কি-না। দ্বিতীয়ত এখানকার কথা বাইরে বলার জন্য কোন ক্ষতি হচ্ছে কি-না।

কাজে ফাঁকি দিক, ক্ষতি হোক—সে সব ব্যাপার বুঝবেন ভবেশ। কিন্তু এই মুহূর্তে রাজেশ যে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে সেটা সম্পূর্ণ অন্য কারণে। রাগটা এখানে যুক্তির হাত ধরে আসে নি। যাই হোক সে বলল, 'তুমি একটা গুপ্তচর। এ বাড়ির খবর বাইরের লোককে জানিয়ে তলায় তলায় ক্ষতি করে যাচ্ছ। তোমাকে আমি পুলিশে দেব।'

হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ভোলা, 'বিশ্বাস করুন ছোট বাবু, এ বাড়ির কোন রকম ক্ষতি হয়, প্রাণ গেলেও আমি তা করব না। পুলিশে আপনি দিতে চান, দিন। তবে একটা কথা বলি, আট ন' বছর এখানে চাকরি করছি। কোনো দিন ভাল ছাড়া এ বাড়ির খারাপ চিন্তা করিনি।'

বোঝা যায়, ভোলার কথাগুলোর মধ্যে কপটতা নেই। একটুক্ষণ চুপ করে রইল রাজেশ। তখনই আরেকটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার। রহস্যময়ীর মুখেই শুনেছিল, সে যেদিন রানীপুর আসে সেদিন তিনি স্টেশনে গিয়েছিলেন। কিন্তু ভবেশ যেহেতু সেখানে উপস্থিত ছিলেন তিনি কাছে এগিয়ে আসেন নি। আভাসে-ইঙ্গিতে এটুকু রাজেশ বুঝেছে, ভবেশের সঙ্গে রহস্যময়ীর সম্পর্ক আর যাই হোক, খুব প্রীতিকর নয়। রাজেশ বলে উঠল, 'তুমি নিশ্চয়ই জানো, ঐ মহিলাটি এ-বাড়ির শত্রুপক্ষ। এখানে চাকরি করে ওর সঙ্গে সম্পর্ক রাখছ কি-রকম?'

'শত্তুর! ছি-ছি, কি বলছেন আপনি ছোটবাবু!' ভোলার চোখেমুখে ব্যথিত বিস্ময়ের ছায়া পড়ল। ঝাপসা করুণ গলায় সে বলতে লাগল, 'ঐ মানুষটাকে যদি একটু বুঝতেন!'

সাগ্রহে রাজেশ বলল, 'জানতেই তো চাই ওঁকে। বুঝতেও চাই। তুমি তো বলছ, উনি আমাদের শত্রুপক্ষ নন। তবে কী?'

'জগতে ওঁনার মতন কেউ আপনাদের ভালবাসে না।' এ-বাড়ির কিসে হিত হবে, সব সময় এই তেনার চিন্তা।'

রাজেশ বলল, 'এতবড় একটা হিতাকাঙ্ক্ষী আছে আমাদের। অথচ তিনি কে, কী তাঁর নাম—সেটুকুই এখনও জেনে উঠতে পারলাম না। জানা উচিত কি না, তুমিই বল।'

রাজেশ একটা কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিল। ভেবেছিল, বিরুদ্ধপক্ষের উকিলের মত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জেরা করে শেষ পর্যন্ত রহস্যময়ী মহিলাটির পরিচয় জেনে নেবে। কৌশলটা বিফলেই গেল। ভোলা উত্তর দিল না।

ষোল

নতুন পাড়ার রহস্যময়ী ডেকে পাঠিয়েছেন। কাল রাত্তিরে ভোলা সে খবরটা জানাতেই রাজেশ মনে মনে স্থির করে ফেলেছিল, আজ সকালে ঘুম ভাঙার পর যাবে। কিন্তু যাওয়াটা শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠল না।

দশ বছর পর প্রথম যেদিন রানীপুর এল রাজেশ সেদিন থেকেই দেখে আসছে প্রতিটি নিশিই ভবেশ বাইরে পালন করেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! এতদিনের নিয়মটা ভঙ্গ করে কাল বাড়িতেই ছিলেন ভবেশ এবং সকাল বেলা রাজেশ যখন নতুন পাড়ায় যাবার জন্য তৈরী হচ্ছে ঠিক সেই সময় তার ঘরে এসে ঢুকলেন। রাজেশের তখন প্যান্ট-জামা পরা হয়ে গেছে। জুতোও পরে ফেলেছে, শুধু ফিতেটা বাঁধা বাকি।

চকিত দৃষ্টিক্ষেপে ছেলের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার জরীপ করে একটু উদ্বিগ্ন স্বরেই ভবেশ বললেন, 'কোথাও বেরুচ্ছিস নাকি ?'

রাজেশ বলল, 'হ্যাঁ।'

'কোথায় ?'

'নতুন পাড়ার দিকে।' কথাটা আদৌ মিথ্যে নয়। নতুন পাড়াতেই যাচ্ছে রাজেশ। তবে ইচ্ছে করেই যার কাছে যাচ্ছে তার কথাটা বলল না।

'কিন্তু এখন তো তোর বেরুনো হবে না।'

'কেন ?' জিজ্ঞাসু চোখে রাজেশ তাকাল।

ভবেশ বললেন, 'আমার সঙ্গে এখুনি তোকে একবার বেরুতে হবে যে।' কি যেন একটু চিন্তা করে বললেন, 'এক কাজ কর। তাড়াতাড়ি স্নানটাই সেরে নে। কখন ফিরতে পারব তার তো কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই। স্নানটা সারা থাকলে বাইরে যেখানে হোক খেয়ে নেওয়া যাবে।'

রাজেশ বলল, 'কোথায় যেতে হবে আপনার সঙ্গে ?'

'আপাতত কলকাতায় যাব। সেখান থেকে সলিসিটরকে নিয়ে সদরে—'

'আমি না গেলে হয় না ?'

'না-না, তা কি করে হবে!' ভবেশ ব্যস্তভাবে বললেন, 'আজ দলিলগুলো রেজিস্ট্রি করব। সলিসিটরের সঙ্গে কথা হয়ে আছে, তিনি অপেক্ষা করবেন। তা ছাড়া রানীপুরের তিনজন গণ্যমান্য ভদ্রলোককে বলে রেখেছি। সাক্ষী হবার জন্যে তাঁরাও সদরে যাবেন। এ অবস্থায় তোর না গেলে কখনও চলে!'

কিছুটা বিস্ময়ই বোধ করল রাজেশ। বলল, 'দলিল রেজিস্ট্রি করবেন! কিসের দলিল ?'

'এত কাণ্ডের পর এখন জিজ্ঞেস করছিস, কিসের দলিল।' ক্ষুব্ধ স্বরে ভবেশ বলতে লাগলেন, 'দশ বছর পর তোকে যে ফিরিয়ে আনলাম, সে কিসের জন্যে? আমার যা কিছু সব তোর হাতে তুলে দেব বলেই না? শুধু মুখের কথাতেই না, আইনসম্মতভাবে ভাল সাক্ষী রেখে সেগুলো আমি তোকে দিতে চাই। পঞ্জিকা দেখেছি, আজকের দিনটা খুবই শুভ।'

এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা বোধগম্য হল। ভবেশের সব কিছু উত্তরাধিকার আজ রাজেশের হাতে এসে পড়বে। এতদিন প্রস্তুতি চলছিল। আজ শুধু অনুষ্ঠান। আজই যে অনুষ্ঠানের দিন স্থির হয়েছে সে কথাটা রাজেশ জানত না। সে বলল, 'এত তাড়াতাড়ির কি ছিল!'

ভবেশ সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে বললেন, 'একটা শুভকাজ করতে বেরিয়েছি; এ-সময় এসব কথা মুখে আনিস না রাজু। যত তাড়াতাড়ি হয় তোকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে আমি মুক্ত হতে চাই বাবা।'

অগত্যা নির্দেশ মত স্নান চুকিয়ে কিছু খেয়ে ভবেশের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল রাজেশ। যেতে যেতে ভাবল, তাড়াতাড়ি সদর থেকে ফিরতে পারলে নতুন পাড়ায় যাবে।

কলকাতা থেকে সলিসিটরকে সঙ্গে নিয়ে সদরে ফিরতে দুপুর হয়ে গেল। সুতরাং দুপুরের খাওয়াটা এখানকারই একটা হোটেলে সেরে নিতে হল। আর খাওয়ার পর্ব সবেমাত্র শেষ হয়েছে, সেই সময় সাক্ষীরা এসে পড়লেন।

তিনজন সাক্ষী। রানীপুরের তিনটি বিশিষ্ট ভদ্রলোক। ভবেশ একে একে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনজনের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তাঁর নাম যোগদাবাবু—যোগদারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। বয়স ষাট পেরিয়েছে। কিন্তু চেহারার কোথাও তার ছাপ পড়ে নি। অটুট স্বাস্থ্য। মেরুদণ্ডটা

খজুরেখায় সোজা ওপর দিকে উঠে গেছে। কজীর চওড়া হাড়, শক্ত চোয়াল আর প্রশস্ত কপাল যেন তাঁর বলশালিতার প্রতীক।

এককালে এ অঞ্চলের নাম-করা মোক্তার ছিলেন যোগদাবাবু। শুধু খ্যাতিই না, মোক্তারির সূত্রে প্রচুর অর্থও উপার্জন করেছেন। ইদানীং কয়েক বছর অর্থ সম্বন্ধে নাকি বিতৃষ্ণা এসেছে। বীতরাগ যোগদাবাবু কোর্ট-কাচারি বর্জন করে জনসেবায় নেমেছেন। বর্তমানে রানীপুর মিউনিসিপ্যালিটির তিনি চেয়ারম্যান।

তিনজনের মধ্যে বয়সে যিনি দ্বিতীয় তিনি নিশানাথ সাহা। নামের সঙ্গে চেহারার মিল এ জগতে বড়ই দুর্লভ। নিশানাথ কিন্তু সার্থকনামা।

এ দেশের মানুষ কালো। এ কথা যদি মানতে হয় তা হলে নিশানাথও কালো। সে জন্যে লজ্জার কিছু নেই। কিন্তু নিশানাথ কি যেমন তেমন কালো! তিনি কালোমাণিক। লোকে উপমা দিয়ে বলে, কয়লার মত কালো। সেটা কথার কথা। এ দেশের মানুষ সত্যিই কিছু কয়লা-বরণ নয়। কিন্তু নিশানাথ সম্বন্ধে এর চাইতে যোগ্যতর উপমা আর হয় না।

নিশানাথ কালো। সে কালোর আবার বাহার কত। বার্নিশ-করা কাঠ থেকে আলো যেমন ঠিকরে পড়ে নিশানাথের শরীর থেকেও তেমনি দীপ্তি বিচ্ছুরিত হতে থাকে। এ তো গেল রঙ। বয়স? পঞ্চাশের সীমান্ত পেরিয়েছেন। চেহারা? ভদ্রলোক বেশ লম্বাই। কিন্তু শরীরে এত মেদ তিনি সঞ্চয় করে ফেলেছেন যাতে বেঁটেই মনে হতে পারে। রঙের উপমা যদি কয়লা হয়, শরীরটাকে অনায়াসেই ছোটখাটো একখানা পাহাড়ের সঙ্গে তুলনা করা যায়। সংক্ষিপ্ত কপালের ওপর থেকেই শুয়োরের কুচির মত দুর্বিনীত চুলগুলো খাড়া হয়ে আছে। চোখ দুটি গোলাকার এবং আরক্ত।

সব চাইতে অবাক হতে হয় ভদ্রলোকের রুচি দেখে। দু-হাতের মোটা মোটা আঙুলগুলোতে খান আষ্টেক আংটি। আংটিগুলোর কোনটায় গোমেদ বসানো, কোনটায় মুক্তো, কোনটায় হীরে, কোনটায় পান্না। একটা আবার অষ্ট-ধাতুর। অনুমান করা যায়, বিরুদ্ধ গ্রহদের মনস্তুষ্টির জন্যই এই রাজসূয় আয়োজন। আংটি ছাড়াও গলায় সোনার সরু হার আছে, হাতে সোনার পদক আছে। গোটাতিনেক দাঁতও তাঁর সোনা-বাঁধানো। পরনে ফিনফিনে ধুতি আর লক্ষ্ণৌর চুড়িদার পাঞ্জাবি। পায়ে ক্রোম লেদারের পাম্প-শু; চলতে ফিরতে মস মস আওয়াজ হয়।

নিশানাথ রানীপুরের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। দেশী তাড়ির দোকান থেকে ধানচালের আড়ত—কি নেই তাঁর!

তিনজনের মধ্যে যিনি তৃতীয় তাঁর নাম আবদুল জামান। জামান সাহেবের বয়স চল্লিশোর্ধে, তবে পঞ্চাশের অনেক নীচে। চেহারা এবং রুচির দিক থেকে তিনি নিশানাথের বিপরীত। জামান সাহেব রীতিমত প্রিয়দর্শন। মেদহীন দোহারা স্বাস্থ্যের জন্য তাঁকে তরুণই মনে হয়। নিখুঁত কামানো মুখ। গায়ের রঙখানি সুগৌর। ভাসা ভাসা দীর্ঘ চোখদুটিতে বুদ্ধির দীপ্তি মাখা। তীক্ষ্ণ চিবুক, ডিম্বাকৃতি মুখ, সুগঠিত উজ্জ্বল দাঁত—সব মিলিয়ে বিচিত্র এক আকর্ষণ আছে তাঁর মধ্যে।

রানীপুরের দক্ষিণে মাইল দুই গেলে যে গ্রামগুলো চোখে পড়বে জামান সাহেবেরা সেখানকার জমিদার। অবশ্য সরকারী সিদ্ধান্তে জমিদারী লুপ্ত হয়ে গেছে। সেদিক থেকে তাঁকে জমিদার বলা অনুচিত। জমিদার খেতাব গেছে বটে কিন্তু জামান সাহেব কালের দিকে পিঠ ফিরিয়ে থাকেন নি। সময়ের যে হাওয়া সেই স্রোতেই তিনি গা ভাসিয়ে দিয়েছেন। ইণ্ডাস্ট্রি নিয়ে মেতেছেন জামান সাহেব। রানীপুর শহর থেকে যে পথটা স্টেশনগামিনী হয়েছে তার একপাশে ইঁটের কারখানা বসিয়েছেন। এবং আরো কি কি শিল্প প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা যেন তাঁর আছে।

পরিচয়-পর্ব চুকলে যোগদাবাবু বললেন, 'বয়েসে তোমার চাইতে আমি ঢের বড়। তোমাকে 'তুমি' করেই কিন্তু বলছি রাজেশ।'

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন ভবেশ। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ! হ্যাঁ তুমি করেই তো বলবেন। ও আপনার ছেলের মত।'

যোগদাবাবু ভবেশের কথার উত্তর দিলেন না। রাজেশের উদ্দেশে বলতে লাগলেন, 'আজ তোমার জীবনের সব চাইতে শুভদিন রাজেশ। নিজের সমস্ত কিছু তোমার বাবা আজ তোমাকে দিচ্ছেন। বাপের সম্পত্তি এ জগতে ক'জন পায়? এই আমার কথাই ধর না। আমার বাবা একেবারে ভিখিরি অবস্থায় স্বর্গে যান নি। রানীপুর শহরে তিনখানা বাড়ি ছিল তাঁর। ব্যাঙ্কে কিছু না হলেও হাজার পঞ্চাশেক টাকা ছিল। তিনি জীবিত থাকতে যে ঘরে শুতেন সেই ঘরের সিন্দুকে সের তিনেকের মত সোনা ছিল। তা ছাড়া রুপো-কাঁসা কত ছিল সঠিক বলতে পারব না। কিন্তু সে সব সম্পত্তির কিছুই পাই নি আমি। একটি কানাকড়ি পর্যন্ত জোটে নি আমার ভাগ্যে।'

'কেন?'

'সব আমার ভাইদের জন্যে। তারাই কারসাজি করে ঠকিয়ে আমাকে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছে। তাই বলছি বাবা, বাপের থাকলেই যে ছেলে পাবে তার কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। যারা বাপের জিনিস পায়

এ সংসারে তারা সত্যিই ভাগ্যবান।'

রাজেশ উত্তর দিল না।

যোগদাবাবুই আবার শুরু করলেন, 'যারা বাপের জিনিস পায় তারা হাজার বার ভাগ্যবান। তার ওপর বাপ যদি তেমন হয় অর্থাৎ দশজনে যাকে খাতির করে সম্মান করে তা হলে ছেলের সৌভাগ্যের তুলনা হয় না। এই তোমার বাবার কথাই বলি। রানীপুরে, শুধু রানীপুরে কেন—সারা তল্লাটেই ওঁর চাইতে বেশী সম্মানিত প্রতিষ্ঠিত মর্যাদাবান আর কে আছে?'

যোগদাবাবুর কথা শেষ হতে না হতেই ও-পাশ থেকে নিশানাথবাবু বলে উঠলেন, 'ঠিক কথা। ভবেশবাবুর মতন মানী মানুষ তো সারা জীবনে আমি আর একটাও দেখলাম না। সম্মানটা কি আর এমনি এমনি হয়েছে, লোকের বিপদে আপদে উনি প্রাণ দিয়ে করেন। কেউ যদি ওঁর শরণ নেয় তাকে উনি রক্ষা করবেনই। সে শক্তি ওঁর আছে। লোকের কথা থাক। এই যে আমি, আমি কত ভাবেই না উপকৃত! তাই পরশুদিন যখন উনি বললেন, ছেলেকে সমস্ত সম্পত্তি দিচ্ছেন আর অমন একটা শুভ কাজে আমাকে সাক্ষী থাকতে হবে তখন কি আনন্দ যে হয়েছিল! গর্বও হচ্ছিল খুব। কেন না আমার মতন একটা সামান্য তুচ্ছ মানুষকে ভবেশবাবু তাঁর কাজে স্মরণ করেছেন, এর চাইতে গৌরবের ব্যাপার কিছু আছে বলে তো আমার মনে হয় না।'

নিশানাথবাবু চুপ করলে জামান সাহেব শুরু করলেন। বেশ গদগদ স্বরে বলতে লাগলেন, 'আমারও ঐ একই কথা। রানীপুরে কত মানুষ তো আছে—গণ্যমান্য বিশিষ্ট মানুষ সব। তাদের মধ্যে বেছে বেছে ভবেশবাবু আমাকে ডেকেছেন। তাঁর একটা কাজে আমার নামটা জড়ানো থাকবে, এ যে কতবড় মর্যাদার ব্যাপার সে শুধু আমিই বুঝি।'

নীরবে রাজেশ সব শুনে যাচ্ছিল। তার মনে হচ্ছিল, সম্পত্তি হস্তান্তরটা উপলক্ষ্য মাত্র। যোগদাবাবু, নিশানাথবাবু আর জামান সাহেব—রানীপুরের তিনটি লোক ভবেশকে কেন্দ্র করে সীমাহীন চাটুকারিতার প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। পরক্ষণেই তার মনে হল, এই স্তুতি কি নিতান্তই অকারণে?

দশ বছর পর রানীপুরে ফিরে ভবেশ সম্বন্ধে শহরের নানা দিগন্তে যে সব মন্তব্য রাজেশ শুনেছে তা আদৌ প্রীতিকর নয়। বরং রীতিমত ভীতিজনক। কিন্তু যোগদাবাবু, নিশানাথবাবু আর জামান সাহেব—সম্মানে-মর্যাদায়-প্রতিপত্তিতে বিশিষ্ট রানীপুরের এই তিনটি ভদ্রলোক যেভাবে ভবেশের বন্দনা করেছেন তাতে দস্তুরমত বিভ্রান্তই হতে হয়। কারা ঠিক? সমালোচনায়-নিন্দায় সরব রানীপুরের সেই মানুষগুলি না যোগদাবাবুরা?

যারাই হোক, এই মুহূর্তে যোগদাবাবুদের স্তুতিতে রাজেশের চেতনায় কিছুটা প্রতিক্রিয়াই বোধ হয় হল। কেন যেন তার মনে হতে লাগল, যে ধাতু দিয়ে ভবেশের চরিত্র গঠিত সেটা হয়তো সকল দিক থেকে 'গুণরাশিনাশী' নয়। প্রশংসা পাবার মত কিছু কিছু উপাদান তার মধ্যে থাকতেও পারে।

যাই হোক এ প্রসঙ্গের উপসংহার টানলেন স্বয়ং ভবেশ। যোগদাবাবুদের দেখিয়ে গাঢ়স্বরে ছেলেকে বললেন, 'ওঁদের সঙ্গে সবেমাত্র আজ তোর পরিচয় হল। এরপর থেকে নানা ব্যাপারে এঁদের সংস্পর্শে তোকে যেতে হবে। তখন দেখবি এই তিনজনের মতন শুভাকাঙ্ক্ষী সারা রানীপুরে আর একটিও আমাদের নেই। দেখবি এঁদের সঙ্গলাভ কত বড় একটা পাওনা।'

গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজোর মত স্তুতির প্রত্যুত্তর স্তুতি দিয়েই সারলেন নাকি ভবেশ ?

সতের

জগতে কোন কিছুই বোধহয় নিরঙ্কুশ নয়। নইলে সম্পত্তি সমর্পণের এমন পরিপাটি আয়োজনটার সামনে এতবড় অভাবনীয় একটা বিঘ্ন এসে দাঁড়াবে কেন ?

সদর শহরের এক প্রান্তে রেজিষ্ট্রি আফিসের একতলা হলুদ বাড়িটা ডানপাশে দেওয়ানী আর ফৌজদারী আদালত। বাঁ দিকে বিস্তৃত একটা মাঠ। মাঠের মাঝখানে বিশাল বটগাছ। বটের ছায়াতলে সারি সারি চালাঘরে উকিল মুহুরীদের সেরেস্তা। সেরেস্তার গা ঘেঁষে খাবারের দোকান, হোটেল।

সমস্ত এলাকাটা প্রকাণ্ড একটা মৌচাকের মত। সর্বক্ষণ ভনভন করে আওয়াজ উঠছেই।

উকিল সেরেস্তা থেকে খানিকটা দূরে একটা বড় মোটরে রাজেশরা বসে ছিল। এই মোটরটা করেই সকালে বেরিয়েছিল তারা। দুপুরের সূর্য এখন মধ্যাকাশ থেকে পশ্চিমে চলতে শুরু করেছে।

সলিসিটরকে কলকাতা থেকে নিয়ে এসে সমস্ত কাগজপত্র রেজিষ্ট্রি অফিসে জমা দিয়েছিলেন ভবেশ। এখন প্রতীক্ষা চলছে—কখন ডাক পড়বে।

অবশেষে ডাক পড়ল। মোটর থেকে বেরিয়ে রেজিষ্ট্রি অফিসের দিকে পা বাড়াতে যাবেন ভবেশরা ঠিক সেই সময় যেন বাজ পড়ল। সদর শহরে যানবাহন বলতে শুধু সাইকেল রিক্সা।

একটা সাইকেল রিক্সা উন্মত্ত ঝড়ের গতিতে একেবারে ভবেশের সামনে

এসে থামল। আর তার মধ্য থেকে যিনি নেমে এলেন এই মুহূর্তে রাজেশের দূরতম কল্পনাতেও তাঁর ছায়া ছিল না। যিনি এসেছেন তিনি নতুন পাড়ার সেই রহস্যময়ী।

পা বাড়াতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন ভবেশ। তাঁর চোখ দুটি রহস্যময়ীর দৃষ্টির ফাঁদে আটকে গেল যেন।

শুধু কি ভবেশই। যোগদাবাবু, আমান সাহেব এবং নিশানাথবাবু—এঁরা তিনজন যেন চিত্রার্পিত তিনটি মূর্তি। সবার পেছনে ছিল রাজেশ। স্তম্ভিত বিস্ময়ে সে-ও দাঁড়িয়ে পড়েছে। তার অবচেতনের তলা থেকে কে যেন জানিয়ে দিতে লাগল, একটা দুর্যোগ খুব আসন্ন।

দমবন্ধ অবস্থাটা খুব বেশিক্ষণ রইল না। নতুন পাড়ার মহিলাটি তাড়াতাড়ি রিক্সাওলার ভাড়া মিটিয়ে পায়ে পায়ে ভবেশের সামনে এসে দাঁড়ালেন। সম্ভবত রানীপুর থেকেই তিনি আসছেন। কাছে এসে ভবেশের চোখের দিকে স্থির নিষ্পলকে আবার তাকালেন ভদ্রমহিলা। তাকিয়েই রইলেন।

রানীপুরে আসার দিনকয়েকের মধ্যেই রাজেশ অনুমান করেছিল, এই মহিলাটি ভবেশের বিরুদ্ধ পক্ষ। এই মুহূর্তে সে লক্ষ্য করল, তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভবেশ কেমন যেন বিচলিত বোধ করছেন। মহিলার দিকে তাকিয়ে আছেন ঠিকই। কিন্তু সে তাকানোর মধ্যে কি-রকম একটা সন্ত্রস্ত চকিত ভাবের ছায়া পড়েছে।

কিছুটা অবাকই হল রাজেশ। চিরদিনই ভবেশকে সে জানে বিবেকবর্জিত, নিষ্ঠুর, ভয়লেশহীন। একটি মহিলার সামনে দাঁড়িয়ে সেই প্রবল ভয়ঙ্কর লোকটির বিচলিত হওয়া খানিকটা বিস্ময়কর বৈকি!

অনেকক্ষণ পর ভবেশই প্রথম মুখ খুললেন। স্খলিত স্বরে বললেন, 'বিভা, তুমি!'

মহিলার নামটা আগেই জেনেছিল রাজেশ। পরিচয় সম্বন্ধে পীড়াপীড়ি করতে নামটুকুই শুধু তিনি বলেছিলেন। বিভাদেবী বিচিত্র একটু হাসলেন। বললেন, 'হ্যাঁ আমি।'

উগ্রস্বরে ভবেশ এবার বললেন, 'তুমি এখানে কেন?' বোঝা গেল, কিছুক্ষণ আগের বিভ্রান্ত বিচলিত ভাবটা কাটিয়ে উঠেছেন তিনি। চোয়াল কঠিন হয়ে উঠেছে তাঁর, চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক তীব্র।

বিভাদেবী হাসি থামান নি। আদুরে গলায় অভিমানের খানিকটা আমেজ মিশিয়ে বললেন, 'বা রে, আসতে নেই!'

'না, নেই।'

'কেন ?'

'আমি তোমাকে আসবার জন্যে নেমন্তন্ন করেছিলাম ?'

'কর নি বলেই তো আমাকে আরো আসতে হল। ভাবলাম—'

কথাটা আর শেষ করতে পারলেন না বিভাদেবী। তার আগেই ভবেশ গর্জে উঠলেন, 'তুমি কি ভাবলে তা শুনে আমি কৃতার্থ হতে চাই না।'

আশ্চর্য, বিভাদেবী কিন্তু উত্তেজিত হলেন না। আগের মতই হাসতে হাসতে বললেন. 'শুধু শুধু রাগ করছ কেন ? কী ভাবলাম, সেটা আগে শুনেই নাও না।' ভবেশের রাগ, বিরক্তি—সমস্ত অগ্রাহ্য করে আপন মনে তিনি বলে যেতে লাগলেন, 'দশ বছর পর ছেলেকে বাড়ি ফিরিয়ে এনে ঘটা করে নিজের সব কিছু তার হাতে তুলে দিচ্ছ। এতবড় একটা স্বকাজ করতে চলেছ জগৎসুদ্ধ সবাইকার নেমন্তন্ন হল, আমিই শুধু বাদ। ভাবলাম, তুমি বুঝি আমার কথা ভুলেই গেছ। ভুলটা শুধরে দেবার জন্যেই না আমাকে ছুটে আসতে হল। কিন্তু—'

রাজেশ স্তম্ভিত। বিমূঢ় বিস্ময়ে দু-জনের কথা শুনে যাচ্ছিল সে। যত শুনছিল বিস্ময় ততই বাড়ছিল। রানীপুরে আসার পরই সে টের পেয়েছে বিভাদেবী এবং ভবেশ পরস্পরের পরিচিত। কিন্তু সে পরিচয় কতখানি গভীর ? জীবনের কোন দিগন্ত পর্যন্ত তা প্রসারিত ?

দুটি অনাত্মীয় নারী পুরুষ পরস্পরকে যখন 'তুমি' বলে তখন স্বভাবতই মনে হয়, দু-জনের সম্পর্কটা অতিশয় নিবিড়। বিভাদেবী কে ? তাঁর সঙ্গে ভবেশের কী সম্পর্ক ?

ভবেশ প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু কী ?'

'মনে হচ্ছে আমি আসাতে তুমি যেন খুশী হও নি।' বিভাদেবী তেমনি হাসতে হাসতে বললেন।

দাঁতে দাঁত চেপে রুদ্ধ চাপা গলায় ভবেশ বলে উঠলেন, 'না, হই নি।'

বিভাদেবী নিজের খেয়ালে আবার বললেন, 'খুশী হও আর না-ই হও আমি বাপু এসে পড়েছি।'

উত্তেজিত কাঁপা স্বরে এবার ভবেশ বললেন. 'মতলবটা কী তোমার কী, কী চাও এখানে ?'

'কী চাই, তুমিই বল না।'

'অত রহস্য আমি বুঝি না। যা চাও তাড়াতাড়ি বলে ফেল। সং দেখার সময় এখন আমার নেই।'

মুহূর্তে বিপরীত ভাবের ছায়া পড়ল বিভাদেবীর মুখে। এতক্ষণ হাসছিলেন

সেই হাসিটা এখন অদৃশ্য। পায়ের পাতা থেকে প্রতিমার দীর্ঘ মত চোখ দুটি পর্যন্ত সমস্ত অবয়বে অনমনীয় কাঠিন্য নেমে এসেছে।

একটুক্ষণ মাত্র। তারপর হঠাৎ এক কাণ্ডই করে বসলেন বিভাদেবী। ছুটে গিয়ে রাজেশের একটা হাত ধরে টানতে টানতে ভবেশের সামনে এনে ফেললেন। বললেন. 'এই ছেলেটাকে তোমার হাত থেকে বাঁচাতে চাই।'

ব্যাপারটা রীতিমত নাটকীয়। রাজেশ বিস্মিত হল যত বিব্রত হল তার হাজারগুণ। সেই সঙ্গে সাঙ্ঘাতিক আড়ষ্টতাও তাকে ছেয়ে ফেলল।

ভবেশ কিন্তু বিস্মিত হন নি। তাঁর চোখদুটি ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। আর ওপরের দাঁতগুলো নীচের ঠোঁটে গভীরভাবে বসে যাচ্ছে। মনে হয়, ঠোঁটের মাংস কেটে ফিনকি দিয়ে এখনই রক্ত ছুটবে। কিন্তু বিন্দুমাত্র সংযম হারালেন না তিনি। চাপা গলায় শুধু জানতে চাইলেন, 'এ-সবের মানে কী?'

'মানেটা বুঝতে কি খুবই অসুবিধে হচ্ছে?' প্রখর শ্লেষে চোখদুটি দপদপিয়ে উঠল বিভাদেবীর।

'হ্যাঁ, হচ্ছে।'

'তা হলে শোন, এই ছেলেটির সর্বনাশ ঘটাতে আমি দেব না।'

ভবেশ তৎক্ষণাৎ কিছু বললেন না। কি যেন ভেবে খুব ক্লান্ত সুরে এক-সময় শুরু করলেন, 'নিজের ছেলেকে কেউ যদি সম্পত্তি লিখে পড়ে দেয় তাকে সর্বনাশ বলে নাকি?' যোগদাবাবুদের দিকে ফিরে বললেন, 'হ্যাঁ মশাই, আপনারা কী বলেন?'

যোগদাবাবু, নিশানাথবাবু আর জামান সাহেব—চিত্রার্পিত মূর্তি তিনটির মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। বিড় বিড় করে কি যেন বলতে শুরু করলেন তাঁরা।

যোগদাবাবুদের বিড়বিড়ানি শেষ হল কি হল না। তার আগেই বিভাদেবী ধমক দিয়ে উঠলেন, 'থামুন, আপনাদের আর দালালি করতে হবে না।'

ভবেশ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, 'ও কি! ওঁদের ওপর অমন ধমক দিয়ে উঠলে যে? জান, ওঁরা রানীপুরের বিশিষ্ট ভদ্রলোক—'

'ভদ্রলোক!' বিদ্রূপে ঠোঁট দুটো বেঁকে গেল বিভাদেবীর। বললেন, 'কেমন ভদ্রলোক আমার জানা আছে। রানীপুরের সবাই জানে ঐ তিনটি লোক তোমার ফেউ। তুমি যা বলবে তাতেই ওরা ঘাড় কাত করবে।'

এতক্ষণ উত্তেজিত, ক্ষিপ্ত, ক্রুদ্ধ—সবই হচ্ছিলেন ভবেশ কিন্তু সংযম হারান নি। সেটা অকারণে নয়। এই খোলা মাঠে যেখানে মানুষের ভিড় লেগে আছে সেখানে হঠকারিতার বশে কিছু করে বসলে সেটা একটা লোক হাসানো মজার ব্যাপারই হয়ে দাঁড়ায়।

এবার কিন্তু নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না ভবেশ। ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছেন তিনি। একরকম লাফ দিয়ে বিভাদেবীর কাছে চলে এলেন। তারপর উন্মত্তের মত চেঁচিয়ে উঠলেন, 'অসভ্য মেয়েমানুষ কোথাকার। অনেকক্ষণ ধরে আমি সহ্য করছি। আর পারব না। এবার—'

বিভাদেবী ভয়লেশহীনা। অবিচলিত মুখে বললেন, 'এবার কী করবে? মারবে নাকি?'

হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মত ভবেশ বললেন, 'তোমার মত বেয়াড়া মেয়েমানুষকে মারাই উচিত।'

'তা হলে আর দেরি কেন, শুভ কাজটা তাড়াতাড়ি আরম্ভ করে দাও।'

নিরুপায় আক্রোশে দাঁতে দাঁত চাপলেন ভবেশ।

এদিকে চেঁচামেচিতে আকৃষ্ট হয়ে উকিল সেরেস্তা থেকে কিছু কিছু লোক এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। মাছির মত অন্যের ঝগড়ার ব্রণ খুঁটে বেড়াবার অভ্যাস ওদের।

বিভাদেবীর কাছে সুবিধা হচ্ছিল না। ভবেশের সেই আক্রোশটা গিয়ে পড়ল চারপাশের জনতার ওপর। তাদের দিকে ছুটে গিয়ে চেঁচাতে লাগলেন, 'এই শুয়ারের বাচ্চারা, কী চাই এখানে? ঠাকুর উঠেছে? ভাগো হিঁয়াসে।'

ভিড়টা পিছু হটল বটে কিন্তু একেবারে সরে গেল না। দূরে দাঁড়িয়ে বিনা পয়সার নাটক দেখতে লাগল।

ভবেশের এবার খেয়াল হল, হঠকারিতার বশে চেঁচামেচি করে কি বিপর্যয় বাধিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্য স্থির করে ফেললেন তিনি। উত্তপ্ত মেজাজটাকে শীতল করে প্রায় নতজানু হয়ে বিভাদেবীর কাছে এসে দাঁড়ালেন। অনুনয়ের সুরে বললেন, 'কেন ঝামেলা করছ বিভা; রাজুকে ছেড়ে দাও।'

রাজেশের একটা হাত ধরেই ছিলেন বিভাদেবী। বললেন, 'না কক্ষনো না।'

'কি আশ্চর্য! রেজিস্ট্রি অফিসে ডাক পড়েছে।'

'পড়ুক।'

'আমাকে এভাবে বিপন্ন অপদস্থ করে তোমার কী লাভ?'

'কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। তোমার হাত থেকে রাজেশকে আমি শুধু বাঁচাতে চাই।' বিভাদেবী এই প্রথম উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, 'তোমার স্বার্থসিদ্ধির জন্যে ছেলেটা বলি হোক, এ আমি কিছুতেই হতে দেব না, দেব না, দেব না।'

ভবেশ আগের ভুলটা আর করলেন না। তাঁর মুখচোখের কোথাও উত্তেজনার চিহ্নমাত্র নেই। বরং নিদারুণ বিস্ময়ের ছায়া পড়েছে। বিস্ময়টার কতখানি অকপট আর কতখানি ছলনা সেটা বুঝে ওঠা দুঃসাধ্য। অবাক সুরে

তিনি বললেন, 'ছেলেটা বলি হবে, এ তুমি কী বলছ বিভা!'

'আমি ঠিকই বলছি।' দৃঢ় অবিচলিত স্বরে বিভাদেবী বললেন।

'নিজের সম্পত্তি আইনসম্মতভাবে ছেলের হাতে তুলে দিচ্ছি। এর ভেতরে অন্যায়টা যে-কোথায়, বুঝে উঠতে পারছি না।' রীতিমত ক্ষুব্ধ আহত মুখে ভবেশ বলতে লাগলেন, 'আশ্চর্য! বাপ ছেলেকে কিছু দিলে তাকে নাকি বলি দেওয়া বলে! এমন কথা কে কবে শুনেছে!'

'অন্য কেউ তার ছেলেকে কিছু দিলে বলির প্রশ্ন উঠত না। কিন্তু তুমি বলেই—'

'আমি বলেই বুঝি উঠছে?'

'ঠিক তাই।' বিভাদেবী বলতে লাগলেন, 'দশ বছর ধরে তোমাকে দেখছি। তুমি কী প্রকৃতির মানুষ, আমার চাইতে ভাল করে তা কেউ জানে না। যে ছেলের সঙ্গে এতকাল কোন সম্পর্ক রাখো নি হঠাৎ তাকে স্নেহের বান ডাকিয়ে নিজের কাছে এনে যথাসর্বস্ব তার হাতে তুলে দিচ্ছ। তোমার মাথায় কী মতলব ঘুরছে, ভাবতেও সাহস পাই না।'

ভবেশ বললেন, 'বেশ, স্বীকার করে নিচ্ছি আমি খুব খারাপ লোক। এখন রাজুকে ছেড়ে দাও। এমনিতেই বড় দেরি হয়ে গেছে।'

এতক্ষণ রাজেশ একটি কথাও বলে নি। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে ভবেশ আর বিভাদেবীর কথোপকথন শুনে যাচ্ছিল শুধু। প্রথম যেদিন নতুন পাড়ায় যায় সেদিনই ইঙ্গিতে বিভাদেবী বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ভবেশের কোন কিছুই গ্রহণযোগ্য নয়। আজ আর কোন অস্পষ্টতা নেই। যাতে সম্পত্তিটা রাজেশ না পায় সে জন্যই ঊর্ধ্বশ্বাসে এই সদর শহরে ছুটে এসেছেন তিনি। যেন প্রতিজ্ঞাই করেছেন যে কোন উপায়ে দলিল রেজিস্ট্রি বন্ধ করবেন।

আজই যে ভবেশ সম্পত্তি হস্তান্তর করবেন, এ খবর কোথায় পেয়েছেন বিভাদেবী? ভোলা মারফত কী? কিন্তু রাজেশকে বাপের সম্পত্তি পাওয়া থেকে সরিয়ে রেখে কী লাভ বিভাদেবীর? এতে তাঁর কোন স্বার্থ সিদ্ধ হবে?

দশ বছর আগে আঠার বছরের জীবনে রাজেশ যতটুকু দেখে গেছে তাতে ভবেশকে কোন দিনই আলোকিত রাজপথের পথিক বলে মনে হয় নি। সে অনুমান করতে পারে ভবেশের অর্থ সঞ্চয়ের পথটা অসংখ্য প্রবঞ্চনা, কপটতা আর ছলনা দিয়ে ঘেরা। এই জন্যেই বিভাদেবীর যদি আপত্তি থেকে থাকে তা হলে বলতে হবে নিজের বিবেককে একেবারেই নিরঙ্কুশ করে ফেলেছে রাজেশ। মামাদের স্পষ্ট নির্দেশ আছে, সম্পূর্ণ দ্বিধাশূন্য হয়ে ভবেশ যা দেবেন তা যেন সে মাথা পেতে নেয়।

বিভাদেবীর মুঠির মধ্যে একটা হাত ধরা ছিল। ধীরে ধীরে সেটা মুক্ত করে নিয়ে তাঁর উদ্দেশে রাজেশ বলল, 'বাবার সম্পত্তি আমি পাই, তা আপনি চান না। কেমন? কিন্তু কেন?'

'তোমাকে একদিন একটা কথা বলেছিলাম, মনে পড়ে?'

ভবেশ বলে উঠলেন, 'এর আগে তুমি আবার রাজুকে কোথায় পেলে যে কথা বলেছ!' তাঁর চোখেমুখে এবং গলার স্বরে বিস্ময়ের একটা তরঙ্গ ছিল।

বিভাদেবী হাসলেন। বললেন, 'সংসারে কে কোথায় কখন কাকে পায় তা কি বোঝান যায়!'

ভবেশ আর কোন প্রশ্ন করলেন না। সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে একবার রাজেশ একবার বিভাদেবীকে দেখতে লাগলেন। তাঁর মুখের ওপর সংশয়ের গাঢ় ঘন ছায়া নেমে এসেছে।

আড়চোখে একবার ভবেশের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করল রাজেশ। তারপর বিভাদেবীর দিকে তাকিয়ে পুরনো প্রসঙ্গটা স্মরণ করিয়ে দিল, 'কী কথা বলেছিলেন ঠিক মনে করতে পারছি না।'

'বেশ, আমিই মনে করিয়ে দিচ্ছি। বলেছিলাম, কোন কিছু দেওয়া খুব বড় কথা কিন্তু হাত পেতে সেটা নেওয়া খুব ছোট ব্যাপার নয়। তাই মনে রাখতে হবে যা নিতে যাচ্ছি তা আদৌ গ্রহণের যোগ্য কি-না!' বিচিত্র আবেগে বিভাদেবীর স্বর কাঁপতে লাগল।

বিভাদেবী যা বলেছেন, আন্তরিকভাবে তা সমর্থন করে রাজেশ। একটুক্ষণ কি ভেবে সে বলল, 'একটা কথা কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না।'

'কী কথা বাবা?'

'আমি যদি সম্পত্তিটা না পাই তাতে আপনার কী লাভ?'

বিভাদেবী থতমত খেয়ে গেলেন।

এদিকে ভবেশের চোখে ভিন্ ভাবের খেলা শুরু হয়ে গেছে। রীতিমত উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন তিনি। দু-পা এগিয়ে এসে তাড়াতাড়ি তিনি বলে উঠলেন, 'বল কী লাভ? রাজুর প্রশ্নের উত্তর দাও।'

ম্লান স্বরে বিভাদেবী বললেন, 'আমার আবার কী লাভ! কিচ্ছু না।'

ভবেশ বললেন, 'কথাটা কি ঠিক হল বিভা। বিনা স্বার্থে তুমি দলিল রেজিস্ট্রি ঠেকাতে এতদূর ছুটে এসেছ—সেটা কি খুব বিশ্বাসযোগ্য?'

এমন অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না বিভাদেবী। প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেন। তারপর দ্রুত ভবেশের দিকে ঘুরে প্রত্যাঘাত করাই স্থির করলেন যেন। বললেন, 'বিনা স্বার্থে কেউ কিছু করে না? সবাইকে তুমি

নিজের মত ভাব নাকি? আমি এসেছি ছেলেটাকে বাঁচাতে।' বললেন বটে কিন্তু স্বরে দৃঢ়তা ফুটল না।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন না ভবেশ। একটুক্ষণ কি ভেবে টেনে টেনে বললেন, 'যাক, তোমার কথা শুনে জীবন ধন্য হল।'

'তার মানে?'

'মানে ঘরের খেয়ে জগদ্ধিতায় নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছ, এমন দৃষ্টান্ত তো বড় একটা চোখে পড়ে না।'

বিভাদেবী নিশ্চুপ! শুধু প্রতিমার মত বিশাল চোখদুটি দপ্ দপ্ করছে।

কিছুক্ষণ পর বিভাদেবীর দিকে তাকিয়ে রাজেশই প্রথম বলে উঠল, 'লাভ লোকসান, স্বার্থ-অস্বার্থের কথা থাক। যদি অপরাধ না নেন একটা কথা বলব।'

বিভাদেবী তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'অপরাধ নেব কেন। তোমার যা মনে এসেছে, বল।'

রাজেশ বলতে লাগল, 'ধরে নিলাম সম্পত্তিগুলো নেওয়া আমার উচিত হবে না। কিন্তু সে জন্যে আপনার এত দুশ্চিন্তা কেন? যদি আপনি আমার আত্মীয়া বা পরিচিতা হতেন তবু না হয় একটা কারণ বোঝা যেত। কিন্তু আপনি কে, কী আপনার পরিচয় সেটুকুও যদি জানতে পারতাম—'

রাজেশ একটা কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিল। বার চার পাঁচেকের মত এই মহিলাটির সঙ্গে দেখা হয়েছে অথচ তাঁর পরিচয়টাই থেকে গেছে অজ্ঞাত। যদি এবার সেই রহস্যের ওপর থেকে যবনিকা তোলা যায়।

রাজেশের কথাগুলো শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দুটি মানুষের চোখে মুখে বিচিত্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। আগে বিভাদেবীর কথাই ধরা যাক: প্রথমটা কেমন যেন চকিত হয়ে উঠেছেন তিনি। তারপর শ্বাসরুদ্ধ মানুষের মত ছটফট করতে শুরু করেছেন। ওদিকে ভবেশও স্থির নিষ্কম্প নেই। তাঁর ঠোঁটদুটি শক্তবদ্ধ, চোখ নিষ্পলক, চোয়াল কঠিন। সমস্ত অবয়ব ঘিরে বিচিত্র উদ্বেগের একটা ছায়া পড়েছে তাঁর।

কিছুক্ষণ পর স্খলিত স্বরে বিভাদেবী বললেন, 'তোমাকে একদিন বলেছিলাম, আমার পরিচয়ের মধ্যে গৌরব নেই। সেটা না-ই বা জানলে।'

রাজেশের সমস্ত সত্তার ওপর কি একটা জেদ যেন ভর করে বসল। সে বলল, 'গৌরব না থাক, নিজের পরিচয় জানাতে এত কুণ্ঠা কেন?'

কি যেন ভেবে বিভাদেবী বললেন, 'আমার পরিচয়ে তোমার যখন এত আগ্রহ তখন বলব। তবে এখন নয়। তোমার বাবা তার সব সম্পত্তি তোমাকে লিখে দেবার জন্য নিয়ে এসেছে। এখন যদি নিজের পরিচয়টা

বলতে যাই তুমি আমাকে ভুল বুঝে বসবে বাবা।'

রাজেশ বিমূঢ়ের মত বিভাদেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

এতক্ষণ শ্বাসরুদ্ধের মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন ভবেশ। এবার বুকের ভেতরকার আবদ্ধ বাতাস সহজ নিঃশ্বাসে বেরিয়ে এল। মুখের ওপর থেকে উদ্বেগের সেই ছায়াটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। লাফ দিয়ে বিভাদেবীর সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। প্রায় যুদ্ধে নামার ভঙ্গিতে বললেন, 'বল, নিজের পরিচয়টা রাজুকে জানিয়ে দাও। বুঝুক, কী মতলবে এখানে ছুটে এসেছ।'

বিভাদেবী নিশ্চুপ। এবার তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের স্বরে ভবেশ বললেন, 'কি, একেবারে বোবা হয়ে গেলে যে!'

বিভাদেবী ভবেশের কথার উত্তর দিলেন না। রাজেশের দিকে ফিরে স্খলিত গলায় বললেন, 'আমার পরিচয়টা তোমাকে এই মুহূর্তে জানাতে পারছি না বাবা। তবে এটুকু বলতে পারি, আমি তোমার মায়ের মতই শুভাকাঙ্ক্ষিনী। যদি কোনদিন প্রমাণ দেবার প্রয়োজন হয়, প্রাণ দিয়েও দেব।' বলতে বলতে স্বর কাঁপতে লাগল তাঁর, 'আমার একান্ত অনুরোধ, তুমি তোমার বাবার সম্পত্তি নিয়ে ভুল করে বোসো না। নিলে শেষ পর্যন্ত অনুশোচনার অন্ত থাকবে না।'

ঘুরে ফিরে সেই একই প্রসঙ্গ এসে পড়ছে। রাজেশ বিরক্তি বোধ করল। একটু উষ্ণ স্বরেই সে বলল, 'আপনাকে জানি না, চিনি না। শুধু শুধু আপনার অনুরোধ রাখতে যাব কেন? আমাকে ক্ষমা করবেন।'

ওই সুযোগটারই যেন প্রতীক্ষা করছিলেন ভবেশ। খপ্ করে ছেলের একটা হাত ধরে বললেন, 'চল্ রাজু। বাজে ঝামেলায় অনেক দেরি হয়ে গেছে।' বলেই টানতে টানতে রেজিস্ট্রি অফিসের দিকে নিয়ে চললেন। পেছনের সেই চিত্রার্পিত মূর্তি তিনটি—নিশানাথ সাহা, জামান সাহেব আর যোগদাবাবু—নিঃশব্দে তাদের অনুসরণ করতে লাগলেন।

বিভাদেবী বাধা দিলেন না। এমন কি একটা কথা পর্যন্ত বললেন না। তাঁর ঠোঁট দুটো অসহ্য এক আবেগে থরথর করতে লাগল। মনে হল, বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা স্তব্ধ হয়ে গেছে।

যেতে যেতে বার বার পেছন ফিরছে রাজেশ। নিষ্প্রাণ অনুভূতিশূন্যের মত একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন বিভাদেবী। রাজেশের কেন যেন মনে হল, ঐ ব্যক্তিত্বময়ী সবলা মহিলাটির হাত থেকে যুদ্ধ করে আদৌ ভবেশ তাকে মুক্ত করতে পারতেন কি-না, যথেষ্ট সংশয় আছে। রাজেশ ভাবল, তার শেষ কথাগুলোই নিদারুণ আঘাতে বিভাদেবীর সমস্ত সত্তাকেই ভেঙেচুরে তছনছ করে দিয়েছে বুঝি।

দলিল রেজিস্ট্রি হতে হতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। নিশানাথ সাহা, জামান সাহেব এবং যোগদাবাবু—রানীপুর থেকে এই তিনজন ট্রেনে এসেছিলেন। ট্রেনেই তাঁরা ফিরে গেলেন। তাঁদের সঙ্গেই সলিসিটার ভদ্রলোকও গেলেন। তিনি সোজা কলকাতায় যাবেন। আর রাজেশকে নিয়ে নিজের গাড়িতে গিয়ে উঠলেন ভবেশ। তাঁরাও রানীপুর ফিরে যাবেন।

গাড়িতে স্টার্ট লাগিয়ে চোখের কোণ দিয়ে ছেলেকে একবার দেখে নিলেন ভবেশ। সাড়ে তিনশ' টাকার চাকরি নিয়ে যে মানুষ সাতসাগরে পাড়ি দিয়ে ফিরছিল আচমকা রাজরাজেশ্বর হবার পর তার কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে খুব সম্ভব তা-ই লক্ষ্য করছিলেন তিনি। কিন্তু রাজেশের মুখ দেখে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

দশ বছর পর রাজেশকে রানীপুরে ফিরিয়ে এনে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন ভবেশ—ছেলে তাঁর কাছের মানুষ নয়। অবশ্য ছেলের এই দূরে সরে যাওয়ার জন্য তিনিই দায়ী—ভবেশ ভাবলেন। কিন্তু আজ তো উপযাচক হয়ে ছেলের কাছে এগিয়ে গেছেন তিনি। তবু রাজেশ কেন নিজেকে এত দূরে সরিয়ে রেখেছে? মনে মনে কিছুটা ক্ষোভেরই সঞ্চার হল ভবেশের।

এদিকে গাড়িটা রানীপুরের দিকে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। মাঝখান দিয়ে পীচের মসৃণ রাস্তা। দু-পাশে উধাও-ধাওয়া মাঠ। শীতশেষের সন্ধ্যা যদিও কিছু বিলম্বিত তবু তার শীতল ছায়া দু-দিকে নেমে আসতে আরম্ভ করেছে।

ছেলের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে দৃষ্টিটাকে সামনের রাস্তায় নিয়ে গিয়েছিলেন ভবেশ। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে চলার পর আবার তাকালেন। ছেলের কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'তুই আমাকে বাঁচালি বাবা। আমি বিশ্বাস করি, স্বর্গ বলে যদি কিছু থাকে সেখানে তোর মা নিশ্চয়ই খুশী হয়েছে।'

ভবেশের আবেগ ছেলেকে স্পর্শ করেছে কি! বোধ হয় না। ভাবলেশ-বর্জিত উদাসীন মুখে সামনের দিকে তাকিয়ে বসেই আছে রাজেশ। ভবেশের কথার উত্তরে ভালমন্দ কোন মন্তব্যই করল না সে।

যাই হোক, ভবেশও আর কিছু বললেন না। ছেলের কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে ষ্টিয়ারিং-এ রাখলেন। গাড়িটা খুব আস্তে আস্তে চলছিল; তার চাকায় ঝড়ের গতি নিয়ে এলেন।

কিছুক্ষণ চলার পর গতি আবার কমে এল। হঠাৎ কি যেন মনে পড়াতে ছেলের দিকে ফিরে খুব আস্তে ডেকে উঠলেন ভবেশ, 'রাজু একটা কথা তোকে জিজ্ঞেস করব।'

'কী?'

'আগে বল্ আমার কাছে কিছু লুকোবি না। ঠিক উত্তর দিবি।'

রানীপুরে আসার পর আরো কয়েকবার রাজেশ লক্ষ্য করেছে, কোন একটা প্রশ্ন করতে গিয়ে উত্তর সম্বন্ধে আগে থেকে তাকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করে নিতে চেয়েছেন ভবেশ। কিন্তু কেন? তাঁর কি ধারণা, রাজেশ মিথ্যে ছাড়া সত্যি বলে না! মনে মনে খুবই বিরক্তি বোধ করছিল রাজেশ। যথা সম্ভব মনোভাবটা গোপন করে সে বলল, 'মিথ্যে বলার কিছু কারণ আছে কি?'

'না, তা নয়—তা নয়—' ভবেশ থতমত খেয়ে গেলেন, 'এমনি বলছিলাম আর কি।'

রাজেশ নিশ্চুপ।

একটু সামলে নিয়ে ভবেশ বললেন, 'যে কথা বলছিলাম। ঐ মেয়েমানুষটাকে তুই চিনিস নাকি?'

রাজেশ এবার চকিত হয়ে উঠল, 'কার কথা বলছেন?'

'ঐ যে রে, যে তোকে সম্পত্তি পেতে দিচ্ছিল না।'

কি একটু ভেবে রাজেশ বলল, 'না, চিনি না।'

উত্তরটা ভবেশের বিশ্বাসযোগ্য মনে হল না। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোর সঙ্গে মেয়েমানুষটা যেভাবে কথা বলল তাতে তো মনে হয়—' কথাটা অসমাপ্ত রেখে হঠাৎ থেমে গেলেন ভবেশ।

ভবেশের ইঙ্গিতটা অবোধ্য নয়। রাজেশ বলল, 'ওঁকে আমি চিনি না, পরিচয়-টরিচয় কিছুই জানা নেই। তবে আলাপ হয়েছে। উনিই নিজে থেকে যেচে আমার সঙ্গে আলাপ করেছেন।'

ভবেশের চোখের কোণে এবার যেন শঙ্কার ছায়া পড়ল। আর সেই ছায়াটা ধীরে ধীরে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল। গাড়ির গতি কমে এসেছিল। রাস্তার একপাশে সেটাকে থামিয়ে দিয়ে উদ্বেগের স্বরে তিনি বললেন, 'যেচে আলাপ করেছে! তোকে পেল কোথায় যে আলাপ করল?'

রাজেশ নিরুত্তর।

ভবেশ এবার তাড়া দিয়ে উঠলেন, 'কি রে, চুপ করে রইলি যে? বল—'

রাজেশকে বলতেই হল। কি-ভাবে বিভাদেবীর সঙ্গে দেখা হয়েছে, দেখা হবার পর ক'দিন নতুন পাড়ায় সে তাঁর বাড়িতে গেছে—প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে সব একে একে জেনে নিলেন ভবেশ।

সব শোনার পর ভবেশ গম্ভীর। থমথমে গলায় বললেন, 'বিভার সঙ্গে তোর আলাপ হয়েছে, তুই তার বাড়ি এতবার গেছিস—কই, এ-সব কথা তো আমায় বলিস নি!'

কণ্ঠস্বরে যদি মানুষের মনোভাবের ছায়া পড়ে তা হলে বলতে হবে ভবেশের মধ্যে এই মুহূর্তে একটা দুর্যোগ চলছে। তাঁর মুখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে রাজেশ বলল, 'ওঁর সঙ্গে আলাপের কথাটা জানানো যে খুব গুরুতর ব্যাপার, আমি তা বুঝি নি।'

রীতিমত ক্ষুব্ধ সুরে ভবেশ বললেন, 'কোনটা গুরুতর কোনটা নয়, সেটা কি করে বুঝবি! দশ বছর তুই রানীপুর ছাড়া। এর মধ্যে এখানকার মানুষের কত গুণ বেড়েছে সে সম্বন্ধে তোর কি কোন ধারণা আছে! তা, হাঁ রে - মেয়েছেলেটা আমার সম্বন্ধে তোকে কী বলেছে?'

'বিশেষ কিছুই না।'

ছেলের চোখে চোখ রেখে ভবেশ বলে উঠলেন, 'আমার কাছে লুকোচ্ছিস নাকি?'

নিস্পৃহ স্বরে রাজেশ বলল, 'লুকোবার কি আছে। কেনই বা লুকবো? তবে একটা ব্যাপারে উনি আমাকে খুব পেড়াপীড়ি করেছেন।'

'কোন ব্যাপারে?'

'আপনার সম্পত্তির।' রাজেশ বলতে লাগল, 'ওগুলো যাতে না নিই সে জন্যে শুধু পেড়াপীড়িই না, কাকুতি-মিনতিও করেছেন খুব।'

অর্ধস্ফুট ক্রুদ্ধ স্বরে ভবেশ বললেন, 'হারামজাদী।'

এরপর কিছুক্ষণ চুপচাপ। শেষ পর্যন্ত স্তব্ধতা ভেঙে ভবেশই বললেন, 'আচ্ছা রাজু, এতবার তো মেয়েছেলেটার কাছে গেছিস। তা ওর পরিচয়-টরিচয় কিছু জানতে পেরেছিস?'

রাজেশ বিরক্ত হল। বলল, 'সদরে বিভাদেবীর সঙ্গে যখন কথা বলছিলাম তখনই তো বুঝতে পেরেছেন ওঁর পরিচয় আমি জানি না।'

ছেলের বিরক্তিতে হকচকিয়ে গেলেন ভবেশ। কিছু বললেন না।

শুধু বিরক্তিই না, খানিকটা রূঢ়তাও প্রকাশ করে ফেলেছে। সে জন্য মনে মনে লজ্জিত হল রাজেশ। স্বরটাকে ঈষৎ কোমল করে এবার বলল, 'আপনি তো ওঁকে চেনেন। কে উনি?'

ভবেশ চমকে উঠলেন। হাত নেড়ে ব্যস্তভাবে বললেন, 'কে আবার, কেউ না, কেউ না। এখানকার গার্লস্ স্কুলের মাস্টারনী।'

'ওঁর বাড়িতে গিয়ে মনে হয়েছে, একাই থাকেন। দেখে তো সধবা বলে মনে হয়। ছেলেপুলে কেউ নেই?'

'একা থাকে না দোকা থাকে, ছেলেপুলে আছে কি নেই—আমি তা কি করে জানব?'

তাঁর প্রতি যে মহিলার সম্বোধনের ভাষা 'তুমি' এবং তিনি যাঁকে নাম ধরে ডাকেন সেই বিভাদেবীর সঙ্গে ভবেশের সম্পর্কটা যে সামান্য আলাপ-পরিচয়ের নয়, বরং অনেক বেশি গাঢ় আর গভীর, আর যা-ই হোক সেটুকু বুঝবার মত সাবালকত্ব অর্জন করে ফেলেছে রাজেশ। যাঁর সঙ্গে সম্পর্কের এতখানি নিবিড়তা তাঁর পারিবারিক জীবনের দু-চারটে মোটা খবর ভবেশ রাখেন না, এটা কেমন যেন অবিশ্বাস্য। রাজেশ বলতে যাচ্ছিল, 'দয়া করে ন্যাকামোটুকু আর করবেন না। যা বুঝবার আমি বুঝে ফেলেছি।' বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বলা হল না। তার বদলে বলল, 'উনি এই রানীপুরে থাকেন। ভেবেছিলাম, ওঁর খবর আপনি জানলেও জানতে পারেন। ছেলেপুলে সম্বন্ধে না হয় না জানতে পারেন। কিন্তু ওঁর স্বামী কে, নিশ্চয়ই জানেন।'

'না-না, অত কথা জানার সময় কোথায় আমার। অনেক রাত হয়ে গেল। চল্, বাড়ি ফেরা যাক।' বলেই ছেলের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে গাড়িতে স্টার্ট দিলেন।

রাজেশের মনে হল, বিভাদেবীর পারিবারিক জীবনের দৃশ্যে-অদৃশ্যে যেখানে যত কথা আছে সবই ভবেশের জানা। সমস্ত জেনেও কেন তিনি লুকোচুরির আশ্রয় নিলেন ?

আজও বিভাদেবীর পরিচয় অজ্ঞাত থেকে গেল। এই রানীপুরে কোনদিনই বুঝি তা জানা যাবে না। হঠাৎ বুকের মধ্যে অত্যন্ত নৈরাশ্য বোধ করল রাজেশ।

গাড়িটা উল্কার মত ছুটে চলেছে। উইণ্ডস্ক্রীনের ওপাশে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে এক সময় ভবেশ ডেকে উঠলেন, 'রাজু।'

'বলুন—' রাজেশ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া দিল।

'আমার একটা অনুরোধ তোকে রাখতে হবে।'

'কী ?'

'বিভার সঙ্গে যেটুকু আলাপ হয়েছে, হয়েছে। তার বেশি মেশামেশির দরকার নেই। মেয়েমানুষটা ডেঞ্জারাস। যদি বলিস কী ধরনের বিপজ্জনক সে, তার উত্তর দিতে পারব না। তবে যা বললাম এক বর্ণও মিথ্যে নয়। আশা করি আমার এই অনুরোধটা তুই পায়ে ঠেলবি না।'

ভবেশ বলতে লাগলেন। তাঁর স্বর কাঁপতে লাগল।

রাজেশ চুপ। কোনরকম প্রতিশ্রুতি সে দিল না।

॥ প্রথম পর্ব শেষ ॥

বাঘবন্দী

(দ্বিতীয় পর্ব)

রেজিস্ট্রী হবার পর একটা দিন পার হয়ে গেল। একটা দিন—
।। চব্বিশটি ঘণ্টা।

এর মধ্যে ক্যাসেলের ভেতর থেকে একবারও বেরোয় নি রাজেশ। দোতলার ক্ষিণ প্রান্তে নিজের সেই ঘরটিতে একরকম স্বেচ্ছা-নির্বাসনই যেন বেছে নয়েছিল সে।

মামাদের পীড়াপীড়িতে এবং ভবেশের জেদের জন্য সসাগরা পৃথিবী হাত তে নিয়েছে বটে কিন্তু এই নেবার পেছনে নিজের প্রাণের দিক থেকে যে শেষ সায় ছিল না। সেটুকু রাজেশের অগোচর নয়।

ভবেশ ইদানীং ভাল হয়ে গেছেন, তিনি অনুতপ্ত, অনুশোচনায় জর্জর—এ-‍ ধরে নিলেও তাঁর অতীতটা মিথ্যে হয়ে যায় না। অতীতের সেই নিষ্ঠুর, ত হৃদয়বর্জিত মানুষটির স্মৃতি আদৌ সুখকর নয়।

ভবেশ আজকাল প্রিয়ভাষী, সহৃদয়। রাজেশের প্রতি তাঁর ব্যবহারে কোথাও ত্রুটি নেই। রূঢ়তা হৃদয়হীনতা দূরের কথা, পিতৃসুলভ সামান্য ইুসটুকুও তিনি বর্জন করেছেন। তাঁর আচরণ বন্ধুর মত। বন্ধুর মত বললে ক হয় না। কেমন একটা বশংবদ ভাব যেন তাঁর চলায়-ফেরায়, কথায় ায় মেশানো।

এতগুলি গুণের সমারোহও অতীতের ভবেশকে ঢেকে রাখার পক্ষে যথেষ্ট। সেই যে একটা প্রবাদ আছে 'গরু মেরে জুতো দান'—সেটাই সম্পত্তি ান্তরের ব্যাপারে বার বার মনে হয়েছে রাজেশের। আরো একটা কথা মনে রছে—বিভাদেবীর কথা। সেই অজ্ঞাত পরিচয় রহস্যময়ী সম্পত্তি নিতে কে নিষেধ করেছিলেন। একলা বিভাদেবীই নাকি, সম্ভবত দোলনদেরও ব্যাপারে নিদারুণ আপত্তি। কিন্তু কেন?

যদি এ কথা ধরেও নেওয়া যায় ভবেশের ঐশ্বর্য আলোকিত রাজপথ ধরে ালিয়ে আসে নি, এসেছে অন্ধকার গলি দিয়ে, চুপিসাড়ে—আর সেই জন্যেই দেবীর আপত্তি, তবু যেন বিশ্লেষণটা সম্পূর্ণ হয় না। মনে হয়, ওদের গভীর স্তরে আরো কোন কারণ আছে। সেটা কী?

ভাবনার শেষে একটি কথাই বার বার তার মনে হয়েছে—সসাগরা

পৃথিবীর অধীশ্বর হয়ে সে কী করবে? এত ঐশ্বর্য এত অজস্রতা তাকে প্র
বিভ্রান্ত করে ফেলতে শুরু করেছে।

সত্তার গহন কেন্দ্রে বসে আশৈশব তিনটি মানুষ রাজেশের চরিত্রকে রূপ দিয়েছে। এই তিনজনের একজন ঠাকুরদা, একজন পিসি, আরেকজন ম
রাজেশের স্বভাবে নিঃশব্দচারিণী মায়ের প্রভাবই সর্বাধিক।

সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, প্রাচুর্য—এ-সবের জন্য মা আদৌ লালায়িত ছিলেন ন
বরং এসব সম্পর্কে তাঁকে খুবই উদাসীনা মনে হত।

সংসারে যে রীতিতে সুখের দর কষা হয়ে থাকে, মনে মনে মা বোধহ
তাকে ঘৃণাই করতেন। যে নিক্তিতে অন্যেরা সুখকে মেপে নেয় মা তা
জীবন থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। চিরদিন মনের শান্তিকে তি
সবার বড় বলে মেনেছেন। রাজার ঐশ্বর্যের বিনিময়েও সেটুকু বিকিয়ে দি
তাঁর ছিল নিদারুণ অনিচ্ছা।

কারো ক্ষতি না করে, জগতের একটি তৃণকেও এতটুকু আঘাত না দে
তিনি এই পৃথিবীতে বাঁচতে চেয়েছিলেন। যে জীবন মৃদু, স্নিগ্ধ, সৎ এবং শু
—তা-ই ছিল মায়ের একান্ত কাম্য। সেজন্য দু-দিন যদি না খেয়ে থাকতে হ
পরনের শাড়িখানা যদি হত শতছিন্ন, তাঁর মুখের হাসিতে ছায়া পড়ার সম্ভাব
ছিল না। মোট কথা, উজ্জ্বল ধ্রুবতারাটির মত মনের শান্তিকে সবার ওপ
রেখেছিলেন মা।

মায়ের সেই নির্লোভ স্নিগ্ধ প্রকৃতি থেকে ধাতু সংগ্রহ করে নিজের অজ্ঞা
সারে আপন স্বভাব তৈরি করে নিয়েছে রাজেশ। প্রাচুর্য আর অজ
আরামের মধ্যে হৈ চৈ করে বাঁচার প্রতি তার মোহ নেই।

কিন্তু এখানে এসে সীমাহীন আরামের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে রাজে
এখানে অপরিমেয় বিলাস। যা-যা প্রয়োজন হাতের কাছে তার হাজার
বেশি মজুদ, তা ছাড়া, ভবেশ তাকে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর করে দিয়েছে

এত সুখ, এত আরাম, এত ঐশ্বর্য—অপরিমিত এত সব দিয়ে কী কর
রাজেশ? পুরো একটি দিন অর্থাৎ চব্বিশটি ঘণ্টা এই ভাবনাতেই ভারাক্রা
হয়ে রইল সে।

কাল বিকেলে সম্পত্তি হস্তান্তর হয়েছে। পুরো একদিন পর আরে
বিকেল এসে গেল।

এখন নিজের ঘরের বিছানায় শুয়ে দক্ষিণের সীমাহীন প্রান্তরের দি
তাকিয়ে রয়েছে রাজেশ। মাঘের শেষাশেষি রানীপুর এসেছিল সে। দেখ
দেখতে ক'টা দিন কেটে গিয়ে ফাল্গুন মাস পড়ে গেছে।

আনুষ্ঠানিকভাবে শীত সবে শেষ। ফাল্গুনের শুরুতে ঠাণ্ডার কিছু জেশ সাধারণতঃ থেকে যায়ই। কিন্তু এরই মধ্যে বাতাস রীতিমত উষ্ণ হয়ে উঠেছে। ফসলহীন নিঃস্ব মাঠের ওপর দিয়ে ধুলোর ঘুর্ণি পাক খেতে খেতে দিগন্তে ছুটে যাচ্ছে।

তাকিয়েই ছিল রাজেশ। আর ভাবছিল। গানের বিচিত্র ধুয়ার মত সেই একই ভাবনা তার সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে তুমুল কোলাহল করে যাচ্ছে। রানীপুরের এই সুবিশাল সাম্রাজ্য দিয়ে সে কী করবে?

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। একযুগ পর রানীপুরে ফিরে রাজেশ শুনেছে, দোলনের বাবা প্রণব বসুকে প্রতারণা করে তাঁর বাড়িটা গ্রাসাৎ করেছেন ভবেশ। এখন সব সম্পত্তি তো রাজেশের। সে যদি দোলনদের বাড়িটা ফিরিয়ে দিয়ে ভবেশের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করে? কথাটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র এক উত্তেজনা তার মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে দুরন্ত বেগে বয়ে গেল।

বাড়িটা ফেরত দিতে গেলে ভবেশের দিক থেকে যে পাহাড়-প্রমাণ বাধা আসবে, তা একরকম সুনিশ্চিত। তবু একবার তাঁকে বলে দেখবে নাকি? দশ বছর পর রানীপুরে ফিরে ভবেশের অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে সে। হয়তো সদয় হয়ে ছেলের অনুরোধ তিনি রাখতেও পারেন। রাজেশ স্থির করল, আজ রাত্তিরে খাবার সময় ভবেশের কাছে প্রস্তাবটা পেশ করবে।

রাত্রি পর্যন্ত কিন্তু অপেক্ষা করতে হল না। তার অনেক—অনেক আগেই ভবেশের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। প্রায় দৈব প্রেরিতের মত এই মুহূর্তে রাজেশের ঘরে ঢুকলেন তিনি।

ভবেশকে দেখে প্রথমটা হকচকিয়ে গেল রাজেশ। যাকে মনে মনে ভাবা যায় অতর্কিতে তাকে চোখের সামনে দেখলে চমক লাগারই কথা।

এ দিকে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে নিজেকে তার মধ্যে সঁপে দিয়েছেন ভবেশ। ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাইরে আজ তোর কি কোন কাজ আছে?'

ভবেশকে দেখেই ধড়মড় করে উঠে বসেছিল রাজেশ। বলল, 'না।'

'ভালই হল। সন্ধ্যের পর জন দুই ভদ্রলোক আসবেন; তাঁদের সঙ্গে তোর আলাপ করিয়ে দেব।'

'তাঁরা কারা?'

'দু-জনেই বিজনেস ম্যান। ব্যবসার ব্যাপারে তাঁদের সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট সম্পর্ক আছে। এখন থেকে তোকেই তো আমার সব দায়িত্ব নিতে হবে। যাদের নিয়ে আমাদের কাজ তাদের সঙ্গে তোর পরিচয় হওয়া দরকার।'

রাজেশ উত্তর দিল না।।

ভবেশ বললেন, 'তা হলে ঐ কথাই রইল। সন্ধ্যের পর ওঁরা আসছে
আচ্ছা, আমি উঠি।'

রাজেশের মনের সমস্ত নিভৃত জুড়ে দোলনদের বাড়ির ভাবনাটা ঘুরপ
খেয়ে ফিরছিল। হঠাৎ সে বলে উঠল, 'শুনুন।'

দরজার দিকে পা বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন ভবেশ। ছেলের মু
দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বলবি কিছু ?'

'হ্যাঁ।' রাজেশ মাথা নাড়ল।

'কী ?'

দোলনদের বাড়ির প্রসঙ্গটা তুলতে গিয়েও থেমে গেল রাজেশ। হঠাৎ ত
মনে হল, সে তো উপযাচক হয়ে দেবার ব্যবস্থা করছে। কিন্তু দিতে গে
দোলনরা যদি প্রত্যাখ্যান করে ? কথাটা মনে হতেই সমস্ত উৎসাহ স্তিমি
হয়ে এল রাজেশের। সে স্থির করল, এখন ভবেশকে কিছু বলবে না। ক
হোক পরশু হোক, একবার দোলনদের বাড়ি যাবে সে। দেওয়া-নেওয়া সম্
প্রথমে তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করবে। যদি মনে হয় বাড়িটা ফিরিয়ে নি
তারা উৎসুক তবেই ভবেশকে সে সম্বন্ধে বলা যেতে পারে।

ভবেশ তাড়া দিয়ে উঠলেন, 'কি রে চুপ করে রইলি যে। কী বল
বল।' মৃদু গলায় রাজেশ বলল, 'এখন থাক।'

ছেলের কণ্ঠস্বরের মৃদুতাকে মনে মনে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করলেন ভবেশ
বললেন, 'সঙ্কোচের কি আছে! যা বলতে চাস, বলে ফ্যাল না।'

রাজেশ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'সঙ্কোচ আবার কি।'

'তা হলে যা বলতে চাইছিস, বলছিস না কেন ?

'এখুনি বলা ঠিক হবে না।'

ভবেশ আর কোন প্রশ্ন করলেন না। স্থির চোখে ছেলেকে একবার দে
আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলেন।

সন্ধ্যের পর একতলার ড্রইং-রুমে ডাক পড়ল।

সেখানে গিয়ে রাজেশ দেখল, ভবেশ একটা ছোট সোফায় বসে আছেন
তাঁর মুখোমুখি বৃহৎ আরেকটি সোফায় বসে আছেন দুটি অপরিচিত ভদ্রলোক।

অচেনা ভদ্রলোক দুটির একজন হিন্দু। আরেকজনের সাজসজ্জা এব
দাড়ির বাহার দেখে মুসলমান মনে হয়। দু-জনেই প্রবীণ; প্রৌঢ়ত্বের সীমা
কিছুদিন হল পা রেখেছেন। মাথার চুল দু-জনেরই কাঁচায়-পাকায় মেশানো

ইন্দু ভদ্রলোকের খুব সম্ভব পোশাক-টোশাকের দিকে তেমন মনোযোগ নেই। পোশাক কেন, নিজের শরীরের প্রতিই তিনি অমনোযোগী। ফলে দু-তিনদিনের দাড়ি তাঁর মুখে অঙ্কুরিত হয়ে আছে। যে হাফশার্টটা পরে এসেছেন সেটা বহুদিন না ধোয়ার ফলে দলিত, মর্দিত এবং তেলচিটে। তুলনায় ধুতিখানা বোধবে, আজই পাট ভেঙেছেন মনে হয়। প্রয়োজন নেই তবু কাঁধের ওপর একখানা শাল চাপানো রয়েছে। শীতের ঋতুটা যে আর নেই সে সম্বন্ধে হয়তো সচেতন নন। ভদ্রলোকের একটা বিশ্রী অভ্যাস আছে। দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে অনবরত দাঁত খুঁটছেন। আর কুচি কুচি পান এবং সুপুরি বার করে এনে কাপড়ে মুছছেন।

তুলনামূলকভাবে মুসলমান ভদ্রলোক অনেক বেশি রুচিশীল। চমৎকার করে তাঁর দাড়ি ছাটা। পান-টান বোধহয় খান না। ফলে দাঁতগুলো ঝকঝকে। পরনের শেরোয়ানী আর পাজাবি, দুটোই ধোপ-দুরস্ত।

রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে আগন্তুকদের দেখছিল রাজেশ। বেশিক্ষণ দেখার সুযোগ পাওয়া গেল না। হঠাৎ ভবেশ তার দিকে ফিরলেন। তাকে দেখামাত্র ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন, 'কি আশ্চর্য দাঁড়িয়ে আছিস কেন? আয়, ভেতরে আয়।'

পায়ে পায়ে ভেতরে গিয়ে একটা সোফায় বসে পড়ল রাজেশ। বসল বটে কিন্তু তার দৃষ্টি আগন্তুকদের মুখের ওপর স্থির নিবদ্ধ হয়ে রইল আগের মতই।

রাজেশ লক্ষ্য করেছে, তাকে দেখামাত্র মুসলমান ভদ্রলোকের চোখদুটো দ্রুত কুঁচকে গেছে। লুকিয়ে লুকিয়ে তিনি রাজেশকে দেখছেন। দৃষ্টিটা তাঁর এত তীক্ষ্ণ যা বুকের গভীর স্তরে নিমেষে পৌঁছে যায় যেন। রাজেশ খানিক অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

মুসলমান ভদ্রলোকই প্রথম স্তব্ধতা ভাঙলেন। ইঙ্গিতে রাজেশকে দেখিয়ে বললেন, 'এই বুঝি আপনার ছেলে।'

'হ্যাঁ।' ভবেশ ঘাড় কাত করলেন।

ভদ্রলোকের চোখদুটি আরো সঙ্কুচিত হয়ে গেল। চতুর একটু হেসে তিনি ফিসফিসিয়ে বললেন, 'সত্যি তো?'

রাজেশ চমকে উঠল। ভবেশ যে তার বাবা, এ সম্বন্ধে লোকটা সন্দেহ পোষণ করেন নাকি। রাগে এবং বিরক্তিতে তাঁর সমস্ত মন বিরূপ হয়ে উঠল।

রাজেশ ভেবেছিল, পিতৃত্বের প্রতি এই কটাক্ষে ভবেশ এত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেন যাতে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে হয়তো লোকটাকে বাড়ির বারও করে দিতে পারেন। কিন্তু কিছুই করলেন না। ঠোঁটের প্রান্তে কৌতুকের বিচিত্র

একটু হাসি ফুটিয়ে আধফোটা সুরে বললেন, 'ছেলে বলে মনে হয় না?'

ভদ্রলোকটি হাসছেন, 'কি জানি। আপনাকে তো বিশ্বাস নেই।'

'কেন?'

ভদ্রলোক ঠোঁটের ফাঁকে হাসতেই লাগলেন। হাসতে হাসতে পরিহা তরল সুরে বললেন, 'আপনি যে জাদুকর—ম্যাজিসিয়ান।'

ভবেশের চোখ এবার তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। জাদুকর—এই বিশেষণটা দি স্তুতি না নিন্দা, কী করতে চায় লোকটা? একটু বিশ্লেষণ করতে স্তুতিই ম হল। মুখচোখ দেখে বোঝা গেল, ভবেশ প্রসন্ন হয়েছেন। বললেন, 'কি বলেন!'

ভবেশের প্রসন্নতায় উৎসাহিত হয়ে উঠলেন ভদ্রলোক। বললেন, 'মিথে না কি! ভবেশ বাঁড়ুজ্জে যে 'হয়'কে নয়, 'নয়'কে হয়—সেটেল্‌ড্‌ ফ্যাক্টে আন-সেটেল্‌ড্‌, আন-সেটেল্‌ড্‌কে সেটেল্‌ড্‌ করতে পারেন, এ খবর এ এলাকার কোন মানুষটা না জানে!'

প্রশংসা বস্তুটি অতি উপাদেয়, অতীব রুচিকর। কিছুক্ষণ তার মধ্যে বুঁ হয়ে রইলেন ভবেশ। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'এ-সব কথা বলে আমি কিন্তু ভারি অপ্রতিভ বোধ করি। আমাকে বিব্রত করা কি আপনা উচিত?'

প্রগলভ ভক্তের মত ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'যা সত্যি, তা-ই বলছি এতকাল ছেলে-টেলে কেউ আপনার ছিল বলে তো শুনি নি। হঠাৎ ভুস করে কোথা থেকে একটা ছেলে যোগাড় করে যে আনলেন! তাই ভাবছি—'

কথাটা আর শেষ করতে পারলেন না ভদ্রলোক। তার আগেই ধ দিয়ে উঠলেন ভবেশ, 'আঃ, কী বলছেন যা-তা—' ধমক দিলেন বটে, ত সেটা জোরালো রকমের নয়। তার মধ্যে খানিকটা প্রশ্রয়ের আবহ যেন রয়ে গেছে।

রাগে এবং বিতৃষ্ণায় সমস্ত স্নায়ু জর্জরিত হয়ে উঠল রাজেশের। ভবে এবং মুসলমান ভদ্রলোকের কথাবার্তার মধ্যে এমন কতকগুলো অশালীন ভয়া দিক আছে যা ভাবতে গেলে ভয় পাবার কথা। প্রথমত, ভবেশ এমন প্রতারক যাতে স্বার্থের খাতিরে যে কোন লোককে নিজের ছেলে বলে চালাতে পারেন। দ্বিতীয়ত, সে যে ভবেশের ছেলে—সে সম্বন্ধে আপত্তিকর ইঙ্গি দেওয়া সত্ত্বেও তাঁর প্রতিবাদ তেমন তীব্র নয়। তৃতীয়ত এই রানীপুরে ভবে এত বড় সর্বশক্তিমান যে, যে কোন ন্যায়কে অন্যায় এবং অন্যায়কে ন্যায় ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।

একটুক্ষণ চুপচাপ। তারপর ভবেশই স্তব্ধতা ভাঙলেন, 'আজে বাজে অনেক কথাই তো হল। এবার কাজের কথা হোক। আসুন আপনাদের সঙ্গে আমার ছেলের পরিচয় করিয়ে দিই।'

ভবেশ জানিয়ে দিলেন সেই সাজ-সজ্জা সম্বন্ধে উদাসীন লোকটির নাম হারানিধি পাল। এ অঞ্চলের বড় ব্যবসায়ী—ভাটিখানা, তেলকল এবং মাছের আড়ত ইত্যাদি মিলিয়ে অনেকগুলি কারবারের মালিক।

হারানিধি পাল—এই নামটা রাজেশের শোনা। কোথায় শুনেছে, এই মুহূর্তে স্মৃতির ভেতর হাজার তোলপাড় করেও মনে করতে পারল না সে। ভদ্রতার খাতিরে ছোট একটা নমস্কার করতে হল তাকে।

হারানিধি পালের পর সেই মুসলমান ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন ভবেশ। তাঁর নাম রহমৎ সাহেব। বর্ডারের কাছে ভবেশের কি একটা ব্যবসা যেন আছে। রহমৎ সাহেব সে ব্যবসায় তাঁর সহযোগী।

যথারীতি হাতজোড় করে নমস্কারের ভঙ্গি করল রাজেশ। আর রহমৎ সাহেব রাজেশকে লম্বা মাপের একটা সেলাম ঠুকে ভবেশের উদ্দেশে বললেন 'এ-ই তা হলে আমার নতুন মালিক!'

'মালিক আবার কি! পার্টনার বলুন।' ভবেশ বললেন।

'বেশ পার্টনারই।' রহমৎ সাহেব হাসলেন, 'এখন থেকে এর সঙ্গেই তো ব্যবসার পরামর্শ করতে হবে?'

'হাঁ।' ভবেশ মাথা নাড়লেন।

কথাগুলো যে তাকে নিয়েই হচ্ছে, সেটুকু বুঝে উঠতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হল না রাজেশের। হারানিধি পালের ব্যবসা কী কী সংক্রান্ত, যথা:—তেল মদ এবং মাছ তা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন ভবেশ। কিন্তু রহমৎ সাহেবের ব্যবসাতে কী আছে, সেটুকু উহ্যই রেখেছেন।

রহমৎ সাহেবের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ রাজেশ বলে উঠল, 'কিসের ব্যবসা আপনার?'

চকিত হয়ে উঠলেন রহমৎ সাহেব। ঠিক এইরকম একটা প্রশ্নের জন্য সম্ভবত প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। কিছু একটা বলতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু পছন্দমত উত্তরটা খুঁজে পেলেন না বোধহয়। আর পেলেন না বলেই অসহায়ের মত ভবেশের দিকে তাকালেন।

এবার বিপদতারণের ভূমিকায় দেখা গেল ভবেশকে। রহমৎ সাহেবের উত্তরটা তিনিই দিলেন, 'সে অনেক রকমের ব্যবসা। আস্তে আস্তে সব জানতে পারবি।'

ব্যাপারটা রহস্যময় মনে হল। সে প্রসঙ্গে অসংখ্য প্রশ্ন ভিড় করে এলেও মুখে কিছু বলল না রাজেশ।

আরো দু-চারটে কথার পর রহমৎ সাহেব বিদায় নিলেন। যাবার আগে রাজেশকে জানিয়ে গেলেন, দিন সাতেক পর আবার তিনি আসবেন। তখন ব্যবসাটা সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনা হবে।

রহমৎ সাহেব চলে গেলেও হারানিধি পাল কিন্তু বসেই রইলেন। এতক্ষণ একটি কথাও বলেন নি তিনি। বসে বসে কিছু ভাবছিলেন।

হঠাৎ ভবেশ ডাকলেন, 'হারানিধি—'

হারানিধি পাল চমকে তাকালেন।

ভবেশ আবার বললেন, 'এসে পর্যন্ত তো একবারও মুখ খুললে না। ঘাড় গুঁজে অত কী ভাবছ!'

'ভারি মুশকিলে পড়ে গেছি ভববাবু।' হারানিধি পালকে চিন্তিত দেখাল।

ভদ্রলোকের এত দুশ্চিন্তা, কিন্তু সে-সব একেবারেই স্পর্শ করল না ভবেশকে। উল্টে দু-চোখ ঝকমক করতে লাগল কৌতুকে। পরিহাসের স্বরে বললেন, "মুশকিলে পড়েছ! বল কি হে! আমি তো জানতাম, এই রানীপুরে তুমিই একমাত্র বিপদ'ভঞ্জন, মুশকিল-আসান।'

ভবেশের পরিহাস দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল যেন। হারানিধির দিক থেকে কোনরকম সাড়া পাওয়া গেল না। গম্ভীর স্বরে তিনি বললেন, 'ঠাট্টা নয় ভববাবু।'

হারানিধির গাম্ভীর্য ভবেশের ইন্দ্রিয়গুলোকে এবার কিঞ্চিৎ নাড়া দিল বোধ হয়। কৌতুকে যে চোখ ঝকমক করছিল, সে দুটো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। কিসের যেন একটা আভাস পেয়েছেন ভবেশ। চাপা গলায় ফিসফিসিয়ে উঠলেন, 'কী ব্যাপার বল তো?'

'হেডমাস্টার সারদা মিত্তিরকে নিয়ে ভারি ঝামেলা বেধেছে।'

'ঝামেলা বাধবে কেন?'

একপাশে চুপচাপ বসে অখণ্ড মনোযোগে দু-জনের কথা শুনছিল রাজেশ। এতক্ষণে তার মনে পড়ল, দিনকয়েক আগে লক্ষ্যহীন উদাসীনের মত হাঁটতে হাঁটতে বাজার পাড়ায় এক রেস্তোরাঁয় গিয়েছিল। সেখানে দোলন রানীপুরের ক'টি ছেলেমেয়েকে নিয়ে আসর বসিয়েছিল। তাদের উত্তেজিত আলোচনায় হারানিধির নামটা উচ্চারিত হতে শুনেছে আর বুঝেছে তাঁকে এবং এখানকার হাইস্কুলের হেডমাস্টার সারদাবাবুকে ঘিরে নিদারুণ এক দুর্যোগ আসন্ন।

নামটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজেশ চমকে উঠল। তার স্নায়ুগুলো এই

মুহূর্তে কুকুরের মত সজাগ হয়ে উঠেছে।

ওদিকে হারানিধি বললেন, 'ঝামেলা বাধলে আমি কী করতে পারি বলুন।'

এতক্ষণ সোফায় হেলান দিয়ে অলস আধশোয়া ভঙ্গিতে ছিলেন ভবেশ। এবার মেরুদণ্ড টান টান করে সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, 'কী বলতে চাও তুমি!'

'আজ্ঞে সারদা মিত্তিরকে স্কুল থেকে তাড়ানো কঠিক হবে।'

'কেন? স্কুল কমিটির মীটিং হয় নি?'

'হয়েছে।'

'কমিটির মেম্বার তো সাতজন আর তুমি হলে গিয়ে সেক্রেটারি।'

'হ্যাঁ।'

'মেম্বারদের ছ'জনই তো আমাদের লোক? মীটিঙের সময় তারা আমাদের বিপক্ষে হাত তুলেছে নাকি?' সন্দিগ্ধ স্বরে প্রশ্ন করলেন ভবেশ।

'কি আশ্চর্য, তা কখনো সম্ভব!' হারানিধি পাল বলতে লাগলেন, 'এই রানীপুরে বাস করে তাদের বুকের এমন পাটা হয় নি যে আপনার মতের বিরুদ্ধে যাবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আমাদের ছ'জন মেম্বারই সারদা মিত্তিরকে তাড়াবার ব্যাপারে একমত। সে দিক থেকে কোন গোলমাল নেই।'

'তা হলে তাকে তাড়ানো কঠিন হবে কেন?'

হারানিধি পাল এবার ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, 'সব ঐ হারামজাদীর কাজ—'

'কার—কার কথা বলছ?' রুক্ষ কর্কশ স্বরে প্রশ্ন করলেন ভবেশ।

'কার আবার, ঐ দোলনের।'

'কী করেছে সে?'

'আপনি ছাখেন নি; সারা রানীপুরে যত দেওয়াল আছে সব পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে দিয়েছে?'

রাজেশ লক্ষ্য করল, ভবেশের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে। হাতের আঙুলগুলো বেঁকে মুঠো পাকিয়ে যাচ্ছে! কপালের রেখাগুলো এখন এত স্পষ্ট আর গভীর যাতে মনে হয়, ধারালো ছুরি টেনে কেউ বুঝি সেগুলো এঁকে দিয়েছে। নিষ্ঠুর অবিচলিত স্বরে তিনি বললেন, 'পোস্টারগুলোতে কী লেখা আছে?'

হারানিধি বললেন, 'যা লেখা আছে তা আপনার সামনে আমি উচ্চারণ করতে পারব না।'

'কেন, আমি তোমার ভাসুর ঠাকুর নাকি?'

হারানিধি এ-কথার উত্তর না দিয়ে বললেন,'কাল ছুঁড়িটা দলবল সঙ্গে করে আমার বাড়ি চড়াও হয়েছিল।'

'কেন?'

'আমাকে শাসাবার জন্যে। আমাকে ওরা বলে গেছে, সারদা মিত্তিরকে সরালে তার ফল খুব ভাল হবে না।'

'তুমি ওদের কী বললে?'

'আমি আর কী বলব!'

'আমি আর কী বলব!' স্বরটাকে টেনে টেনে নির্মম বিদ্রূপে হারানিধির কথাগুলোর প্রতিধ্বনি করলেন ভবেশ। তারপর বললেন, 'ওরা শাসিয়ে গেল। তুমি আর কী করবে! দারুভূতো মুরারির মত সব শুনে গেলে!'

হারানিধি পাল এবার অবরুদ্ধ গলায় গুঙিয়ে উঠলেন যেন, 'আপনি আমার ওপর শুধু শুধু রাগ করছেন ভববাবু।'

তৎক্ষণাৎ আর কিছু বললেন না ভবেশ। সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে হারানিধির চারদিকে ঘুরে ঘুরে তাঁকে দেখতে লাগলেন। এমনভাবে দেখতে লাগলেন যাতে মনে হয়, রহস্যময় বিস্ময়কর কিছু একটা দেখছেন।

হারানিধি ভয়ে ভয়ে বললেন, 'আমাকে কী দেখছেন অত?'

ভবেশ আপন মনে বলে যেতে লাগলেন, 'দেখছি তুমি কত বড় অপদার্থ, কত বড় আহাম্মক। তোমার সারা শরীরের কোথাও এতটুকু পদার্থ আছে কি-না সেটাই খুঁজে বার করতে চেষ্টা করছি।'

দুর্বোধ্য জড়িত স্বরে কি যেন একটা বলতে চেষ্টা করলেন হারানিধি।

ভবেশ এবার বললেন, 'তোমাকে স্কুলের সেক্রেটারি করা আমারই ভুল হয়েছিল—'

দুর্বল গলায় একটা কৈফিয়ৎ যেন পেশ করতে চাইলেন হারানিধি, 'আজ্ঞে, আমার কী অপরাধ!'

এতক্ষণ ভবেশ বিদ্রূপ করছিলেন, ভেঙচে উঠছিলেন কিন্তু স্বরটা ছিল নীচু স্বাভাবিক গতে বাঁধা। এবার সশব্দে বিদীর্ণ হলেন তিনি, 'তোমার অপরাধ কী, বলতে লজ্জা হল না!'

হারানিধি নিশ্চুপ।

ভবেশ বলতে লাগলেন, এত বড় একটা স্কুলের সেক্রেটারি তুমি; সামান্য একটু পার্সোনালিটি পর্যন্ত নেই! তোমার বাড়ি চড়াও হয়ে লোকে শাসিয়ে যায় আর তুমি চুপচাপ মুখ বুজে সহ্য করে যাও। আমি হলে কী করতাম জান?'

'কী?'

'একটু বুদ্ধি খরচ করতাম। কী বুদ্ধি বল তো ?'

হারানিধি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

ভবেশ বললেন, 'বাড়ির দরজা বন্ধ করে দারোয়ান লেলিয়ে সব ক'টার হাড়গোড় আগে ভাঙতাম। তারপর পুলিশে খবর দিয়ে ট্রেসপাশিং-এর জন্যে অ্যারেস্ট করতাম। তাতে কত দিক দিয়ে লাভ হত হিসেব কষে ছাখো দেখি।'

'আজ্ঞে—' সমস্ত চোখমুখ কেমন যেন বিমূঢ় দেখাল হারানিধির।

এবার বুঝিবা করুণাই বোধ করলেন ভবেশ। হারানিধির কাঁধে একখানা হাত রেখে সস্নেহে বললেন, 'বুঝতে পারছ না, না ?'

'আজ্ঞে না।'

'বেশ আমিই বুঝিয়ে দিচ্ছি। প্রথমত, বাড়ি চড়াও হবার ফলটা সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যেত ওরা। দ্বিতীয়ত, সারদা মিত্তির সম্বন্ধে আন্দোলনের সুযোগটা ওদের হাতছাড়া হয়ে যেত। তৃতীয়ত, ভবিষ্যতে স্কুলের ব্যাপারে মাথা গলাতে ওরা সাহসই পেত না।'

দূরের সোফার মধ্যে বসে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে কানের মধ্যে একত্র করে ভবেশের কথাগুলো শুনে যাচ্ছিল রাজেশ। ভবেশের শেষ কথা ক'টা তার চরিত্রের ওপর থেকে মুহূর্তের একখানা যবনিকা সরিয়ে দিয়েছে যেন। চিরদিনই তো তার প্রকৃতি নিষ্ঠুর, ভয়াবহ—জীবনের সরল আলোকিত রাস্তায় তাঁর আনাগোনা নেই। ভবেশের প্রকৃতি বক্রগামী ঃ কুটিল অন্ধকার পথে চিরদিনই তার সঞ্চরণ।

আশ্চর্য, এক যুগ পর রানীপুরে ফিরে যে মানুষটাকে শান্ত, উদাসীন, স্পৃহাশূন্য বলে জানা গিয়েছিল আসলে সে তো তা নয়। নিজের চারপাশে নিস্পৃহতার একটা মলাট এঁটে ভেতরের সীমাহীন জটিলতাকে আড়াল করে রেখেছেন ভবেশ। রাজেশের সামনে নিজের যে চেহারাটা মেলে ধরেছেন তার সঙ্গে এই মুহূর্তে তাঁর আচরণগুলির বিন্দুমাত্র মিল নেই। দুয়ের মাঝখানে এত অসামঞ্জস্য এত অসঙ্গতি যে পরস্পরকে মিলিয়ে দেখতে যাওয়া নিতান্ত বিড়ম্বনা। এই মানুষটার দিকে তাকিয়ে তাঁর কথা ভাবতে ভাবতে রাজেশ শঙ্কিত হয়ে উঠল।

এদিকে বিস্ময়ে ভক্তিতে চোখের তারা স্থির হয়ে গেছে হারানিধির। শ্রদ্ধাপ্লুত গাঢ় স্বরে তিনি বললেন, 'এত কথা আমি ভেবে দেখিনি ভববাবু।'

ভবেশ বললেন, 'কেন দেখ নি ? হাজারবার দেখা উচিত ছিল।'

'তা ছিল। কিন্তু আপনার মত আমার বুদ্ধি তো অত ধারালো নয়। শুধু আমি কেন, এই রানীপুরের কে-ই বা আপনার মত বুদ্ধিমান—'

প্রশংসায় বিগলিত হলেন না ভবেশ। রুক্ষ স্বরে বললেন, 'ফ্লাটারি করে

আমাকে ভোলাতে পারবে না হারানিধি। বুদ্ধি সবারই আছে; সেটাকে খাটানো নিয়ে কথা। যে কোন ব্যাপার সামনে এসে দাঁড়ালে কিভাবে সেটা থেকে ম্যাক্সিমাম সুবিধে আদায় করে নেওয়া যায় তা ভাবতে হবে।'

এবার হতাশ একটা ভঙ্গি করলেন হারানিধি। বললেন, 'নাঃ, আপনার সংস্রবে এত বছর থেকেও কিছুই হল না আমার। পুরোপুরি অপদার্থই রয়ে গেলাম।'

ভবেশ উত্তর দিলেন না।

একটু ভেবে হারানিধি আবার বললেন, 'কিছু একটা আমিও করতাম। কিন্তু—দোলন আর অতগুলো ইয়ং ছেলেমেয়ে দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।'

শ্লেষের ভঙ্গিতে ভবেশ বললেন, 'ভীতুর ডিম কোথাকার!' একটু থেমে আবার বললেন, 'সে যাক গে। অনেক রাত হল। এখন তুমি এস। ভেবে-চিন্তে পরে যা হয় একটা করা যাবে।'

'যা ভাবার একটু তাড়াতাড়িই ভাববেন। ঐ হারামজাদী ছুঁড়িটার বড্ড বাড় বেড়েছে।'

'জানি।' দাঁতে দাঁত চাপলেন ভবেশ।

হঠাৎ কি মনে পড়ে গেল হারানিধির। ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন, 'শুধু দোলনের দোষ দিয়ে কী হবে? এর পেছনে ঘরের লোক রয়েছেন যে। তাঁর উস্কানিতেই—'

কথা শেষ হবার আগেই অসহিষ্ণু ক্ষিপ্ত স্বরে ভবেশ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'জানি—জানি, কে দোলনদের নাচাচ্ছে আমাকে আর তা শেখাতে এসো না। তার তেল আমি মজিয়ে ছেড়ে দেব।'

ভবেশের এই আকস্মিক উত্তেজনা রাজেশকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। হারানিধি বলেছেন, কে এক ঘরের লোক নেপথ্যে থেকে হারানিধি এ্যাণ্ড কোম্পানীর বিরুদ্ধে দোলন এবং রানীপুরের সমস্ত তরুণ-তরুণীকে চালিত করছে? কে সে?

হারানিধি স্কুল সম্বন্ধে আর কোন কথা বললেন না। এক সময় বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

ঘরের মধ্যে এখন দুটি মাত্র প্রাণী—রাজেশ এবং ভবেশ। রাজেশ সোফায় বসেই ছিল। ভবেশ কিন্তু অস্থির, হাত দুটি পেছনে মুষ্টিবদ্ধ করে ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন।

অনেকক্ষণ স্তব্ধতার পর হঠাৎ রাজেশ ডেকে উঠল, 'আচ্ছা—'

হাঁটতে হাঁটতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন ভবেশ।

রাজেশ বলল, 'স্কুলটার সঙ্গে আপনার কোন সম্পর্ক আছে কী ?'

ছেলের প্রশ্নটা বুঝতে চেষ্টা করলেন ভবেশ। অবশেষে বললেন, 'কিছুমাত্র না।'

'তা হলে ওটা নিয়ে এত ভাবছেন কেন ?'

স্থির দৃষ্টিতে রাজেশের চোখের দিকে তাকিয়ে খুব আস্তে আস্তে ভবেশ বললেন, 'সে অনেক ব্যাপার। চট করে বোঝানো যাবে না। এসেছিস যখন, নিশ্চয়ই জানতে পারবি।'

রাজেশের মনে হল, নিজের সমস্ত সঞ্চয় ছেলের হাতে তুলে দিয়ে ভবেশ যে বানপ্রস্থে যেতে চান, তা বোধহয় সত্যি নয়। নিশ্চিন্ত নির্ভর জীবনই যদি তিনি চাইবেন, একান্তভাবে শান্তিই যদি তাঁর কাম্য হবে, ঐশ্বর্যের বন্ধন আর নানা দায়িত্বের শৃঙ্খলই যদি ছিন্ন করবেন—তা হলে স্কুলের ব্যাপার নিয়ে তাঁর এত উত্তেজনা এত দুশ্চিন্তা কেন বিশেষ করে সেই স্কুল যার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নেই ?

একযুগ পর নাটকীয়ভাবে তাকে রানীপুরে ফিরিয়ে এনে হঠাৎ কেন যে নিজস্ব সব কিছু লিখে পড়ে হাতে তুলে দিলেন, রাজেশের কাছে তা জটিল এক ধাঁধার মত মনে হচ্ছে এখন।

দুই

রাজেশ ভেবেছিল, দু-এক দিনের মধ্যেই দোলনদের বাড়ি যাবে। সংকল্পটা কিন্তু মনের মধ্যেই থেকে গেল। পুরো একটি সপ্তাহ ভবেশ তাকে নিয়ে এমনভাবে মেতে রইলেন যাতে বেরুবার মত এতটুকু অবকাশ পাওয়া গেল না। এর মধ্যে ভবেশ তাকে কেমিক্যাল ফ্যাক্টরি আর রাইস মিলের কর্মচারীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। এবং দু-জায়গার কাজ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। শুধু কি তাই, কলকাতায় আটটা ব্যাঙ্কে ভবেশের নামে এ্যাকাউণ্ট রয়েছে। ছেলেকে ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে নিয়ে এজেন্টদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে নিজের নামের সমস্ত এ্যাকাউণ্ট তার নামে করে দিয়েছেন। এতেই নিস্তার পায়নি রাজেশ। রানীপুরের গ্রামাঞ্চলে বিঘে পঞ্চাশের মত জমি কিনেছিলেন ভবেশ। ছেলেকে সেখানে নিয়ে গিয়ে সে-সব দেখিয়ে পুরোপুরি মুক্তপুরুষ হতে চেয়েছেন তিনি।

তা ছাড়া একটা উল্লেখযোগ্য রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটেছে এর মধ্যে। রাইস মিল আর কেমিক্যাল ফ্যাক্টরির সমস্ত কর্মী বিরাট প্যাণ্ডেল সাজিয়ে তাদের নূতন মালিককে সম্বর্ধনা জানিয়েছে। সম্বর্ধনা সভার প্রবেশ পথে লাল সালুর ওপর

বড় বড় তুলোর হরফে প্রথমে লেখা ছিল: 'শ্রীযুক্ত রাজেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁহার নূতন কর্মভার উপলক্ষ্যে আন্তরিক অভিনন্দন।' তার নীচে লেখা ছিল: 'কল্যাণী রাইস মিল এবং কেমিক্যাল ফ্যাক্টরির কর্মচারিবৃন্দ।'

সম্বর্ধনা সভায় রানীপুরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। তাঁরা রাজেশের এই নতুন জীবন সম্বন্ধে শুভেচ্ছা এবং আশীর্বাদ জানিয়ে ভাষণ দিয়েছেন। কর্মীদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, তারা রাজেশের সন্তানতুল্য। রাজেশের স্নেহ আর প্রীতি শ্রাবণধারার মত তাদের ওপর যেন বর্ষিত হয়। তারাও কাজের ব্যাপারে সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা করে রাজেশকে সন্তুষ্ট রাখবে।

সম্বর্ধনা উপলক্ষ্যে ভোজেরও আয়োজন হয়েছিল। রানীপুরের গণ্যমান্যেরা তো ছিলেনই, রাইস মিল এবং কেমিক্যাল ফ্যাক্টরির কোন কর্মীই সেদিনের নিমন্ত্রণ থেকে বঞ্চিত হয় নি।

ভোজটা পাত পেড়ে হাপুস-হুপুস শব্দ করে চিরাচরিত দেশী প্রথায় হয় নি; হয়েছিল সম্পূর্ণ বিদেশী রীতিতে। অর্থাৎ বুফে ডিনারের আয়োজন করা হয়েছিল।

রীতিমত উৎসব। সে উৎসব উজ্জ্বল বেগবর্ণময় বিস্ময়কর।

রাজেশ জানে এই বিপুল সমারোহের পেছনে কে ছিলেন। তিনি ভবেশ। সমস্ত পরিকল্পনাটাই তাঁর। কর্মচারীদের সামনে এগিয়ে দিয়ে নেপথ্যে বসে তিনিই তাদের নিয়ন্ত্রিত করেছেন। সব জানা সত্ত্বেও এত মানুষের শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, আশীর্বাদ রাজেশকে অভিভূত করে ফেলেছিল। সে সবের মধ্যে কতটুকু আন্তরিকতা আর কতটুকু ছলনা—তা যাচাই করার সময় তখন নয়। তা ছাড়া সুসজ্জিত সভামঞ্চ, ফ্লুরেসেন্ট আলোর উচ্ছ্বসিত ফোয়ারা, মালা, ফুল, সুখাদ্য, সুপেয়—সব একাকার হয়ে ভবেশের বিরুদ্ধে তার আজীবনের পুঞ্জীভূত ঘৃণা, বিতৃষ্ণা এবং বিরূপতার দৃঢ় ভিত্তিটার নীচে কোথায় যেন ফাটল ধরাতে শুরু করেছিল। সেই সম্বর্ধনা সেই উৎসব বিচিত্র মোহরসে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল যেন। সুখদায়ক কোন নেশার মত রাজেশের সমস্ত স্নায়ু অবিরাম ঝিমঝিম করতে শুরু করেছিল। ভবেশ যেন বর্ণহীন স্তিমিত অতীত থেকে রাজেশের হাত ধরে এক বহুবর্ণময় মুখর প্রাঙ্গণের সিংহদ্বারে তাকে পৌঁছে দিয়েছেন।

কিন্তু সাতটা দিন তো আর অন্তহীন নয়! সময়ের নিরবধি সমুদ্রে তার স্থান আর কতটুকু জুড়ে? অতএব স্বাভাবিক নিয়মেই একদিন শেষ হল কিন্তু তার জের মিটল না! সাত দিনের স্মৃতি রমণীয় এক সুখের মত তার স্নায়ুর গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে জড়িয়ে রইল। আর অস্তিত্বের গহন কেন্দ্রে

সেই সুখের আস্বাদ নিতে নিতে রাজেশ অনুভব করল, ভবেশ যেন রাতারাতি কি এক অলৌকিক ইন্দ্রজালে তার সমস্ত শক্তি হরণ করে নিয়েছেন।

যাই হোক, সম্বর্ধনার তিন দিন পর একটি সকাল। ঘুমটা সবেমাত্র ভেঙেছে রাজেশের। শিথিল এক আলস্য তার সর্বাঙ্গ বেষ্টন করে রয়েছে।

কিন্তু খুব বেশিক্ষণ সেই আলস্যের মধ্যে বুঁদ হয়ে থাকা গেল না। ভবেশ এসে ঘরে ঢুকলেন এবং এমনভাবে ডাকাডাকি শুরু করলেন যাতে উঠতেই হল রাজেশকে।

রাজেশ উঠলে তাড়া দিয়ে তার হাতমুখ ধুয়ে ডাইনিং রুমে নিয়ে এলেন ভবেশ। তারপর ব্রেকফাস্ট সারতে সারতে হঠাৎ বলে উঠলেন, 'বুঝলি রাজু, সমস্ত ঝামেলা থেকে মুক্ত হতে পেরেছি। আজ আমার চাইতে সুখী এ জগতে আর কেউ নেই। কিন্তু—'

এবার গলায় স্বর ফুটল রাজেশের। বলল, 'কী ?'

'এত সুখ আমার। তবু একটা দুশ্চিন্তা এখনও আছে বাবা।'

'কিসের দুশ্চিন্তা ?'

মৃদু রহস্যময় একটু হাসলেন ভবেশ। তারপর গলার স্বরে প্রহেলিকা মিশিয়ে বললেন, 'তুই-ই বল্ না।'

রাজেশ বিমূঢ়ের মত বলল, 'আপনার দুশ্চিন্তার কথা আমি কেমন করে জানব ?'

'বোকা ছেলে।' মুখের হাসিটাকে আরেকটু বিস্তৃত করলেন ভবেশ। তারপর ছেলের দিকে চোরা চোখের দৃষ্টি হেনে আস্তে আস্তে বললেন, 'এক দিক থেকে মোটামুটি তোকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। কিন্তু আরেকটা দিক এখনও বাকি।'

রাজেশ নিরুত্তর।

ভবেশ আবার বললেন, 'যোগদা মুখুজ্জে খুব ধরেছেন। তাঁর খুব ইচ্ছে—' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন তিনি।

ভেতরে ভেতরে ঈষৎ কৌতুহল বোধ করছিল রাজেশ। নিজের প্রায় অজ্ঞাতসারেই সে প্রশ্ন করে বসল, 'যোগদা মুখুজ্জে কে ?'

'কি আশ্চর্য, এর মধ্যেই তাঁকে ভুলে গেলি ! না, তোর মেমারি বড্ড উইক। এই তো সেদিন সদরে তাঁকে দেখলি। দলিল রেজিস্ট্রির সময় সাক্ষী হয়ে গেছলেন। রানীপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। এবার মনে পড়ছে ?'

এতক্ষণে রাজেশ মনে করতে পারল। বলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু যোগদাবাবু আপনাকে ধরেছেন কেন?'

'যোগদাবাবুর খুব ইচ্ছে, তাঁর মেয়েকে আমাদের ঘরে পাঠান—'

রাজেশ চুপ।

ভবেশ বলতে লাগলেন, 'মানুষ হিসেবে যোগদাবাবু অত্যন্ত সৎ, পরোপকারী। এমন ভদ্রলোক রানীপুরে দ্বিতীয় কেউ আছে কি-না, আমার জানা নেই। শুধু ঐটুকুই গুণ নয়। ওঁদের পরিবারও খুব বনেদী আর প্রতিষ্ঠিত। রানীপুরে এমন কেউ নেই যে তাঁকে সম্মান না করে।'

রাজেশ ভালমন্দ কোন মন্তব্য করল না। শুনে যেতে লাগল।

ভবেশ থামেন নি, 'ওঁরই ছোট মেয়ে সুলেখা। দেখতে খুবই সুশ্রী. গেল বছরে বি, এ, পাশ করেছে ডিস্টিংশন নিয়ে। রূপেগুণে মেয়েটা সমান।'

রাজেশ যথারীতি নিরুত্তর।

এবার ভবেশ কি যেন চিন্তা করে বললে, 'ত্যাখ রাজু, আমি তোর বাবা। ছেলের সঙ্গে তার বিয়ের ব্যাপার নিয়ে কোন বাপই বা সওয়াল-জবাব করতে বসে। এখন যদি তোর মা বেঁচে থাকত তবে কি এ-সব নিয়ে আমার ভাবনা ছিল। যা করবার সে-ই করত। সে নেই, বাধ্য হয়েই তোর সঙ্গে খোলাখুলিভাবে এ-সব আমাকে বলতে হচ্ছে।'

অব্যক্ত অস্ফুট স্বরে রাজেশ কী বলল, বোঝা গেল না।

ভবেশ বলতে লাগলেন, 'সে যাক গে। সুলেখা মেয়েটি ভারি বুদ্ধিমতী, ভারী লক্ষ্মী। ছেলেবেলা থেকেই তো দেখছি, অমন মেয়ে সারা রানীপুরে আছে কিনা সন্দেহ।'

কোথাও কোন অস্পষ্টতা বা আড়াল নেই। ভবেশ যা বলতে চান স্পষ্টভাবেই বলেছেন। অর্থাৎ যোগদা মুখার্জি তাঁর সর্বগুণান্বিতা রূপসী মেয়েটি বিয়ে দিতে চান এবং পাত্র হিসেবে রাজেশকে তাঁর খুব পছন্দ। আর এই পছন্দের সঙ্গে ভবেশের প্রশ্রয় যে মেশানো—সেটুকু অবোধ্য নয়।

সুলেখার কথা ভাবতে গিয়ে তুরন্ত চমকের মত দোলনের কথা মনে পড়ে গেল।

হঠাৎ ভবেশ ডেকে উঠলেন, 'রাজু—'

রাজেশ যেন শুনতেই পেল না। দোলনের ভাবনার মধ্যেই বিভোর হয়ে রইল। আর থাকতে থাকতে হঠাৎ ক'দিন আগের সেই সংকল্পটা চকিতের জন্য মনে পড়ে গেল।

রাজেশ স্থির করেছিল দোলনদের সঙ্গে দেখা করবে তাদের সেই পুরনো

াড়িটা ফিরিয়ে দেবার প্রস্তাব করবে। কিন্তু মাঝখানের নেশার মত ক'টা দিন তাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যাতে সেই সংকল্পটা একেবারেই ভুলে গিয়েছিল। নতুন করে সেই কথাটা মনে পড়তে দোলনদের বাড়ি যাবার জন্য রাজেশের সমস্ত চেতনা অস্থির উন্মুখ হয়ে উঠল।

ভবেশ আবার ডাকলেন, 'রাজু—'

এবার ডাকটা শুনতে পেল রাজেশ। চমকে ভবেশের দিকে তাকাল সে।

ভবেশ বললেন, 'অত কি ভাবছিস ?'

মনে মনে লজ্জা পেল রাজেশ। মাথা নেড়ে মৃদু গলায় বলল, 'কই, কিছু না তো।'

উত্তরটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হল না ভবেশের। তীক্ষ্ণ নিষ্পলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ রাজেশের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'যোগদাবাবু বলছিলেন আসছে রবিবার দুপুরবেলা তুই আর আমি যেন তাঁদের বাড়ি যাই। খাবার নেমন্তন্ন করেছেন। অবশ্য 'হ্যাঁ না'—কিছু বলি নি। তোর মতামত না জেনে কি করেই বা বলি। তা হ্যাঁ রে, রবিবার যাবি ?'

রাজেশ লক্ষ্য করল, এই নিমন্ত্রণের ব্যাপারে ভবেশের বিপুল উৎসাহ। এবার যোগদাবাবুর বাড়িতে যাবার জন্য তিনি একরকম পা বাড়িয়েই আছেন। রাজেশের সম্মতি অসম্মতির প্রশ্নটা যে তুলেছেন, সেটা নিতান্তই ভদ্রতার খাতিরে।

ভবেশ কেন যে সেখানে যেতে এত উৎসুক, কেন ছেলেকে টেনে নিয়ে যেতে চান—সেটুকু অবোধ্য নয়। তবু রাজেশ বলল, 'নেমন্তন্নের আবার কী দরকার ?'

ভবেশ বললেন, 'না, মানে—একটু উদ্দেশ্য আছে বৈ কি। এই উপলক্ষ্যে মাধবীর সঙ্গে তোর আলাপ সালাপ হবে, এই আর কি।' বলেই ছেলের মুখের দিকে তাকালেন, সম্ভবত তাঁর কথাগুলো রাজেশের ওপর কী ধরনের প্রতিক্রিয়া করছে, সেটাই ভবেশের লক্ষ্যণীয়।

একটু ভেবে রাজেশ হঠাৎ বলে উঠল, 'কিন্তু—'

ভবেশ বললেন, 'কী ?'

ইতস্তত করে রাজেশ বলল, 'এখন এ-সব বিয়ে টিয়ের ঝামেলা থাক না।'

'তোর আবার ঝামেলা কি! তুই শুধু মেয়ে পছন্দ হয়েছে কিনা বলবি। তারপর আমি যা করবার করব।'

'বলছিলাম কি—'

ভবেশ ভাবলেন, তাঁর সামনে বসে বিয়ের স্বপক্ষে মত দিতে লজ্জা পা[illegible]
রাজেশ। বাপের কাছে ছেলের স্বাভাবিক সঙ্কোচ। বললেন, 'তোর কিছু বল[illegible]
হবে না। আমি যা বলি, মুখ বুজে তুই তা করে যাবি। দেখবি লাভই হয়েছে

রাজেশ বলল, 'একটা কথা আমাকে বলতেই হবে।'

ভবেশ একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর খুব আস্তে আস্তে বললেন, '[illegible]
কথা রে?'

'আমি তো মোটে ম্যাট্রিকুলেট আর যোগদাবাবুর মেয়ে বি. এ, পা[illegible]
ন — না, এ হতে পারে না। অসম্ভব।'

'এই ব্যাপার! ভবেশ হেসে উঠলেন, 'না-না, ওতে কিছু আটকাবে ন[illegible]
তুই রাজী হলেই হল।'

'আমি কতদূর পড়াশোনা করেছি ওঁদের বলেছেন?'

'ও-সব অনাবশ্যক। আসছে রবিবার তুই আমার সঙ্গে যোগদাবাবুর ওখা[illegible]
যাবি। ঐ কথাটা কিন্তু রইল। আচ্ছা, আমি এখন উঠি।' বলতে বল[illegible]
ব্যস্তভাবে উঠে পড়লেন ভবেশ। তাঁর খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল।

রাজেশ কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল। কিন্তু তার গলা থেকে স্বরটা মু[illegible]
হবার আগেই ডাইনিং রুম থেকে বাইরে বেরিয়ে গেছেন ভবেশ।

তিন

ভবেশ চলে যাবার পরও কিছুক্ষণ খাবার ঘরে বসে রইল রাজেশ। বিয়ে[illegible]
প্রস্তাবটা খুবই আকস্মিক, সন্দেহ নেই। সকল দিক থেকেই ভবেশ তা[illegible]
অসংখ্য শিকলে বাঁধতে চাইছেন।

ভবেশের মুখে যে বিবরণ পাওয়া গেছে তাতে মনে হয়েছে, পাত্রী হিসে[illegible]
সুলেখা শাস্ত্র-সুলক্ষণা। রূপ এবং গুণের বাঞ্ছিত মিশ্রণে সে লোভনীয়াও।

লোভনীয়া, তবু তার জন্য রাজেশের প্রাণ এতটুকু উৎসুক নয়। সুলেখার
নামে তার তরুণ বুকে ঢল দূরে থাক, একটা ছোটখাটো ঢেউও অনুভব কর[illegible]
গেল না।

বিয়ে সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল রাজেশের
আশৈশব ভবেশের প্রতি তার নিদারুণ সন্দেহ। কিন্তু সম্পত্তি হস্তান্তরের পর
থেকেই সন্দেহ করার শক্তিটা ক্রমশ শিথিল হয়ে আসছে রাজেশের
এতকালের পুঞ্জীভূত বিদ্বেষের চড়া রঙটাও কেমন যেন ফিকে হয়ে গেছে
আগেও একবার তার মনে হয়েছিল, আজও আবার মনে হল—পুরাণের দৈত্যের
মত তার সমস্ত সামর্থ্য নিঃশেষে হরণ করে নিচ্ছেন ভবেশ। নইলে চারদিনে

নাম করে রানীপুর এসে ভবেশের নির্দেশে এত অসংখ্য বন্ধনের মধ্যে সে জড়িয়ে পড়বে কেন? মামাদের পীড়াপীড়ি আর ভবেশের ব্যাকুলতায় সম্পত্তিটা না হয় নিয়েছিল সে। তারপরে তো অনায়াসেই সমুদ্রে ফিরে যেতে পারত। তা না করে এখানেই থেকে গেল কেন? আলো, ফুল, মালা, ভোজ, সম্বর্ধনা—এই সব উদ্দাম মাতামাতির মধ্যে নিজেকে নিক্ষেপ করার কী প্রয়োজন ছিল? তা ছাড়া আজ বিয়ের কথা পাড়লেন ভবেশ। কই, সে সম্বন্ধে প্রবল আপত্তি তো তার গলা থেকে বেরিয়ে এল না!

আশ্চর্য! এ-ভাবে কিছুদিন চললে পুরাণের সেই হৃতশক্তি দৈত্যের মত ভবেশের একান্ত বশংবদ হয়ে পড়বে সে। তখন ভবেশ যা বলবেন, যেভাবে চালাবেন রাজেশ তা-ই করবে, সে-ভাবেই চলবে।

বসে থাকতে থাকতে আর ভবেশের কথা ভাবতে ভাবতে ভাবনাটা হঠাৎ আরেক দিকে ঘুরে গেল রাজেশের। চোখের সামনে দোলনের মুখটা ফুটে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র অস্থিরতা অনুভব করল সে। তাড়াতাড়ি উঠে প্রথমে নিজের ঘরে গেল রাজেশ। সেখান থেকে জামা-কাপড় বদলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। আজই, এখনই একবার দোলনদের বাড়ি যেতে হবে।

অনেক দিন পর আজ আবার একা একা রানীপুরের রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে রাজেশ।

সে হাঁটছিল আর হাঁটছিল। ফাল্গুন মাস পড়ে গেছে। রোদের উত্তাপ কিছু বেড়েছে, রঙও বেশ তীব্র। তবু খুব ভাল লাগছে। স্বপ্নচালিতের মত সে যেন ভাসতে ভাসতে চলেছে।

ভাসার সুখটা বেশিক্ষণ রইল না। হঠাৎ রাজেশের চোখ গিয়ে পড়ল দুধারের দেওয়ালগুলোতে। খবরের কাগজের পোস্টারে পোস্টারে দেওয়াল গুলো ছয়লাপ। চলতে চলতে থমকে দাঁড়াল রাজেশ।

পোস্টারে পোস্টারে যে দেওয়াল-লিপি রয়েছে সেগুলো পড়তে পড়তে এতক্ষণের ভাল লাগাটা বাষ্প হয়ে উবে গেল।

সেদিন হারানিধি পাল এ সম্বন্ধে কিছু আভাস দিয়ে এসেছিলেন। আভাসই। তবু কেউ যে এমন মর্মান্তিক উলঙ্গ ভাষায় আক্রমণ করতে পারে, এ ছিল রাজেশের পক্ষে অভাবনীয়! দেওয়ালগুলোতে যা লেখা আছে তা এইরকম:

'সারদা মিত্রকে হাইস্কুল থেকে তাড়ানো চলবে না।'

'রানীপুরের সবাই জানে, সারদাবাবুকে কেন তাড়াবার ষড়যন্ত্র হয়েছে।'

'জুয়াচোর হারানিধি পালের শয়তানি আমরা বরদাস্ত করব না।'

'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দল পাকিয়ে রাজনীতি চলবে না।'

পড়তে পড়তে একটা পোস্টারে দৃষ্টিটা আটকে গেল রাজেশের। সেখা[নে] লেখা আছে: 'আমরা রানীপুরের বাসিন্দারা জানি হারানিধি পাল আস[লে] শিখণ্ডীমাত্র। তার পেছনে যে ধনুর্ধরটি রয়েছে তার নাম ভবেশ বাঁড়ুজ্জে। আমরা জানি তাঁরই ইঙ্গিতে বিশেষ একটি মানবেতর প্রাণীর মত হারানিধি না[চে,] কাঁদে, লাফায়, ঝাঁপায়। এ-ও জানি ভবেশ বাঁড়ুজ্জে নামে এই ব্যক্তিটি প[য়লা] নম্বরের প্রতারক, শয়তান, বেশ্যাসক্ত। রানীপুরের সর্বত্র, তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠা[ন] হোক আর মিউনিসিপ্যালিটিই হোক, এই লোকটি নিজের প্রতিনিধি দা[ঁড়] করিয়ে স্বার্থসিদ্ধি করে যাচ্ছে। এর স্বরূপ আপনারা ভাল করে জানুন।' লেখা[র] নীচে ভবেশের একটা ব্যঙ্গ চিত্র রয়েছে।

পোস্টারে এ কোন্ ভবেশের কথা লেখা আছে? এক যুগ আগে যে ভবে[শকে] সে দেখে গেছে তার সঙ্গে বরং ঐ লেখাটার হুবহু মিল থাকতে পারে। কিন্তু [এত] বছর পরে আজকের অনুতপ্ত, সর্বত্যাগী, নিস্পৃহ মানুষটির মিল খুঁজতে যাও[য়া] নিতান্তই বিড়ম্বনা। অবশ্য হারানিধির সঙ্গে ভবেশের সেদিনের কথাবার্তায় এটু[কু] বোঝা গেছে, হাইস্কুলে হেডমাস্টার হিসেবে সারদাবাবুকে রাখার তিনি পক্ষপা[তী] না আর এ-ও বোঝা গেছে, হারানিধি তাঁর একান্ত বশংবদ এবং স্কুল কমিটি[র] অধিকাংশ সদস্য তাঁর অনুগৃহীত এবং অনুগত।

কিন্তু পোস্টারে ঐ যে অন্যান্য বিশেষণগুলো রয়েছে—যেমন প্রতার[ক,] শয়তান, বেশ্যাসক্ত—এগুলো ভবেশের নামের সঙ্গে জোড়া লাগাতে মন [কিছুতেই] সায় দিয়ে উঠছে না। এককালে তিনি হয়তো ঐ সব বিশেষণের একান্ত যো[গ্য] হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তা অতীত ইতিহাস মাত্র।

ভবেশ সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতে আচমকা একটা কথা মনে পড়ে গেল। [এই] হপ্তা তিনেকের মত রানীপুরে এসেছে রাজেশ। এর মধ্যে একটি কি দুটি [রাত] মাত্র বাড়িতে কাটিয়েছেন ভবেশ। বাকি নিশিগুলির প্রতিটিই তিনি বা[ইরে] পালন করে এসেছেন। বাকি রাতগুলো কোথায় কাটিয়েছেন ভবেশ? রা[জেশ] ভাবল, হয়তো বিশেষ কোন প্রয়োজনে তাঁকে বাইরে থাকতে হয়ে[ছে।] কৈফিয়তটা নিজের কাছেই খুব একটা জোরালো মনে হল না। তার [সব] ভাবনাটা ক্রমশ জট পাকিয়ে যেতে লাগল।

কতক্ষণ বিমূঢ় বিভ্রান্ত এবং স্তম্ভিতের মত রাজেশ দাঁড়িয়ে ছিল, খেয়াল নে[ই।] একসময় মাথার ওপর চিলের তীক্ষ্ণ চিৎকারে তার চেতনা ফিরে এল যেন। [মনে] পড়ল, দোলনদের বাড়ি যাবার জন্য আজ সে বেরিয়েছে। সামনের দিকে আ[বার] পা বাড়াল রাজেশ। আর বাড়িয়েই থমকে দাঁড়াল। তার সমস্ত অস্তিত্ব জ[ুড়ে]

এখানা গাঢ় কাল ছায়া পড়েছে। দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার লাগিয়ে ভবেশের দিকে এত কালি আর কাদা ছুঁড়েছে কে? ভবেশকে প্রকাশ্যে এমন লাঞ্ছিত করার দুঃসাহস রানীপুরে কার আছে? এতগুলি প্রশ্নের উত্তর রয়েছে একটি মাত্র নামে। সে নাম বোধ হয় দোলন। এই কারণে তো বটেই, আর একটা কারণেও পা তার থমকে গেছে। দ্বিতীয় কারণটা হল, নিজের মন। মনটা এমন বিক্ষিপ্ত বিচলিত যে এখন কোথাও যেতে বা কারো সঙ্গে কথা বলতে একেবারেই ভাল লাগছে না।

যাবে কি যাবে না এই দ্বন্দ্বের মধ্যে কিছুক্ষণ দোল খেতে খেতে কখন যে পায়ে পায়ে একেবারে দোলনদের বাড়ীর সামনে এসে পড়েছিল, খেয়াল নেই।

রাজেশ একবার ভাবল, ফিরেই যায়। পরমুহূর্তেই সিদ্ধান্তটা বদলে ফেলল। অবশ্য স্রোতের টানে যখন এসেই পড়েছে তখন আর ফেরা কেন? একটু ইতস্তত করল সে। তারপর এগিয়ে গিয়ে শিথিল হাতে আস্তে আস্তে দরজার কড়া নাড়তে লাগল।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। দরজা খুলে যে মুখোমুখি দাঁড়াল সে দোলন।

এই মুহূর্তে দোলনকে যেন প্রত্যাশা করে নি রাজেশ। মনে মনে নিদারুণ অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে। দশ বছর পর রানীপুরে ফিরে দোলনদের এই নতুন ঠিকানায় রাজেশ বেশ কয়েক বার এসেছে। একমাত্র প্রথম বার ছাড়া একবারও দোলনকে বাড়িতে পাওয়া যায় নি।

সারাদিনের বেশির ভাগ সময়ই বাইরে টহল দিয়ে ফেরে দোলন। আজকের দিনটাও অনায়াসেই বাইরে থাকতে পারত সে। হঠাৎ এমন সুশীলা বালিকার মত আজ দোলন যে ঘরে বসে আছে, কে তা ভাবতে পেরেছিল।

দোলনই প্রথম কথা বলল, 'আরে রাজুদা যে! কি সৌভাগ্য!'

রাজেশ হকচকিয়ে গেল।

দোলনের দীর্ঘ চোখ দুটি প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। সোচ্ছ্বাসে সরবে বিগলিত স্বরে সে বলতে লাগল, 'আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে না জানি কোন পুণ্যাত্মার মুখ দেখেছিলাম। না হলে এমন সৌভাগ্য হয়!'

একযুগ পর রানীপুর ফিরে দোলনকে কোন রূপে আবিষ্কার করেছে রাজেশ? আর যাই হোক, সদয়া সহৃদয়ার বেশে নয়। সে দেখেছে সুদর্শনা তরুণীটির মুখ রেখায় কঠিন, চোখে বিরক্ত ভ্রূকুটি। সেই হৃদয়হীনা আজ এত উচ্ছ্বাসময়ী কেন? বিমূঢ়ের মত রাজেশ বলল, 'সৌভাগ্য!'

'নয়তো তো কী ?'

রাজেশ বলল, 'তোমাদের বাড়ি আজ কি আমার নতুন আসা! আগে কতবার তো এসেছি।'

'তফাৎটা কোথায় ?

রহস্যময় একটু হাসল দোলন। বলল, 'তফাৎটা তোমার পরিবর্তনের মধ্যে। আগে তুমি যা ছিলে, আজ আর তো তা নেই।'

বিস্মিত রাজেশ প্রশ্ন করল, 'কেন, আমার বাড়িতে দু-চারটে হাত-পা বেরিয়েছে নাকি ?'

দোলন কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় ভেতর থেকে দোলনের মায়ের গলা ভেসে এল, 'সদরে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে বকবক করছিস রে দোলন ?'

মুখ ফিরিয়ে দোলন চেঁচিয়ে উঠল, 'রানীপুরের শাহানশা'র সঙ্গে। তাড়াতাড়ি এসো মা, রাজদর্শনের পুণ্য করে যাও।'

রাজেশের সমস্ত ইন্দ্রিয় নিদারুণ এক ধাক্কায় সজাগ হয়ে গেল যেন। তার স্নায়ুর মধ্য থেকে অস্পষ্টভাবে কে যেন বুঝিয়ে দিতে লাগল, দোলনের এত উচ্ছ্বাস এত আপ্যায়নের ঘটা—সবই ছলনা। বরং বলা যায় এ সব নতুন ধরনের একটা আক্রমণের প্রস্তুতি মাত্র।

এদিকে কৌতূহলের বশবর্তিনী হয়ে দোলনের মা পায়ে পায়ে সদরের কাছে চলে এসেছিলেন। রাজেশকে দেখে প্রথমটা তিনি হতবাক। তারপরেই বলে উঠলেন, 'ওমা, এ যে রাজু—'

'হ্যাঁ, রাজুদাই-ই তো।'

'তবে যে তুই রাজা-টাজা না কি যেন বললি। তাই শুনেই তো পড়ি-মরি করে ছুটে এলাম।'

দোলন ব্যস্তভাবে বলে উঠল, 'রাজাই তো। রাজুদা সারা রানীপুরের রাজা হয়েছে, তুমি জান না বুঝি ?'

অতর্কিতে নিজের স্বভাবের সেই উচ্ছ্বসিত খিল খিল হাসিতে মুখর হয়ে উঠলেন দোলনের মা। হাসতে হাসতেই বললেন, 'হতচ্ছাড়া মেয়েকে নিয়ে আর পারি না।'

রাজেশ মনে মনে খুবই আড়ষ্টতা বোধ করছিল। সেই অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেও সে লক্ষ্য করল, অনেক দিন পর দোলনের মা তার সামনে নিজের সেই অকুণ্ঠ নির্মল হাসিটি হেসেছেন।

নিজের অজ্ঞাতসারে জবেশ সম্বন্ধে একটা বিরূপ মন্তব্য করে কেমন যেন

সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছিলেন দোলনের মা। তার পর দু-একবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, নিজের প্রাণটাকে আর অসঙ্কোচে মেলে দিতে পারেন নি। রাজেশকে দেখলেই কেমন যেন বিব্রত হয়ে পড়তেন। আজ তাঁকে অকুণ্ঠভাবে হাসতে দেখে মনে মনে আশ্বস্ত হল রাজেশ।

এদিকে হাসির উচ্ছ্বাস কিছু কমলে দোলনের মা বললেন, 'এসো রাজু, ভেতরে এসো।'

ভয়ে ভয়ে সংশয়ের দৃষ্টিতে দোলনের দিকে তাকাল রাজেশ। অর্থাৎ বাড়ির মধ্যে যাবে কি যাবে না, সেটা যেন দোলনের সম্মতি বা অসম্মতির ওপর নির্ভর করছে।

দোলন বলল, 'আমার দিকে তাকিয়ে দেখছ কি? চল—চল।'

নিঃশব্দে দোলন আর দোলনের মাকে অনুসরণ করে ভেতরের বিস্তৃত বারান্দায় এসে উঠল রাজেশ।

দোলনের মা একটা আসন পেতে রাজেশকে বসালেন। একটু দূরে একটা থামে ঠেসান দিয়ে দোলনও বসল। দোলনের মা অবশ্য বসলেন না। এ-সময় রান্নাবান্নায় তাঁর ঝালাপালা থাকার কথা। আছেনও। বললেন, 'তুমি একটু বস বাবা, উনুনে ঝোল চাপিয়ে এসেছি। নাবিয়ে এক্ষুনি আসছি।' বলেই রান্নাঘরের দিকে ছুটলেন। একটু পর ফিরে এসে বললেন, 'এবার কিন্তু অনেকদিন পর এলে রাজু। রোজই আশায় আশায় থাকি, তুমি আসবে। কিন্তু আর আস না।'

কি একটা বলতে যাচ্ছিল রাজেশ, তার আগেই হঠাৎ দোলন বলে উঠল, 'আজ তো তবু রাজুদা এল। এর পরে থেকে আর তাকে দেখতে পাবে না মা।'

রাজেশ ব্যস্তভাবে বলে উঠল, 'না মাসিমা, ক'টা দিন ভারি ঝামেলা গেল। সেই জন্যে আসতে পারি নি। এবার থেকে রোজ আসব; দেখে নেবেন।'

দোলন ঠোঁটের কোণে অদ্ভুতভাবে হাসল। বলল, 'ঝামেলার তো সবে শুরু। এর পর দেখবে, নিঃশ্বাস ফেলার সময় পাচ্ছ না। সব সময় খালি—'

এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ চুপ করল সে।

তীক্ষ্ণ দূরগামী চোখে দোলনের দিকে তাকাল রাজেশ। দোলনের মুখচোখের ভঙ্গি, ঠোঁটের হাসি কিংবা কথাগুলি—সবই বিশেষ একটা অর্থের সঙ্কেতে ইঙ্গিতময়। তবে কি—তবে কি—

রাজেশের ভাবনার বৃত্তটা সম্পূর্ণ হল না। দোলনের মা বলে উঠলেন, 'এ ক'দিন কিসের ঝামেলা গেল রাজেশ?'

'আপনাকে সব বলব মাসিমা' রাজেশ বলতে লাগল, 'বিশেষ' একটা

প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। শুনতে অনেকক্ষণ সময় লাগবে। আপনি বরং এক কাজ করুন। তাড়াতাড়ি রান্নাটা চুকিয়ে ফেলুন। আমি ততক্ষণ এখানে বসছি।'

একমুহূর্ত কি ভেবে দোলনের মা বললেন, 'রান্না সেরে তোমার কথা শুনতে তো ঢের বেলা হয়ে যাবে। ডাল-ভাত যা হয়, এখানেই চাট্টি খেয়ে নিও। এখন দোলনের সঙ্গে গল্প-টল্প কর।'

খাওয়ার বিষয়ে রাজেশ হয়তো আপত্তি জানাত। ফস্ করে দোলন বলে উঠল, 'তুমি তো মা বেশ লোক। রাজুদারা হল রাজা লোক। ডাল-ভাত ছাই-পাঁশ আমরা গিলতে পারি বলে রাজুদা পারবে নাকি। শুধু শুধু একটা লোককে কষ্ট দেওয়া।'

দোলনের কথাগুলোর মধ্যে তীব্র একটা আঘাত ছিল। রাজেশ লক্ষ্য করল দোলনের মা নিমেষে ম্রিয়মাণ হয়ে গেলেন। বললেন, 'তা হলে থাক বাছা, তোমার যদি কষ্ট হয়—'

সংসারের জটিলতা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞা এই সরলা মহিলাটির প্রাণের কোন প্রান্ত পর্যন্ত আঘাতটা পৌঁছেছে, রাজেশ তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছে। তাড়াতাড়ি সে বলে উঠল, 'আমি এখানেই খাব মাসিমা। মায়ের হাত থেকে ডাল-ভাতই হোক আর ছাই-পাঁশই হোক, তা-ই আমার কাছে অমৃত।'

দোলনের মায়ের চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, 'তাহলে রান্নাঘরে যাই। তুমি বস।' তিনি চলে গেলেন।

রাজেশ যদি তাকাত, দেখতে পেত দোলনের মুখে বিচিত্র সূক্ষ্ম একটি হাসির রেখা ফুটে উঠেছে।

দোলনের মা চলে যাওয়ার পর সমস্ত বারান্দাটা জুড়ে অনেকক্ষণের জন্য নীরবতা নেমে এসেছিল। মাঝে মাঝে ছন্দোপতনের মত দূর থেকে পাখির শব্দ ভেসে আসছিল।

রাজেশ ভাবছিল, এর আগে যখনই দোলনের সঙ্গে দেখা হয়েছে তার সঙ্গ বর্জন করতে চেয়েছে সে। যে কোন অজুহাতে বা ছলে তাকে এড়াতে চেয়েছে দোলন। কিন্তু আজ প্রথম থেকেই সে সঙ্গে সঙ্গে আছে। হয়তো কিছু বলবে। কী বলবে? কী? সাংঘাতিক নিদারুণ কিছু নয় তো?

একসময় দোলন ডেকে উঠল, 'রাজুদা—'

চমকে রাজেশ সাড়া দিল, 'বল—'

'তোমার সেই নেভীর চাকরিটা এখনও আছে?'

প্রশ্নটা এমন অতর্কিত যে প্রথমটা রাজেশ বিমূঢ় হয়ে গেল। সে জানাল

থিতিয়ে এলে বলল, 'থাকবে না কেন? নিশ্চয়ই আছে। আমি পার্মানেন্ট স্টাফ—'

দোলন বলল, 'মনে তো হয় না চাকরিটা আছে।'

'মনে না হবার কারণ?'

'কারণটা বলছি। তার আগে আমার অন্য একটা প্রশ্নের উত্তর দাও।'

'কী প্রশ্ন?'

'কতদিন হল রানীপুরে এসেছ?'

'প্রায় সপ্তা তিনেক।'

'তিন সপ্তা ডুব দিয়ে আছ? তার পরেও চাকরিটা থাকবে ভেবেছ?'

রাজেশ বলল, 'না থাকবার কোন হেতু তো দেখছি না। প্রথমত এখানে যে আছি সে জন্যে ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়েছি। তাছাড়া এই তিন সপ্তা বাদ দিলেও আরো মাস পাঁচেকের ওপর ছুটি আমার পাওনা।'

যেন খুবই আশ্বস্ত হয়েছে এমন ভঙ্গিতে দোলন বলল, 'যাক, চাকরিটা তাহলে যাবে না।'

'না।' রাজেশ মাথা নাড়ল।

কি ভেবে দোলন আবার বলল, 'তা হলে আরো পাঁচ মাসের মত রানীপুরে থাকছ?'

উত্তর দিতে গিয়ে থতিয়ে গেল রাজেশ। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'দেখি, কি করি।'

রাজেশের কথা শেষ হতে না হতেই দোলন বলে উঠল, 'কী করবে, আমি জানি।'

রাজেশ স্তম্ভিত। সবিস্ময়ে কিছুক্ষণ দোলনের দিকে তাকিয়ে রইল সে। তারপর বলল, 'তুমি জানো—!'

'জানি বৈকি। নিশ্চয়ই জানি।'

'তুমি অন্তর্যামী নাকি?'

দোলন হাসল। বলল, 'তা একরকম বলতে পার।'

রাজেশ হাসতে চেষ্টা করল। পারল না। তার দৃষ্টি অনেকক্ষণ থেকেই দোলনের ওপর নিবদ্ধ ছিল। চোখ না সরিয়ে আস্তে আস্তে সে বলল, 'বল তো, আমি কী করব।'

'নেভীর চাকরিটা তুমি ছেড়ে দেবে।'

'ছেড়ে দেব!'

'নিশ্চয়।'

রাজেশ বলতে লাগল, 'চাকরি ছেড়ে দেব তো বলছ। ছাড়লে খাওয়া জুটবে কোথা থেকে?'

দোলন উত্তর দিল না। তার বদনে হঠাৎ প্রমত্ত হাসিতে মেতে উঠল। আর হাসতে হাসতে তার সুঠাম শরীর বেঁকে চুরে দুমড়ে একাকার হয়ে যেতে লাগল।

রাজেশ অবাক। বলল, 'ও কি, অমন পাগলের মতন হাসছ যে?'

দোলন হাসতে লাগল। আর সেই হাসির মধ্যেই বলে উঠল, 'হাসির কথা বললে হাসব না। নেভীর চাকরি ছাড়লে তোমার নাকি খাওয়া জুটবে না! আমি তো জানি অমন দশ বিশ গণ্ডা চাকরি তুমি এখন লোককে দিতে পার।'

রাজেশ নিশ্চুপ। ভবেশ যে তাঁর সব কিছুর উত্তরাধিকার তার হাতে তুলে দিয়েছেন সে খবর কি দোলনের কাছে পৌঁছে গেছে?

দোলন আবার বলল, 'নেভীর চাকরিটাই শুধু তুমি ছাড়বে না। আরো একটা কাণ্ড করবে।'

চকিত রাজেশ রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'কী করব?'

'এবার থেকে রানীপুরেই তুমি থাকবে। রানীপুর ছেড়ে কোথাও যাওয়া তোমার পক্ষে আর সম্ভব হবে না।'

রাজেশ কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, দোলনের মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। মেয়ের দিকে ফিরে বললেন, 'কি রে; ছেলেটার সঙ্গে আবার ঝগড়াঝাটি বাধিয়ে বসিস নি তো? যা ঝগড়াটি তুই।'

দোলন বলল, 'আমাকে কেন, ছেলেকেই জিজ্ঞেস কর ঝগড়া বাধিয়েছি কি-না।'

দোলনের মা প্রশ্ন করার আগেই রাজেশ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না-না, শুধু শুধু ঝগড়া করবে কেন?'

'না করলেই ভাল। তবে নিজের পেটের মেয়ে তো। ওকে কি আমার জানতে বাকি আছে!' বলেই খিল খিল করে হেসে উঠলেন দোলনের মা।

সূর্যটা যখন রানীপুরের মধ্যাকাশে সেই সময় রান্না সেরে রাজেশের সামনে আবার দাঁড়ালেন দোলনের মা। বললেন, 'আমার হয়ে গেছে। তুমি চান করে এসো।' দোলনের দিকে ফিরে বললেন, 'যা, তুইও চানটা সেরে ফেল।'

রাজেশ বলল, 'অত তাড়া কিসের। আমার খুব একটা খিদে পায় নি।

মেসোমশায় ফিরে আসুন না। সবাই একসঙ্গে বসে খাওয়া যাবে'খন।'

'তোমার মেসোমশায় আজ দুপুরে খেতে আসবেন না। প্রেসে খুব কাজের চাপ পড়েছে। ফিরতে ফিরতে অনেক রাত। দুপুরের ভাত পাঠিয়ে দিতে হবে।'

অগত্যা স্নান সেরে আসতে হল রাজেশকে। তারপর একে একে দোলন এবং তার মা-ও স্নান সারলেন।

খাবার ব্যবস্থাও হল বারান্দাতেই। হাতে-বোনা দু-খানা চটের আসন পেতে রাজেশ আর দোলনকে পাশাপাশি খেতে দিলেন দোলনের মা।

খেতে খেতে রাজেশ বলল, 'আচ্ছা মাসিমা, নান্টু-পিন্টুদের তো দেখছি না।'

দোলনের মা বললেন, 'মামাবাড়ি থেকে ওরা এখনও ফেরে নি।'

রাজেশ হাসল। বলল, 'খুব মামার বাড়ির আদর খাচ্ছে।'

কিছুক্ষণ নীরবতা। খাওয়াটা তখন প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় এসে পৌঁছেছে। দোলনের মা হঠাৎ ডেকে উঠলেন 'রাজু—'

খেতে খেতে রাজেশ মুখ তুলল।

দোলনের মা বললেন, 'তখন বলছিলে, কী একটা কথা যেন বলবে—'

'বলব বৈকি ; আপনার খাওয়া-দাওয়া আগে হয়ে যাক—'

'না, তুমি এখনই বল।'

রাজেশ লক্ষ্য করল, তার কথা শুনবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন দোলনের মা। সুতরাং রাজেশকে আরম্ভ করতেই হল। একটু ইতস্তত করে সে বলল, 'আমার কথা তো বলবই। তার আগে আপনাকে ক'টা প্রশ্ন করতে চাই। ঠিক উত্তরটা কিন্তু দিতে হবে।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন দোলনের মা। বললেন, 'কী প্রশ্ন বাবা?'

একটুক্ষণ চুপ করে রইল রাজেশ। তারপর প্রায় মরিয়ার মত বলে ফেলল, 'আপনারা কেন নিজেদের বাড়ি ছেড়ে এই ভাড়াটে বাড়িতে এসে আছেন, আমি তা জানি।'

দোলনের মা বললেন, 'ও-সব কথা থাক রাজু।'

'না, থাকবে না।'

'কিন্তু বাবা—'

'কী?'

'তুমি আমার ছেলের মতন। এখানে আসবে, খাবে, গল্প করবে, হাসবে—মাত্র এটুকুই তোমার কাছে চাই। এর বাইরে কোন অপ্রিয় ব্যাপারে তুমি

আমাদের জন্যে জড়িয়ে পড়, সেটা আমার পক্ষে কিন্তু খুব কষ্টকর হবে।'

দোলনের মায়ের চোখে চোখ রেখে রাজেশ বলল, 'আপনি আমাকে সত্যিই ছেলের মতন ভাবেন, না যা বললেন তা নেহাতই মুখের কথা? সত্যি করে বলুন।'

ব্যথিত স্বরে দোলনের মা বললেন, 'সত্যি-মিথ্যে এতদিন পর মুখ ফুটে না বললে তুমি কি বুঝতে পারবে না রাজু? তোমার মা স্বর্গে গেলে সারাদিন ছাদের ঘরে চুপচাপ মনমরার মতন বসে থাকতে। সেদিন দোলনকে পাঠিয়ে তোমাকে যে ডেকে এনেছিলাম সেই ডাকটার মধ্যে কি মিথ্যে ছিল?'

রাজেশ বুঝল, ঝোঁকের মাথায় আঘাতটা কোথায় কত গভীরে হেনে বসেছে। তাড়াতাড়ি জিভ কেটে বলল, 'আমাকে ক্ষমা করবেন মাসিমা। মায়ের মৃত্যুর পর থেকে আপনাকে মা বলেই জানি। আর সেই জন্যেই বলছিলাম ছেলেরও কিছু কর্তব্য থাকে। আমাকে সেই কর্তব্য আপনি করতে দিন।'

দোলনের মা চোখে চোখ রেখে তাকিয়েই ছিলেন। বললেন, 'তুমি কী বলতে চাও, আমি বুঝতে পারছি না বাবা।'

একটুক্ষণ চুপচাপ। তারপর রাজেশ বলল, 'আচ্ছা মাসিমা আপনি তো জানেন, দশ বছর আমি রানাপুর-ছাড়া। এতকাল পর এখানে ফিরে অনেক কিছুই দেখেছি, অনেক কিছুই শুনেছি। কিন্তু যে দেখাটা সবচাইতে আমাকে বেশি আঘাত দিয়েছে তা হল আপনাদের ভাড়াটে বাড়িতে উঠে আসা। শুনেছি--'

দোলনের মা হঠাৎ অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। বললেন, 'তোমাকে তো একটু আগে বুঝিয়ে দিয়েছি রাজু, এ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে আমার একেবারেই ইচ্ছা নেই। তবু বার বার একই কথা তুলছ কেন?'

'না তুলে পারছি না মাসিমা।'

দৃঢ় কঠিন স্বরে দোলনের মা বললেন, 'তোমাকে পারতেই হবে।'

রাজেশ এবার কেমন যেন অসহায়তা বোধ করল। দোলনের মা যদি তাঁদের বাড়ির প্রসঙ্গটা তুলতে না দেন তা হলে যে প্রস্তাব নিয়ে সে এখানে এসেছে সেটা নিতান্তই অর্থহীন হয়ে যায়।

চিরদিনই দোলনের মায়ের একটি মাত্র পরিচয় রাজেশের জানা। তিনি সরলা, সাবলীলা, অনুষ্ঠহাসিনী। কিন্তু কোন কোন ব্যাপারে যে অনমনীয়াও হয়ে উঠতে পারেন, সে পরিচয় বিশেষ পাওয়া যায় নি। বাড়ি প্রসঙ্গে তিনি যেভাবে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন তারপর আর কিছু বলার মত সাহস প্রাণের

কোন প্রান্ত থেকেই সংগ্রহ করে উঠতে পারল না রাজেশ।

এখন কেউই আর কোন কথা বলছে না। না রাজেশ, না দোলনের মা। দুজনেই নির্বাক, নিঃশব্দ। অতর্কিতে দোলনদের এই একতলা পুরনো বাড়িটা ঘিরে রুদ্ধশ্বাস অস্বস্তি নেমে এল।

অবাঞ্ছিত আবহাওয়াটা কতক্ষণ যে রাজেশের স্নায়ুর ওপর ভারী পাথরের মত অনড় হয়ে থাকত, কে বলবে। হঠাৎ দোলন সীমাহীন সেই নৈঃশব্দের তাল কেটে দিল।

খেতে বসার পর থেকে এতক্ষণ একটি কথাও বলে নি দোলন। স্থির নিবদ্ধ দৃষ্টিতে মা আর রাজেশের দিকে তাকিয়ে একান্ত নীরবে তাদের কথাবার্তা শুনে যাচ্ছিল। এবার সে মুখ খুলল। নিজের মায়ের দিকে ফিরে বলল, 'এত অস্থির হচ্ছ কেন মা? রাজুদা কী বলতে চায়, শোনই না।'

দোলনের মা বললেন, 'কি হবে শুনে। শুধু শুধু তিক্ততাই বাড়বে।'

'না বাড়তেও তো পারে। আগে সব শুনেই নাও।'

দোলনের মা অস্ফুটে কী বললেন, বোঝা গেল না।

এবার রাজেশের দিকে তাকিয়ে দোলন বলল, 'যা বলবার বলে ফেল রাজুদা—'

রানীপুরের দক্ষিণে তাদের সেই বাড়ির প্রসঙ্গ উত্থাপন করার সুযোগ করে দিয়েছে দোলন। এই মুহূর্তে মনে মনে তার প্রতি কৃতজ্ঞতাই বোধ করল রাজেশ। তবু দ্বিধা এবং জড়তা তার কাটল না। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে আস্তে আস্তে দোলনের মায়ের দিকে তাকিয়ে একসময় বলল, 'রানীপুরে এসে শুনেছি, আমার বাবা ঠকিয়ে আপনাদের ঐ বাড়িটা গ্রাস করেছেন।'

দোলনের মা কিছু বললেন না।

মায়ের প্রতিনিধি হিসেবে দোলনই উত্তরটা দিল, 'ঠিকই শুনেছ। প্রথম যেদিন আমাদের এ বাড়িতে আস, সেদিনই আমি তোমাকে সে কথা জানিয়ে দিয়েছিলাম।'

'শুধু তোমার কাছে না, রানীপুরের আরো দুয়েক জনের মুখেও কথাটা শুনেছি।' রাজেশ বলতে লাগল, 'বাড়িটা বাবা প্রতারণা করে নিয়েছেন, এটুকুই মাত্র শুনেছি। কিন্তু প্রতারণাটা কী ধরনের, আমার জানা নেই। তুমি যদি ব্যাপারটা বুঝিয়ে বল, বড় ভাল হয়।'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলল না দোলন। কিছুক্ষণ আত্মমগ্ন এক ভাবনার মধ্যে ডুবে রইল। তারপর খুব আস্তে আস্তে একসময় বলে উঠল, 'ব্যাপার আর কি। বাবা রিটায়ার করার পর ঠিক করলেন একটা প্রেস করবেন। আজ-

কালকার দিনে একটা প্রেস করা তো সোজা কথা নয়। অনেক টাকার দরকার কিন্তু অত টাকা বাবার হাতে ছিল না। প্রাভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে যা পেয়েছিলেন তাতে সংসার চালিয়ে প্রেস করা অসম্ভব। তাই বাবাকে ঋণ নিতে হয়েছিল। বাবা ঋণের জন্যে কার কাছে হাত পেতেছিলেন, জানো? তোমার বাবার কাছে।'

রাজেশ কিছু বলল না।

দোলন আবার বলল, 'তোমার বাবা একটা কাগজে আমার বাবাকে দিয়ে সই করিয়ে পাঁচ হাজার টাকা ধার দিয়েছিলেন। তোমার বাবার শর্ত ছিল, শতকরা মাসিক দু-টাকা সুদ দিতে হবে। অর্থাৎ বার্ষিক শতকরা চব্বিশ টাকা। বাবা নিরুপায়। তাতেই রাজী হতে হয়েছিল তাঁকে। স্থির হয়েছিল, চার বছরের ভেতর টাকাটা বাবা শোধ করে দেবেন।'

দম বন্ধ করে শুনে যাচ্ছিল রাজেশ। উদ্বেগের স্বরে বলল, 'তারপর?'

'তারপর আর কি। কলকাতা থেকে প্রেস কিনে এনে কাজ আরম্ভ করলেন বাবা। 'রানীপুর সংবাদ' বলে একখানা পত্রিকা বার করলেন। কিন্তু মফঃস্বলের শহর। সব খরচ বাদ দিয়ে প্রেস আর পত্রিকা থেকে কতই বা লাভ হতে পারে। কোনরকমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দিন চলতে লাগল।' বলতে বলতে একটু থামল দোলন। পরক্ষণেই আবার শুরু করল, 'দেখতে দেখতে চারটে বছর কেটে গেল। এদিকে আমরা খেয়ে না খেয়ে চরম কৃচ্ছ্রসাধনের ভেতর দিন কাটিয়ে তোমার বাবার ঋণের টাকাটা জমিয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু ঋণ আর শোধ করা গেল না।'

'কেন?'

'কেন গেল না, তুমি অনুমান করতে পার?'

হতভম্বের মত রাজেশ মাথা নাড়তে লাগল। অর্থাৎ পারবে না।

দোলন বলল, 'বেশ, আমিই বলছি। সুদ আর আসলের সব টাকা নিয়ে বাবা আর আমি তোমার বাবার কাছে তো গেলাম। তোমার বাবা খুব খুশী। বাবাকে খুব আদর করে বসিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'ঋণ শোধ করতে এসেছেন। এতো খুব আনন্দের কথা। দিন, টাকা দিন।' বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে গুনে দেখে তোমার বাবা তো অবাক। বলেছিলেন, 'কত টাকা এনেছেন প্রণব বাবু!' বাবা জানিয়েছিলেন, পাঁচ হাজার টাকা আর তার সুদ এনেছেন। শুনে তোমার বাবা বলেছিলেন, 'সেকি মশায়, কুড়ি হাজার টাকা নিয়ে পাঁচ হাজার টাকা দিতে এসেছেন! মাথাটাথা খারাপ হয়ে যায় নি তো!' বাবার তখন সত্যিই মাথা খারাপ হয়ে যাবার অবস্থা। দর দর করে

সারা গা দিয়ে ঘাম ছুটতে শুরু করেছিল। কাঁপতে কাঁপতে বাবা বলেছিলেন, 'এ আপনি কী বলছেন ভবেশ বাবু! মাথাটা আমার খারাপ হয়েছে, না আপনার?' তোমার বাবা বলেছিলেন, 'একটু অপেক্ষা করুন, আপনাকে একটা জিনিস দেখাচ্ছি।' বলে আলমারি খুলে একটা ভাঁজ করা কাগজ এনে বাবার সামনে মেলে ধরেছিলেন। তাতে পরিষ্কার লেখা ছিল, বাবা নগদ কুড়ি হাজার টাকা ঋণ নিয়ে স্বীকৃতি স্বরূপ নীচে সই করে দিয়েছেন। নির্ভুল বাবার সই। তোমার বাবা বলেছিলেন, 'এটা নিশ্চয়ই অস্বীকার করবেন না।' বাবা শুধু বলতে পেরেছিলেন, 'কিন্তু—' তাঁর হাত-পা-সারা শরীর থর থর করে কাঁপতে শুরু করেছিল। করুণা করে তোমার বাবা বলেছিলেন, 'আপনাকে খুব অসুস্থ মনে হচ্ছে প্রণব বাবু। আজ বাড়ি যান। আমি আপনার প্রতিবেশী—একেবারে আত্মীয়ের মতন। টাকা ফেরত দেবার জন্যে অত তাড়াহুড়োর কি আছে। বছর খানেক সময় আপনাকে দিলাম।'

অবরুদ্ধ গলায় রাজেশ বলে উঠল, 'আসলে ব্যাপারটা কী? তোমার বাবা সত্যিই কত টাকা নিয়েছিলেন? পাঁচ হাজার না কুড়ি হাজার?' দোলনের ভ্রূ দুটো ধনুকের মত মুহূর্তে টান হয়ে গেল যেন। চোখের তারায় বিদ্যুৎ ঝলকে গেল। সে বলল, 'তোমাকে একটা কথা বলি রাজুদা. হয় তুমি তোমার বাবাকে আজও চিনতে পার নি নয় সব জেনেশুনেও ন্যাকা সেজে বসে আছ। আমার বাবা আর যাই হোক কুড়ি হাজার টাকা নিয়ে পাঁচ হাজার শোধ করতে যাবেন না। আত্মভোলা হলেও ঋণ ভুলে যাবার মতন মানুষ তিনি নন।' এতক্ষণ যে স্বরে সে কথা বলছিল, তার সঙ্গে এখনকার স্বরটার আশ্চর্য অমিল। স্বরটা এখন তীক্ষ্ণ, শাণিত কর্কশ।

রাজেশ চকিত হয়ে উঠল। বলল, 'তা হলে?'

'তা হলে কী, নিজেই মনে মনে ভেবে দেখ না।'

ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠল রাজেশ। দোলন স্পষ্ট করে কিছু বলে নি। তবে যে ইঙ্গিতটুকু দিয়েছে তা-ই যথেষ্ট। ভবেশের প্রতারণার স্বরূপটা ম্যাজিক লণ্ঠনের ছবির মত চোখের সামনে ফুটে উঠেছে। হ্যাঁ, প্রণব বসুর সই জাল করেছেন ভবেশ। ভবেশ সই জাল করেছেন···কথাটা যতবার ভাবল, বুকের ভেতর বাতাস ততবারই আটকে আসতে লাগল। নিঃশ্বাস নিতে খুবই কষ্ট হচ্ছে।

দোলন বলল, 'তারপর কী হল শুনবে?'

মুখ না তুলে রাজেশ ফিস ফিস করল, 'বল।'

'তোমার বাবা ভদ্রতা করেছিলেন। চার বছরের পরও একটা বছর সময় দিয়েছিলেন। কিন্তু এতখানি মহানুভবতার দাম আমরা দিতে পারিনি।

টাকাটা শোধ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হল না। কাজেই কুড়ি হাজার টাকা আর তার সুদের দায়ে আমাদের বাড়িটা আত্মসাৎ করে ফেললেন তোমার বাবা। আমরা অবশ্য কেস করেছিলাম কিন্তু জিততে পারি নি। কুড়ি হাজার টাকা ধার নিয়েছেন বলে বাবা যে কাগজটায় সই করেছিলেন সেটা কোর্টে জমা দিয়েছিলেন তোমার বাবা। আশ্চর্য, আদালতও সেই সইটার ভেতর কোন খুঁত বার করতে পারেনি।'

রাজেশ কোন কথা বলল না। দোলনের মা অনেকক্ষণ ধরেই নিশ্চুপ একতলা প্রাচীন বাড়িখানা ঘিরে হঠাৎ ভারী কঠিন শ্বাসরুদ্ধ স্তব্ধতা নেমে এল।

কতক্ষণ যে কেটে গিয়েছিল, খেয়াল নেই। এক সময় রাজেশই প্রথম স্তব্ধতা ভাঙল। দোলনের দিকে তাকিয়ে ঝাপসা গলায় সে বলল, 'ব্যাপারটা যে এত সাংঘাতিক আমি জানতাম না।'

অদ্ভুত একটু হাসল দোলন। বলল, 'তুমি জানলে কিছু সুরাহা হত নাকি।'

রাজেশ বলল, 'হয়তো হত।'

দোলন বলল, 'আমাদের দুর্ভাগ্য, সে-সময় তুমি এখানে ছিলে না।'

রাজেশ অনুভব করল, এবারও দোলনের চোখ-মুখ-কণ্ঠস্বর থেকে বিদ্রূপ বিচ্ছুরিত হয়েছে। সেটা উপেক্ষাই করল সে। একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ দোলনের মায়ের দিকে ফিরে ডেকে উঠল, 'মাসিমা—'

এতক্ষণ দোলনের মায়ের ভূমিকা ছিল নির্বাক শ্রোতার। এবার তিনি মুখ খুললেন। বললেন, 'কী বলছ বাবা।'

'আপনাদের কাছে আমি একটা প্রার্থনা নিয়ে এসেছি।'

'কিসের ?'

'বলছি। তার আগে আরেকটা কথা বলে নিই।'

'বল।'

'আপনি জানেন কি-না জানি না, বাবা তাঁর সমস্ত সম্পত্তি আমার নামে লিখে দিয়েছেন।'

একটু আগে যে একটা দমবন্ধ ভারী আবহাওয়া সমস্ত বাড়িটাকে বেষ্টন করে ছিল সে কথা যেন বিস্মৃত হলেন দোলনের মা। উৎফুল্ল স্বরে বললেন, 'ও মা তাই নাকি। কবে দিলেন ?'

রাজেশ বলল, 'এই তো চার পাঁচ দিন হল।'

'বেশ, বেশ। খুব সুখের খবর। ভারি খুশী হলাম।' দোলনের মা বলতে লাগলেন, 'আমি যতদূর জানি তোমার বাবা তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতেন না। যাক তাঁর মতিগতি তা হলে ফিরেছে।'

রাজেশ লক্ষ্য করল. দোলনের মায়ের এত উচ্ছ্বাস এত আনন্দ কোন কিছুই দোলনের ওপর প্রতিক্রিয়াই করতে পারছে না। সে বলল, 'মাসিমা, আমি বাবার সম্পত্তি পেয়েছি। পাবার পর থেকেই মনে মনে একটা কথা স্থির করে ফেলেছি।'

'কী কথা ?' দোলনের মা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

রাজেশ বলল, 'বাবা আপনাদের ওপর যে অন্যায় করেছেন আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই মাসিমা।'

দোলনের মা তৎক্ষণাৎ কিছু বললেন না। সম্ভবত রাজেশ কী বলতে চায় সেটা মনে মনে বিশ্লেষণ করে নিলেন। কিছু একটা অনুমান করলেন সম্ভবত। তারপর নিরুচ্ছ্বাস স্খলিত স্বরে ভেঙে ভেঙে বললেন, 'প্রায়শ্চিত্ত করতে চাও ?'

ব্যগ্র স্বরে রাজেশ বলল, 'হ্যাঁ মাসিমা। আপনি আমাকে একটা সুযোগ দিন।'

হঠাৎ পাশ থেকে দোলন বলে উঠল, 'অত ভণিতা না করে কী করতে চাও, স্পষ্ট করে বলে ফেল।'

প্রথমটা হকচকিয়ে গেল রাজেশ। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'বলছি।' বাবা যখন তাঁর সমস্ত সম্পত্তি আমাকে লিখেপড়ে দিয়েছেন তখন আইনত তোমাদের বাড়িটার মালিকানা আমার নামে এসে গেছে। আমার ইচ্ছে তোমাদের বাড়িটা তোমরা ফিরিয়ে নাও।'

কিছুক্ষন চুপচাপ। তারপর দোলন বলে উঠল, 'বাড়িটা ফিরিয়ে দিতে চাইছ !'

'হ্যাঁ।' রাজেশ মাথা নাড়ল।

স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে চাপা তীব্র স্বরে দোলন ফিসফিসিয়ে উঠল, 'এতটা কিন্তু আমি ভাবতে পারিনি রাজুদা—'

বুঝতে না পেরে রাজেশ বলল, 'কী ভাবতে পার নি ?'

'তুমি যে আজ মহত্ত্ব দেখাবার জন্যে সত্যি সত্যি আমাদের বাড়ি ধাওয়া করবে, এটা ছিল আমার স্বপ্নেরও বাইরে।'

বিব্রত মুখে রাজেশ বলল, 'ন্যায় বা আইনের দিক থেকে ও বাড়িখানা তোমাদের। নিজের জিনিস নিজে নেবে, এর ভেতর আমার মহত্ত্বের কি আছে!'

চোখের কোণে বিচিত্র হেসে দোলন বলল, 'মহত্ত্ব নেই বলছ !'

রাজেশ চুপ করে রইল।

দোলন আবার বলে উঠল, 'কিন্তু রাজুদা তোমাদের কুড়ি হাজার টাকা

আর এত বছরের সুদ তো দিতে পারব না !'

'কে চেয়েছে ঐ টাকাগুলো ?'

'কিন্তু—'

'কী ?'

'পাঁচ হাজার টাকা তো আমার বাবা হাত পেতে নিয়েছিলেন। অন্তত সেই টাকাটা তো দিতে হবে। কিন্তু অত টাকা তো দেবার মত সামর্থ্য আপাততঃ আমাদের নেই।'

রাজেশ বুঝল, ঋণমুক্ত না হয়ে বাড়িটা ফিরিয়ে নিতে দোলনের আপত্তি আছে। তৎক্ষণাৎ সে বলে উঠল, 'ঠিক এক্ষুনি টাকাটা নাই বা দিলে। যখন সুবিধা হয় দিও।'

দোলন এবার আর কিছু বলল না।

হঠাৎ রাজেশের খেয়াল হল, দোলনের মা অনেকক্ষণ নিশ্চুপ। তাঁর দিকে ফিরে সে বলল, 'কি মাসিমা, আপনি তো কিছুই বলছেন না।'

রাজেশের প্রস্তাবটা দোলনের মাকে খুবই চিন্তিত করে তুলেছে। অতএব গভীর এক ভাবনার মধ্যে তিনি মগ্ন হয়ে ছিলেন। রাজেশের ডাকে চকিত হয়ে বললেন 'কী বলব বাবা ?'

'আপনাদের ঐ বাড়িটার ব্যাপারে বড় আশা নিয়ে এসেছিলাম। এ সম্বন্ধে আপনার মতামত—' এই পর্যন্ত বলে রাজেশ থেমে গেল।

দোলনের মা হাসলেন, 'আমি কি মতামত দেবার মালিক বাবা। কথাটা তুমি বলে গেলে। তোমার মেসোমশায়কে বলি। দেখি, উনি কী বলেন এ-ব্যাপারে—'

এবার অনুনয়ের সুরে রাজেশ বলল, 'মেসোমশায়কে আমার হয়ে একটু বুঝিয়ে বলবেন, যাতে বাড়িটা নিতে উনি রাজী হন। আর যদি বলেন আমি দেখা করলে ভাল হয়, তা হলে না হয় আজই প্রেসে গিয়ে—'

রাজেশের কথা শেষ হবার আগেই দোলনের মা তাড়াতাড়ি বললেন, 'আজ তোমার দেখা করার দরকার নেই। আগে আমি ওঁকে সব বলি। তারপর যদি মনে করি তুমি দেখা করলে ভাল হবে তখন তোমাকে বলব।'

'আচ্ছা'।

এতক্ষণ কথায় কথায় কেউ খেয়াল করেনি, পশ্চিম আকাশের ঢালু বেয়ে সূর্যটা ইতিমধ্যেই নেমে গেছে। গ্রীষ্ম ঋতুর রোদের উত্তাপ সবার অলক্ষ্যে জুড়িয়ে যেতে শুরু করেছে। সেদিকে প্রথম নজর পড়ল দোলনের। খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। লাফ দিয়ে আসন থেকে উঠে দ্রুত আঁচিয়ে এসে সে বলল, 'ইস,

বেলা হেলে গেল। ওদিকে বাবার পিত্তি পড়তে শুরু করেছে। তাড়াতাড়ি টিফিন কেরিয়ারে ভাত দিয়ে দাও মা। আমি জামা-কাপড়টা বদলে আসি।' বলেই দক্ষিণ দিকের একটা ঘরে গিয়ে ঢুকল।

কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন দোলনের মা। ব্যস্তভাবে রান্নাঘরে চলে গেলেন তিনি।

এদিকে রাজেশ মনে মনে খুবই কুণ্ঠাবোধ করতে লাগল। তারই জন্য একটি লোক এখনও অভুক্ত রয়েছেন।

মুহূর্তে টিফিন কেরিয়ার সাজিয়ে রান্নাঘর থেকে চলে এলেন দোলনের মা। দোলনও বাড়ির আটপৌরে সাজটাকে বদলে অনেকখানি শোভন হয়ে দক্ষিণের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তারপর মায়ের হাত থেকে টিফিন কেরিয়ারটা নিয়ে উঠানে নামতে নামতে রাজেশের দিকে ফিরে বলল, 'তোমার কিছু কাজ আছে নাকি এখন ?'

রাজেশ বলল, 'না, কাজ আর কি। এখান থেকে সোজা বাড়ি ফিরব।'

'তা হলে এস না আমার সঙ্গে। গল্প করতে করতে খানিক দূর যাওয়া যাবে'খন।'

ব্যাপারটা চমকপ্রদ এবং অভাবনীয়ও। দোলন তার সঙ্গী হতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। কী উদ্দেশ্য তার ? প্রথমটা বিচিত্র সংশয়ে সমস্ত অস্তিত্ব আচ্ছন্ন হয়ে গেল রাজেশের। পরক্ষণেই মনে হল, এটাই তো স্বাভাবিক। সে আজ যে প্রস্তাব নিয়ে এসেছে তাতে যে কোন রূঢ় মানুষও নরম হতে বাধ্য। রাজেশের ধারণা, শ্লেষবিদ্রূপময়ী তীক্ষ্ণভাষিণী দোলন কৃতজ্ঞতার পথেই তাকে ডাক দিয়েছে।

আঁচিয়ে এসে রাজেশ বলল, 'চল।' বলে আর অপেক্ষা করল না। লম্বা পায়ে উঠোনে নেমে এল।

নিশির ঘোরের মত তীব্র এক আচ্ছন্নতার মধ্যে দোলনের পাশাপাশি অনেকক্ষণ হাঁটল রাজেশ। হাঁটতে হাঁটতে একসময় দোলন ডেকে উঠল, 'রাজুদা—'

রাজেশ যেন উদ্‌গ্রীব হয়েই ছিল। তৎক্ষণাৎ সাড়া দিল, 'বল—'

'সত্যি করে একটা কথার জবাব দেবে ?'

'জবাবটা জানা থাকলে নিশ্চয়ই দেব।'

'আমাদের বাড়িটা ফিরিয়ে দেবার পাগলামি হঠাৎ তোমার মাথায় চাড়া দিয়ে উঠল কেন ?'

'পাগলামি বলছ কেন ?'

'তা হলে কী ?'

'এটা আমার কর্তব্য।'

দোলন এবার আর কিছু বলল না। বিচিত্র নিঃশব্দ হাসিতে তার ঠোঁ আর চোখের প্রান্তে খাঁজ পড়তে লাগল।

রাজেশ প্রথমটা থতমত। তারপর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি হাসলে যে?'

দোলন বলল, 'তোমার ঐ কর্তব্যের কথায় হাসি পেয়ে গেল।'

'ওটা কি হাসির কথা?'

কথাটার উত্তর না দিয়ে বলল, 'আচ্ছা রাজুদা—'

'বল।'

'তুমি কেন আমাদের বাড়িটা ফিরিয়ে দিতে চাইছ, মোটামুটি বুঝতে পেরেছি বোধহয়।'

রাজেশ কৌতূহল বোধ করল। বলল, 'কেন দিতে চাইছি?'

নিজের বুকে একটা আঙুল রেখে দোলন বলল, 'এই আমার জন্যে।'

'তোমার জন্যে!' রাজেশের গলায় তরঙ্গ খেলে গেল।

'নিশ্চয়।'

'তুমি কি বলতে চাইছ, বুঝতে পারছি না।'

'বেশ, বুঝিয়ে দিচ্ছি।' বলে দোলন একটু চুপ করল। তারপর রাজেশে দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে বলল, 'আমার বাবার যদি আমার মতন একটা সুন্দ যুবতী মেয়ে না থাকত তা হলে কি বাড়িটা ফিরিয়ে দেবার এতখানি উৎসাহ তোমার হত রাজুদা?'

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠল রাজেশ। সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে দিয়ে হিমাক্ত একটা স্রোত দুরন্ত দ্রুত গতিতে ছুটে গেল। শিথিল কাঁপা গলায় সে বলল, 'এ তুমি কী বলছ! ছিঃ!'

'কথাটা শুনতে খুব খারাপ কিন্তু নিজের মনের দিকে একবার চোখ ফেরাও দেখবে এর চাইতে সত্যি আর কিছু নেই।'

রাজেশ কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল কিন্তু তার স্তম্ভিত বিমূঢ় সত্তার অতল থেকে একটি কথাও উঠে এল না।

নিজের অবচেতনে কী আছে, রাজেশ জানে না। কিন্তু বাড়িটা ফিরিয়ে দেবার ভাবনা যখন তাকে পেয়ে বসে তখন মনের সজ্ঞান স্তরের কোথাও দোলনের ছায়া ছিল না। সে ছুটে এসেছিল প্রাণের মধ্যেকার নিদারুণ এক যন্ত্রণার তাড়া খেয়ে।

যাই হোক দোলনের সঙ্গ এই মুহূর্তে অসহনীয় মনে হচ্ছে। কে জানত

অমন উদার আমন্ত্রণে কুহকিত করে দোলন তাকে নিয়ে এমন নিষ্ঠুর প্রাণান্তকর খেলায় মেতে উঠবে।

হঠাৎ দোলন ডেকে উঠল, 'রাজুদা—'

রাজেশ সাড়া দিল।

ঈষৎ কোমল স্বরে দোলন বলল, 'মনে মনে খুব কষ্ট পেলে তো?'

দুর্বোধ্য গলায় রাজেশ কী বিড় বিড় করল বোঝা গেল না।

দোলন আবার বলল, 'তোমায় একদিন বলেছিলাম আমার সংস্পর্শে এলে দুঃখই পেতে হয়।'

রাজেশ নিশ্চুপ।

দোলন বলতে লাগল 'যাক ওসব কথা। ধরে নিলাম তুমি না হয় কর্তব্যের খাতিরে আমাদের বাড়িটা ফিরিয়ে দিতে এসেছ। তবু কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যায়।'

এতক্ষণে মুখ খুলল রাজেশ। সাগ্রহে বলল, 'কী?'

'কর্তব্যটা শুধু আমাদের ওপর করলেই চলবে না। এই রানীপুর শহরে কত লোককে তোমার বাবা সর্বস্বান্ত করেছেন, কত লোকের বাড়িঘর আত্মসাৎ করেছেন তা বোধ হয় তুমি জানো না। আমাদের ওপর কর্তব্য করতে চাইছ জানলে তারা কিন্তু তোমাকে ছাড়বে না রাজুদা। যখন তারা দল বেধে বর্গীর মত তোমার কাছে হানা দেবে তখন কী করবে?'

রাজেশ এ দিকটা ভাবে নি। তা ছাড়া আর কারুকে ভবেশ পথে বসিয়েছেন কি-না, সে খবরও সঠিকভাবে তার জানা নেই। বিব্রত বিমূঢ়ের মত সে দোলনের দিকে তাকাল কিন্তু কিছুই বলতে পারল না।

রাজেশ নিরুত্তর।

দোলন আবার বলল, 'ভয় পেয়ে গেলে নাকি?' বিদ্রূপের সূক্ষ্ম বিসর্পিত একটি রেখা তার ঠোঁটের ফাঁকে ফুটে উঠল।

একটা ঢোক গিলে রাজেশ কোন রকমে বলতে পারল, 'না, ভয়ের কি। যদি সত্যিই তারা আসে আর যদি দেখি বাবা সত্যিসত্যিই তাদের ঠকিয়েছেন নিশ্চয়ই তাদের জিনিস তাদের ফিরিয়ে দেব।'

'এমন কথা বললে হাততালি পাওয়া যায় কিন্তু।'

'হাততালির জন্যে বলিনি। কাজে করেও দেখাব।'

'সত্যি?'

'নিশ্চয়ই।'

দোলন বলল, 'সেই সুদিনের দিকে তাকিয়ে তা হলে বসে থাকি।'

দোলনের সঙ্গ এবার কিছুটা সহনীয় হয়ে এল রাজেশের কাছে। সে বলল, 'সত্যিই যদি ওদের জিনিস ফিরিয়ে দিই তোমাদের বাড়িটা নিতে আপত্তি হবে না তো ?'

অন্যমনস্কের মত দোলন বলল, 'আগে তো দিয়ে নাও, তারপর দেখা যাবে।'

কথায় কথায় তারা বাজারপাড়ার কাছাকাছি এসে পড়েছিল। হঠাৎ দোলন বলে উঠল, 'আচ্ছা রাজুদা, আমরা যে একটা পত্রিকা বার করি, তুমি নিশ্চয়ই তা জানো।'

'শুনেছি—কি যেন নাম—'রানীপুর সংবাদ' তো ?'

'হ্যাঁ।' দোলন মাথা নাড়ল। বলল, 'পত্রিকাটা তুমি কখনও দেখেছ ?'

'না।'

'দেখতে ইচ্ছে করে ?'

সাগ্রহে রাজেশ বলল 'করে বৈকি !'

'আমি তোমাকে এই সপ্তাহের এক কপি 'রানীপুর সংবাদ' দিতে চাই।'

'বেশ তো।'

এবার দোলন করল কি, শাড়ীর কোন এক গোপন প্রান্ত থেকে একটা ভাঁজকরা ছাপানো পত্রিকা বার করে রাজেশের দিকে বাড়িয়ে দিল। বলল, 'এই নাও।'

হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিল রাজেশ এবং অসীম ব্যগ্রতায় তৎক্ষণাৎ সেটা খুলতে গেল। খোলা আর হল না। বাধা দিয়ে দোলন ব্যস্তভাবে বলে উঠল 'উহু—উহু—'

'কী ?' একটু বিস্মিতই যেন হল রাজেশ।

'এখন খুলো না। একেবারে বাড়ি গিয়ে পড়ো।'

'আচ্ছা।' কাগজের একটা ভাঁজ খুলে ফেলেছিল রাজেশ। আবার সেটাকে আগের মত মুড়ে জামার পকেটে রেখে দিল।

এরপর কিছুক্ষণ চুপচাপ। নিঃশব্দে হাঁটতে হাঁটতে দু-জনে বাজারপাড়ার একেবারে মাঝখানে এসে পড়েছিল। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল দোলন। সুতরাং রাজেশকেও থামতে হল।

দোলন বলল, 'ইস্, কথায় কথায় তোমায় কতদূর টেনে এনেছি। আর না, এবার বাড়ি ফের। একটা রিক্সা নাও, কষ্ট করে আর হেঁটে যেতে হবে না।'

ফিরে যাবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। ঈষৎ অনুনয়ের সুরেই রাজেশ বলল,

'এখন বাড়ি ফিরে আর কাজ নেই। চল না, তোমার সঙ্গে আরেকটু যাই।'

'কোথায় যাবে?' আমি তো প্রেসে যাচ্ছি।' দোলনের স্বর এবার বেশ কঠিনই।

মনে মনে শঙ্কিত হল রাজেশ। ভয়ে ভয়ে জড়িত গলায় বলল, 'চল না, তোমাদের প্রেসটা দেখে আসি। কতকাল পর রানীপুর ফিরলাম, তোমাদের বাড়ি ক'দিন গেলামও। কিন্তু মেসোমশায়ের সঙ্গে দেখাই হল না। আজ এতদূর যখন এসেই পড়েছি, দেখাটা সেরেই আসি।'

রূঢ় শীতল স্বরে দোলন বলল, 'না।'

রাজেশ হকচকিয়ে গেল, 'কী না?'

'প্রেসে যেতে হবে না তোমাকে।'

স্পষ্ট নির্দেশ। তবু রাজেশ বলল, 'আমি গেলে তোমাদের প্রেস অপবিত্র হয়ে যাবে নাকি!' তার স্বরে শ্লেষের আভাসটুকু গোপন রইল না।

এতকাল পর রানীপুরে ফেরা থেকে ক্রমাগত একের পর এক আঘাত এসেছে দোলনের কাছ থেকে। আজই প্রথম তার দিক থেকে মৃদু প্রত্যাঘাত ফিরে গেল। দোলন কি একটু অবাক হল। স্থির নিষ্পলকে রাজেশের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'না, অপবিত্র হবে কেন?'

'তা হলে?'

'তোমাকে 'রানীপুর সংবাদে'র যে সংখ্যাটা দিলাম, আগে সেটা পড়ে নাও। পড়ার পরও যদি আমাদের প্রেসে আসার রুচি থাকে, এসো।'

'বেশ।'

দোলন আর অপেক্ষা করল না। দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল রাজেশ। তারপর বাজারপাড়ার রাস্তায় লক্ষ্যহীনের মত ঘুরে বাড়ির পথ ধরল।

দোলন যে কাগজখানা দিয়েছে সেটা সম্বন্ধে নিদারুণ কৌতূহল ছিল রাজেশের। কী এমন থাকতে পারে তার মধ্যে? কী?

ঔৎসুক্য ছিল, তবু বাড়ি ফিরে নিজের ঘরখানায় ঢুকে দক্ষিণের সীমাহীন মাঠখানার দিকে তাকিয়ে অনেকটা সময় দাঁড়িয়ে রইল রাজেশ। তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজের মধ্যে কেমন যেন অবসাদ বোধ করল। সেই সঙ্গে অপরিসীম ক্লান্তি। বার বার দোলনের দিকে ছুটে গেছে সে। যতখানি সে এগিয়েছে ঠিক ততখানিই পিছিয়ে গেছে দোলন। ফলে মাঝখানের ব্যবধান দুস্তরই থেকে গেছে।

আচ্ছন্নের মত কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, খেয়াল নেই। তারপর কখন সন্ধ্যা নেমেছে, তা-ও মনে নেই।

একসময় মাঠের দিক থেকে সরে এসে উত্তরের দেওয়ালে গিয়ে বোতাম টিপে আলো জ্বালল রাজেশ। তারপর নিজের বিছানায় গিয়ে বসল।

মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন যেন সেই পত্রিকাটার কথা ভুলে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে সেটা বার করে ভাঁজ খুলে আলোয় মেলে ধরলে রাজেশ।

কি আর এমন! আকারে সাধারণ খবরের কাগজের অর্ধেক হবে। এপিঠ ওপিঠ ধরে মোট চার পৃষ্ঠা। মফঃস্বল শহর থেকে যে সব পত্রিকা বার হয় তাদের নিজস্ব একটা চেহারা আছে। 'রানীপুর সংবাদ' তার বাইরে নয়।

মোট কথা বাইরের সাজসজ্জার দিক থেকে 'রানীপুর সংবাদ' সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হবার কিছু নেই। অতি দীন চেহারার বৈশিষ্টবর্জিত নগণ্য কাগজ 'রানীপুর সংবাদ'।

বসন-ভূষণ-প্রসাধন যেমনই হোক, বৈশিষ্ট্য কি সত্যিই নেই কাগজটায়? অবহেলার সঙ্গে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এক জায়গায় এসে দৃষ্টিটা থমকে গেল রাজেশের। সেখানে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে:

'দশবছর পর রানীপুরে যুবরাজের আবির্ভাব।'

তার তলায় ছোট ছোট হরফে যা লেখা আছে তা এইরকম:

> 'রানীপুরের মুকুটহীন সম্রাট একদা যুবরাজকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। তখন যুবরাজের বয়স আর কত? কৈশোর এবং যৌবনের বয়ঃসন্ধিতে সবেমাত্র পা দিয়াছে।'

এই পর্যন্ত পড়েই চমকে উঠল রাজেশ। স্নায়ুগুলো একটু আগে শ্লথ ছিল। মনে হল, এইমুহূর্তে কেউ যেন কষে সেগুলো বেঁধে দিয়েছে। সে পড়তে লাগল:

> 'আমরা শুনিয়াছি বিতাড়িত যুবরাজ মনের খেদে শেষ পর্যন্ত সমুদ্রে পাড়ি জমাইয়াছিল। দশ বৎসর ছন্নছাড়ার মত নোনা বাতাস খাইয়া দুনিয়ার বন্দরে বন্দরে সে ভাসিয়া বেড়াইয়াছে। অবশেষে কিছুদিন হইল ভাগ্য তাহার প্রতি কৃপাকটাক্ষ হানিয়াছে। সম্রাটের মনে কী ছিল, তিনিই জানেন। অকস্মাৎ

অপত্য স্নেহের ফোয়ারা ছুটাইয়া দশ বৎসর পর যুবরাজকে রানীপুরে ফিরাইয়া আনিয়াছেন।

আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিয়াছি, গত পরশু দিন সদর শহরে ক্রাউন প্রিন্সের রাজ্যাভিষেক হইয়া গিয়াছে। সম্রাট তাঁহার সাম্রাজ্য যুবরাজের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন।

আমাদের প্রগাঢ় ইচ্ছা সত্ত্বেও যথাসময়ে সদরে উপস্থিত হইতে পারি নাই। পাঠকের জ্ঞাতার্থে জানাইতেছি, ইহাতে আমাদের বিশেষ ত্রুটি ছিল না। প্রথমত আমরা নিমন্ত্রিত হই নাই। তথাপি রবাহূতের মতই যাইতাম। কিন্তু অভিষেকের পূর্বে সে সংবাদ আমরা ঘুণাক্ষরেও পাই নাই।

এ অভিষেকে ব্যাণ্ড বাজে নাই, আলো জ্বলে নাই, উৎসবের সমারোহও ছিল না। সম্রাট সব কিছু করিতে চাহিয়াছিলেন সবার চোখের অন্তরালে।

কাহাকেও কিছু না জানাইয়া, চুপিসারে সাম্রাজ্য হস্তান্তরের ব্যবস্থাটি হইয়াছিল ভালই। তবু সব কাঁচাইয়া গিয়াছে। রানীপুরের জনৈকা শিক্ষিকা কেমন করিয়া যেন জানিতে পারিয়া সদরে ছুটিয়াছিলেন। এবং সেখানে রীতিমত একটি নাটক জমিয়া উঠিয়াছিল। আমাদের আপসোস, পূর্বাহ্নে রানীপুরবাসীদের খবরটা দিতে পারিলে বিনা পয়সায় মজাদার নাটকটি দেখিয়া আসিতে পারিতেন।

সম্রাট এবং ক্রাউন প্রিন্স বলিতে আমরা যাহাদের কথা বলিতেছি তাহাদের নাম ভাঙিয়া বলার বোধ হয় প্রয়োজন নাই। সাধু বুঝ, যে জান সন্ধান।

যাহা হউক, কী উদ্দেশ্যে রানীপুরের সম্রাট বদল হইল, জানি না। তবে উদ্দেশ্য যে মহৎ নয় এর সম্বন্ধে আমরা সুনিশ্চিত। এই পরিবর্তনের ফল যে এ অঞ্চলের পক্ষে বিশেষ শুভ হইবে না, সে কথা আগেই বলিতে পারি। কেননা, যে লম্পট প্রতারক হৃদয়হীন পশুর রক্ত যুবরাজের শরীরে

প্রবাহিত আর যাহাই হউক তা সং শুদ্ধ আলোকিত জীবনের পথ খুঁজিয়া পাইবে না।

রানীপুরের নূতন ভাগ্য বিধাতা কি ভাবে কোন পথে চলে তাহা দেখিবার জন্য আমরা উদ্গ্রীব হইয়া রহিলাম। রানীপুরবাসীদের আমরা প্রতিশ্রুতি দিতেছি, নবাগত যুবরাজের চলাফেরা ওঠাবসার প্রতিটি খুঁটিনাটি সংবাদ এই পত্রিকা মারফত জানাইয়া দিব।'

সম্রাট আর যুবরাজ যে কে, সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র অস্পষ্টতা নেই। সাধারণ ক'টি শব্দ একসঙ্গে জোড়া লাগালে তার ইঙ্গিত যে এত তীক্ষ্ণ, এত কর্কশ এবং মর্মভেদী হয়ে উঠতে পারে—এ ছিল রাজেশের পক্ষে অকল্পনীয়। দোলন যে কতখানি নিষ্ঠুর, কতখানি হৃদয়হীন, এই সামান্য কয়েক ছত্র লেখার মধ্য থেকে তা যেন নিদারুণভাবে ফুটে উঠেছে।

তার জগৎ এবং দোলনদের জগৎ যে একেবারে ভিন্ন এবং দুয়ের মধ্যে যে বিন্দুমাত্র মিল, পারম্পর্য বা সঙ্গতি নেই—নিরাবরণ নগ্ন ভাষায় তা বুঝিয়ে দিয়েছে দোলন।

চার

আক্রমণটা যে এত দ্রুত অতর্কিতে এসে পড়বে, কে ভেবেছিল। অন্তত রাজেশের সুদূর কল্পনাতেও তার ছায়া ছিল না।

কাল দুপুরে বাড়ি ফিরিয়ে দেবার প্রস্তাব নিয়ে দোলনদের বাড়ি গিয়েছিল সে। কথায় কথায় এরকম ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলেছিল, ভবেশ যাদের প্রতারণা করে যে সব সম্পত্তি গ্রাস করেছেন সে সব তাদের ফিরিয়ে দেবে। কাল বুঝতে পারে নি, কত বড মারণবাণ সে দোলনের হাতে তুলে দিয়ে এসেছে।

ব্যাপারটা বলার আগে কাল রাত্রের অন্য একটা প্রসঙ্গ জানা দরকার।

দোলনের কাছে বিদায় নিয়ে বাড়ি গিয়ে কাল রাতে 'রানীপুর সংবাদে' সেই খবরটা পাবার পর জীবনের স্বাদ কেমন যেন কটু হয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল, এতকাল পর রানীপুরে ফেরা তার নিরর্থক হয়ে গেছে।

কাগজটা হাতের মুঠিতে ডেলা পাকিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছিল রাজেশ। কতক্ষণ শুয়ে ছিল, খেয়াল নেই। ইতিমধ্যে ভবেশ বাড়ি ফিরে খাবার জন্য

দু-বার বয় পাঠিয়েছিলেন। সে জানিয়ে দিয়েছিল, খাবে না। বয় মারফত খাবে না জেনেও নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি ভবেশ। স্বয়ং এসেছিলেন। বলেছিলেন, 'খাবি না কেন ?'

রাজেশ বলেছিল, 'খিদে নেই।'

ঈষৎ উদ্বিগ্ন সুরে ভবেশ এবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কেন, শরীর খারাপ লাগছে নাকি ?'

'না।'

একটু চুপ করে থেকে ভবেশ প্রশ্ন করেছিলেন, 'দুপুরে নাকি বাড়িতে খাস নি। কোথায় খেয়েছিলি ?'

রাজেশ মিথ্যেই বলেছিল, 'একটা হোটেলে খেয়ে নিয়েছিলাম।'

'এ রকম যেখানে সেখানে খাওয়া ঠিক না। বাড়িতে খাবার সাজানো থাকতে হোটেলে খেতে যাবার দরকারটা কী ?' যত্রতত্র খাবার অপকারিতা সম্বন্ধে মাঝারি মাপের একটা বক্তৃতা দিয়ে এবং ছেলের পাকস্থলী সম্পর্কে সবিশেষ চিন্তাগ্রস্ত হয়ে নিজের হাতে খানিকটা যোয়ানের আরক নিয়ে এসেছিলেন ভবেশ। রাজেশকে সেটুকু খাইয়ে, তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ার উপদেশ দিয়ে চলে গিয়েছিলেন।

ভবেশ হয়তো মনে করেছিলেন, হোটেলে খাবার দরুণ ছেলের পেটের কিছু গোলমাল হয়ে থাকবে। সে জন্য খেতে তার অনিচ্ছা। কিন্তু অন্তর্যামী হলে তিনি বুঝতে পারতেন, আসল বিপর্যয়টা পাকস্থীতে নয়, হৃদ্‌যন্ত্রে।

যাই হোক, 'রানীপুর সংবাদে'র সেই তীক্ষ্ণ শাণিত বিস্ফোরক হরফগুলো ভাবতে ভাবতে কাল রাত্রে কখন যেন একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিল রাজেশ।

আজ ভোরে রাজেশের ঘুম ভাঙল বিশ্রী চেঁচামেচিতে। ধড় মড় করে উঠে কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে রইল রাজেশ। চিৎকারটা কোন'দিক থেকে আসছে খুব সম্ভবত, বুঝতে চেষ্টা করল। মনে হল, যেন নীচ থেকেই আসছে। এখন কি এমন ঘটতে পারে যাতে ভোরের শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে ! মাসখানেক মাসদেড়েকের মত রানীপুর এসেছে রাজেশ। কিন্তু এ বাড়িতে কোন দিন কারুকে গলা চড়িয়ে কথা বলতে শোনে নি।

তা হলে আজ ভোরে এমন একটা বিশ্রী রকমের ছন্দোপতন ঘটল কেন ? কিছুটা বিরক্তি, কিছুটা বা কৌতূহলের মধ্যে পায়ে পায়ে নীচে নেমে এল রাজেশ।

এবার সেই না-বলা ব্যাপার।

নীচে নেমে রাজেশ যা দেখল, তা দেখবার মতই। পোর্টিকোর তলায় একটা অস্বাভাবিক লম্বা লোক গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে আর তিড়িং তিড়িং লাফাচ্ছে। চেঁচাতে চেঁচাতে এবং লাফাতে লাফাতে প্রায়ই সে দরজার দিকে তেড়ে আসছে। উদ্দেশ্য মহৎ—ভেতরে ঢোকা। কিন্তু এ বাড়িতে চাকর-বাকরেরা সপ্তরথীর মত তাকে ঘিরে রেখেছে। সেই ব্যূহ ভেদ করে লোকটা ভেতরে ঢুকতে পারছে না।

লোকটাকে প্রৌঢ় বলা যায় না' আবার বৃদ্ধ বললেও অবিচার করা হবে। সে অস্বাভাবিক লম্বা বলেই বোধ হয় কিছুটা কুঁজো দেখায়। বেতের মত পাকানো চেহারা, শাঁস বলতে তার কিছুই নেই। হেজে যাওয়া মাথাটায় পেছন দিকে জয়ধ্বজার মত একটা টিকি। লাফানির তালে তালে সেটা নাচছে।

একে এ বাড়িতে আর কখনও দেখেছে বলে মনে করতে পারল না রাজেশ। কেন সে চীৎকার করছে, বাড়ির ভিতর ঢোকার উদ্দেশ্যই বা তার কি—কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। যাচ্ছে না বলেই একটু যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল রাজেশ।

নিশ্চিন্তে খুব বেশিক্ষণ দর্শনের সৌভাগ্য হল না। একটি দারোয়ানের নজর এসে পড়ল রাজেশের ওপর। এতক্ষণ নিদারুণ একটা সমস্যার মধ্যে ছিল যেন সে। রাজেশকে দেখতে পেয়ে অভিযোগের স্বরে বলল, 'দেখিয়ে—দেখিয়ে এ বুড্ঢা বহুত ঢেরা আদমী। অন্দরমে ঘুস্‌নে মাঙতা।'

ধরা যখন পড়েই গেছে তখন আর নির্লিপ্ত থাকা চলে না। পায়ে পায়ে সামনে এগিয়ে এল রাজেশ। তারপর সেই লোকটার চোখে চোখ রেখে বলল, 'ব্যাপার কী? আপনি কে?'

রাজেশকে দেখে লাফানি এবং চিৎকার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। লোকটা বলল, 'আমার নাম রমণী ভটচায।' একটা বেলো ছেঁড়া হারমোনিয়মের গোটাতিনেক রিড একসঙ্গে চেপে ধরে বাজালে যে রকম মিশ্র আওয়াজ বার হয়, লোকটার গলার স্বর অনেকটা সেই রকম।

এবার বিরক্ত স্বরে রাজেশ বলল, 'আপনি থাকেন কোথায়?'

'এই রানীপুরেই। এখেনকার যত আদি বাসিন্দে আছে আমি তাদের একজন।'

'তা এখেনে এসে চেঁচামেচি করছেন কেন? কী চান আপনি?'

'একটুন ভেতরে যেতে চাই।'

'ভেতরে কী দরকার?'

একটুক্ষণ চুপ করে রইল রমণী ভটচায। চোখের পাতাদুটো বারকয়েক নাচল। তারপর বলল, 'আমি একজনের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

রাজেশ প্রশ্ন করল, 'কার সঙ্গে ?'

'হিরণ্যকশিপুর ব্যাটা পেহ্লাদের সঙ্গে।'

'মানে !'

'মানে ভবেশ বাঁড়ুজ্জের ছেলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

এক মুহূর্ত কি ভাবল রাজেশ। তারপর শ্বাস রুদ্ধ করে বলল, 'আমিই ভবেশবাবুর ছেলে। কী দরকার বলুন।'

'তা হলে তুমিই!' রমণী ভটচাজের চোখেমুখে এবং গলার স্বরে ঢেউএর মত কি যেন খেলে গেল। হাঁটু ভেঙে বাঁকা ঠামে অনেকখানি হেলে জড়িয়ে জড়িয়ে গেয়ে উঠল, 'কৃষ্ণ দাঁড়াও হে কালো রূপ হেরি নয়নে। দেখে জেবন সাত্থক করি।'

রাজেশ স্বরটাকে দৃঢ় করে বলল, 'এসব কী ?'

তার কথা বোধহয় শুনতেই পেল না রমণী ভটচায। আপন মনে বলে যেতে লাগল 'আমি দেঁতেল গেঁজেল মানুষ বাবাজী। গাঁজা খেয়ে খেয়ে স্বরটা আউরে গেছে। কান খাড়া না রাখলে আমার কথা ঠিক মতন বুঝতে পারবে না। তাই—'

ধমক দিয়ে উঠল রাজেশ, 'বাজে কথা শোনার সময় এখন আমার নেই। যদি কোন দরকার থাকে বলতে পারেন। নইলে আমি ওপরে যাচ্ছি।'

এবার একটু হকচকিয়ে গেল রমণী ভটচায। কিন্তু তা নিমেষের জন্যই। পরমুহূর্তে স্বভাবসিদ্ধ সেই ভঙ্গিতে বলে উঠল, 'সেকালে দাতা কন্নের নাম শুনেছিলুম। একালে তুমি নাকিন তা-ই হয়ে এসেছ ?'

'আপনি কী বলতে চান স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলুন।'

দারোয়ান আর চাকরগুলো ধৈর্য ধরে এতক্ষণ একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার তাদের মধ্যে কিছুটা চাঞ্চল্য দেখা দিল যেন। একটা দারোয়ান সাহসে ভর করে তাদের ছোট সাহেবের উদ্দেশে জানাল, তিনি যদি মেহেরবানি করে ফরমাশ করেন এই বেআদপ অসভ্য লোকটাকে তারা বাড়ির বার করে দ্যায়।

হাতের ইঙ্গিতে দারোয়ানদের নিরস্ত করল রাজেশ।

এবার রমণী ভটচায বলে উঠল, 'শুনলুম তুমি নাকি বাবাজী—'

বাধা দিয়ে কঠিন সুরে রাজেশ বলল, 'বাবাজী টাবাজী বলবেন না। আমার নাম রাজেশ। রাজেশই বলবেন।'

লোকটার চোখে সম্ভবত পর্দা নেই। গায়ের চামড়াও বিশেষ ইতর প্রাণীর মত পুরু। রাজেশের আঘাত তার গায়ে বিঁধল না যেন। খ্যাল খ্যাল করে হেসে রমণী ভটচায বলল, 'তা যা বলেছ বাপু! খুড়ি কি যেন নামটা বললে,

ও হ্যাঁ রাজেশ—তোমরা হলে গে লেখাপড়া জানা শহর-বাজারের ছেলে। তোমাদের কেন 'বাবাজী-টাবাজী' ভাল লাগবে ? তবে কথাটা কী, জানো—'

নীরস রুক্ষ সুরে রাজেশ বলল, 'কী ?'

'আমরা মুখ্যুসুখ্যু গেঁইয়া মানুষ। 'বাবাজী-টাবাজী' গুলোন আমাদের কথার মাত্রা—গয়নাও বলতে পার। ঐ জন্যে রাগ করে থেকো না বাবাজী, থুড়ি রাজেশ।'

লোকটা ধূর্ত অথবা সরল মারপ্যাঁচহীন, এই মুহূর্তে বোঝা যাচ্ছে না। গম্ভীর মুখে রাজেশ বলল, 'কী দরকারে আমার কাছে এসেছেন, তাড়াতাড়ি সেটা সেরে ফেলুন। ঘুম থেকে উঠে সোজা এখানে নেমে এসেছি। মুখ-টুখ কিছুই ধোয়া হয় নি। নিন, 'বলুন—'

'বলছি বাবা, বলছি'—রমণী ভটচায বলল, 'কিন্তুন—'

বিরক্ত মুখে রাজেশ বলল, 'আবার কী হল ?'

আড়চোখে দারোয়ান চাকরদের দেখিয়ে রমণী ভটচায বলল, 'তোমার এই নন্দী ভৃঙ্গীদের একটুন সরতে হবে যে রাজেশ। যা বলতে এসেছি স্রেফ তোমার কাছেই বলব।'

নাঃ, লোকটাকে নিয়ে আর পারা যায় না। রাগ, বিরক্তি, বিতৃষ্ণা—সবই পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। তথাপি প্রাণের অতল স্তরে কোথায় যেন দুর্বার একটু কৌতূহলও উঁকি দিতে শুরু করেছে। চোখের ইশারায় দারোয়ানদের সরে যেতে নির্দেশ দিল রাজেশ। তারা চলে গেলে রমণীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'হল তো ?'

'হ্যাঁ, হয়েছে।' রমণী ভটচাযের চোখমুখ দেখে মনে হল, এবার সে সন্তুষ্ট। বলল, 'সত্যি বাবা এমনটি আর শুনিনি।'

রাজেশ বুঝল, সংক্ষেপে আসল কথাটি বলা এই লোকটির পক্ষে অসম্ভব। অতএব চুপচাপ প্রতীক্ষা করাই ভাল।

রমণী ভটচায আবার বলল, 'বাপ যার অমন পাষণ্ড তার ছেলে কি করে যে এত ভাল হয়, সেটাই বুঝে উঠতে পারছি না। পেথম পেথম তো বিশ্বেসই করি নি। কিন্তু দোলন যখন বলল—'

রাজেশ চকিত হয়ে উঠল, 'কী বলেছে দোলন ?'

'তোমার বাবা যার যার সম্পত্তি ঠকিয়ে নিয়েছিল, তুমি নাকিন সে-সব তাদের ফিরিয়ে দিচ্ছ।'

রাজেশ স্তম্ভিত। শিথিল সুরে বলল, 'দোলন এ-কথা আপনাকে বলেছে।

বলছেন ?'

নিশ্চয় বলেছে !' রমণী ভটচায জোরে জোরে মাথা নাড়ল। তারপর য়ার তলা থেকে এক গোছা মোটা পৈতা বার করে বলল, 'খাঁটি বামুনের ল বাবাজী, খুড়ি রাজেশ। একেবারে কাশ্যপ গোত্তর। মিথ্যে বলার লোক য় না।'

কাল দুপুরে সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবার কথা হয়েছে। আজ সকালেই লোক ঠিয়ে দিয়েছে দোলন। শত্রুতাটা ভালই শুরু করেছে সে।

প্রসঙ্গত আরেকটা সম্ভাবনার কথা মনে পড়ল রাজেশের। শুধু কী রমণী চায়কেই, না ঢাকে কাঠি দিয়ে এক দিনের মধ্যে সারা রানীপুরের তাবত ষকে খবরটা জানিয়ে দিয়েছে দোলন ? যদি সবাইকে তার দিকে লেলিয়ে দোলন ? ভাবতে গিয়ে রাজেশ দেখল, ভাবনাটা খুব সুখকর নয়।

সবাই যদি এ বাড়িতে হানা দিতে থাকে, উল্টোচণ্ডীর মেলা বসে যাবে। পরিস্থিতিটা মনে মনে কল্পনা করতে গিয়ে রীতিমত শঙ্কিতই হয়ে উঠল নেশ।

রমণী ভটচায আবার বলে উঠল, 'তা হ্যাঁ বাবাজী, বাড়িটা কবে ফেরত চ্ছ ?' বলতে বলতে করল কি, রাজেশের দুটো হাত ধরে ভেউ ভেউ করে দ উঠল, 'তোমার বাবা বাড়িঘর নিজের গভ্ভে পুরে আমাদের একেবারে তলায় বসিয়ে দিয়েছে। দুটো ছেলে রয়েছে তাদের বড় মামার কাছে, রটা রয়েছে আমার বোনের বাড়ি, বউটা তার এক জেঠতুতো ভাইয়ের বাড়ি িবিত্তি করছে। আর আমি থাকি এখানে-ওখানে। কেউ দিল তো াম, নইলে পেটে কীল মেরে পড়ে রইলাম। দোহাই রাজেশ, গরীব নকে বাঁচাও।'

রাজেশ বিপন্ন। বিব্রত মুখে বলল, 'কাঁদবেন না, কাঁদবেন না—'

কান্নাটা তাতে কমল না; বরং আরো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। আরো র এবং আরো শব্দময়।

াজেশ বলল, 'বাবা আপনার বাড়ি ঠকিয়ে নিয়েছে ?'

কান্নাজড়িত দুর্বোধ্য স্বরে রমণী ভটচায বলতে লাগল, 'বামুনের ছেলে, শ্যপ গোত্তর হয়ে আমি কি মিথ্যে বলছি বাবা। আমি দেঁতেল-গেঁজেল য, তার ওপর গো-মুখ্যু। আমায় নেশায় চুর করে তোমার বাবা কোথায় যেন সই করিয়ে নিলে আর তারই চোটে সগোষ্ঠী একদিন ভিটেছাড়া হয়ে ায।'

রাজেশ বলল, 'আচ্ছা আপনি এখন যান। যদি বুঝি বাবা আপনাকে সত্যি

সত্যিই ঠকিয়েছেন —'

'তা হলে বাড়িটা আমায় ফেরত দেবে তো ?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না রাজেশ। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অবরুদ্ধ মরিয়ার মত বলল, 'হ্যাঁ দেব। আচ্ছা আপনি এখন আসুন।'

রমণী ভটচাযের মুঠির ভেতর হাতটা আবদ্ধ ছিল। সেটা ছাড়িয়ে আর অপেক্ষা করল না রাজেশ। পেছন ফিরে শ্লথ পায়ে দোতলার সি দিকে চলে গেল।

রানীপুরে মাত্র চারটি দিন থাকবে বলে ভবেশের সঙ্গে চুক্তি করেছিল সেই চুক্তি ভঙ্গ হয়ে গেছে। সম্পত্তি হস্তান্তর, রানীপুর- সংবাদ, রমণী ভটচা সব মিলিয়ে এখন রাজেশের মনে হচ্ছে, একটু একটু করে একটা জটিল আবর্তের মধ্যে সে তলিয়ে যাচ্ছে। তার স্নায়ুগুলো অস্পষ্টভাবে জানান দিচ্ছে একটা সংঘর্ষ যেন খুব আসন্ন। সেটা কোন্ দিক থেকে আসবে, রাজেশ জানে

দোতলায় উঠে অন্যমনস্কের মত মুখ ধুল রাজেশ। তারপর রাতের পো বদলে সবে চুল আঁচড়াতে শুরু করেছে ঠিক সেইসময় দরজার কাছে উত্তেজিত চাপা গলায় শোনা গেল, 'ছোটা সাব—'

ফিরে দাঁড়াতেই চোখাচোখি হয়ে গেল, একটা বয়। ভ্রূ কুঁচকে র জানতে চাইল, 'কী ব্যাপার ?'

বয়টা বলল, 'পাঁচ সাতটা আদমী আপনার সঙ্গে মুলাকাত করতে এসে

সমস্ত অস্তিত্বের মধ্য দিয়ে দ্রুতবহ চমক খেলে গেল যেন। দোলনের সংশপ্তক বাহিনী ? অনিশ্চিত স্বরে রাজেশ বলল, 'আমার সা

'জী।'

'কোথায় তারা ?'

'নীচে।'

'তুমি যাও। আমি আসছি।'

বয়টা চলে গেল। দ্রুত চিরুনি চালিয়ে চুল আঁচড়াল রাজেশ। স্খলিত পায়ে নীচে নেমে এল।

পোর্টিকোর তলায় যেখানে একটু আগে রমণী ভটচায দাঁড়িয়ে ছিল সেইখানে প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধের একটি দল সাগ্রহ প্রতীক্ষায় উর্ধ্বমুখ হয়ে স্বাস্থ্যহীন দেহ, দীপ্তিহীন চোখ, মুখময় বহু দিনের না-কামনো দাড়ি ভাঙ্গাচোরা চোয়াল, কণ্ঠার ঠেলে ওঠা হাড়, রেখাময় কর্কশ চামড়া—সব লোকগুলো যেন গোটা মানুষ না, মানুষের ধ্বংসাবশেষ মাত্র।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল রাজেশ। তারপর শিথিল স্বরে বলল, 'আপনারা?'

দলটার মধ্যে যিনি সব চাইতে বর্ষীয়ান, পায়ে পায়ে তিনি সামনে এগিয়ে এলেন। সকলের মুখপাত্র হিসেবে ভয়ে ভয়ে প্রথমে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আমার নাম অবিনাশ মাইতি—এখানকার হাইস্কুলে জিওগ্রাফি আর ড্রইংয়ের টীচার ছিলাম এককালে।' তারপর একে একে সঙ্গীদের দেখিয়ে পরিচয় দিতে লাগলেন। সঙ্গীদের একজনের নাম বিনোদ হাজরা, ব্যাঙ্কের এ্যাকাউন্টেন্ট ছিলেন বছর দশেক আগে। আরেকজনের নাম নিরাপদ চক্রবর্তী, উকিল সেরেস্তার মুহুরি ছিলেন। আরেকজনের নাম অমূল্য সেন, কিসের যেন ব্যবসা করতেন। আরেকজনের নাম ললিতমোহন চট্টরাজ, সওদাগরী অফিসের কেরানীগিরি করতেন। আরেকটি ভদ্রলোক আছেন যার নাম ধর্মদাস পুরকায়স্থ—একদা ছোটখাটো জমিদার ছিলেন। মোট ছজন ভদ্রলোক। একদিন তাঁদের সবারই একটা না একটা ভদ্ররকমের আয়ের পথ ছিল। তবে অনায়াসেই এটুকু টের পাওয়া যায়, তাঁরা সবাই জীবিকা হারিয়েছেন।

আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করল রাজেশ : রমণী ভটচাযের মত ভদ্রলোকেরা গেঁয়ো, অমার্জিত বা পালিশহীন নয়।

সবার হয়ে অবিনাশ মাইতি আবার বললে, 'আমার ধারণা, আপনার নাম শ্রীরাজেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। নিশ্চয়ই আপনি ভবেশবাবুর ছেলে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' রাজেশ মাথা নাড়ল। মৃদুস্বরে বলল, 'আমার কাছে আপনাদের কিছু দরকার আছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে এ-ভাবে দাঁড়িয়ে তো কথাবার্তা হয় না। একটু বসতে পারলে—'

রমণী ভটচাযকে বাড়ির ভেতর ঢোকায় নি রাজেশ। কিন্তু এই ভদ্রলোকেরা এত মার্জিত এত পরিশীলিত যে সমীহ না করে পারা যায় না। ব্যস্তভাবে সে বলল, 'আসুন আসুন। আপনারা ভেতরে এসে বসুন।'

অবিনাশ মাইতি এবং তাঁর সঙ্গীদের বাইরের ঘরে এনে বসাল রাজেশ। তারপর নিজে তাঁদের মুখোমুখি বসল। বলল, 'কী ব্যাপার, এবার বলুন—'

অবিনাশ কি বলতে যাচ্ছিলেন বলা হল না। হঠাৎ কি মনে পড়তে রাজেশ আবার বলে উঠল, 'আপনারা চা খান তো? একটু আনতে বলি?'

অবিনাশ মাইতি মৃদু আপত্তি জানালেন, 'না-না, আবার চা কেন।'

আপত্তিটা টিকল না। রাজেশ বলল, 'সামান্য একটু চা-ই তো।' বলেই গলা উঁচু করে একটা বয়কে ডেকে চা আনতে বলল।

বয় চলে গেলে অবিনাশদের দিকে ফিরল রাজেশ। বলল, 'এবার ত হলে—'

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। অবিনাশ মাইতি বললেন, 'আমরা একটা খবর পেয়ে বড় আশা নিয়ে এসেছি।'

'কী খবর ?'

'বলতে ঠিক সাহস পাচ্ছি না—।'

'কোন সঙ্কোচ নেই, আপনি বলুন—'

ঠিক এই সময় চা এসে পড়ল। পেয়ালায় দীর্ঘ চুমুক দিয়ে মুখ তুললেন অবিনাশ। আস্তে আস্তে বললেন, 'দোলন আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছে।'

যা আশঙ্কা করেছিল রাজেশ, ঠিক তা-ই। দূরমনস্কের মত বলল, 'দোলন পাঠিয়েছে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

কেন এঁরা এসেছেন, রাজেশের অবোধ্য নয়। তবু সে প্রশ্ন করল, 'কী জন্যে পাঠিয়েছে যদি বলতেন—' এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ চুপ করে গেল।

অবিনাশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর শুরু করলেন, 'দোলনের মুখে শুনেছি, আপনার কাছে এলে আমাদের সব প্রত্যাশা পূরণ হবে।'

অবিনাশের কথা থেকে একটি শব্দ বেছে নিয়ে রাজেশ উচ্চারণ করল, 'প্রত্যাশা !'

'হ্যাঁ, অসীম প্রত্যাশা। আমাদের সব দিকের সব আলো নিভে গিয়েছিল রাজেশবাবু। শুয়োরের খোঁয়াড়ের মতন অন্ধকার ঘরে পশুর মত জীবন যাপন করছিলাম। পেটে ভাত নেই, রোগে ওষুধ নেই, পরনে কাপড় নেই, ছেলেপুলেদের শিক্ষা নেই—সে অবস্থা চিন্তা করতে গেলে শিউরে উঠবেন। তবে ওর মধ্যেই আমরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম এ জন্মের মত এ ভাবেই মানবলীলা সাঙ্গ হবে। কিন্তু দোলন যখন আপনার কথা বললে তখন আশার আলো দেখতে পেলাম। কাল রাত্রে সে আমাদের বলেছে, আজ সকালেই ছুটে এসেছি।' বলতে বলতে একটু থামলেন অবিনাশ তারপর দ্বিধান্বিত ভীরু গলায় আবার আরম্ভ করলেন, 'আমাদের কিছু বিষয় সম্পত্তি ছিল রাজেশবাবু। কিন্তু আপনার বাবা—' এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ থমকে গেলেন অবিনাশ।

'আমার বাবা কী ?'

অবিনাশ নিশ্চুপ। রাজেশের প্রশ্নের উত্তর দিলেন না তিনি।

কিছুটা যেন উত্তেজিতই হয়ে উঠল রাজেশ। বলল, 'ছেলের সামনে

পিতৃনিন্দা করতে বুঝি বাধছে। তা হলে আমিই বলছি। আমার বাবা আপনাদের ঠকিয়ে বিষয়-সম্পত্তি সব গ্রাস করেছেন আর সেই জন্যেই আপনাদের চরম দুরবস্থা—এই তো ?'

অবিনাশ নিরুত্তর।

রাজেশ আবার বলল, 'দোলন নিশ্চয়ই আপনাদের জানিয়েছে, আমার কাছে এলে খোয়ানো সম্পত্তিগুলো ফিরে পাবেন। তাই না ?'

এতক্ষণে মুখ খুললেন অবিনাশ। ভয়ে ভয়ে বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।। অনেক আশা নিয়ে—'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই বাইরে থেকে বহু কণ্ঠের মিলিত চিৎকার ভেসে এল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা হিন্দুস্থানী দারোয়ান সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে একরকম ছুটেই ড্রইং রুমে এসে ঢুকল। উত্তেজিত স্বরে বলল, 'বহুত আদমী আয়া, আপকো সাথ মুলাকাত করনে মাঙ্‌তা'।

রাজেশ বুঝল, ওরা কারা। নিশ্চয়ই দোলনের পাঠানো আরেকটি বাহিনী।

রাজেশ একবার ভাবল, বাইরের লোকগুলোর সঙ্গে দেখা করবে না। পরক্ষণেই তার খেয়াল হল, যদি দেখা না করে লোকগুলো নিশ্চয়ই দোলনের কাছে সে খবর পৌঁছে দেবে। খবরটা পাবার পর কী করবে দোলন ? নিশ্চয়ই শ্লেষ বিদ্রূপময়ী মেয়েটার ঠোঁটের প্রান্ত বিচিত্র শ্লেষে বেঁকে যাবে। নাঃ, অতখানি পরাজয় সে মানতে পারবে না।

রাজেশ স্থির করল, লোকগুলোর মুখোমুখি সে দাঁড়াবে। স্থির করার সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে পড়ল। দারোয়ানের উদ্দেশ্যে বলল, 'চল তো দেখি।'

বাইরে এসে রাজেশ দেখল, প্রায় জন পনের লোকের একটা জটলা পোর্টিকোর তলায় ডেলা পাকিয়ে রয়েছে। তাকে দেখে লোকগুলোর চিৎকার কিছুটা শান্ত হল। কিছুটা রুক্ষ স্বরেই রাজেশ বলল, 'কী চাই ?'

একসঙ্গে লোকগুলো চেঁচামেচি করে উঠল, 'আমরা দোলনের কাছ থেকে আসছি। ভব বাঁড়ুজ্জের ছেলে রাজেশকে আমাদের দরকার।'

হঠাৎ খুবই অসহায় বোধ করল রাজেশ। অসহায় এবং অবসন্ন। এখন যদি ভবেশ বাড়ি থাকতেন এ সব সমস্যা খুব সম্ভব তিনিই সামলাতেন। যদিও এই সব লোক রাজেশের সন্ধানেই এসেছে তবু ছেলের বিপদ দেখে ভবেশ কি আর দূরে থাকতে পারতেন ? নিশ্চয়ই ছেলেকে আড়াল করে দাঁড়াতেন।

এদিকে লোকগুলো সমানে চিৎকার করে যাচ্ছিল, 'রাজেশ বাঁড়ুজ্জেকে ডেকে দিন, রাজেশ বাঁড়ুজ্জেকে ডেকে দিন।'

রাজেশ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। বলা হল না। তার আগেই বিশাল ফটক পেরিয়ে ভবেশের ঝকঝকে দামী মোটর এসে পোর্টিকোর নীচে থামল। গাড়ি দেখে লোকগুলো ছুটে পাশে সরে গিয়েছিল। চিৎকারও থেমে গিয়েছিল তাদের। গাড়ি থেকে নেমে একবার ভ্রূ কুঁচকে লোকগুলোর দিকে তাকালেন ভবেশ। কর্কশ তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'কী চাই?'

লোকগুলো ডেলা পাকিয়ে কিছুটা সামনে এগিয়ে এল। তারপর ভয়ে ভয়েই যেন বলল, 'রাজেশ বাঁড়ুজ্জের কাছ থেকে আমরা বিষয়-আশয় ফেরত নিতে এসেছি। দোলন আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছে।'

ভ্রূ আগেই কুঞ্চিত হয়েছিল। এবার ঠোঁটের প্রান্তে গভীর নিষ্ঠুর খাঁজ পড়ল। তীব্র চাপা গলায় তিনি বললেন, 'বিষয়-আশয় ফেরত নেবে বলে এসেছ!'

লোকগুলো সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ—'

ভবেশ তাদের আর কিছু বললেন না। চীনা পুতুলের মত সারি সারি কয়েকটা দারোয়ান আর বয় দাঁড়িয়েছিল। লোকগুলোকে দেখিয়ে তাদের উদ্দেশে হাতের বিশেষ ইঙ্গিত করলেন ভবেশ।

দারোয়ানরা তৎক্ষণাৎ সেই লোকগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এবং ধাক্কা দিতে দিতে ফটকের বাইরে বার করে দিয়ে এল।

ভবেশ দাঁড়িয়েই ছিলেন। মহৎ কার্যটি সমাধা হলে রাজেশের দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ল। বললেন, 'ব্যাপার কী? সকালবেলা এই ঝামেলা কেন?'

ঝামেলা যে কেন, রাজেশের চাইতে কে আর তা ভাল করে জানে। সঠিক উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে এলোমেলোভাবে সে বলল, 'এই লোকগুলো সব—' এ পর্যন্ত বলে হঠাৎ চুপ করল।

ভবেশ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বললেন, 'যাক গে. আপদগুলো সব বিদেয় হয়েছে। ত. ইয়ে. রে, চা-টা খেয়ে নিয়েছিস তো? আজ আমার আসতে একটু দেরি হয়ে গেল।'

চায়ের কথায় অবিনাশ মাইতিদের কথা মনে পড়ে গেল। এই পোর্টিকোর তলা থেকে দুটি ত্রয়েক এগুলেই তো তাঁদের দেখতে পাবেন ভবেশ। যখন দেখবেন ছেলে তাদের সমাদর করে সোফায় বসিয়ে চা দিয়ে আপ্যায়ন করেছে তখন ভবেশের মনোভাব কোন পথ ধরবে, সেটুকু অনুমান করা খুব কঠিন নয়। এই মাত্র সেই লোকগুলোকে তাড়াবার ব্যাপারে তার কিঞ্চিৎ নমুনা দেখা গেছে।

রাজেশ অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করতে লাগল। বিচিত্র স্নায়ুভীতিতে তার মনে হল, কপালে কণা কণা ঘাম জমেছে।

ভবেশ আবার বললেন, 'এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে। চল, ভেতরে যাই।' সেই ড্রইং রুমের দিকে পা বাড়িয়ে দিলেন।

জড়িত স্বরে কি একটা বলতে চেষ্টা করল রাজেশ ; পারল না। এলোমেলো পায়ে প্রায় টলতে টলতেই যেন ভবেশকে অনুসরণ করল সে।

ড্রইং রুমে পা দিয়েই থমকে দাঁড়ালেন ভবেশ। চোয়াল কঠিন হয়ে উঠল তার, ঠোঁট শক্তবদ্ধ। দীর্ঘ শরীর ঘিরে আক্রমণকারীর নিষ্ঠুরতা উদ্যত। তাঁর এই চেহারা দেখে ভয় পেল রাজেশ।

একদৃষ্টে কিছুক্ষণ অবিনাশদের দেখলেন ভবেশ, টি-পয় টেবিলে সাজানো সারি সারি চায়ের কাপগুলো দেখলেন। তারপর একটু এগিয়ে অনেকখানি ঝুঁকে বললেন, 'সময়টা তোমরা ভালই বেছে নিয়েছ অবিনাশ। রানীপুরে সবাই জানে, রাত্তিরে আমি বাড়ি থাকি না। সকালবেলা কোনদিন ফিরি, কোনদিন ফিরি না। বুদ্ধি করে এসেছিলে ঠিক, তবে সুযোগটা বোধ হয় কাজে লাগল না।'

ভবেশ বলতে লাগলেন, 'আমি বাড়ি নেই, রাজু ছেলেমানুষ। তার ওপর দল বেঁধে বর্গীর মত হানা দিয়েছ। বাইরে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা নয়, একেবারে ঘরের মাঝখানটিতে এসে চা-টা নিয়ে জাঁকিয়ে বসেছ। ভাল— ভাল, চমৎকার।'

ক্ষীণ স্বরে রাজেশ বলল, 'ওঁরা জোর করে আসেন নি, আমিই এনে বসিয়েছি, ভদ্রলোকেরা এসেছেন, তাই একটু চায়ের ব্যবস্থা করেছি।'

রাজেশের কথা গ্রাহ্যই করলেন না ভবেশ। অবিনাশের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, 'তা হ্যাঁ হে, রাজুর কাছে তোমাদের কী দরকার? কী মতলব পাকিয়ে এসেছ?'

ভীত স্বরে অবিনাশ শুধু বলতে পারলেন, 'আজ্ঞে—'

একটা ব্যাপার রাজেশ লক্ষ্য করল, এতগুলো প্রতারিত মানুষ দলবদ্ধ হয়ে এসেছে কিন্তু সবাই কেমন যেন অসহায় দুর্বল, ব্যক্তিত্বহীন। তারা নিঃস্ব হয়েছে, প্রবঞ্চিত হয়েছে। স্বাভাবিক নিয়মে ন্যায়ের জোরটা তাদের দিকেই। ঠিক ভবেশেরই তো সঙ্কুচিত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকার কথা। কিন্তু এখানে দেখা যায় বিপরীত রীতি। যে অন্যায় করেছে সে-ই এখানে প্রবল, ব্যক্তিত্বময় নিঃসঙ্কোচ।

সেই ভোর থেকে এতগুলো লোক এসেছে কিন্তু তাদের মধ্যে একমাত্র ভটচায ছাড়া কেউ এসে বলেনি, 'আমাকে কৌশলে ঠকানো হয়েছে, যা কুড়ে তোমরা নিয়েছ ফিরিয়ে দাও।' অবশিষ্ট সবাই যেন একদল ভীরু

প্রার্থী ; তাদের চাওয়ার পেছনে ন্যায়ের বা দাবীর জোর নেই।

ভবেশ আবার সেই কথাটাই বললেন, 'কি অবিনাশ, কেন এসেছ বললে তো ?' এবার তাঁর স্বর অত্যন্ত গম্ভীর এবং কর্কশ।

অবিনাশ ভয়ে ভয়ে বললেন, 'যা বলবার রাজেশবাবুকে আমরা বলেছি।'

'রাজেশবাবুকে তো বলেছ। আমাকে না হয় কষ্ট করে আরেকবার বললে

'না—মানে' অবিনাশ হঠাৎ তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ভী ফিস ফিস স্বরে বললেন, 'রাজেশবাবুকে সব বলে গেছি। উনিই আপনা জানিয়ে দেবেন। আচ্ছা আমরা এখন যাই। বলে এক মুহূর্ত অপেক্ষ করলেন না। একরকম উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গেলেন।

চোখমুখ কুঁচকে অবিনাশদের পালানোটা উপভোগ করলেন ভবেশ। দাঁ দাঁত চেপে অস্ফুটে বললেন, 'যত সব হতচ্ছাড়ার দল।'

এরপর অনেকক্ষণ চুপচাপ।

একসময় ভবেশই আবার স্তব্ধতা ভাঙলেন। রুক্ষ স্বরে বললেন, 'যাকে তা বাড়ির ভেতর এনে ঢোকাস কেন ? কেউ যদি তোর কাছে আসতে চ সোজা আমার কথা বলে দিবি। বলবি 'আমি কিছু জানি না। বাবার স দেখা করুন।' তা-ও যদি না শোনে দারোয়ান ডেকে বাড়ির বার ক দিবি।'

মৃদু অথচ দৃঢ় গলায় রাজেশ বলল, 'ওরা কিন্তু একটা উদ্দেশ্য নি এসেছিল।'

মুহূর্তের জন্য থতিয়ে গেলেন ভবেশ। তারপর আবার আগের মতই স্বচ্ছ হলেন। রাজেশ যা বলেছে তার জের টেনে আর কোন প্রশ্ন করলেন না। বললেন, 'চল, খাবার ঘরে যাই। খিদে পেয়ে গেছে।'

ডাইনিং রুমে এসে খেতে খেতে হঠাৎ রাজেশ বলল, 'একটা ক বলছিলাম—'

'কী ?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন ভবেশ।

'রানীপুরে আমাদের তো অনেক সম্পত্তি !'

'হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে ?'

'এই সম্পত্তিগুলোর দলিল নিশ্চয়ই আছে।'

'মানে ?'

'মানে সম্পত্তিগুলো কারো না কারো কাছ থেকে তো আপনি কিনেছেন।'

ভবেশ হাসলেন। মজার গলায় বললেন, 'কিনেছি বৈকি। না কিন এই রানীপুরে আমার এমন কোন সম্বন্ধী আছে যে এমনি দেবে !'

রাজেশ বলল, 'আপনি যাদের যাদের কাছ থেকে সম্পত্তি কিনেছেন তারা নিশ্চয়ই দলিলে সই দিয়েছে। কী-কী শর্তে মানে কত টাকায় সম্পত্তিগুলো কেনা হয়েছে তা-ও নিশ্চয়ই দলিলে পাওয়া যাবে।'

ভবেশ এবার জোরে জোরে হেসে উঠলেন, 'কি ছেলেমানুষ রে তুই। ও-সব লেখা না থাকলে দলিল কখনো রেজিস্ট্রী হয়!'

একটু চুপ। তারপরই রাজেশ বলল, 'দলিলগুলো আমি একটু দেখতে চাই।'

রাজেশের কথা শেষ হল কি হল না, ভবেশের সমস্ত শরীরের উপর দিয়ে ঢেউ-এর মত কি যেন একটা বয়ে গেল। চোখেমুখে আলোছায়ার খেলা চলল অনেকক্ষণ। স্থির নিষ্পলকে ছেলের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'বেশ। কখন দেখবি?'

'যত তাড়াতাড়ি হয়। সম্ভব হলে আজই।'

'তা হলে চা খেয়ে এখনই চল। আমার শোবার ঘরে দলিলগুলো রয়েছে; দিয়ে দিচ্ছি।'

কিছুক্ষণ পর ছেলেকে নিয়ে দোতলায় নিজের শোবার ঘরে এলেন ভবেশ। তারপর প্রকাণ্ড লোহার সিন্দুক থেকে রাশি রাশি দলিলের স্তূপ বার করলেন। সেগুলো রাজেশের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'এই নে। এখন তো এগুলো তোরই। ইচ্ছে হলে পড়ার পর নিজের কাছে রেখে দিতে পারিস।'

'আমার কাছে রেখে কী হবে!' নিস্পৃহ স্বরে রাজেশ বলল, 'পড়া হলেই ওগুলো আপনাকে ফিরিয়ে দেব।'

'তাই দিস। তোর কাছে থাকাও যা আমার কাছে থাকাও তা-ই। তবে একটা কথা—'

'কী?'

'এগুলো সাবধানে নাড়াচাড়া করিস, দেখিস কোনটা যেন না হারায়।'

'আচ্ছা।' রাজেশ মাথা নাড়ল। তারপর দলিলের স্তূপটা কুড়োবার জন্য ঝুঁকে পড়ল।

দলিল কুড়ানো শেষ করে মুখ তুলতেই রাজেশের দৃষ্টি ভবেশের মুখে নিবদ্ধ হল, তাঁর দুই চোখ থেকে ঠোঁটের প্রান্ত পর্যন্ত একটা অতি সূক্ষ্ম আর রহস্যময় হাসির খেলা চলছে। হাসিটার মধ্যে বিচিত্র একটু পরিহাস, নাকি তাচ্ছিল্য মেশানো।

যাই হোক চোখাচোখি হতেই ভবেশের চোখ মুখ থেকে হাসির খেলাটা অদৃশ্য। তবু অনেকক্ষণ স্থির নিষ্পলকে তাকিয়ে রইল রাজেশ। ভাবল, ভবেশের চেতনার আরেক দিকে অদ্ভুত ছায়া পড়ল। রাজেশ উল্লসিত। ভাবল, ভবেশের

ঐ তাচ্ছিল্যের হাসিটার যোগ্য প্রত্যুত্তর সে দিতে পারে। তেমন অস্ত্র তার হাতে আছে। হঠাৎ অতিরিক্ত ব্যস্ত হয়ে ভবেশের উদ্দেশে সে বলল, 'আপনি কি এখন বাড়িতে থাকবেন ?'

'না চান করেই বেরিয়ে যাব। কেন, কিছু দরকার আছে ?'

'হ্যাঁ। দলিলগুলো আমার ঘরে রেখে এক্ষুনি আসছি। আপনাকে একটা জিনিস দেখাব।'

'কী দেখাবি ?' ভবেশের বিস্তৃত কপালে সরু সরু কয়েকটা আঁচড় পড়ল।

'আনছি।' বলে আর দাঁড়াল না রাজেশ। নিজের ঘরের দিকে ছুটল।

একটু পরেই ফিরে এল রাজেশ। ভবেশ সাগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। বললেন, 'কী এনেছিস, দেখা।'

দোলনের দেওয়া 'রানীপুর-সংবাদ'টা নিঃশব্দে ভবেশের দিকে এগিয়ে দিল রাজেশ। হাত বাড়িয়ে সেটা ধরলেন ভবেশ।

রাজেশ লক্ষ্য করল, মুহূর্তে চোখ-মুখ-হাত—ভবেশের সবাঙ্গ ঘিরে রুক্ষ ছায়া পড়েছে। চোখ দুটি কুঁচকে গেছে। সমস্ত মুখের ওপর পাথুরে কাঠিন্য নেমে এসেছে। দাঁতে দাঁত চেপে অসহিষ্ণু স্বরে ভবেশ বললেন, 'এই আঁস্তাকুড়ের কাগজটা তুই পেলি কোথায় ? এ কাগজ তো আমাদের বাড়ি ঢোকান হয় না।'

ভবেশের কি ধারণা, বাড়িতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করলেই রাজেশ তা পেতে পারে না ! ভাসা-ভাসা ভাবে সে বলল, 'পেয়ে গেলাম এক জায়গায়।'

'তা আমাকে এটা দেখাতে চাইছিস কেন ?'

'চারের পৃষ্ঠায় বাঁ দিকে একটা খবর আছে। সেই পড়লেই বুঝতে পারবেন।'

কাগজটায় ভাঁজ খুলে চারের পৃষ্ঠায় পৌঁছে গেলেন ভবেশ। এবং সেই খবরটায় তাঁর দৃষ্টি আটকে গেল। সেই খবরটা যা রাজেশকে পীড়িত, অস্থির এবং জর্জর করে তুলেছিল।

খবরটা পড়ছেন আর মুহূর্তে মুহূর্তে ভবেশের মুখের চেহারা বদলে যাচ্ছে। চোখ দুটি এখন তাঁর এত লাল, মনে হয়, শরীরের সমস্ত রক্ত সেখানে জমা হয়েছে। ঠোঁট আর হাতের আঙুল রাগে উত্তেজনায় থরথর করছে।

রাজেশ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সজ্ঞানে নয়, অবচেতনেই বোধ হয় মনে হল, একটু আগে ভবেশের চোখে মুখে যে হাসিটা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল সেটা জায়গা বদল করে তার চোখেমুখে এসে গেছে। বাপ আর ছেলে নয়

যেন তারা। বুঝিবা দুই বিষম প্রতিদ্বন্দ্বী।

আশ্চর্য। যতক্ষণ খবরটা পড়ছিলেন ততক্ষণই উত্তেজনা ছিল। পড়া শেষ করে ভবেশ যখন তাকালেন তখন আগের মতই তিনি শান্ত, স্বাভাবিক। আস্তে আস্তে উপেক্ষার স্বরে বললেন, 'সব বোগাস।'

রাজেশ অবাক। বিস্ময়টা তার শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছিল। থতিয়ে থতিয়ে কোনরকমে ভবেশের কথার প্রতিধ্বনিই করতে পারল সে, 'সব বোগাস?'

'নিশ্চয়ই। তোকে একদিন একটা কথা বলেছিলাম, মনে পড়ে?'

'কী?'

'বলেছিলাম এই রানীপুরে আমাদের অনেক শত্রু আছে। আমাদের অবস্থা ফিরেছে বলে শালাদের চোখে ঘুম নেই। সামনা-সামনি তো আর পারে না। পেছন থেকে একটু আধটু চিমটি কেটে যতটুকু সুখ পাওয়া যায়।'

রাজেশ কিছু বলল না। তাকিয়েই রইল।

'রানীপুর-সংবাদ'টা হাতের মুঠিতে পাকানো অবস্থায় ছিল। সেটা উঁচুতে তুলে সবেগে আন্দোলিত করতে করতে ভবেশ বললেন, 'এ-সব নিয়ে মাথা ঘামাস না রাজু। আর এই কাগজটাকে একেবারেই গ্রাহ্য করবি না। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছিস?'

রাজেশ বলল, 'কী?'

'তোর কিংবা আমার নাম দিয়ে কাগজটায় চিপটেন কাটে নি। যে সব কথা লেখা হয়েছে সেগুলো যদি সত্যি হত আমাদের নাম কি আর দিত না! আসল কথা কিছু কাদা ছোঁড়াই এদের উদ্দেশ্য। কতকগুলো ভাগাড়ের কুকুর।'

দুর্বোধ্য স্বরে রাজেশ কি বলল, বোঝা গেল না।

ভবেশ আবার বললেন, 'নাম ধাম যদি ছাপাত ভারি সুবিধে হত আমার পক্ষে।'

'কী সুবিধে?

'মানহানির দায়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা দাবী করে একটা কেস ঠুকে দিতাম। সেই টাকা যোগাতে হারামজাদাদের চাটিবাটি তো বিকিয়ে যেতই, এই নোংরা কাগজটাও উঠে যেত। আমি তাকে তাকে আছি। যদি কোনদিন সুযোগ পাই, কাগজটা তুলে ছাড়বই ছাড়ব।'

একটু চুপচাপ। তারপরেই হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে গেল ভবেশের। বললেন, 'এই বাজে জঘন্য টাইপের কাগজটা কারা বার করে জানিস?'

রাজেশ চকিত হয়ে উঠল। 'রানীপুর-সংবাদে'র প্রকাশক, মুদ্রাকর এবং সম্পাদক যে কে, রাজেশের তা অজানা নয়। যদি সে বলে তা হলে নিশ্চয়ই

তোপের মুখে পড়তে হবে। জেরায় জেরায় তাকে অস্থির করে ফেলবেন ভবেশ। তা ছাড়া দোলনদের সম্বন্ধে তাঁর প্রকৃত মনোভাবটাও জানা যাবে না। অতএব চাপা গলায় ফিসফিসিয়ে সে প্রশ্ন করল, 'কারা ?'

'ঐ যে হতচ্ছাড়া প্রণব বোসটা।'

'কোন প্রণব বোস ?'

'স্মৃতিশক্তি তোর খুব দুর্বল দেখছি। আমাদের পুরনো বাড়ির পাশে ওর প্রতিবেশী ছিল ; মনে নেই ?'

স্মৃতির ব্যাপারে আগেও আরেকবার ধিক্কার দিয়েছেন ভবেশ। এখনও দিলেন। কিন্তু এবারকার ধিক্কারটা বোধহয় তাঁরই প্রাপ্য। রানীপুরে আসার পর পৈতৃক আমলের পুরনো বাড়ি দেখাতে গিয়ে প্রণব বসুদের প্রসঙ্গ তুলেছিল রাজেশ। ভবেশ সেদিন জানিয়েছিলেন, প্রণব বসুদের খবর তিনি জানেন না। রানীপুরেই তাঁরা থাকেন কি-না, সে সম্বন্ধেও নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেন নি। নিজের অজ্ঞাতসারেই, বুঝিবা বিস্মৃতির ঘোরে আজ ধরা দিয়েছেন ভবেশ। প্রণব বসুদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সম্ভবত এই রানীপুরে তাঁর চাইতে সচেতন আর কেউ নয়।

রাজেশ বিস্ময়ের ভান করল। বলল, 'সেই প্রণব বসু এই কাগজ বার করেছেন!'

ভবেশ বললেন, 'হ্যা, মরার পাখা গজিয়েছে। এই অঞ্চলের সমস্ত মান্যগণ্য রেসপেক্টেবল্ লোককে পেছনে লেগে ক্ষেপিয়ে তুলেছে হারামজাদা। মরবে ও, নিশ্চয়ই মরবে।' একটু থেমে আবার বললেন, 'সব নষ্টের মূল কে জানিস ?'

'কে ?'

'প্রণব বোসের মেয়েটা! নাম দোলন।'

রাজেশ উৎসুক হয়ে রইল। কিন্তু না, দোলন প্রসঙ্গে আর কোন মন্তব্য করলেন না ভবেশ।

মোট সাতাশখানা দলিল। সেগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া শেষ করতে পুরো তিনটে দিন লেগে গেল রাজেশের।

কিন্তু দলিলগুলোর কোথাও বিন্দুমাত্র খুঁত আবিষ্কার করা গেল না। দলিলগুলোতে যাদের স্বাক্ষর আছে তারা দস্তুরমত রানীপুরের ভদ্র শিক্ষিত সম্মানিত ব্যক্তিদের সাক্ষী রেখে সজ্ঞানে সুস্থ মস্তিষ্কে জমি জমা, বাড়িঘর বা অন্য কোন অস্থাবর সম্পত্তি ভবেশের হাতে সঁপে দিয়েছে। বিনিময়ে তারা দাম নিয়েছে। দামটা ন্যায্য কি-না, সে সম্বন্ধে সংশয় অবশ্যই জেগেছে রাজেশর মনে

সংশয়টা মনের ভেতর পুরে রেখে চুপচাপ বসে রইল না রাজেশ। তিন দিন পর রানীপুরের রাস্তায় বেরুল সে। বেরুবার আগে যে যে তারিখে সম্পত্তিগুলো ভবেশ কিনেছিলেন সেই সেই তারিখ এবং সম্পত্তির বিবরণ একটা কাগজে টুকে নিল। তারপর একজন জমির দালাল খুঁজে বার করে ঐ ঐ তারিখে ঐ সব সম্পত্তির কি রকম দাম হতে পারে তার একটা তালিকা তৈরি করে বাড়ি ফিরল। দালালটাকে অবশ্য কিছু দক্ষিণা দিতে হল।

আশ্চর্য! বাড়ি ফিরে দলিলগুলোর দামের সঙ্গে সংগৃহীত দাম মেলাতে গিয়ে রাজেশ হতবাক। কোথাও অসঙ্গতি নেই। ঠিক ন্যায্য অঙ্কের বিনিময়েই সম্পত্তিগুলোর অধীশ্বর হয়ে বসেছেন ভবেশ।

হঠাৎ রাজেশের একটা কথা মনে পড়ে গেল। দলিলগুলো দেবার সময় পরিহাসের সূক্ষ্ম একটু হাসি ভবেশের মুখে লেগে ছিল। হাসিটার মানে এই মুহূর্তে স্বচ্ছ হয়ে গেল।

হঠাৎ অপরিসীম ক্লান্তি বোধ করল রাজেশ। ক্লান্তি এবং অবসাদ। নাঃ, বৃথাই একটা ছলনার পেছনে একদিন ঘুরে মরল সে। ব্যর্থ ক্লান্ত অবসন্ন রাজেশ দলিলগুলো ভবেশকে ফিরিয়ে দিল।

পাঁচ

দলিল নিয়ে মেতে থাকতে থাকতে কবে যে সেই দিনটা এসে পড়েছিল, রাজেশের খেয়াল নেই। সেই দিনটা অর্থাৎ রবিবার।

এখনও খুব ভাল করে সকাল হয়নি। পুব দিগন্তে আবছা অন্ধকারের একটা যবনিকা অস্পষ্টভাবে লেগে আছে।

রাজেশ ঘুমিয়েই ছিল। পুরোপুরি ঘুম ঠিক নয়। ঘুম আর জাগরণের মাঝামাঝি অলস সুখদায়ক এক ঘোরের মধ্যে সে যেন ভাসছিল।

হঠাৎ দরজায় কার যেন মৃদু টোকা পড়ল।

এই ভোরের সুখের তন্দ্রাটা নষ্ট হওয়ায় সে কিছু বিরক্ত। রুক্ষ স্বরে বলল, 'কে?'

বাইরে থেকে একটা গলা ভেসে এল, 'আমি ভবেশ।'

রাজেশ অবাক। অনেককাল পর রানীপুরে ফিরে প্রথম দিনই সে লক্ষ্য করেছিল, ভবেশ বাড়ির বাইরে নিশিপালন করে থাকেন। সেটাকে নিয়ম ভেবে এ সম্বন্ধে কোনদিন কোন প্রশ্ন করেনি। কিন্তু এত ভোরে তো তাঁর ফেরার কথা নয়।

ভবেশের গলা আবার শোনা গেল, 'দোর খোল রাজু—'

এবার তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরজা খুয়ল দিল রাজেশ। ভবেশ ঘরে ঢুকলেন। রাজেশ ফিরে এসে খাটের বাজু ধরে ভবেশের দিকে তাকাল। তার তাকানোর মধ্যেই প্রশ্নটা ছিল। অর্থাৎ এত ভোরে ভবেশ তার ঘুম ভাঙালেন কেন ?

প্রশ্নটা বুঝলেন ভবেশ। কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বললেন, 'তুই নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে ছিলি। সেই কথাটা মনে করিয়ে দেবার জন্য তোকে জাগাতে হল।'

'কোন কথাটা ?'

'আজ রবিবার। যোগদাবাবুর বাড়ি নেমন্তন্ন—মনে আছে তো ? পাছে ভুলে গিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাস তাই তাড়াতাড়ি এসে তোর ঘুম ভাঙালাম।'

সত্যিই নিমন্ত্রণের কথাটা একেবারে ভুলে গিয়েছিল রাজেশ। ভবেশ না বললে মনেও পড়ত না।

রাজেশ চিন্তিত। যোগদাবাবুর মেয়েকে তার জীবনের সঙ্গে জুড়ে দিতে এত আগ্রহান্বিত কেন ভবেশ ? এই রানীপুরে, রানীপুরে না হোক সারা বাঙলাদেশে কতই তো সুলক্ষণা সুশিক্ষিতা মেয়ে ছড়িয়ে আছে কিন্তু একটি বিশেষ মেয়ের জন্য এত অপরিসীম ঔৎসুক্য কেন তাঁর ? কেন ? এতে তাঁর কোন স্বার্থ ?

স্বার্থ ! স্বার্থের কথায় আরো একটা কথা মনে পড়ল। জগতের সব দায়িত্ব সব মোহবন্ধন থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য নিজের সমস্ত সঞ্চয় ছেলের হাতে তুলে দিয়ে শাস্ত্রোক্ত মুক্তপুরুষ হবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন ভবেশ। কিন্তু কোন দায়িত্ব কোন বন্ধন—

ভাবনার বৃত্তটা সম্পূর্ণ হল না রাজেশের। তার আগেই ভবেশ আবার বলে উঠলেন, 'এগারোটা নাগাদ যোগদাবাবুদের ওখানে যাব। যদি কোথাও বেরুস তার মধ্যেই ফিরে আসিস কিন্তু।'

'আচ্ছা।' রাজেশ মাথা নাড়ল।

কাঁটায় কাঁটায় এগারোটা বাজলে ছেলেকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন ভবেশ।

বাজার পাড়ার কিছু উত্তরে যেখানে প্রাচীন রানীপুর জরাগ্রস্ত হয়ে রয়েছে তার ঠিক মাঝখানটিতেই যোগদাবাবুদের পাঁচ পুরুষের বাস। পাঁচ পুরুষ অর্থাৎ প্রায় এক শতাব্দী ধরে তাঁরা এখানে আছেন। এ ইতিহাস রাজেশের জানা ছিল না। পথে যেতে যেতে ভবেশই শুনিয়ে দিয়েছেন।

চারদিকে ভাঙাচোরা ধ্বসে-পড়া অসংখ্য বাড়ি। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, মাটির অতল থেকে আবিষ্কৃত কোন আদ্যিকালের জনপদ। আর তারই মাঝখানে যোগদাবাবুদের সুবিশাল ঝকঝকে তেতলা বাড়িটা বিরাট এক ছন্দোপতন যেন। ছন্দোপতন বললে সঠিক হয় না, বলা উচিত ঠাট্টা। বিশ্রী রকমের ঠাট্টা।

সদর দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন যোগদাবাবু। ভবেশদের মোটর থামতেই ছুটে এলেন। কৃতার্থ হবার ভঙ্গিতে বললেন, 'আসুন—আসুন ভববাবু। এসো বাবা রাজেশ।'

রাজেশরা নামলে তাদের সোজা দোতলার একটি ঘরে নিয়ে এলেন যোগদাবাবু। ঘরখানা বিশাল--ড্রইং রুম বললে এর মর্যাদা যেন অনেক খাটো করে দেওয়া হয়। বলা উচিত বৈঠকখানা। উনিশ শতকের রুচি অনুযায়ী এখানে নিভাঁজ নরম ধবধবে ফরাস পাতা। তার ওপর ঝালর দেওয়া অসংখ্য তাকিয়া ছড়ানো রয়েছে। মাথার ওপর ঝাড়লণ্ঠনের ব্যবস্থা। অবশ্য তার ভেতর মোম বসানো নেই। যে বাল্বগুলো রয়েছে সেগুলো অবিকল মোমবাতির মত দেখতে। দেওয়াল জুড়ে অসংখ্য অয়েল পেন্টিং। নিশ্চয়ই যোগদাবাবুর পূর্বপুরুষদের প্রতিকৃতি সব।

ভবেশ আগেই ফরাসের ওপর কাত হয়ে পড়েছিলেন। রাজেশ বসতে যাবে যোগদাবাবু হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। দুই হাত নেড়ে ব্যস্তভাবে বললেন, 'উঁহু-উঁহু, এ ঘরে তুমি নয়। তোমার বাবা আর আমি—এই দুই বুড়ো শুধু এখানে বসে বসে গল্প করব।'

রাজেশ কী বলবে, ভেবে পেল না। বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল শুধু।

রাজেশের অবস্থাটা যেন অনুমান করতে পারলেন যোগদাবাবু। সকৌতুকে বললেন, 'ভয় নেই। তোমারও বসার ব্যবস্থা করেছি। চল আমার সঙ্গে।'

রাজেশ বলল, 'কোথায় যাব?'

'চল, তোমাকে তোমার কাকীমার কাছে দিয়ে আসি। আমাদের গল্প-সল্প তোমার ভাল লাগবে না। শুধু শুধু মুখ বুজে বসে থাকবে। তার চাইতে কাকিমার সঙ্গ অনেক ভাল লাগবে।'

রাজেশ বুঝল, তাকে অন্তঃপুরে পাঠানোই যোগদাবাবুর আসল উদ্দেশ্য। অপরিচিত মানুষের অন্দরমহলে যেতে হলে সঙ্কুচিত হবার কথা। স্বাভাবিক নিয়মেই রাজেশ কুণ্ঠিত হল, সঙ্কোচ বোধ করল। অবশেষে অসহায়ের মত ভবেশের দিকে তাকাল।

মৃদু হেসে মাথাটা ঈষৎ হেলালেন ভবেশ। চোখের ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন, কোন ভাবনা নেই। যোগদাবাবুর সঙ্গে নিশ্চিন্ত মনে অন্দর মহলে যেতে

পারে সে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও যোগদাবাবুর সঙ্গে যেতে হল। যেতে যেতে হঠাৎ একটা কথা মনে হল তার। একদা রানীপুরের সব দরজাই তো ভবেশের কাছে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আবার কি এ শহর তার অন্তঃপুরের দুয়ার খুলে ভবেশকে ডেকে এনেছে। যাই হোক, তাকে নিয়ে সোজা তিন তলায় এলেন যোগদাবাবু। আর এনেই চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন, 'ওগো কোথায় গেলে ? দেখ, কাকে এনেছি।'

একটু পরেই ডান দিকের একখানা ঘর থেকে একজন সৌখিনা বর্ষীয়সী বেরিয়ে এলেন। এই বয়সেও গায়ের রঙ স্বগৌর, পান না খেয়েও ঠোঁট রক্তাভ। ছোট কপালের ঠিক ওপর থেকেই কুঞ্চিত ঘন চুলের ঘের শুরু হয়েছে। এত বয়স হয়েছে, তবু ভদ্রমহিলা নিবিড়-কুন্তলা। চুলগুলো আ-বাঁধা, ফলত পিঠময় উদ্দামভাবে ছড়ানো। মুখখানা পানপাতার মত ; নীচের দিকে সরু চিবুক. কপাল থেকে সুছাঁদ নাক বেরিয়ে এসেছে ; মাঝখানে কোথাও খাঁজ নেই।

পরনে ফরাসডাঙ্গার ধবধবে শাড়ি আর সাদা রেশমের ব্লাউজ। শাড়িটার আঁচলা এবং পাড় বিশাল ; সেখানে জরি আর মুগার চমৎকার নক্সা।

সত্যিই রূপসী, আশ্চর্য রূপসী। তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ দোলনের মায়ের কথা মনে পড়ল রাজেশের। দোলনের মা-ও রূপহীনা নন এবং এইরকম সৌখিনাই। তবু দু-জনের মধ্যে অনেক তফাত। দোলনের মায়ের চোখ-মুখ— সর্বাঙ্গ ঘিরে অসীম সারল্য মাখানো। কিন্তু এই মহিলাটির চোখের মণিতে, তীক্ষ্ণ নাসিকায়, চিবুকের খাঁজে সর্বত্রই আভিজাত্যের স্পর্শ রয়েছে। তবে সে স্পর্শটা উগ্র নয়, স্নিগ্ধ। আরেকটা কথা মনে হল রাজেশের, মহিলা সম্ভবত খুবই ব্যক্তিত্বময়ী।

যোগদাবাবু রাজেশের উদ্দেশে বললেন, 'উনি তোমার কাকীমা।' তারপর সেই মহিলাটির দিকে ফিরে বললেন, 'এই হল গিয়ে আমাদের ভববাবুর ছেলে— রাজেশ। তোমার কাছে একে দিয়ে গেলাম শিবানী। আমরা দোতলায় আছি। চা—না না, ভববাবুর তো আবার চা চলে না। কফি আর গড়গড়া পাঠিয়ে দাও।' বলেই আর অপেক্ষা করলেন না। দোতলার সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নামতে লাগলেন।

শিবানীদেবী কিন্তু খুব একটা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন না। সম্ভবত এ-ই তাঁর স্বভাব। উচ্ছ্বাসের আতিশয্য না থাকলেও সস্নেহ স্মিত মুখে ডাকলেন 'এসো বাবা।'

রাজেশের হঠাৎ খেয়াল হল প্রণাম করা হয়নি। তাড়াতাড়ি কাছে এগিয়ে

পা ছোঁবার জন্য যেই সে ঝুঁকেছে, শিবানীদেবী ধরে ফেললেন। তার চিবুক স্পর্শ করে বললেন, 'দীর্ঘজীবী হও।' একটু থেমে আবার বললেন, 'চল, ঘরে গিয়ে বসি।'

ডান দিকের যে ঘরখানা থেকে শিবানীদেবী বেরিয়ে এসেছিলেন, রাজেশকে নিয়ে সেখানে আর গেলেন না তিনি। সামনের দীর্ঘ বারান্দা এবং অনেকগুলি ঘর ডাইনে-বাঁয়ে রেখে সোজা এগিয়ে চললেন। রাজেশ তাঁকে অনুসরণ করতে লাগল।

একসময়ে চলা শেষ হল। দক্ষিণের শেষ ঘরখানায় এনে একটা বিশাল খাটে রাজেশকে প্রথমে বসালেন শিবানীদেবী। বললেন, 'তুমি একটু বস বাবা, আমি এক্ষুনি আসছি।' দরজার দিকে পা বাড়াতে গিয়ে থমকে আবার পেছন ফিরলেন তিনি, 'ভালো কথা, তুমি কি খুব বেশি চা খাও?'

সঙ্কোচের স্বরে রাজেশ বলল, 'না, খুব বেশি না।'

'অনেক বেলা হয়ে গেছে। একটু পরেই খেতে বসবে। এখন আর চা দেব না; একটু সরবৎ নিয়ে আসি।'

'সরবতের আবার কি দরকার!'

শিবানীদেবী আর কিছু বললেন না। স্নিগ্ধ একটু হেসে চলে গেলেন।

একা একা খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। একটু পরেই নিজের হাতে সরবতের গেলাস আর প্লেটে পাঁচ রকমের মিষ্টি এনে রাজেশের সামনে সাজিয়ে দিলেন শিবানীদেবী।

রাজেশের চোখেমুখে আতঙ্ক। ভয়ে ভয়ে সে বলল, 'এত মিষ্টি আমি খেতে পারব না।'

'আজকালকার ছেলেদের এই এক কথা; খেতে পারব না! তুমি শুরু কর দেখি—' বলেই পেছন ফিরে শিবানীদেবী অবাক। বিস্ময়ের স্বরে আপন মনে বললে, 'ও মা গেল কোথায়!' বলতে বলতে দরজার পর্দা সরিয়ে আবার বাইরে গেলেন।

পরমুহূর্তেই শিবানীদেবীর গলা শুনতে পেল রাজেশ। কাকে যেন তিনি বলছেন, 'পেছনে আসতে আসতে এখানে দাঁড়িয়ে পড়েছিস!'

রাজেশ বুঝল, কারুকে সঙ্গে করে এ ঘরে নিয়ে আসছিলেন শিবানীদেবী। তিনি ঘরে ঢুকে পড়েছিলেন কিন্তু তাঁর অজ্ঞাতসারে সঙ্গিটি বাইরে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

শিবানীদেবী আবার বললেন, 'আয়, ভেতরে আয়।'

এরপর আর কোন কথা নেই। হঠাৎ রাজেশ লক্ষ্য করল, পর্দা সরিয়ে একটি মেয়ের হাত ধরে নিয়ে আসছেন শিবানীদেবী। মেয়েটি নিজেকে মুক্ত করতে

চাইছে কিন্তু শিবানীদেবীর শক্ত মুঠির মধ্যে তার হাতটি দৃঢ়ভাবে ধরা।

মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে রাজেশ হতবাক। সেমুখে অবিকল শিবানীদেবীর আদল বসানো। অলৌকিক কোন কৌশলে শিবানীদেবীর বয়স বছর কুড়ি কমিয়ে দিলে এই চেহারাই দাঁড়াবে। শিবানীদেবী যে এই মেয়ের মা তা অনায়াসেই অনুমান করা যায়।

মেয়েকে টানতে টানতে ঘরের ভেতর এনে রাজেশ যে খাটে বসে ছিল তারই একধারে তাকে জোর করে বসিয়ে দিলেন শিবানী। নিজেও বসলেন মেয়ের পাশে।

রাজেশ তাকিয়েই ছিল। তার দিকে তাকিয়ে শিবানীদেবী বললেন, 'আমার মেয়ে স্থলেখা।'

ভবেশ বলেছিলেন, যোগদাবাবুর মেয়ে শাস্ত্র-সুলক্ষণা। মিথ্যে বলেন নি তিনি। সত্যিই স্থলেখা আশ্চর্য রূপসী—প্রিয়দর্শিনী। তুলনামূলকভাবে দোলনের মুখটা মনে পড়ে গেল রাজেশের। দোলনের চাইতে স্থলেখা যে অনেক বেশি সুন্দরী, সে ব্যাপারে সে নিঃসংশয়।

আরো একটা কথা মনে পড়ল রাজেশের। এখানে আসার পর শিবানীদেবীকে দেখে দোলনের মায়ের কথা ভেবেছিল সে। সজ্ঞানে ভাবে নি। অবচেতনের অতল থেকে বার বার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে দোলন।

কমনীয় ব্রীড়ায় মুখ নত করে খাটের এককোণে চুপচাপ বসে রয়েছে স্থলেখা। মুখ আর তুলতে পারছে না সে। তার দিকে তাকিয়ে রাজেশ ভাবতে চেষ্টা করল, শিক্ষিতা আধুনিকাদের এতখানি লজ্জা ঠিক স্বাভাবিক কিনা! নাকি যোগদাবাবুর অন্তঃপুরে এখনও একালের বাতাস বইতে শুরু করে নি!

মেয়ের পরিচয় দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। এবার স্থলেখার দিকে তাকিয়ে রাজেশের পরিচয় দিলেন শিবানীদেবী। বললেন 'এ হল রাজেশ, আমাদের ভববাবুর ছেলে।'

মুখ না তুলেই মেয়েটি নমস্কারের ভঙ্গি করল। অপ্রতিভের মত রাজেশও তাড়াতাড়ি হাত জোড় করে বুকের কাছে তুলে আনল।

মেয়ে দেখাবার ব্যবস্থাটা ভালই করেছেন যোগদাবাবুরা। সাজিয়ে গুছিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে স্থলেখাকে যদি সামনে এনে বসানো হত, রাজেশের অস্বস্তির সীমা থাকত না। তার চাইতে অন্তঃপুরে ডেকে এনে ঘরোয়া সহৃদয় পরিবেশে মেয়ের সঙ্গে যে আলাপ করিয়ে দিচ্ছেন শিবানীদেবী—এর মধ্যে একটা মার্জিত রুচিশীল মনের পরিচয় আছে।

পরিচয়ের প্রথম পর্বটা সারা হলে শিবানীদেবী হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠলেন।

বললেন, 'ও কি বাবা, তুমি তো হাত তুলেই বসে আছ। খাও—'

রাজেশ বলল, 'এই খাচ্ছি।' বলে অন্যমনস্কের মত মিষ্টি ভেঙে ভেঙে মুখে দিতে লাগল কিন্তু তার দৃষ্টিটা সুলেখার দিকেই নিবদ্ধ রইল।

শিবানীদেবী আবার বললেন, 'আমাদের এই বাড়ি দেখলে তো বাবা।'

সুলেখার দিকে চোখ রেখেই রাজেশ বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'এই বাড়ি তোমার বাবার অনুগ্রহেই হয়েছে। আমার স্বামীর মোট পাঁচ ভাই। ভাইরা সব একজোট হয়ে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে তাঁকে বঞ্চিত করেছে। অবশ্য—'

দূরমনস্কের মত রাজেশ বলল, 'কী?'

'আমার স্বামী ছিলেন এ অঞ্চলের নামকরা মোক্তার। পসার বেশ ভালই ছিল, আয়ও হত প্রচুর। কিন্তু যত আয়ই হোক, মোক্তারির পয়সায় এত বড় বাড়ি হয় না। তুমি ঘরের ছেলে তাই বলছি। তোমার বাবা দয়া করে আমার স্বামীকে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান করে দিয়েছেন। তার পর থেকেই আমাদের সচ্ছলতা বেড়েছে। এই বাড়ি হয়েছে।' কৃতজ্ঞতায় শিবানীদেবীর কণ্ঠ দুলতে লাগল।

রাজেশ উত্তর দিল না। সুলেখার দিকে তাকিয়েই আছে সে। থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে পড়ল, এর আগেও কোথায় যেন দেখেছে মেয়েটিকে। কোথায় দেখেছে? ঠিক মনে করা গেল না।

এদিকে শিবানীদেবী বলে যাচ্ছেন, 'তোমাদের আর আমাদের এই দুই পরিবারে অনেক দিন থেকেই ঘনিষ্ঠতা। আমাদের খুব ইচ্ছা, আরো আপন হই।'

রাজেশ এবারও নিশ্চুপ। তার সমস্ত চেতনা জুড়ে এখন একটি মাত্র প্রশ্নই ব্যাপ্ত হয়ে আছে। কোথায় দেখেছে মেয়েটিকে? কোথায়?

শিবানীদেবী আবার বললেন, 'তোমাদের কাছে চিরদিন আমরা হাত পেতে আছি। বড় আশা নিয়ে এবারও হাত পেতেছি রাজেশ। বিশ্বাস আছে, আমরা বিমুখ হব না।'

তাঁর দিকে লক্ষ্য নেই রাজেশের। সেই প্রশ্নটা নিয়েই মগ্ন হয়ে আছে সে।

শিবানীদেবী আপন মনেই বলে যেতে লাগলেন, 'আমাদের ঐ একটাই মেয়ে। ওকে তোমার নিতেই হবে বাবা। আমাদের বিশ্বাস আছে ও তোমার অযোগ্য হবে না।'

যথারীতি রাজেশ নিশ্চুপ।

রাজেশের নীরবতাকে সম্ভবত লজ্জা বলেই ভাবলেন শিবানীদেবী। তিনি জানতেও পারলেন না, রাজেশের সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে এই মুহূর্তে কোন

আলোছায়ার খেলা চলছে। তিনি আবার শুরু করলেন, 'গেল বছর স্কুলে বি. এ, পাশ করেছে। মেয়ে বলে বলছি না, গানের গলাখানা ওর সত্যি ভাল।'

এর পরও আরো কি-কি যেন বলে গেলেন শিবানীদেবী কিন্তু রাজেশের চেতনায় সে-সব রেখাপাত করতে পারল না।

একসময় তিন তলারই অন্য একটি ঘরে রাজেশকে ডেকে নিয়ে গেলেন শিবানীদেবী। সুলেখাও তাদের সঙ্গে এল। সেখানে গিয়ে রাজেশ দেখল ভবেশ এবং যোগদাবাবু ইতিমধ্যেই এসে গেছেন।

এ ঘরেই খাবার ব্যবস্থা হয়েছে, ব্যবস্থাটা নিখুঁত দিশি প্রথায়। মেঝেতে তিনখানা সুদৃশ্য কার্পেটের আসন পাতা রয়েছে। আসনগুলোর সামনে নক্সাকরা বিরাট বিরাট কাঁসার থালা, কাঁসার গেলাস এবং অগণিত কাঁসার বাটি চমৎকার ভাবে সাজানো। থালা এবং বাটিগুলো এখন অবশ্য খালি।

শিবানীদেবী বললেন, 'বসুন ভববাবু। বোসো বাবা রাজেশ।' স্বামীর দিকে কটাক্ষ হেনে বললেন, 'তোমাকেও গলবস্ত্র হয়ে বসতে বলতে হবে নাকি!'

রাজেশ বুঝল, শিবানীদেবীর ঐ কথা এবং কটাক্ষ মধুর দাম্পত্য লীলার অঙ্গ। সবাই হেসে উঠলেন। হাসিটা রাজেশের মধ্যেও সংক্রামক হল।

একটা লঘু আবহাওয়ার মধ্যে রাজেশ, যোগদাবাবু এবং ভবেশ—তিনজনে আসনে গিয়ে বসলেন।

সুলেখা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। রাজেশরা বসলে মেয়ের দিকে তাকিয়ে কি একটা ইঙ্গিত করলেন শিবানীদেবী। সঙ্গে সঙ্গে সুলেখা পাশের ঘরে ছুটল। একটু পরেই বড় বড় কয়েকটা ডেকচি নিয়ে ফিরে এল সে সেগুলো রেখেই আবার ছুটল। কতবার যে পাশের ঘরে গেল সুলেখা আর খাবারভর্তি কত ডেকচি যে নিয়ে এল, রাজেশ হিসেব রাখতে পারে নি। সব আনা হলে মায়ের পেছন দিকে বসল সে। তারপর মা এবং মেয়ে দুজনেই পরিবেশন করতে লাগল।

ছোটোখাটো একটা উৎসবেরই যেন ব্যাপার। বিপুল আয়োজন করেছেন শিবানীদেবী। পোলাও, দু'রকমের মাংস, পাঁচ রকমের মাছ, ফ্রাই, কাট্‌লেট। অবশেষে দই, রাবড়ি এবং সন্দেশ।

খেতে খেতে শিবানীদেবীর দিকে তাকালেন ভবেশ। সকৌতুকে বললেন, 'এতদিন তো আপনাকে বৌদি বলেছি। এবার কী বলব? বেয়ান?'

শিবানীদেবীর আয়ত চোখে আলো নেচে গেল যেন। গাঢ় কৃতজ্ঞ গলায় বললেন, 'সে তো আমার অসীম সৌভাগ্য।'

তৎক্ষণাৎ আর কিছু বললেন না ভবেশ। কি যেন একটু ভেবে প্রগলভ স্বরে শুরু করলেন, 'তারপর বেয়ান ঠাকরুন—'

ঠোটের প্রান্তে পরিহাসের স্নিগ্ধ হাসি ফুটিয়ে শিবানীদেবী বললেন, 'বলুন বেয়াই মশায়।'

'জামাইয়ের সঙ্গে আলাপ-টালাপ হল?'

'হয়েছে। তবে ছেলে আপনার ভীষণ লাজুক।'

জামাই বলতে ভবেশ কাকে ইঙ্গিত করেছেন, রাজেশ বুঝতে পারল। চকিত হয়ে মুখ তুলল সে। আর দৃষ্টিটা নিজের অজ্ঞাতসারেই স্বলেখার দিকে ফিরল।

আশ্চর্য! স্বলেখার চোখ তার দিকেই নিবদ্ধ। রাজেশের মনে হল অনেকক্ষণ থেকেই স্থির নিষ্পলকে মেয়েটা তাকে লক্ষ্য করছে।

অবাক হবার মতই ব্যাপার। চোখাচোখি হতেও মুখ নামিয়ে নিল না স্বলেখা। একদৃষ্টে তীক্ষ্ণ দূরভেদী চোখে তাকিয়েই রইল। কিছুক্ষণ আগে এই মেয়েটিই কি দক্ষিণের সেই ঘরটিতে কুণ্ঠায় সঙ্কোচে জড়সড় হয়ে বসে ছিল? রাজেশের সংশয় হতে লাগল, সেই কুণ্ঠিতা ব্রীড়ানতা স্বলেখা যেন অন্য কেউ। শুধু সংশয়ই না, মাথার মধ্যে বোধ হয় বিপর্যয়ই শুরু হয়ে গেল। এতক্ষণ একটা সমস্যাই ছিল। মেয়েটাকে কোথাও দেখেছে অথচ সেই জায়গাটা স্মরণ করতে না পারার সমস্যা। তার সঙ্গে এখন আবার আরেকটা জটিলতা এসে জুটেছে। ক্ষণে ব্রীড়াময়ী, ক্ষণে সঙ্কোচহীনা—মেয়েটার এই দুই রূপের কোনটা সত্যি।

পাশ থেকে ভবেশ আবার বলে উঠলেন, 'তা হলে একটা দিন টিন দেখে বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলুন। যত তাড়াতাড়ি হয় কিন্তু স্বলেখাকে আমি আমার ঘরে নিয়ে যাব।'

শিবানীদেবী যেন অপ্রত্যাশিত কিছু পেয়ে গেছেন—এমন ভঙ্গিতে বললেন, 'বেশ তো। স্বলেখা আপনারই মেয়ে; যেদিন ইচ্ছে হবে নিয়ে যাবেন।'

রাজেশ লক্ষ্য করল, বিয়ের প্রসঙ্গে একটি কথাও বলেন নি যোগদাবাবু। ঘাড় গুঁজে সমস্ত ধ্যানজ্ঞান কাঁসার থালায় সঁপে দিয়ে অখণ্ড মনোযোগে খেয়ে যাচ্ছেন তিনি।

এদিকে বিয়ের সম্ভাব্য তারিখ, দেনা-পাওনা ইত্যাদি নিয়ে শিবানীদেবী আর ভবেশের মধ্যে আরো কিছুক্ষণ হাসাহাসি এবং রসিকতা চলল। আর

তারই মধ্যে একসময় খাওয়ার পালা চুকল।

খাবার পর তিনতলারই একটি ঘরে শিবানীদেবী আর সুলেখা তিনজনে জন্য বিছানা পেতে দিল। মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে শিবানীদেবী খেতে চ গেলেন।

খাওয়াটা গুরুতর রকমেরই হয়ে গিয়েছিল। বিছানায় শরীর সঁপে দেবা সঙ্গে সঙ্গে যোগদাবাবু এবং ভবেশের নাক ডাকতে শুরু করেছিল। সেই কনসার্ট শুনতে শুনতে রাজেশের চোখও বুজে গেছে।

রাজেশের ঘুম যখন ভাঙল তখন আর দুপুর নেই। ইতিমধ্যেই ভবেশ যোগদাবাবু উঠে পড়েছেন। নীচু চাপা গলায় পরস্পর তাঁরা কি যেন আলোচন করছেন।

সবাই জেগে ওঠার কিছুক্ষণ পর মেয়েকে নিয়ে শিবানীদেবী আবার এলেন তারপর এল চা, কেক, প্যাস্ট্রি, কাজু বাদাম আর ছানার কিছু মিষ্টি।

রাজেশরা চা-ই শুধু খেল।

চা-পর্ব সারা হলে একটা চাকর হারমোনিয়াম দিয়ে গেল। শিবানীদেবী মেয়ের উদ্দেশে বললেন, 'একখানা রবীন্দ্র-সঙ্গীত গা তো মা।'

একখানা নয়, পর পর তিনখানা গান গাইল সুলেখা। গলা সত্যি চমৎকার ; শুনতে শুনতে সমস্ত সত্তা যেন মুগ্ধ হয়ে যায়।

গান শেষ হবার পরও অনেকক্ষণ আচ্ছন্নের মত বসে রইল সবাই। তারপর ভবেশই প্রথম স্তব্ধতা ভাঙলেন। সুলেখার উদ্দেশে বললেন, 'সত্যি ভগবানের আশীর্বাদ পেয়েছিস তুই। বিয়ের পর গান ছেড়ে দিলে চলবে রেগুলার চর্চা রাখতে হবে।' শিবানীদেবীর দিকে ফিরে বললেন, 'আমারে কিন্তু এখুনি উঠতে হবে বেয়ান ঠাকরুন।'

'এখুনি! কেন? এত কি তাড়া?' শিবানীদেবী জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন

ভবেশ বলেন, 'আজ ফ্যাক্টরিতে যাওয়া হয় নি। বিশেষ একটা দরকার আছে। এখন একবার না গেলেই নয়।'

ঠিক এইসময় যোগদাবাবুরও অত্যন্ত জরুরী কি যেন একটা মনে পড়ে গেল ব্যস্তভাবে বললেন, 'আমাকেও একবার মিউনিসিপ্যালিটিতে যেতে হবে চলুন ভববাবু, আপনার গাড়িতেই যাই।'

শিবানীদেবী ভবেশকে বললেন, 'বেশ আপনারা যান। আমি কিন্তু রাজেশকে এখন ছাড়ছি না।'

ভবেশ হাসলেন। বললেন, 'সুলেখা যেমন আমার মেয়ে রাজুও তেমনি

আপনার ছেলে। আপনি ওকে ছেড়ে না দিলে আমার সাধ্য কি ওকে নিয়ে যাই।'

'আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে।'

'অনুরোধ না বলে আদেশ বলুন। বান্দা প্রস্তুত।'

'ঠাট্টা নয়। কথাটা বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে। আবার না বলেও পারছি না। দুপুরবেলা খাবার জন্য আপনাদের নেমন্তন্ন করেছিলাম। রাজু যদি রাত্তিরে এখান থেকে খেয়ে যায় আপনার আপত্তি আছে!'

'এই কথা! আমি ভাবলাম না জানি কি!' ভবেশ জোরে হেসে উঠলেন। বললেন, 'রাজু আপনার ছেলে। খাইয়ে ছাড়বেন, না না-খাইয়ে ছাড়বেন, আজ ছাড়বেন কি কাল ছাড়বেন—সে-সব আপনার ইচ্ছে। সব চাইতে বড় কথা ওর মা নেই, এতদিনে ছেলেটা মা পেল। আচ্ছা আমি চলি।'

ভবেশের কথা শেষ হল কি হল না, হঠাৎ রাজেশ বলে উঠল, 'আমিও এখন যাব।'

শিবানীদেবী কিছুটা হতচকিত। বিমূঢ়ও। মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'সে কি কথা! ওঁদের কাজ আছে, ওঁরা যাবেন। তোমার যাবার তাড়া কিসের?'

রাজেশ বলল, 'এক জায়গায় আমাকে যেতে হবে। বিশেষ দরকার আছে।'

'অন্য দিন গেলে হয় না!'

'না।'

এই মুহূর্তে সত্যিই এমন কিছু কাজের তাগিদ নেই যাতে না গেলেই নয়। সত্যি বলতে কি, কোন কাজই নেই তার। তবু কেন যেতে চাইছে তার স্পষ্ট জবাবদিহি বোধ হয় নিজের কাছেই করতে পারবে না সে।

খুব সম্ভব এখানকার মোহময় প্রভাব থেকে নিজেকে ছিন্ন করে দূরে চলে যেতে চাইছে রাজেশ। তারপর নির্জনে বসে আজকের এই বিচিত্র দিনটাকে একটু একটু করে বিশ্লেষণ করবে।

যোগদাবাবু, ভবেশ বা শিবানীদেবী—কারো অনুরোধই রাখল না রাজেশ। নিজের সিদ্ধান্তেই অটল রইল সে। অতএব ক্ষুণ্ণ মনে শিবানীদেবী বললেন, 'বড় আশা করেছিলাম, তুমি থাকবে। সুলেখার সঙ্গে তোমার কোন কথাই হল না।'

রাজেশ নিশ্চুপ।

ভবেশ বললেন, 'যখন থাকবিই না, চল্ আমার সঙ্গে। তোকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যাই।'

রাজেশ বলল, 'আমি এখন বাড়ি ফিরব না।'

'তবে কোথায় যাবি ?'

'যাব এক জায়গায়। আপনি চলে যান। আমি হেঁটেই যাব।'

ভবেশ বুঝলেন তাঁর সঙ্গে যেতে রাজেশের খুবই অনিচ্ছা। যোগদাবাবুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। আর রাজেশ একা-একাই রানীপুরের রাস্তায় নামল।

ছয়

এতক্ষণ বিচিত্র এক আচ্ছন্নতা সমস্ত সত্তার ওপর ব্যাপ্ত হয়ে ছিল। রানীপুরের পথে পথে দ্যমনস্কের মত হাঁটতে হাঁটতে এক সময় রাজেশের মনে হল, ঘোরটা কেটে যেতে শুরু করেছে। আর ঘুরে ফিরে সেই প্রশ্নটা মাথার ভেতর হানা দিতে লাগল।

যোগদাবাবুর মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে ভবেশ কেন এত উদ্‌গ্রীব। যোগদাবাবুদের আগ্রহও তো কম নয়।

স্নলেখার মত মেয়ের জন্য আরেকটু উচ্চাভিলাষী হতে পারতেন যোগদাবাবুরা। হলে অন্যায় কিছু হত না। আর ঐ মেয়ের জন্য রাজেশের চাইতে বহুগুণে যোগ্যতর ছেলে অনায়াসেই পাওয়া যেত।

চলতে চলতে হঠাৎ শিবানীদেবীর একটা কথা মনে পড়ে গেল। তখন কথাটা খেয়াল করেনি রাজেশ। শিবানীদেবী বলেছিলেন, ভবেশ যোগদাবাবুকে রানীপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান করে দিয়েছেন। সে জন্য তাঁদের অবস্থা ফিরে গেছে। সেই কৃতজ্ঞতার বশেই কি রাজেশকে অযোগ্য জেনেও তার হাতে মেয়েকে তুলে দিতে চাইছেন ?

প্রসঙ্গত' আরো একটা ভাবনা রাজেশের সমস্ত সত্তাকে প্রবলভাবে নাড়া দিল। যতদূর সে জানে, পৌরসভার কাজ হল জনসেবার কাজ এবং তা স্বার্থহীন। তাই যদি হয়, পৌরসভায় এসে যোগদাবাবুর পক্ষে এত বড় বাড়ি করা কি ভাবে সম্ভব ? প্রশ্নটা রাজেশের মস্তিষ্কে ক্রমাগত জট পাকাতে লাগল। আর এই জটিলতার মধ্যে আচমকা রৌদ্র ঝলকের মত স্নলেখার মুখখানা চেতনায় ফুটে উঠল। কোথায় দেখেছে তাকে ? কোথায় ?

রাজেশের মন এই মুহূর্তে অস্থির, বিভ্রান্ত এবং কিছুটা বিক্ষিপ্তও। মনের এই অবস্থায় রানীপুরের অলিগলি দিয়ে অন্যমনস্কের মত সে শুধু হাঁটছে, হাঁটছে আর হাঁটছে।

হাঁটতে হাঁটতে মাথার ওপর অতর্কিত বিদ্যুৎ-চমকে রাজেশ চকিত হয়ে উঠল। চকিত এবং সচেতন। তার অজ্ঞাতসারে কখন যেন ঈশানী আকাশে

স্তরে স্তরে গাঢ় কালো মেঘ জমেছে। দিগন্তে আড়াআড়ি ফাটল ধরিয়ে সাপের জিভের মত বিদ্যুৎ চমকে যাচ্ছে।

সবে ফাল্গুন মাস। ঝড়বৃষ্টির এটা মরসুম নয়। তবু এই দিনটার ঝোঁক যেন সেদিকেই।

আকাশটা তো আসন্ন দুর্যোগের সাজঘর। সেদিকে তাকালে চিন্তিত হবার কথাই। নীচের দিকে তাকিয়েও কম ভাবনা হল না রাজেশের। রানীপুরের অলিগলির জটিলতায় ঘুরতে ঘুরতে কখন যে একটা অপরিচিত এলাকায় এসে পড়েছিল, খেয়াল নেই।

এদিকে অকালের মেঘ সাজগোজ করেই রেহাই দিল না। দেখতে দেখতে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল।

নিরুপায়ের মত এদিক-সেদিক তাকাতে তাকাতে হলুদ রঙের দোতলা একটা বাড়ি চোখে পড়ল। নীচে একটা বারান্দা রয়েছে। ছুটে গিয়ে আপাতত সেখানেই আশ্রয় নিল রাজেশ।

যে বাড়িটার নীচে এই মুহূর্তে রাজেশ দাঁড়িয়ে তার দোতলা থেকে গানের সুর ভেসে আসছে, 'পিউ পিউ পাপিয়া বোলে—' যে গাইছে সে কোন স্ত্রীলোক গলার স্বর তীক্ষ্ণ, রণরণে—কেমন একটা ধাতব বেশ যেন তাতে মেশানো।

কী গান ওটা? গজল, না ঠুংরি? রাজেশ তা জানে না। গজল হোক আর ঠুংরিই হোক, দোতলা থেকে ভেসে-আসা সেই গানটা তাকে মগ্ন করে রাখতে পারল না। আবার—আবার সেই অস্বস্তিকর প্রশ্নটার মধ্যে ফিরে গেল রাজেশ। কোথায় সে সুলেখাকে দেখেছে? কোথায়?

হঠাৎ ম্যাজিক লণ্ঠনের ছবির মত ভাবনার পর্দায় জায়গাটা ভেসে উঠল। মনে পড়েছে, বাজার পাড়ার সেই রেস্তোরাঁয় দোলনের সঙ্গে সুলেখাকে দেখেছিল রাজেশ। দূরের একটা চেয়ারে বসে ছিল সুলেখা। হাইস্কুলের হেডমাস্টার সারদা মিত্রকে নিয়ে সবাই যখন উত্তেজিত আলোচনায় মেতেছে সেই সময় এই মেয়েটিও তাতে যোগ দিয়েছিল। কথাটা মনে করতে পেরে এতক্ষণে আরাম বোধ করল রাজেশ। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় আরেকটি ভাবনা তাকে তীক্ষ্ণভাবে বিদ্ধ করল।

যে মেয়েকে ভবেশ নিজের পুত্রবধূ করতে চান সে অন্তত, তাঁর বিরুদ্ধপক্ষের সঙ্গে মেলামেশা করবে না, এটাই বাঞ্ছনীয়। দোলনের সঙ্গে সুলেখার যে যোগাযোগ আছে এ খবর কি ভবেশের অজানা?

আচমকা পাশ থেকে কে যেন ডেকে উঠল, 'দাদা—'

চমকে ডান দিকে মুখ ফেরাল রাজেশ। কখন যেন অকালের বর্ষা থেকে

মাথা বাঁচাবার জন্য লোকটি পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ভাঙাচোরা চারকোণা মুখ, চোখের কোণে গাঢ় কালির প্রলেপ, পানের রসে মাজানো-করা কালো কালো দাঁত, চুলে পরিপাটি বাবরি, ঢুলুঢুলু আরক্ত চোখ, পরনে দিশি ধুতি আর গিলে-করা পাঞ্জাবির ওপর রঙ জ্বলে-যাওয়া বিবর্ণ শাল। ধুতি-পাঞ্জাবির অনেক জায়গায় রিপু করা। দেখামাত্রই গোত্র বোঝা যায়, একটি নিখুঁত লম্পট। লোকটির চেহারা এবং পোশাক জানিয়ে দিচ্ছে, আর্থিক দুর্দশার শেষ কূলে গিয়ে সে ভিড়েছে তবু লাম্পট্য ছাড়তে পারে নি।

এমন একটা লোক পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সমস্ত শরীর যেন কুঁচকে যেতে লাগল। বিরক্ত উগ্র স্বরে রাজেশ বলল, 'কী চাই ?'

লোকটা বলল, 'আমার কাছে ঘোড়া আছে। একটু লাগামের ব্যবস্থা করতে পারেন ?'

রাজেশের বিরক্তির সঙ্গে এবার বিমূঢ়তা মিশল। বলল, 'লাগাম !'

'হুঁ।' বলেই পকেট থেকে আধপোড়া একটা সিগারেট বার করে ঠোঁটে চেপে বলল, 'এটা হল ঘোড়া। আর আগুন হল লাগাম ! একটা দেশলাই হবে ?'

ব্যাপারটা বোধগম্য হল। পকেট হাতড়ে একটা লাইটার বার করে লোকটির দিকে এগিয়ে দিল রাজেশ। সিগারেট ধরিয়ে সেটা তৎক্ষণাৎ ফেরত দিল লোকটি। তারপর গাঁজার কলকের মত সিগারেটটা হাতের মুঠিতে বসিয়ে প্রচণ্ড এক টান লাগাল। গল গল করে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'দাদার নামটা কী ?'

কর্কশ স্বরে রাজেশ বলল, 'কোন দরকার আছে ?'

'না ! দরকার আর কি ! তবে ডাকতে সুবিধে হয়। তা আপনি যখন নামটা বলতে চান না, তখন পেদাপেড়ি করব না। আমার নামটা অবশ্য শুনে রাখতে পারেন—হরবিলাস চৌধুরী।'

রাজেশ উত্তর দিল না।

একটু চুপ করে থেকে বৃষ্টির দিকে তাকাল হরবিলাস। অসীম বিতৃষ্ণায় বলল, 'ফাল্গুন মাসে কি কাণ্ডটা বাধল, দেখছেন ! কথায় বলে বসন্ত ঋতুর রাজা ছ্যাঃ ! দেবে আজকের ফুর্তিটা মাটি করে, না কি বলেন !'

কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর হঠাৎ রাজেশের মনে হল, এই লোকটির কাছ থেকে বাড়ি ফেরার পথ জেনে নেওয়া যেতে পারে। সে বলল, 'আচ্ছা হরবিলাসবাবু—'

'বলুন—' হরবিলাস জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

রাজেশ বলল, 'এ জায়গাটার নাম কী ?'

প্রশ্নটা করে একটা নিদারুণ গর্হিত কাজই যেন করে ফেলেছে রাজেশ। তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত তীক্ষ্ণ চোখে একবার জরীপ করে নিল হরবিলাস তারপর থেমে থেমে বলতে লাগল, 'রানীপুরে আপনি নতুন এসেছেন!'

'তা এক রকম বলতে পারেন।'

'ত-ই। আমারও সেই রকমই ঠেকছিল। তা মশাই এটা হল রসবতীদের পাড়া।'

'রসবতীদের পাড়া!' রাজেশ হতবাক।

হরবিলাস খুক খুক করে হাসল। তারপর চোখের একটা ইঙ্গিত করল।

ইঙ্গিতটা বুঝতে অসুবিধে হল না। সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠল রাজেশ। মনে হল, সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে ঝন ঝন করে কি যেন ভাঙতে শুরু করেছে। এটাই তা হলে সেই কুখ্যাত পুবের পাড়া! একদা এখানেই তো ভবেশ তাদের পারিবারিক সম্মান, মর্যাদা নিজের উজ্জল ছাত্রজীবন—সবকিছু দু হাতে টেনে নামিয়ে পথের ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিলেন।

জীবনের প্রথম আঠারোটা বছর এ শহরেই থেকে গেছে রাজেশ। কিন্তু পুবের পাড়াটা ছিল তার কাছে নিষিদ্ধ দেশ। এখানে কোনদিনই আসেনি। এলে অনায়াসেই জায়গাটা আজ চিনে ফেলতে পারত।

পাশ থেকেই হরবিলাস আবার বলে উঠল, 'নতুন বলেই চিনতে পারিনি। নইলে এ পাড়ায় যাদের আনাগোনা তাদের কোন শালাকে না চিনি। তা হ্যাঁ মশাই, আজ তো হাতে খড়ি হল। এবার থেকে রোজ আসবেন তো?'

রাজেশ হতভম্ব। লোকটা তাকে স্বগোত্র ঠাউরেছে নাকি! সে কিছু বলবার আগেই আঙুল ঠেকিয়ে প্রচণ্ড উৎসাহে হরবিলাস আবার বলল, 'এ শর্মা রোজ এখানে আসে। এখানকার নাড়ি-নক্ষত্র আমার জানা। বাবার আমলের তিনখানি বাড়ি আর পাঁচশ বিঘে জমি রসবতীদের পেছনে আমি উড়িয়ে দিয়েছি। তা এখানে এসে আমার খোঁজ নেবেন। কোথায় কাঁচা সরেস মাল আছে—সব খবর দিয়ে দেব।'

বলতে বলতে একটু থেমে পরক্ষণেই কি মনে পড়তে আবার শুরু করে দিল হরবিলাস, 'ভাল কথা, আপনি নতুন মানুষ। তাই একটা হিত উপদেশ দিচ্ছি। এখানে এসে চোখ বুজে যে কোন বাড়িতে ঢুকে পড়বেন। কিন্তু যে বাড়িটার তলায় দাঁড়িয়ে আছি এর ভেতরে কদাপি না!'

'কেন বলুন তো?'

'এ বাড়িটা বাঘের গুহা।'

'তার মানে?'

'মানে জানতে চাইছেন!' একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হরবিলাস বলল, 'জানতে চাইতেন না যদি বুঝতেন এ বাড়িতে কার মেয়েমানুষ থাকে।'

যে প্রসঙ্গ নিয়ে হরবিলাস ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করেছে তাতে বিন্দুমাত্র রুচি নেই রাজেশের। এ ব্যাপারে তার প্রাণে একটি মাত্র সক্রিয় অনুভূতিই আছে। তার নাম ঘৃণা—নিষ্ঠুর, নির্দয়, চরমতম ঘৃণা। তবু—তবু তার গলার মধ্য থেকে প্রশ্নটা ছিটকে বেরিয়ে এল, 'কার মেয়েমানুষ থাকে এখানে?'

হরবিলাস কি বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ দেখা গেল অবিশ্রাম বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে একটা খালি সাইকেল রিক্সা এদিকেই আসছে। স্বর্গ যেন হাতে নেমে এসেছে, এমন ভঙ্গিতে রাজেশের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'এতক্ষণে তবু একটা পুষ্পরথ মিলল। আজ রাতের মতন ফুর্তিটা ভিজে একেবারে বোদা মেরে যাবে ভেবেছিলাম। এখন দেখছি, না, অতটা ভেঙে পড়াব কিছু হয় নি।' বলেই দিগ্বিদিকের জ্ঞান হারিয়ে একরকম লাফ দিয়েই রিক্সায় গিয়ে উঠল। বলল, 'হাঁকাও বাবা পক্ষীরাজ—সিধে ময়নার ঘরে গিয়ে থামবি।'

মুহূর্তে রিক্সাটা সামনের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল। বিমূঢ়ের মত একা একা দাঁড়িয়ে রইল রাজেশ।

কতক্ষণ নীচের তলায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল, রাজেশের খেয়াল নেই। বৃষ্টিটা আজ আর কমবে বলে মনে হচ্ছে না।

এই দুর্যোগে কি-ভাবেই বা বাড়ি ফেরা যায়! যতদূর চোখ যায়, রিক্সা দূরে থাক, একটি মানুষের চিহ্নও নেই। যাও বা একটা রিক্সা এসেছিল, ডাকবার আগেই হরবিলাস সেটা নিয়ে উধাও হয়েছে। অবশ্য ভদ্র লোকালয় হলে একটা কাজ করতে পারত রাজেশ। যে কোন একটা বাড়িতে কড়া নেড়ে আশ্রয় নিতে বাধা ছিল না। কিন্তু না জেনে ঘোরের মধ্যে যে অলকাপুরীতে সে এসে পড়েছে সেখানে কোন দরজার কড়া নাড়ার মত দুঃসাহস অন্তত তার বুকে নেই।

কী করবে ভেবে ভেবে রাজেশ যখন দিশেহারা ঠিক সেই সময় বারান্দার সঙ্গে লাগানো এই দোতলা বাড়ির একটা দরজা খুলে গেলো। আর তার ফাঁক দিয়ে যার মুখ উঁকি দিল তাকে কী বলা যায়? যুবতী? না। প্রৌঢ়া। তা-ও না। প্রৌঢ়ত্ব এবং যৌবনের মাঝামাঝি একটা জায়গায় তার বয়স থমকানো।

মেয়েমানুষটিকে বোধ হয় হেমন্তের নদী বলা যায়। হেমন্তের প্রথম দিকের।

তলে তলে বেশ টান ধরে গেছে। দ্বিতীয় ঋতু বর্ষার সেই ঢল যদিও নেই, তবে শীতের ছোঁয়া লাগতে এখনও অনেক দেরি। শরীরখানি ঢলো ঢলো দলমলে; ভাটার টান ধরলেও পূর্ণতা এখনও ঘোচে নি।

মেয়েমানুষটির মুখখানি ডিম্বাকৃতি। বিশাল চোখ, নিখুঁত চিবুক, ধারালো নাক, অনুন্নত ভরাট বুক, মসৃণ গলা। চুলগুলি সামনের দিকে খানিক এগিয়ে দিয়ে পাতা পেড়ে খোঁপা বেঁধেছে। গায়ের রঙ রীতিমত রক্তাভ। হাতের আঙুল, ঠোঁটের খাঁজ, সুচারু কোমর—সব কিছুই দৃষ্টির আনন্দ।

সাজসজ্জার বেশ বাহার আছে মেয়েমানুষটির। বুটিদার ঢাকাই শাড়ি কুঁচি দিয়ে পরা। চোখে সূক্ষ্ম রেখায় সুর্মা টানা। গলায় তেঁতুল পাতা হার, হাতে গোছা গোছা সোনার চুড়ি, পাঁচ আঙুলে পাঁচটি আঙটি, নাকের পাটায় হীরের নাকছবি, কানে ঝুমকো।

মেয়েমানুষটির সব আকর্ষণ তার চোখে। দৃষ্টি তার আশ্চর্য সজাগ। তার সঙ্গে বিচিত্র খরতা মেশানো। এমন চোখ গৃহপালিত রমণীর হয় না।

তাকে দেখে অসীম বিতৃষ্ণায় চোখ কুঁচকে গেছে রাজেশের। মনে হচ্ছে কতকগুলো পোকা তার রক্তের মধ্যে কিলবিল করে বেড়াচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল তারা। তারপর মেয়েমানুষটিই প্রথম স্তব্ধতা ভাঙল, 'ওদিকের জানালা দিয়ে দেখছিলাম, অনেকক্ষণ আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন।'

রাজেশ লক্ষ্য করল বাড়িটা ইংরাজী এল হরফের মত। দক্ষিণের জানালা থেকে সত্যিই এই বারান্দাটাকে দেখা যায়, শুধু লক্ষ্যই করল সে, মুখে কিছু বলল না।

মেয়েমানুষটি আবার বলল, 'ফাল্গুন মাসে কি বিচ্ছিরি বর্ষাই না আরম্ভ হয়েছে। তা এক কাজ করুন না। যতক্ষণ বর্ষাটা না থামছে, ভেতরে এসে বসুন।'

এতক্ষণে মুখ খুলল রাজেশ। তীক্ষ্ণ কর্কশ স্বরে বলল, 'ভেতরে গেলে খুব সুবিধে হয়, না? আমার কাছে কোনরকম চালাকি খাটবে না।'

মেয়েমানুষটি প্রথমে হকচকিয়ে গেল। তারপর রাজেশের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার চকিত দৃষ্টিক্ষেপ করে বলল, 'আপনি বুঝি এ-পাড়ার বাসিন্দাদের ঘেন্না করেন?'

রাজেশ উত্তর দিল না। দেওয়ার প্রয়োজনও বোধ করল না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর মেয়েমানুষটি কি ভেবে আবার শুরু করল, এ-পাড়ায় আপনি নতুন—তাই না?'

রাজেশ যথারীতি নিরুত্তর।

মেয়েমানুষটি থামে নি। সমানে সে বলে যাচ্ছে, 'হুঁ', নতুন বলেই তো মনে হচ্ছে। নতুন না হলে বুঝতেন উটকো লোককে ঘরে ঢোকাবার দরকার হয় না মেনকার।'

নিজের অজ্ঞাতসারেই হঠাৎ রাজেশ বলে ফেলল, 'মেনকা—মেনকা কে?'

'আমি।' মেয়েমানুষটি বলল। বলে একটুক্ষণ কি যেন চিন্তা করে পরমুহূর্তে আরম্ভ করল, 'এপাড়ার অন্য মেয়েমানুষদের মতন লোক ঢোকাবার দরকার তো হয়ই না; উপায়ও নেই। নেহাত আপনি এই বর্ষার ভেতর দাঁড়িয়ে আছেন তাই—'

স্থির নিবদ্ধ দৃষ্টিতে মেয়েমানুষটির দিকে তাকাল রাজেশ। তার কথাগুলো সত্যি না মিথ্যে—বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করল। কামিনী পাড়ার মেয়ে সম্বন্ধে রাজেশের ধারণায় একটিমাত্র চেহারাই আঁকা আছে। নিজের দেহে দোকান সাজিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সে শুধু লুব্ধ পতঙ্গদের আকর্ষণ করবে। কিন্তু মেনকার চালচলন ধরন-ধারন দেখে তা মনে হয় না। সে বলেছে, দেহোপজীবিনী হয়েও বাইরের লোক ঘরে ডেকে আনার প্রয়োজন হয় না তার। কেন হয় না? সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করে বসল রাজেশ।

মেনকা বলল, 'আমি যার কাছে বাঁধা, সে যদি জানতে পারে অন্য লোক ঘরে এনেছি আমায় দু-খানা করে ফেলবে। তা ছাড়া সে আমায় সোনায়, হীরেয় মুড়ে রেখেছে। অন্য লোক আমায় ক'পয়সা দেবে! শুধু শুধু গতর নষ্ট করা।'

মেনকা আবার বলল, 'আপনার ইচ্ছে হলে ভেতরে এসে বসতে পারেন। বৃষ্টি ধরলে চলে যাবেন। আর যদি না আসেন, আমি যাচ্ছি।'

রাজেশের মনটা দ্বিধায় দুলতে শুরু করল। একবার সে ভাবল, ভেতরে যায়। আবার ভাবল যাবে না। যাওয়া না-যাওয়ার আলোছায়ায় অনেকক্ষণ দোল খেয়ে অবশেষে স্থির করল যাবে। না গিয়ে উপায়ই বা কী? বৃষ্টির ফলাগুলো উত্তুরে বাতাসের সওয়ার হয়ে যেভাবে বেঁকতে শুরু করেছে তাতে অর্ধেক ভেজা হয়েই গেছে। আর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে পুরোপুরি একখানা স্নানই হয়ে যাবে। সুতরাং এখানে দাঁড়িয়ে ভেজার চাইতে ভেতরে গিয়ে বসাই শ্রেয়। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে মরিয়ার মত রাজেশ বলল, 'চলুন তবে—'

অজ্ঞাতপরিচয় এক দেহব্যবসায়িনীকে অনুসরণ করতে করতে বুকের মধ্যটা দুরু দুরু করে উঠল রাজেশের। সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে কালো সংশয়ের ছায়া পড়ল একটা। এই সব স্বৈরিণীদের সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী শুনেছে। ছলাকলায়

তারা নাকি খুবই পটিয়সী। মেনকাও কি ভালমানুষির ছদ্মবেশে তাকে ফাঁদে ফেলতে চাইছে? কিন্তু এখন আর ফেরার পথ নেই।

রাজেশের দুর্ভাবনার মধ্যেই মেয়েমানুষটি দোতলার বিশাল একটি ঘরে এসে ঢুকল।

ঘরখানি নিখুঁত সাজানো। হাল ফ্যাসানের খাট, আলমারি, ড্রেসিং টেবল, এক কোণে খান দুই সোফা—প্রয়োজনীয় সব কিছুই রয়েছে। বাকলোর মধ্যে দক্ষিণের দেওয়াল ঘেঁষে বিস্তৃত ফরাস পাতা। তার ওপর ঝালর দেওয়া অনেকগুলি তাকিয়া ছড়ানো। আর আছে হারমোনিয়াম, ডুগি, তবলা, সেতার এবং বেহালা। একটু আগে গজল অথবা ঠুংরি-যে গানখানি শোনা গিয়েছে, তা কি ঐ ফরাসে বসে মেনকাই গাইছিল? সম্ভবত।

একটা সোফা দেখিয়ে মেনকা বলল, 'বসুন।'

বুকের মধ্যে অসহ্য কাঁপুনি নিয়ে রাজেশ সেই সোফাটায় নিজেকে সঁপে দিল। মেনকা অবশ্য পাশের সোফায় বসল না। খানিকটা দূরে ড্রেসিং টেবিলে ঠেসান দিয়ে দাঁড়াল।

গান-বাজনার ঐ ফরাসটুকু বাদ দিলে এ ঘরের যা-যা আছে, কোনটাই দোষাবহ নয়। যে কোন ভদ্রলোকের বাড়িতে গেলে এ-সব চোখে পড়বে। আর ঐ ফরাসটাই বা কি এমন অপরাধ করেছে! কিন্তু হরবিলাসের মুখে এ পাড়ার পরিচয় জানার পর থেকেই এখানকার সব কিছু একটা কালো কাচের ভিতর দিয়ে দেখতে শুরু করেছে সে। এখানকার যা কিছু, সমস্তই জঘন্য, ঘৃণ্য, কুৎসিত।

হঠাৎ মেনকা ডেকে উঠল, 'শুনছেন—'

চকিত রাজেশ মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

'একটু চা আনতে বলব?'

রাজেশ তীক্ষ্ণ স্বরে প্রায় চেঁচিয়েই উঠল, 'না-না—'

একটুক্ষণ খর চোখে তাকিয়ে রইল মেনকা। ঠোঁটের প্রান্তদুটো আস্তে আস্তে গভীর খাঁজের মধ্যে বিলীন হয়ে যেতে লাগল। নাকের ডগা ঈষৎ কাঁপল বুঝি। শরীরটা সামনের দিকে অনেকখানি ঝুঁকিয়ে নিষ্ঠুর বিদ্রূপের ভঙ্গিতে সে ফিস-ফিসিয়ে উঠল, 'জানি, আমরা নরকের পোকা। তবু চা-টা খেলে মহাভারত একেবারে অশুদ্ধ হয়ে যেত না। খানিকটা গরম জল তো শুধু।'

রাজেশ উত্তর দিল না।

মেনকা আবার বলে উঠল, 'আগুনে পুড়লে সব কিছুই শুদ্ধ হয়ে যায়। ভেবে দেখুন, খাবেন কি না?'

বিব্রত মুখে রাজেশ কি উত্তর দিতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় একটি প্রৌঢ় লোক (খুব সম্ভব এখানকার চাকর। চেহারা দেখে অন্তত তা-ই মনে হয়।) উত্তেজিত মুখে ঘরে এসে ঢুকল।

তার দিকে তাকিয়ে মেনকার সজাগ চোখ মুহূর্তে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। কিছুটা উদ্বেগের স্বরেই সে বলল, 'কী ব্যাপার গণেশ ?'

গণেশ বলল, 'মহা বিপদে পড়েছি রাধাকে নিয়ে।' কলকাতা থেকে মারোয়াড়ীবাবুরা গাড়ি পাঠিয়েছে। রাধা কিছুতেই যেতে চাইছে না। নিজে তো যাবেই না। মায়া, ছবি, সন্ধ্যা, মালতী—ওদেরও যেতে দিচ্ছে না।'

মেয়েমানুষটির চেহারা মুহূর্তে বদলে গেল। চোয়াল কঠিন হয়ে উঠল তার। সদাজাগ্রত চোখ দুটো থেকে ছুরির ফলার মত নিষ্ঠুরতা বিচ্ছুরিত হতে লাগল। তীব্র স্বরে মেনকা বলল, 'কী বলতে চায় রাধা ? কেন এরকম করছে ?'

ঠোঁট উল্টে গণেশ বলল, 'কেন করছে সে তো আপনি জানেন। ওকে রেখে দরকার নেই মা। একটা দাগী আম থাকলে বাকিগুলোতে দাগ ধরে যায়।'

রুক্ষ গলায় মেনকা বলল, 'এখন সে কী করছে ?'

'কী আবার করবে, শাস্তোর আওড়াচ্ছে। মহা জ্বালা হয়েছে ওকে নিয়ে।'

'শাস্তোর আওড়াচ্ছে ! তার মানে ?'

'মানে আবার কি। খালি বলছে, তুমি নাকি চাকরি দেবার নাম করে পাপের ব্যওসায় (ব্যবসা) এনে তুলেছ। কিছুতেই সে এ-সব মেনে নেবে না।

সোফায় বসে বিভ্রান্তের মত একবার গণেশ আরেকবার মেনকার দিকে তাকাচ্ছিল রাজেশ। কোন কিছুই স্পষ্টভাবে সে বুঝতে পারছিল না। তবে এটুকু সে অনুমান করতে পেরেছে, রাধা হয়তো কোন অভাবের ঘরের মেয়ে। চাকরির প্রলোভনে তাকে লুব্ধ করে ঘরের বার করে এনেছে মেনকা; অবশেষে দেহব্যবসায়ের ক্লেদাক্ত অন্ধকারে নামিয়ে দিয়েছে। কিন্তু রাধার মধ্যে এখনও পবিত্র শুদ্ধ জীবনের আকাঙ্খা মরে নি। এই নরক থেকে মুক্তির জন্য সে বোধ হয় যুদ্ধ করে যাচ্ছে।

চিন্তিত স্বরে মেনকা বলল, 'তাই তো, ভারি মুশকিল হল।'

'মুশকিল বলে মুশকিল ! এক ঘণ্টার ওপর মারোয়াড়ীদের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ভববাবু হুকুম দিয়ে গিয়েছিল, গাড়ি আসা মাত্তর যেন ছুঁড়িগুলোনকে তুলে দিই। এখন কী করব, বলুন দিকিন ?' গণেশ বলল।

গণেশের মুখে 'ভববাবু' নামটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে একটা হিমাক্ত ঠাণ্ডা স্রোত রাজেশের মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে দুরন্ত দ্রুতগতিতে বয়ে গেল।

গণেশ-কথিত ভববাবু কে ? ভবেশ কি ? রাজেশের ভাবনার বৃত্তটা সম্পূর্ণ হল না। তার আগেই গণেশের উদ্দেশে মেনকা বলে উঠল, 'মারোয়াড়ীবাবুরা তো অনেক টাকা দিয়েছে ?'

'হ্যাঁ।' গণেশ মাথা নাড়ল, 'দু-রাত পাঁচটা মেয়ের জন্যে সাত শ' টাকা। ভববাবুর কাছেই দিয়ে গেছে।' রাত্তিরে তো ভববাবু আসবে। এসে যদি দ্যাখে ছুঁড়িগুলোন যায় নি, আমাদের আস্ত রাখবে না।'

'চল একবার দেখি। হারামজাদীকে বলে কয়ে গাড়িতে তুলতে পারি কিনা।' রাজেশ যে ঘরের এককোণে বসে আছে, সে সম্বন্ধে যেন খেয়ালই নেই মেনকার। গণেশকে নিয়ে চলে গেল সে।

আর একা-একা বিশাল ঘরখানায় বসে ঘামতে লাগল রাজেশ। তার চোখ মুখ ঝাঁ ঝাঁ করছে। বার বার প্রার্থনা করতে লাগল, গণেশদের ভববাবু যেন ভবেশ না হয়।

রাজেশ ভাবছিল আর উদ্‌ভ্রান্তের মত বিশাল ঘরখানার চারদিকে তাকাচ্ছিল। হঠাৎ তার দৃষ্টি ড্রেসিং টেবিলের ওপর একটা ফোটোয় আটকে গেল। রাজেশের হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল। ফোটোটা ভবেশের। গণেশদের ভববাবু আর ভবেশ যে একই ব্যক্তি সে সম্বন্ধে সংশয়ের আর অবকাশ নেই।

নিশ্চেতনের মত কতক্ষণ যে ফোটোটার দিকে রাজেশ তাকিয়ে ছিল, খেয়াল নেই। চেতনা ফিরল পায়ের শব্দে। চমকে রাজেশ দেখল, গণেশ আর মেনকা আবার ফিরে এসেছে। তারা ঘরে ঢোকামাত্র ভবেশের ফোটোটা দেখিয়ে মেনকাকে সে বলল, 'ওটা কার ফোটো ?'

ফোটোটা কার, সে সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়েও প্রশ্নটা করেছে রাজেশ। কেন করেছে, সে সম্পর্কে বোধ হয় নিজের কাছেই স্পষ্ট কোন ব্যাখ্যা নেই। একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে থেকে মেনকা পাল্টা প্রশ্ন করল, 'রানীপুরে আপনি কতদিন আছেন ?'

'দিনকতক হল এসেছি।' রাজেশ বলল। জীবনের প্রথম আঠারটা বছর যে সে এখানে কাটিয়ে গেছে, সে হিসাবটা আর দিল না।

'তাই। ওটা ভবেশ বাঁড়ুজ্জের ফোটো।'

'এখানে কেন ?'

'এখানে ছাড়া আর কোথাও ও ফোটো মানায় না যে।' ঠোঁট টিপে মেনকা হাসল।

একটু চুপচাপ। তারপর কি ভেবে রাজেশ বলল, 'ফোটোর ঐ লোকটা কি

রোজ এখানে আসে ?'

'আসে বৈকি। এখানে রাত না কাটালে ভববাবুর ঘুমই আসে না।'

এতদিনে রাজেশ জানতে পারল, প্রত্যহ কোথায় নিশিপালন করে যান ভবেশ। চাপা তীব্র স্বরে সে বলল, 'আপনার সঙ্গে লোকটার সম্পর্ক কী ?'

রাজেশের প্রশ্ন শেষ হবার আগেই প্রমত্ত হাসিতে মেতে উঠল মেনকা। হাসতে হাসতে গণেশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ও গণেশ, ভববাবুর সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক, ভদ্রলোককে বলে দাও না।'

মেনকার হাসি গণেশের মধ্যেও সংক্রামক রোগের মত ছড়িয়ে পড়েছে। সে বলল, 'আমি আর কতটুকুন বলতে পারব! আপনিই বুঝিয়ে দিন মা।'

মেনকা কিছু বলল না। শুধু বেঁকেচুরে, সুঠাম দেহ সাপের মত হেলিয়ে দুলিয়ে হাসতেই লাগল।

গণেশ আবার বলল, 'আর ঠ্যাকার করবেন না মা। বাবুটিকে বলে দিন।'

হাসির বেগ কিছু কমিয়ে মেনকা এবার বলল, 'ভবেশবাবুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক একটাই, রসের সম্পর্ক। বলেই চোখের তারায়, কোমরের বাঁকা বিভঙ্গে এমন একটা অশ্লীল সংকেত ফুটিয়ে তুলল যাতে কান লাল হয়ে উঠল রাজেশের।

হঠাৎ রাজেশের মনে হল, মেনকাই কি তার দ্বিতীয়া স্ত্রী ? পরমুহূর্তে তার খেয়াল হল, স্ত্রীকে কেউ আর নরকে এনে বসায় না। কিন্তু ভবেশের বেলায় কিছুই বুঝি অনিয়ম নয়। প্রথমা স্ত্রীকে যে প্রকারান্তরে হত্যা করতে পারে, বংশমর্যাদাকে যে গ্লানির অন্ধকারে ছুঁড়ে দিতে পারে, একটি পরিবারের প্রতিটি মানুষের দুঃখের কেন্দ্রে যে লোক বসে আছে তার পক্ষে দ্বিতীয়বার বিয়ে করে সেই স্ত্রীকে নরকের মাঝখানটিতে এনে প্রতিষ্ঠা করা এমন কি বিস্ময়কর !

রাজেশ কি যেন বলতে যাচ্ছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে নীচের রাস্তা থেকে বিলম্বিত লয়ে মোটরের হর্ন বেজে উঠল। মেনকা এবং গণেশ—দু-জনেই চমকে উঠল। আর সেই চমকানির মধ্যেই দক্ষিণের জানালায় ছুটে গেল মেনকা। উঁকি দিয়ে রাস্তাটা একবার দেখে মুখ ফিরিয়ে সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে বলল, 'সর্বনাশ, ভববাবু এসে গেছে। ভদ্রলোককে (রাজেশকে) নিয়ে এখন কী করি !' একটু থেমে আবার বলল, 'আজ তো রাত এগারোটার পর ভববাবুর আসার কথা ছিল। এখন তো সাড়ে আটটাও বাজে নি। এত তাড়াতাড়ি আসবে জানলে ভদ্রলোককে কি ঘরে এনে ঢোকাই !'

এদিকে রাজেশের ধমনীতে রক্তের চলাচল যেন চিরদিনের মত থেমে গেছে। সে শঙ্কিত, বিমূঢ়, বিচলিত। আকণ্ঠ অস্বস্তি নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। বাপের

মেয়েমানুষের ঘরে ছেলের সঙ্গে বাপের মিলন নিশ্চয়ই খুব শাস্ত্রসম্মত ব্যাপার হবে না।

রাস্তায় হর্নের আওয়াজ ক্রমশ অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

ওদিকে নীচের ঠোঁটে দাঁত বসিয়ে মেনকা কি যেন ভাবছিল। হঠাৎ তার চোখদুটি ঝকমকিয়ে উঠল। সমস্যাটার একটা সমাধান সে বোধ হয় পেয়ে গেছে।

ব্যস্তভাবে মেনকা বলে উঠল, 'গণেশ, ভদ্রলোককে পেছনের দরজা দিয়ে তাড়াতাড়ি রাস্তায় পৌঁছে দাও। আমি ভববাবুকে আনতে যাচ্ছি।' রাজেশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার উপায় নেই। বৃষ্টি থেকে বাঁচাবার জন্যে আপনাকে ঘরে এনেছিলাম। সেই বৃষ্টিতেই আপনাকে ভিজতে হবে। আচ্ছা। নমস্কার।' বলেই নীচের তলায় ছুটল।

আর গণেশ রাজেশকে নিয়ে বিপরীত দিকের একটা সিঁড়ি ধরে অন্ধকার ঘুরপথে যেখানে এসে থামল সেটাকে এ-বাড়ির খিড়কি বলাই সঙ্গত। সামনেই ছোট নীচু একটা দরজা। সেটা খুলে দিয়ে গণেশ বলল, 'চলে যান বাবু।'

দরজার দিকে পা বাড়াতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল রাজেশ। পকেট থেকে দ্রুত একটা দু টাকার নোট বার করে গণেশের হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, 'এটা রাখ।' নোটটা পেয়ে গণেশ বিগলিত। বলল, 'আবার এটা কেন?'

'তুমি আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেলে. সেজন্যে ওটা বখশিশ।'

'এইটুকুন পথ সনগে এসেছি, সে জন্যে দু টাকা! হেঁ—হেঁ—'

দুটো টাকা এমনি এমনি দেয় নি রাজেশ। ওটা দিয়ে টোপ ফেলেছে সে। দেখতে চেয়েছে, গণেশ নামে গণিকাপল্লীর এই ক্রীতদাসটার চরিত্র কতখানি মজবুত!

কিন্তু না, অর্থের ব্যাপারে তার স্বভাব একেবারেই ঢিলে। টোপ ফেলামাত্র সে গিলে বসেছে। রাজেশ বলল, 'তোমাকে আরো ক'টা টাকা আমি দেব। যদি—'

'যদিন কী?'

'আমাকে একটা খবর দাও।'

'কী খপর?'

'তখন তুমি আর তোমার মা তো ছুটে গেলে। রাধা বলে ঐ মেয়েটাকে গাড়িতে তুলতে পেরেছিলে?'

'তা আর পারি নি।' গণেশ বলতে লাগল, 'মা গিয়ে পেথমটা খুব বোঝালে। রাধী শুনলে না। তখন আমায় হুকুম দিলে জোর করে তুলে

দিতে। মুখের কথায় যখন কাজ হল না তখন গায়ের জোর ফলাতে হল।'

একটু চুপচাপ। অতল গভীর ভাবনার মধ্যে কিছুক্ষণ তলিয়ে থেকে রাজেশ আবার বলল, 'তোমাদের এখানে মেয়েদের নিয়ে খুব ব্যবসা চলে বুঝি?'

'উঁহু এখানে নয়। এ বাড়ির একতলাটা হল গুদাম। ভব বাঁড়ুজ্জে আড়কাঠি লাগিয়ে লাগিয়ে নানা জায়গা থেকে কচি কচি মেয়ে এনে এখানে তোলে। চারদিকে ঘরে ঘরে অভাব লেগেই আছে। চট করে মেয়ে জুটেও যায়। এখেন থেকে তাদের কলকাতায় 'সাপ্লাই' করা হয়। মারোয়াড়ী-বাবুরাই বড় খদ্দের; আমাদের লক্ষ্মী।' গণেশ বলে যাচ্ছে, 'কাঁচামালের ব্যাওসা বাব্। ভব বাঁড়ুজ্জে তো এতেই লাল হয়ে গেল।'

রাজেশ হতভম্ব। অবাক স্বরে বলল, 'কাঁচামালের ব্যবসা!'

'মানে ঐ ছুঁড়িগুলোনের কথা বলছি আর কি।'

'আচ্ছা গণেশ—' মেয়েগুলোকে তো পাপের পথে ঠেলে দেওয়া হয়; তারা আপত্তি করে না?'

'তা আবার করে না! কাদাকাটি যদিন তাদের ছাখেন, মাথা ঘুরে যাবে'। কিছুদিন কেঁদেকেটে শেষ পর্যন্ত অবিশ্যি একেই অদেষ্ট বলে তারা মেনে নেয়। বলতে বলতে হঠাৎ কি যেন মনে পড়ল গণেশের। রীতিমত চঞ্চল হয়ে উঠল সে, 'ভব বাঁড়ুজ্জে এসে গেছে। কখন আমার ডাক পড়বে ঠিক নেই। টাকাটা যদিন দিতেন—'

অর্থাৎ খবর দেবার জন্য যে অর্থের প্রতিশ্রুতি রাজেশ দিয়েছিল, গণেশ তা দাবী করছে। ব্যস্তভাবে পকেটে হাত ঢুকিয়ে এক টাকার একখানা নোট বার করে আনল সে। বার করেও তৎক্ষণাৎ গণেশকে দিল না। কি ভেবে বলল, 'আচ্ছা গণেশ, তোমার সঙ্গে পরে যদি দেখা করতে চাই, কি ভাবে তা হতে পারে?'

এবার কিসের একটা ছায়া পড়ল গণেশের মুখে। বলল, 'যা জানবার তো জেনেই গেলেন। আবার আমার সনগে দেখা হয়ে কী হবে?'

'ভয় নেই, দেখা হলে তোমার লাভ ছাড়া ক্ষতি হবে না।' চোখের বিশেষ একটা ইঙ্গিত করে রাজেশ তাকাল।

ইঙ্গিতটা বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হবার কথা নয়। গণেশ উৎসাহিত হয়ে উঠল। বলল, 'তা হলে বাবু এক কাজ করবেন। রোজ সকালে আমি বাজারে যাই। সেখানে দেখা করতে পারেন।'

'বেশ।' একটাকার নোটখানা গণেশকে দিয়ে বাইরে এল রাজেশ।

অকালের বৃষ্টি এখনও ঝরে যাচ্ছে। তবে আগের সেই তীব্রতা আর

নেই।

এলোমেলো স্খলিত পায়ে ভিজতে ভিজতে এগিয়ে চলেছে রাজেশ। এই মুহূর্তে নিজের সমস্ত অস্তিত্ব একটা জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি হয়ে উঠেছে বুঝি!

ভবেশের চারিদিক ঘিরে যে এত অন্ধকারের মেলা সাজানো ছিল, তা কে জানতো! রানীপুরের অসংখ্য মানুষকে প্রতারিত করেছেন তিনি। আর সেই প্রতারণার পথে বিপুল সম্পত্তি তাঁর হাতে এসেছে। আরো কত উপায়ে ভবেশ অর্থ সঞ্চয় করেছেন, রাজেশের অজানা। তবে এই মুহূর্তে একটি দিকের খবর জেনে এসেছে সে। জানার পর থেকেই তার সমস্ত অস্তিত্ব শিউরে উঠেছে।

আশ্চর্য! দশ বছর পর রানীপুরে ফিরে ভবেশের কুণ্ঠিত অনুতাপ-জর্জর চেহারা দেখে কি বিভ্রান্তই না হয়ে পড়েছিল রাজেশ। মনে হয়েছিল, নিজের সমস্ত অতীতের জন্য পাপবোধে তিনি ভারাক্রান্ত হয়ে আছেন। কিন্তু কে জানত, ভবেশ যে রূপে দশ বছর পর তাঁর সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন, সেটা নিতান্তই ছদ্মবেশ।

আশ্চর্যের কথা, ভবেশের ছলনায় বিমূঢ় হয়ে তাঁর সমস্ত অতীতকে বিস্মৃত হয়েছিল রাজেশ। আর সেই ক্ষণিক বিভ্রান্তির ঘোরে নিজের সমস্ত সম্পত্তি তার হাতে তুলে দিয়েছেন ভবেশ। শিথিল পায়ে চলতে চলতে রাজেশের মনে হল, সম্পত্তি নয়, ভবেশের সমস্ত পাপ, অন্যায় আর গ্লানির উত্তরাধিকার সে পেয়েছে।

অতর্কিতে সেই মহিলাটির মুখ মনে পড়ে গেল রাজেশের। সেই মহিলা—নতুন পাড়ার বিভাদেবী। সম্পত্তি হস্তান্তরের দিন সদর শহরে তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল। তারপর তাঁকে আর দেখে নি রাজেশ।

অতদিন পর বিভাদেবীকে মনে পড়তেই একটা সম্ভাবনার কথা রাজেশের চেতনায় ছায়া ফেলল। তার মনে হল, ভবেশের গুহাগোপন অন্ধকার যত দিক আছে, সেই মহিলা সবই জানেন। আর জানেন বলেই ভবেশের সম্পত্তি যাতে সে না নেয়, সে ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন। এমন কি দলিল রেজিস্ট্রি আটকাবার জন্য সদরে পর্যন্ত ছুটেছিলেন।

রাজেশ ভাবল, দু-চার দিনের মধ্যেই একবার বিভাদেবীর সঙ্গে দেখা করবে।

সাত

মামারা পরামর্শ দিয়েছিলেন, সম্পত্তি নিয়েই যেন রাজেশ সন্তুষ্ট থাকে। ভবেশ

সে-সব কিভাবে আয়ত্ত করেছেন তা নিয়ে অহেতুক দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নেই।

মামাদের পরামর্শ অনুযায়ী কিছুদিন সেদিকে পিঠ ফিরিয়ে ছিল রাজেশ। অর্থাগমের উৎসগুলি যতই নিজেদের অপার মহিমা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে ততই অস্থির হয়ে পড়েছে রাজেশ।

আশৈশব ভবেশ সম্বন্ধে দুটি মাত্র অনুভূতি তার মধ্যে সক্রিয় ছিল। তাদের একটির নাম বিদ্বেষ, অপরটি ঘৃণা।

মাঝখানে সম্পত্তি-হস্তান্তর, রাইস মিল আর কল্যাণী কেমিক্যালসের কর্মচারীদের দিয়ে সম্বর্ধনা, রানীপুরের বিশিষ্ট নাগরিকদের অভিনন্দন,ফুল, মালা, আলো, প্রীতিভোজ—সব মিলিয়ে বিতৃষ্ণার ভিতটা শিথিল হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু সেদিন মেনকার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পর চাপা-পড়া বিরূপতা ফুলে ফুলে আবার পাহাড় প্রমাণ হয়ে উঠেছে।

দেখতে দেখতে আরো কয়েকটা দিন কেটে গেল। সময়টা যেন অলস, মন্থর, ক্লান্তগতি। রাজেশের দিন আর কাটতে চায় না। একা একা রাস্তায় ঘুরে সময়ের কতটুকু ভগ্নাংশ আর খরচ করা যায়।

কতদিন এ-ভাবে কাটাতে হত বলা যায় না। অতর্কিতে সময়ের নিস্তরঙ্গ জলে বিরাট আকারের একটা ঢিল এসে পড়ল। আর তাতে রানীপুরের ধমনী চঞ্চল হয়ে উঠল।

চাঞ্চল্যটা রানীপুর স্কুলের হেডমাস্টার সারদা মিত্রকে কেন্দ্র করে। সেক্রেটারি হারানিধি পালকে সামনে রেখে নেপথ্যে তলোয়ার শানাচ্ছিলেন ভবেশ। ওদিকে রানীপুরের যৌবনও নিষ্ক্রিয় থাকে নি, দোলনের নেতৃত্বে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। প্রথমে তারা শহরের দেওয়ালগুলো পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে দিয়েছিল। তারপর শুরু করেছিল স্কুলের সামনে পিকেটিং।

পিকেটিং-এর পর হারানিধি এমন চাল চেলেছে যাতে সমস্ত রানীপুর স্তম্ভিত বিমূঢ় এবং সমপরিমাণে উত্তেজিতও। অবশ্য চালটা যে কার মস্তিষ্ক হতে রাজেশের চাইতে কে আর তা ভাল করে জানে। সামান্য বোড়ের একটা চালেই কিস্তিমাত করে দিয়েছেন ভবেশ।

ব্যাপারটা এইরকম। পিকেটিং-এর চতুর্থ দিনে হঠাৎ হারানিধি পাল এসে সবিনয়ে দোলনদের জানাল, অনর্থক এ-সব ঝঞ্ঝাট করে লাভ নেই। তাতে তিক্ততাই শুধু বাড়বে। পিকেটিং এর হামলা চললে স্কুল বন্ধ থাকবে এবং তাতে ছাত্রদেরই সব চেয়ে ক্ষতি। তার চাইতে সবাই যদি একসঙ্গে বসে আলোচনা করা যায় তাতে সুফলেরই সম্ভাবনা। হেডমাস্টার প্রসঙ্গের একটা সন্তোষজনক

মীমাংসা হোক—হারানিধির ত' কাম্য। এবং সমস্তটা নিষ্পত্তির জন্ম দোলনের মধ্য থেকে জন দশ পনের প্রতিনিধিকে নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল সে।

দোলনরা বুঝতে পারে নি, তাদের জন্য কি সাংঘাতিক একটা ফাঁদ পাতা হয়েছে।

হারানিধির বাড়িতে যাবার শুধু অপেক্ষা। একদল ভাড়াটে গুণ্ডা আগে থেকেই মজুত রাখা হয়েছিল। দোলনরা ঢোকামাত্র সদর বন্ধ করে তারা শিকারী কুকুরের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। মুহূর্তে একটা বীভৎস রক্তারক্তি কাণ্ড বাধিয়ে গুণ্ডারা উধাও হয়েছে। ওদিকে পুলিশে খবর দিয়ে হারানিধি ট্রেস্‌পাসিং অর্থাৎ অনধিকার প্রবেশের দায়ে ছেলেমেয়েগুলোকে এ্যারেস্ট করিয়েছে। সবাইকে অবশ্য পারে নি। দোলন আর একটি ছেলে রক্তাক্ত অবস্থাতেও কোনরকমে সদর খুলে পালাতে পেরেছিল।

নিখুঁত পরিকল্পনা। এর আগের বারে দোলনরা যখন তার বাড়িতে হানা দেয়, হারানিধি নিষ্ক্রিয় ছিল। ভবেশের নির্দেশে এবার দোলনদের ডেকে এনে ভুলটা সংশোধন করে ফেলেছে সে। আর তারই ফলে সারদা মিত্রের স্বপক্ষে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে রানীপুরের বাতাসে মিশিয়ে গেছে।

আন্দোলনটা সারদা মিত্রের স্বপক্ষে যতখানি ছিল, তার চাইতে হাজারগুণ তীব্রভাবে ছিল ভবেশের বিপক্ষে। ভবেশ তাঁর বিরুদ্ধে উত্থিত সাগর-তরঙ্গকে হাতের ইঙ্গিতে স্তব্ধ করে দিয়েছেন।

আন্দোলনটা নিষ্ফল হওয়াতে রাজেশ কতখানি হতাশ হয়েছে, নিজেই সে জানে না! সেটা তার চেতনা এবং অবচেতনার মাঝখানে আলোছায়ার খেলা। কিন্তু এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত একটি মেয়ের কথা সে সজ্ঞানে সচেতনভাবে ভেবেছে।

হারানিধির বাড়ি থেকে দোলনের আহত হয়ে আসার খবরটা পেয়ে রাজেশ বিচলিত, অস্থির। সে শুনেছে, দোলনের আঘাত এত মারাত্মক ধরনের যাতে সদর হাসপাতালে তাকে নিয়ে যেতে হয়েছে। বর্তমানে সেখানেই আছে সে এবং আরো কতদিন থাকতে হবে, তার কিছু ঠিক নেই।

দোলন হাসপাতালে আছে—এই খবরটা পাওয়ামাত্র একমুখী ঢিলের মত রাজেশের সমস্ত প্রাণ সেদিকে ছুটতে চেয়েছে। প্রাণটাই শুধু ছুটেছে কিন্তু নিজে পা বাড়াতে গিয়ে থমকে গেছে রাজেশ। সে তো জানে দোলনের আঘাতের জন্ম কে দায়ী। ভবেশের ছেলে হয়ে এই অবস্থায় দোলনকে সহানুভূতি জানাতে যাওয়া নিতান্তই বিড়ম্বনা।

তবু সমস্ত সঙ্কোচ, দ্বিধা আর কুণ্ঠা দু-হাতে সরিয়ে দিল রাজেশ। একদিন মরিয়ার মত সদর হাসপাতালে চলে এল রাজেশ। দোলনকে দেখে তার হৃদ্‌স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে গেল বুঝি। স্তম্ভিত হবার মতই ব্যাপার। আশৈশব দোলনকে কোন রূপে দেখে আসছে সে? চিরদিনই তো দোলন প্রদীপ্ত, অপরিমিত স্বাস্থ্যের গৌরবে ঝলমল। শুধু কি স্বাস্থ্য, আবেগে উচ্ছ্বাসে সে ভরপুর।

চিরদিনের চেনা সেই মেয়েটি যেন অন্য কেউ। এই মুহূর্তে হাসপাতালের ধবধবে বিছানায় যে বিলীন হয়ে আছে তার মুখ দীপ্তিহীন, ফ্যাকাশে। শরীরের কোথাও তার রক্ত নেই। একটা বর্ণহীন প্রচ্ছদ তার ওপর কেউ টেনে দিয়েছে বুঝি। প্রাণময়ী দোলন এই মুহূর্তে ক্লান্ত, বিষণ্ণ, দীপ্তিহীন। তার মাথায় প্রকাণ্ড ব্যাণ্ডেজ; ডান হাতে প্ল্যাস্টার।

আশেপাশে আর কেউ ছিল না। বাঁ হাতের ইঙ্গিতে রাজেশকে কাছে ডাকল দোলন। পায়ে পায়ে রাজেশ এগিয়ে এলে স্তিমিত স্বরে সে বলল, 'হঠাৎ তুমি যে!'

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল না রাজেশ। চারিদিকে তাকিয়ে একখানা উঁচু টুল সংগ্রহ করে টেনে এনে বসতে বসতে বলল, 'তোমাকে দেখতে এলাম।'

ব্যাপারটা যেন খুবই অবিশ্বাস্য, এমন একটা ভঙ্গি দোলনের চোখেমুখে ফুটে উঠল। ক্লান্ত নির্জীব স্বরে সে বলল, 'আমাকে দেখতে এসেছ!'

'তাই তো মনে হয়।' দোলনের চোখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল রাজেশ।

'কিন্তু—'

'কী?'

এবার একটু যেন বিব্রতই হল দোলন। কুণ্ঠিত মুখে বলল, 'রানীপুর সংবাদে'র যে কপিটা দিয়েছিলাম, সেটা পড়েছিলে?'

অত্যন্ত স্বাভাবিক স্বরে রাজেশ বলল, 'পড়েছি বৈকি!'

'সেটা পড়ার পরও এলে যে?'

'তুমিই তো একদিন বলেছিলে, তোমার কাছে এলে শুধু দুঃখই পেতে হয়। আমি দেখতে চাই তুমি কতখানি দুঃখ দিতে পার আর আমিই বা কতখানি সহ করতে পারি।'

এরপর স্তব্ধতা। সেই নিশ্চল নিস্তরঙ্গ সময়কে নাড়া দিয়ে খানিকটা পর দোলন বলে উঠল, 'একটা সত্যি কথা বলবে রাজুদা?'

দোলনের প্রশ্নটায় গভীর স্বরে এমন একটা কিছু ছিল যাতে চকিত হল রাজেশ। বলল, 'মিথ্যে বলার কোন কারণ আছে?'

দোলন হাসল, 'সেটা তোমার বিবেচনার বিষয়।'

একটু চুপ করে থেকে রাজেশ বলল, 'কী বলতে হবে, বল।'

'তুমি কি নিজের তাগিদেই এসেছ? না তোমার বাবা তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে?'

হকচকিয়ে গেল রাজেশ। থতিয়ে থতিয়ে কোনরকমে সে বলতে পারল, 'আমার বাবা!'

'হ্যাঁ।' ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মাথাটা আস্তে আস্তে নাড়ল দোলন।

বিস্ময়ের রেশ তখনও থিতিয়ে যায় নি। ধীরে ধীরে রাজেশ বলল, 'আমার বাবা পাঠাতে যাবেন কেন?'

'কেন আবার, আমার খবর নিতে।' দোলন বলল।

রাজেশ কিছু বলল না। স্থির নিষ্পলকে তাকিয়েই রইল।

দোলন আবার বলে উঠল, 'তোমার বাবা কী খবর নিতে পাঠিয়েছে, তা জানি। আমি কতখানি জখম হয়েছি, সেটুকু জানাই তার উদ্দেশ্য। যা হোক, খবরটা কিন্তু—তোমার বাবার পক্ষে না-ভালো, না মন্দ—'

'তার মানে!'

'ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। তুমি তো দেখছ আমার মাথা ফেটেছে, হাত ভেঙেছে। পাক্কা দুটি মাস আমাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। এ খবরটা যখন দেবে, তোমার বাবা মোটামুটি খুশীই হবে। কিন্তু যখন তুমি তোমার বাবাকে আবার বলবে, এ যাত্রা আমি মরছি না, এক মাস পর হোক দু-মাস পর হোক বিছানা থেকে ঠিক টাল সামলে উঠে পড়ব তখন কিন্তু বেচারা ভারি মুষড়ে পড়বে। আমার মৃত্যুর খবরটা যদি নিয়ে যেতে পারতে, অন্তত শিগ্‌গিরই যে দেহরক্ষা করব—সে আশ্বাসটুকুও যদি তোমার বাবাকে গিয়ে দিতে পারতে তা হলে রানীপুরের সাম্রাজ্য আর কতটুকু, দেখতে সারা পৃথিবী তোমার নামে লিখে দিয়েছে তোমার বাবা।'

এতক্ষণ নিজের খেয়ালেই বকে যাচ্ছিল দোলন। হঠাৎ রাজেশ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল সে। বলল, 'এ কি রাজুদা, তুমি চুপ করে আছ যে!'

রাজেশ বলল, 'তুমিই তো বলছ; আমি শুনছি। দু-জনে একসঙ্গে কথা বললে কেউ কারুরটা শুনতে পাব কি?'

'আমি যা বললাম তা সত্যি কি-না, বল।'

'তুমি যখন বলছ সত্যি, তখন নিশ্চয়ই সত্যি।'

'তুমি কি বলতে চাও, তোমার বাবা আমার খবর নিতে তোমাকে পাঠায় নি?'

'তুমি যখন বলছ পাঠিয়েছেন তখন সেটাই মেনে নিলাম।'

'তার মানে!'

'মানে আবার কি। তোমার যখন একবার সন্দেহ হয়েছে বাবা আমাকে পাঠিয়েছেন, আমি হাজার 'না' বললেও কি সে সন্দেহটা ঘুচবে!'

'বাঃ বাঃ, বেশ প্যাসিভ রেজিস্টান্সের কায়দা শিখে গেছ তো!' দোলনের চোখ দুটি ঝলকে উঠল। অক্ষত ডান হাতের ভরে উঠে বসতে চাইল সে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওঠা আর হল না। সে প্রচেষ্টাকে বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি রাজেশ আবার শুইয়ে দিল দোলনকে। বলল, 'কি পাগলামি করছ!'

কর্কশ স্বরে দোলন বলল, 'আমি তোমার কাছে স্পষ্ট জবাব চাই। বল, সত্যি করে বল—তোমার বাবা তোমাকে পাঠিয়েছে কি-না।'

এতক্ষণ দোলন তাকে আঘাত হেনেছে। সে আঘাতের প্রতিক্রিয়া সত্তার গভীর স্তর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। মনে রাজেশ কষ্ট পেয়েছে, অসন্তুষ্ট হয়েছে। কিন্তু সংযমের আশ্চর্য মহিমায় সে তা প্রকাশ করে নি। একটা শয্যাশায়ী মানুষকে প্রত্যাঘাত হানার মত পশু সে নয়। সস্নেহ কোমল দৃষ্টিতে দোলনের দিকে তাকিয়ে রাজেশ বলল, 'তুমি অসুস্থ। এ অবস্থায় তোমার পক্ষে উত্তেজনা খুব খারাপ। তাতে তোমারই ক্ষতি হবে।'

'কোন কথা আমি শুনতে চাই না।' অবুঝ জেদী মেয়ের মত জোরে জোরে মাথা নাড়তে লাগল দোলন, 'আগে বল তোমার বাবা পাঠিয়েছে কি-না।'

একমুহূর্ত ইতস্তত করল রাজেশ। তারপর দৃঢ় স্বরে বলল, 'না।'

'তবে এসেছ কেন?' দোলনের অবসন্ন স্বরে এবার তীক্ষ্ণতা মিশেছে।

আহত অভিমানে এবার রাজেশের চোখ দুটি ঝাপসাই হয়ে গেল বুঝি। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে শিথিল গলায় সে বলল, 'কেন এসেছি তা যদি না বুঝে থাকো আমি কতটুকু বোঝাতে পারব! ওটা না-বোঝাই থাক।'

দোলন আর কিছু বলল না। শুধু তার নির্জীব ঠোঁটে বিদ্রূপের সূক্ষ্ম নিঃশব্দ একটি হাসি চকিতের জন্য ফুটে উঠেই বিলীন হয়ে গেল।

একটু চুপচাপ। তারপর দোলনই একসময় বলে উঠল, 'আচ্ছা রাজুদা—'

রাজেশ মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

দোলন বলল, 'শুনলাম তোমাদের বাড়িতে নাকি ক'দিন আগে অনেকগুলো লোক সম্পত্তি ফিরিয়ে নেবার জন্যে চড়াও হয়েছিল?'

রাজেশ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল না। খানিকটা ঝুঁকে দোলনের স্তিমিত চোখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আস্তে আস্তে বলল, 'ঠিকই শুনেছ। তোমার বাহিনী যথাসময়ে

আমাকে আক্রমণ করেছিল।'

'আমার বাহিনী!' দোলন যেন একটু অবাকই হল।

রাজেশ বলল, 'অবিনাশ মাইতি, রমণী ভটচায আর যারা যারা গিয়েছিল তারা সবাই বলেছে তুমিই নাকি তাদের আমার কাছে পাঠিয়েছ। আর তুমি বলামাত্রই তারা আমার ওপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তুমিই বল, সেই লোকগুলোকে যদি তোমার বাহিনী বলি তাতে কিছু অপরাধ হয় কি?'

চিরদিনের সাবলীলা সঙ্কোচহীনা দোলন একটু যেন বিব্রতই হয়ে পড়ল। স্খলিত স্বরে বলল, 'তারা গিয়ে আমার কথা বলেছে বুঝি!'

'না বললে জানলাম কী করে?' রাজেশ হাসল।

একটুক্ষণ মাত্র। তারপরে নিজের সহজ, নিঃসঙ্কোচ স্বভাবের মধ্যে আবার ফিরে এসেছে দোলন। সে বলল, 'তোমার বাবা এতগুলো লোককে পথে বসিয়েছে। যদি তাদের পাঠিয়েই থাকি তাতে খুব একটা অন্যায় হয়ে গেছে নাকি?'

'ন্যায়-অন্যায়ের কথা আসছে কিসে! আমি তো সে প্রশ্ন তুলিনি।'

দোলন এতক্ষণ খেয়াল করেনি। এবার লক্ষ্য করল, এর আগে যতবার রাজেশের সঙ্গে দেখা হয়েছে প্রতিবারই সে কেমন যেন আড়ষ্ট, কুণ্ঠিত, কিসের এক ভয়ে জড়সড়। কিন্তু আজ রাজেশ একেবারে অন্য মানুষ। সঙ্কোচ, কুণ্ঠা, ভয়—সব কিছু থেকেই সে মুক্ত। প্রতিটি কথা বলছে শান্ত, মার্জিত এবং বিচক্ষণ ভঙ্গিতে।

রাজেশের আজকের এই চেহারাটা খুব সম্ভব দোলনের ওপর গাঢ় গভীর এক ছায়া ফেলে থাকবে। আস্তে আস্তে সে বলল, 'তা ঠিক। ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন তুমি তোল নি!' একটু চুপ করে থেকে পরক্ষণেই আবার শুরু করল, 'আচ্ছা রাজুদা—সেই কথাটা মনে আছে তো?'

'কোন কথা?'

'এর মধ্যেই ভুলে গেছ!'

'কি আশ্চর্য!' রাজেশ হেসে ফেলল, 'রানীপুরে ফেরবার পর তোমার সঙ্গে অনেকবার দেখা হয়েছে, অনেক কথা হয়েছে। তার মধ্যে কোন বিশেষ কথাটা আমার মনে থাকা উচিত, বুঝতে পারছি না।'

'মনে না থাকারই কথা!' তীব্র শ্লেষে ঠোঁটদুটি বেঁকে গেল দোলনের।

মনে মনে রীতিমত ক্ষুব্ধই হল রাজেশ। মনের সেই বিক্ষোভকে এবার আর গোপন রাখতে পারল না সে। বলল, 'তুমি অসুস্থ! তোমার সামনে আমার উত্তেজিত হওয়া উচিত না। তবু বার বার যদি তুমি আঘাত দাও,

আমি এমন সর্বংসহ নই যে বার বারই সয়ে যাব। তুমি কখন কোন কথা ভাববে, তা চট করে বলে দেবার মত জগতে কে এমন অন্তর্যামী আছে, আমার জানা নেই।'

রাজেশের ক্ষুব্ধ ভঙ্গিটুকু যেন উপভোগই করল দোলন। সে-সম্বন্ধে কোনরকম মন্তব্য না করে শুধু বলল, 'বেশ আমিই মনে করিয়ে দিচ্ছি। একদিন তুমি বলেছিলে, তোমার বাবা যার যার সম্পত্তি গ্রাস করেছে সেগুলো তুমি ফিরিয়ে দেবে। তুমি তোমার কথা রাখবে কি?'

'কিন্তু সমস্ত সম্পত্তির দলিল আমি দেখেছি। সেগুলোর মধ্যে এমন কোন ফাঁক নেই যা দিয়ে বাবার প্রতারণা প্রমাণ করতে পারি।'

হঠাৎ বিচিত্র একটু শব্দ করে দোলন হেসে উঠল।

রাজেশ হতভম্ব। বলল, 'হাসলে যে!'

'হাসাটা কি অনুচিত!' দোলন বলতে লাগল, 'তোমার কি ধারণা, তোমার বাবা লোক ঠকিয়ে অন্যের হাতে মৃত্যুবাণ তুলে দেবার জন্যে সারি সারি প্রমাণ সাজিয়ে রাখবে।'

রাজেশ উত্তর দিল না। তার সমস্ত মন বলল, দোলন যা বলেছে তা সত্যি —একান্তভাবেই সত্যি।

দোলন আবার বলল, 'তুমি যদি তা মনে করে থাকো তা হলে বলব, হয় তুমি সাংঘাতিক বোকা নইলে মারাত্মক রকমের শয়তান। তুমি কী, আমি জানি না। তবে—'

রাজেশ এবার বলল, 'আমি কী, আপাতত জানার প্রয়োজন নেই। সে বোঝাপড়াটা তুমি সুস্থ হলেই না হয় করা যাবে। এখন একটু চুপ কর দেখি।'

দোলনের নীরক্ত ফ্যাকাশে মুখে শ্লেষের বিচিত্র একটু হাসি ফুটল। ক্ষীণ স্বর টেনে টেনে সে বলল, 'বুঝতে পেরেছি। সম্পত্তি ফেরত দেবার ব্যাপারে এখন তুমি পিছিয়ে যাচ্ছ।'

'পিছিয়ে যাব কি এগিয়ে আসব, সেটা তোমার সুস্থ হবার পর দেখে নিও। দোহাই তোমার, এখন দয়া করে মুখটা একটু থামাও।'

সদর হাসপাতালের এই ঘরখানা থেকে বাইরের অবাধ দিগন্ত দেখা যায়। সূর্যটাকে এখন আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। মাসটা ফাল্গুন, ঋতুর হিসেবে ষষ্ঠ। ষষ্ঠ ঋতুর স্তিমিত বেলাশেষ দ্রুত জুড়িয়ে যাচ্ছে। লম্বা পায়ে বিষণ্ণ অন্ধকার নেমে আসতে শুরু করেছে।

হাসপাতালের এই ঘরখানিতে এখনও আলো জ্বলে নি। বাইরের আবছা অন্ধকার ভেতরে এসে সব কিছু ঢেকে দিতে আরম্ভ করেছে।

হাসপাতালের রুগীদের দেখতে আসার নির্দিষ্ট একটা সময় আছে। বিকেল চারটে থেকে ছটা। দু ঘণ্টার সেই মেয়াদ ফুরিয়ে আসতে বেশি বাকি নেই। একটু পরেই ছ'টার ঘণ্টা পড়বে।

রাজেশ উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আজ তা হলে চলি দোলন। দু-এক দিনের মধ্যেই আবার আসব। লক্ষ্মী মেয়ের মত থেকো। উত্তেজনা হয়, এমন কিছু করবে না। ভালো কথা—'

'কী ?'

'মাসিমা মেসোমশায় তোমাকে আজ দেখতে এলেন না তো !'

'কাল এসেছিলেন। রোজ আসা তো ওঁদের পক্ষে সম্ভব না। মা'র সংসার আছে। বাবা প্রেস-পত্রিকা নিয়ে ব্যস্ত। আমিই ওঁদের রোজ আসতে বারণ করে দিয়েছি।'

'একটা কথা বলব ?'

'বল।'

'জাহাজে থাকতে একবার আমার অসুখ করেছিল। মারাত্মক ধরনের ব্লাড ডিসেন্ট্রি। জাহাজে যা ওষুধ-পত্তর ছিল তাতে ঐ রোগ সারবার নয়। ভাগ্য ভাল, সেই সময় আমরা ইউরোপের একটা নাম-করা পোর্টে রয়েছি। জাহাজে মাল লোডিং চলছে। অন্তত মাসদেড়েক সেখানে থাকতে হবে। আমাকে নামিয়ে ওখানকার একটা হাসপাতালে ভর্তি করা হল। মনে আছে, প্রত্যেক দিন বিকেলে হাসপাতালের ভিজিটিং আওয়ার্সে জাহাজের সহকর্মীরা আমাকে দেখতে আসত। কোন কারণে এক আধদিন তারা না এলে মনটা কি খারাপ হয়ে যেত, তোমাকে বোঝাতে পারব না। হাসপাতালে যাদের থাকতে হয় তাদের মনস্তত্ত্ব আমি কিছু বুঝি। তাই বলছিলাম, আমার তো কোন কাজ নেই। যদি একবার করে রোজ তোমাকে দেখতে আসি তা হলে তোমার কি খুব আপত্তি হবে ?'

দোলন হাসল। বলল, 'এত বিরাট ভনিতার কী দরকার ছিল ! বললেই হত, রোজ একবার করে আসব। তোমার যখন এত ইচ্ছে, এসো।'

প্রথম দিকে শ্লেষ আর বিদ্রূপে নিষ্ঠুর হলেও এখন দোলনকে আশ্চর্য উদার মনে হচ্ছে। রাজেশ বলল, 'তা হলে আজ যাচ্ছি !'

কিন্তু বাইরে বেরুনো আর হল না। পেছন থেকে দোলন হঠাৎ ডাকল, 'রাজুদা—'

রাজেশ ফিরে দাঁড়াল।

দোলন বলল, 'একটু শুনে যাও।' রাজেশ কাছে আসতে বলল, 'তোমাকে

একটা কথা বলব বলব করেও একেবারে ভুলে গেছি।'

'কী কথা?'

চোখের কোণে বিচিত্র একটু কৌতুক ধরে দোলন বলল, 'সেবার খুব ফাঁকি দিয়েছিলে। এবারে কিন্তু কোন কথা শুনব না।'

রাজেশ হতবাক। বলল, 'কী ব্যাপার?'

'সেবার তোমার বাবা সব সম্পত্তি লিখে দিলে। আমরা ইতর জন অমন শুভ ব্যাপারে একটু মিষ্টিমুখ পর্যন্ত করতে পারলাম না। সেবার যা হবার হয়ে গেছে। এবার যদি ফাঁকিতে পড়ি সাংঘাতিক রকমের একটা ঝগড়া হয়ে যাবে বলছি।'

রাজেশ বিমূঢ়ের মতো তাকাল।

দোলন বলল, 'শুভ দিনটা কবে?'

'কী বলছ তুমি!'

'ঠিকই বলছি। যোগদাবাবুর মেয়ে স্বলেখার সঙ্গে তোমার বিয়ে না?'

'যোগদাবাবুর মেয়ের সঙ্গে যে আমার বিয়ে, এ খবরটা তোমায় কে দিলে!'

'যে-ই দিক, সেটা খুব বড় কথা নয়। বিয়েটা কবে হচ্ছে, তা-ই আগে বল। সেটাই আসল কথা।'

রাজেশ কী বলবে, ভেবে পেল না।

দোলন আবার বলল, 'এক রবিবার সারাদিন ভাবী শ্বশুর বাড়ি কাটিয়ে এলে, চব্য-চোষ্য দিব্যি একখানা ভোজ হল, ভাবী বউ গান শোনালে—'

রাজেশ স্তম্ভিত। এত সব খবর কোথায় পেল দোলন! তার পেছনে মেয়েটা কি গুপ্তচর লাগিয়েছে! পরমুহূর্তেই খেয়াল হল, দোলনের সঙ্গে স্বলেখার যোগাযোগ আছে। স্বলেখাই কি তাকে সে-খবর দিয়েছে!

দোলন সমানে বলে যাচ্ছে, 'ভাল, খুব ভাল। রানীপুরের সবাই জানে যোগদা মুখুজ্জে আর ভবেশ বাঁড়ুজ্জে, এই দু-জন হল জোড় মানিক। এবার-দুজনে কুটুম্বিতে হবে। বন্ধু হবে বেয়াই। আহা, কি চমৎকার খবর!'

রাজেশ বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করল, দোলনের কথাগুলোর নেপথ্যে বিদ্রূপ, কৌতুক অথবা অন্য কোন আক্রমণাত্মক মনোভাব কাজ করছে কি না!

দোলন আবার বলল, 'তা কবে সানাই বাজছে রাজুদা? এই ফাল্গুনেই কি?' বলতে বলতে স্বরটা আদুরে হয়ে উঠল, 'আমায় কিন্তু তোমার সঙ্গে বরযাত্রী নিয়ে যেতে হবে।'

দোলন চিরদিনই শাবলীলা, স্বচ্ছন্দগামিনী। আবেগের তরঙ্গে নিজেকে

সঁপে দিতে পারলে কখনও সখনও সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেও পারে। কিন্তু প্রগলভা? না—প্রগলভতা তার স্বভাব-বিরুদ্ধ। কিন্তু অসুস্থ শয্যাবিলীন মেয়েটিকে তাতেই যেন পেয়ে বসেছে। সে বলতে লাগল, 'আমি কিন্তু বরযাত্রীই যাব না শুধু, তোমার সঙ্গে বাসরও জাগব। মনে থাকে যেন।'

দোলনের এত প্রগলভতা রাজেশকে প্রায় দিশেহারা করে ফেলল।

দোলন আবার বলল, 'তোমার বিয়েতে কী উপহার দেওয়া যায় বল তো রাজুদা? তোমার বউকে একটা ঘড়ি দিলে কেমন হয়?' বলেই একটু থেমে কি ভেবে আবার শুরু করল, 'উঁহু, ও-সব ঘড়িটড়ি নয়। তোমার একখানা ফোটো চমৎকার করে বাঁধিয়ে সুলেখাকে উপহার দেব। ফোটোটার তলায় কী লেখা থাকবে জান? 'সুলেখার রাজেশ' তবে 'সুলেখার রাজেশ্বর'ও দেওয়া যেতে পারে।'

এবার কিছু একটা বলতে চাইল রাজেশ। বলা আর হল না। হঠাৎ হাসপাতালের ঘণ্টা বেজে উঠল। রুগীদের সঙ্গে দেখা করার মেয়াদ শেষ।

হাসপাতাল থেকে ক্যাসেলের মত সেই বিশাল বাড়িটায় ফিরে এল রাজেশ। তারপর সোজা নিজের ঘরখানায় ঢুকে দক্ষিণের জানালা ঘেঁষে দাঁড়াল।

সামনের দিকে যতদূর চোখ যায়, শুধু গাঢ় গহন অন্ধকার। বিপুল অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টিটাকে ছড়িয়ে দিয়ে দোলনের সঙ্গে আজ তার যত কথা হয়েছে, সব বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করল রাজেশ। সে যাওয়াতে ভবেশ সম্পর্কে দোলন যে সন্দেহ প্রকাশ করেছে অথবা সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবার ব্যাপারে বিদ্রূপ-শ্লেষে যেভাবে আঘাত হানতে চেয়েছে, সে-সবের মধ্যে তেমন কোন বিস্ময় নেই। বরং বলা যায়, যুদ্ধের এই ভঙ্গিটুকু না থাকলেই যেন দোলন-চরিত্রের ছন্দোপতন ঘটে যায়; তার সম্পূর্ণতা সম্বন্ধেই সংশয় জাগে।

সবই বুঝেছে রাজেশ কিন্তু একটা ব্যাপার তার কাছে বিচিত্র রকমের দুর্বোধ্য। সুলেখার সঙ্গে তার বিয়ের প্রসঙ্গে এত প্রগলভ কেন দোলন? দশ বছর পর রানীপুরে ফিরে দোলনকে একটি রূপেই তো দেখা গেছে। রাজেশ সম্পর্কে মেয়েটা নিষ্ঠুর রকমের উদাসীনা। সেই দোলন তার স্বভাবের বিরুদ্ধ স্রোতে হঠাৎ নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিল কেন?

বিশ্লেষণটা সম্পূর্ণ হল না। তার আগেই কে যেন ডেকে উঠল, 'ছোটাসাব—'

পায়ে পায়ে এগিয়ে দেওয়াল হাতড়ে বোতাম টিপল রাজেশ। আলো জ্বলতেই আবিষ্কার করা গেল, দরজার ওপারে একটা বয় দাঁড়িয়ে আছে।

জিজ্ঞাসু ভঙ্গিতে রাজেশ বলল, 'কী ব্যাপার ?'

'আপনার একটা চিঠি আছে।'

নিঃশব্দে হাত বাড়াল রাজেশ। বয় একটা খাম তার হাতে দিয়ে চলে গেল।

অন্যমনস্কের মত খামটা ওল্টাতে ওল্টাতে রাজেশ লক্ষ্য করল, সেটার ওপর ডাকটিকিট বা পোস্ট অফিসের কোন শীলমোহর মারা নেই। শুধু তার নাম আর ঠিকানাটা গোটা গোটা পরিচ্ছন্ন হরফে লেখা রয়েছে। এককোণে প্রেরকের নামও অবশ্য আছে। সেদিকে চোখ পড়তেই বিদ্যুৎস্পর্শের মত একটা অনুভূতি তার সমস্ত চেতনা আর অবচেতনার মধ্য দিয়ে দুরন্ত বেগে বয়ে গেল।

প্রেরক, না প্রেরক নয়—প্রেরিকা। প্রেরিকার নাম সুলেখা মুখোপাধ্যায়।

সুলেখা কি নিজে এসে চিঠিটা দিয়ে গেছে ? ছুটে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল রাজেশ। উদ্দেশ্য, সেই বয়টাকে খোঁজা। দেখা গেল, দীর্ঘ করিডরের অন্য প্রান্তে চলে গেছে সে। রাজেশ গলা চড়িয়ে ডাকল, 'এই শোন—'

বয়টা ফিরে এল।

রাজেশ জিজ্ঞেস করল, 'এ চিঠি কে দিয়ে গেছে ?'

'জী, একটা ছোকরা আদমী—'

'আওরত না ?'

'জী, না।'

রাজেশ বলল, 'আচ্ছা তুমি যাও।'

বয়টা চলে গেলে রাজেশ আবার ঘরে ঢুকল। তারপর খামটা ছিঁড়ে ক্ষিপ্র হাতে ভেতর থেকে চিঠিটা বার করল। হাতের লেখাটি ভারি সুশ্রী সুলেখার। কোথাও কাটাকাটির চিহ্নমাত্র নেই। রাজেশ পড়তে লাগল :

"সবিনয় নিবেদন,

রাজেশবাবু, প্রায় অপরিচিতা একটি মেয়ের চিঠি পেয়ে আপনি নিশ্চয়ই কিছুটা অবাক হবেন। হওয়াই স্বাভাবিক। আবার মেয়েটি যদি সে-ই হয় অর্থাৎ যার সঙ্গে আপনার বিয়ের প্রস্তাব চলছে তা হলে শুধু বিস্ময়ই নয়, আপনার মনোরাজ্যে তীব্রতর কোন প্রতিক্রিয়াও ঘটতে পারে।

মনে মনে আপনি আমাকে চটুলা, নির্লজ্জা অথবা অন্য কোন জঘন্য বিশেষণে ভূষিত করতে পারেন। যে মেয়ে একবার মাত্র দেখেই চিঠি লিখে বসতে পারে তার স্বভাব সম্বন্ধে আপনার মধ্যে যদি সংশয়ের ছায়া পড়ে, সেটা খুব অসঙ্গত হবে না। সে জন্য আপনাকে কেউ দোষারোপও করবে না।

আপনি আমাকে, যা খুশি ভাবতে পারেন, তা নিয়ে আমার খুব একটা

দুশ্চিন্তা নেই।

আমার সম্বন্ধে আপনার ধারণাটা বিরূপ হতে পারে তা জেনেও এবং সে সম্বন্ধে সমস্ত সম্ভাব্য কলঙ্ক আগে থাকতেই গায়ে মেখে আমি এ চিঠি লিখতে বসেছি। নিজের স্বপক্ষে এটুকুই শুধু বলতে পারি, নিতান্ত নিরুপায় না হলে, এ চিঠি আপনাকে লিখতাম না। আমার বিশ্বাস, কোন শিক্ষিতা ভদ্র মেয়ে তা লেখেও না।

এতক্ষণ ক্লান্তিকর দীর্ঘ একটা ভনিতা করলাম। বুঝতে পারছি আপনার ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে শুরু করেছে।

যাই হোক, আপনার সহনশীলতার ওপর আর পীড়ন চালাব না। এবার আসল বক্তব্যে আসা যাক।

প্রথমেই জানিয়ে দিচ্ছি, আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হোক—এটা আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছাবিরুদ্ধ। আপনাকে আমি ঘৃণা করি—নিদারুণ ঘৃণা। আপনি হয়তো প্রশ্ন তুলতে পারেন জীবনে যাকে একবার মাত্র দেখেছি, যার সঙ্গে একটি কথারও বিনিময় হয় নি তার ওপর ঘৃণা করার অধিকার আমার জন্মায় কোথা থেকে? এ প্রশ্ন একান্ত সঙ্গত এবং তার জবাবদিহি করতেও আমি বাধ্য।

সত্যি কথা, আপনার প্রতি আমার ব্যক্তিগত আক্রোশ নেই। আপনি ভাল কি মন্দ—সে ব্যাপারে কোনদিন আমি মাথা ঘামাই নি। ঘামাবার মত অবকাশই বা কোথায়! তবে এটুকু বলতে পারি, আপনি ভবেশ বাঁড়ুজ্জের ছেলে আর এই পরিচয়টাই আমার ঘৃণার পক্ষে যথেষ্ট।

আপনি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন, যাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করি তার সঙ্গে জীবন কাটানো অসম্ভব। ঘৃণার ওপর আর যা-ই হোক দাম্পত্য জীবনের ভূমিকা রচনা করা যায় না। তাতে আপনার বা আমার—কারো কল্যাণ নেই।

প্রসঙ্গত আরেকটা কথা আপনাকে জানানো দরকার। ভবেশ বাঁড়ুজ্জের ছেলে হওয়া আপনার পক্ষে যতখানি ঘৃণার, যোগদা মুখার্জির মেয়ে হওয়াটা আমার কাছে ঠিক ততখানিই অগৌরবের। সে জন্য আমার প্রাণে কোনদিন গৌরব উথলায় না।

আপনি জানেন কি-জানি না। আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবার পেছনে যোগদা মুখার্জি আর ভবেশ বাঁড়ুজ্জের একটা উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্য না বলে ষড়যন্ত্র বলাই ভাল। মারাত্মক ধরনের ষড়যন্ত্র। ষড়যন্ত্রটা কী, আপনাকে স্পষ্ট করে জানাব না। ইচ্ছা হলে আপনার নিজেকেই সেটা বুঝে নিতে হবে।

আমাদের দু-জনের মঙ্গলের জন্যই যেমন করে হোক, এ বিয়ে বন্ধ করতে

হবে। কিভাবে বন্ধ করা যায় তার একটা উপায় আপনিও আবিষ্কার করুন আমিও চেষ্টা করে দেখি, কোন পথ পাই কি-না।

ইতি—সুলেখা।

পুনশ্চ : এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত চিঠি। আশাকরি এর মধ্যে যা লেখা আছে তা আপনি আর আমি ছাড়া জগতের তৃতীয় কেউ জানবে না। যদি কেউ জানে, বুঝব আপনি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। তাতে আপনার প্রতি আমার ঘৃণার পরিমাণ আরো প্রবলভাবে বেড়েই যাবে।

আমার বিনীত অনুরোধ, চিঠিটা পড়া হলেই অনুগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলবেন।"

চিঠিটা পড়া শেষ করে কিছুক্ষণ আচ্ছন্নের মত দাঁড়িয়ে রইল রাজেশ। মাথার ভেতরটা কেমন যেন শূন্য হয়ে গেছে। একটাই মাত্র মুহূর্ত। তারপরেই আনন্দের দুরন্ত একটা ঢল তার সমস্ত শূন্যতা আর আচ্ছন্নতাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। সে মুক্তি পেয়েছে।

যৌবনের শুরু থেকেই একটি বালিকা তার চেতনে আর অচেতনে, তার মুক্তবন্ধের সমস্ত দিগন্তে, তার ধ্যানে আর কল্পনায় দুর্জয় প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই বালিকা—সেই দোলনকে সরিয়ে তার মনের গহন প্রদেশকে অধিকার করে বসবে—এত বড় শক্তি নিশ্চয়ই সুলেখার নেই।

এই বিয়ের ব্যাপারে একটা তিক্ত অধ্যায়ের সম্ভাবনা ছিল। এমন একটা সময় হয়তো আসত যখন ভবেশের সঙ্গে বিয়েটাকে উপলক্ষ্য করে সম্মুখ-সমরে নামতে হত। এ একরকম ভালই হয়েছে, সুলেখারও যখন এ ব্যাপারে প্রবল আপত্তি তখন ভবেশ আর যোগদাবাবুর পরিকল্পনাটাকে সহজেই ব্যর্থ করে দেওয়া যাবে।

সুলেখা তার হাতে মুক্তির সনদ তুলে দিয়েছে। রাজেশ মনে মনে কৃতজ্ঞতাই বোধ করল।

কিন্তু কৃতজ্ঞতাটা একেবারে নিরঙ্কুশ নয়। মুক্তির জন্য রাজেশ অবশ্যই খুশী আর তাতেই এতক্ষণ মগ্ন হয়ে ছিল সে। কিন্তু চিঠিটার মধ্যে আরেকটা সুর যে ছিল, এতক্ষণ তা খেয়াল করেনি। অতর্কিতে সেটা মনে পড়ে গেল।

সুলেখার চিঠির মধ্যে কোথায় কোন প্রচ্ছন্নতা নেই। অত্যন্ত স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ এবং রূঢ় ভঙ্গিতে এ বিয়ের ব্যাপারে সে অনিচ্ছা জানিয়েছে। সুলেখা লিখেছে ভবেশ বাঁড়ুজ্জের ছেলে হবার অপরাধে রাজেশের সঙ্গে নিজের জীবনকে সে গ্রন্থিবদ্ধ করতে চায় না এবং ভবেশের রক্তে জাত বলেই রাজেশের প্রতি তার প্রচণ্ড বিদ্বেষ। ভবেশের জন্য যদিও সে সুলেখার ঘৃণার শিকার হয়ে দাঁড়িয়েছে

তবু যেন পুরোপুরি সান্ত্বনা মেলে না। একটি রূপসী তরুণীর পছন্দের জগৎ থেকে নাকচ হয়ে যাওয়া কোন পুরুষের পক্ষেই গৌরবের ব্যাপার নয়।

সুলেখার সঙ্গে তার বিয়েকে কেন্দ্র করে দোলন আজ প্রগল্ভ হয়েছে। তবে কি—তবে কি দোলন জানত, সুলেখার মনোনয়ন থেকে আগেই বাতিল হয়ে গেছে সে! আর সেই জন্যই তাকে নিয়ে অমন প্রমত্ত খেলায় মেতে উঠেছিল!

কথাটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে রক্তে যেন জ্বালা ধরে গেল। নাক-মুখ ছিপি-খোলা সোডার বোতলের মত ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। আর এই অস্থির উত্তেজনার মধ্যে চকিতের জন্য ভবেশকে মনে পড়ে গেল।

ভবেশ! হ্যাঁ, এই ব্যক্তিটিই দু-হাত ধরে তাকে আজ সুলেখার অপমান আর দোলনের মর্মান্তিক পরিহাসের মাঝখানে টেনে নিয়ে গেছেন। একদা তাদের পরিবারের প্রতিটি মানুষের অপার দুঃখের কেন্দ্রে এই ভবেশই বসে ছিলেন। আজও তিনি তার ক্ষোভ এবং অসম্মানের কারণ হয়েছেন।

রাজেশ স্থির করল, আজ রাত্রে ভবেশ যখন খেতে আসবেন সেই সময় কৈফিয়ত চাইবে। কেন—কেন তিনি তাকে একটা জঘন্য প্রহসনের নায়ক করে দিয়েছেন?

আট

ভবেশের কৈফিয়ত শেষ পর্যন্ত আদায় করা গেল না।

সুলেখার চিঠি পড়া হয়ে গেলে কখন যে আলো নিভিয়ে পায়ে পায়ে আবার দক্ষিণের জানালার সামনে এসে আচ্ছন্নের মত দাঁড়িয়েছিল, রাজেশের খেয়াল নেই।

হঠাৎ নীচের তলা থেকে অনেকগুলো কণ্ঠের সম্মিলিত ভীত চেঁচামেচি ভেসে এল। সেই সঙ্গে মনে হল, কারা যেন সন্ত্রস্ত পায়ে ছোটাছুটি করছে।

মুহূর্তে রাজেশের আচ্ছন্নতা ছিন্ন হয়ে গেল। সে একবার ভাবল, নীচে যায়। ব্যাপারটা কী, জেনে আসে।

শেষ পর্যন্ত যাওয়া আর হল না। দরজার কাছ থেকে বিচলিত কাঁপা সুরে কে যেন ডেকে উঠল, 'ছোটাসাব।'

ক্ষিপ্র পায়ে এগিয়ে এসে আলো জ্বালল রাজেশ। দেখল, একটা বয় দাঁড়িয়ে আছে।

বয়টা বলল, 'আপনি তাড়াতাড়ি আসুন।'

'কোথায় ?' জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল রাজেশ।

'বড়াসাবের ঘরে।'

'কেন ?'

'এক্ষুনি বড়াসাব ফিরে এসেছেন। তাঁর খুব বুখার।'

উদ্বিগ্ন স্বরে রাজেশ এবার জানতে চাইল, 'কী হয়েছে ?'

'বহুত ভারী জ্বর। আর তাতেই উনি বেহোঁশ হয়ে বাড়ি ফিরে এসেছেন।'

আর কোন প্রশ্ন করল না রাজেশ। বয়টাকে সঙ্গে নিয়ে এরকম ছুটতেই শুরু করল।

ভবেশের ঘরের ভেতরে এবং বাইরে এ বাড়ির যত বয়-বেয়ারা-চাকর-বাবুর্চি জমা হয়েছে। তাদের চোখেমুখে অপরিসীম উৎকণ্ঠা।

রাজেশকে আসতে দেখে বয় বাহিনী সসম্ভ্রমে সরে গিয়ে পথ করে দিল।

ভেতরে ঢুকে রাজেশ সোজা খাটের কাছে চলে এল। একটু আগে যে বয়টা তাকে খবর দিতে গিয়েছিল, সে মিথ্যে বলে নি। সত্যিই জ্ঞান নেই ভবেশের। তার কপালে হাত দিয়েই অনুমান করা গেল, জ্বর এক শ পাঁচ ডিগ্রির কম হবে না। অসহ্য উত্তাপে ভবেশের মুখ কেন, সর্বাঙ্গ গনগনে, রক্তবর্ণ। চোখ দুটি বোজা। হাত-পা-ঠোঁট এবং চোখের পাতা অল্প অল্প কাঁপছে।

যতদূর মনে আছে, আজ সকালেও একবার ভবেশের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তখনও তো তিনি বেশ সুস্থ, প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর। এমন কোন লক্ষণই তখন দেখা যায় নি যা থেকে অনুমান করা যেতে পারে রাত্রির মধ্যেই তিনি এমন শয্যাশায়ী হয়ে পড়বেন।

দিশেহারার মত চারপাশের ভৃত্যবাহিনীর দিকে তাকাল রাজেশ। বিমূঢ়ের মত বলল, 'সকালে তো ওঁকে বেশ ভাল দেখেছি। কী এমন হয়েছিল যাতে হঠাৎ এত অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

ভিড় ঠেলে একটি লোক সামনে এগিয়ে এল। রাজেশ তাকে চেনে। লোকটার নাম নীরদ—ভবেশের খাস ড্রাইভার। সবার মুখপাত্র হয়ে সে যা বললে, সংক্ষেপে এইরকম। দুপুরবেলা বড় সাহেব অর্থাৎ ভবেশকে নিয়ে কলকাতায় সরকারী শিল্প-অধিকারের দপ্তরে গিয়েছিল সে। সেখানে কাজ সেরে ভবেশের বেরুতে বেরুতে বিকেল হয়ে গিয়েছিল। বেরিয়ে এসেই তিনি বলেছিলেন, শরীরটা নাকি জ্বরো জ্বরো লাগছে। সেখান থেকে সোজা এসেছিলেন রাইস মিলে। তারপর কল্যাণী কেমিকালস-এর ফ্যাক্টরিতে কাগজপত্র দেখতে দেখতেই হু হু করে জ্বর এসে গিয়েছিল, সেই সঙ্গে শুরু হয়েছিল শরীরময়

অসহ্য যন্ত্রণা। অতএব কাগজপত্র আর দেখা হয় নি। দু-হাতে কপাল টিপে টলতে টলতে গাড়িতে ফিরে এসেছিলেন ভবেশ। নীরদকে বলেছিলেন, সোজা বাড়ি চলে আসতে। বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই রাস্তায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন।

রাজেশ বলল, 'এ-রকম অসুস্থ উনি মাঝে মাঝেই হয়ে পড়েন নাকি?'

'আজ্ঞে না।' নীরদ মাথা নাড়ল, 'পাঁচ-ছ বছর এখানে ড্রাইভারি করছি। কোনদিন বড় সাহেবের জ্বরজ্বারি, মাথা ধরা হয়েছে বলে তো মনে পড়ে না।'

'তাই তো'—চিন্তিত মুখে রাজেশ বলল, 'এখন কী করা যায় বলুন দেখি।'

'কাছাকাছি একজন ডাক্তার আছে। তাকে নিয়ে আসব?'

'তাই ডাকুন।'

নীরদ চলে গেল।

রাজেশ ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার ভবেশের দিকে তাকাল। খানিকটা আগে সে সিদ্ধান্ত করেছিল, ভবেশের ফেরামাত্র কঠিন নির্মম আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলবে।

কিন্তু—কিন্তু কাকে আঘাত হানবে রাজেশ? কাকে? যাকে ধরাশায়ী করতে সে আয়ুধ শানিয়েছে প্রকারান্তরে তিনি একরকম তারই শরণাগত। বিছানায় শায়িত, জ্ঞানহীন আচ্ছন্ন মানুষটির দিকে তাকিয়ে আঘাত হানার প্রতিজ্ঞাটা মনের মধ্যে কুঁকড়ে গেছে রাজেশের। আশ্চর্যের ব্যাপার, এই ভবেশের জন্যই দুশ্চিন্তা আর উৎকণ্ঠায় অধীর হয়ে সে কি-না ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছে।

কিছুক্ষণ পর ডাক্তার নিয়ে ফিরে এল নীরদ।

ডাক্তার এক মুহূর্তও সময় অপচয় করলেন না। রোগীকে পরীক্ষা শুরু করলেন। আর পৃথিবীর সবটুকু উদ্বেগ নিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে রাজেশ অপেক্ষা করতে লাগল।

পরীক্ষা শেষ হলে গম্ভীর মুখে ডাক্তার বললেন, 'পেসেন্ট সম্পর্কে কার সঙ্গে কথা বলব? মানে ওঁর কেউ আত্মীয়-স্বজন—'

ইঙ্গিতটা বুঝল রাজেশ। বলল, 'আমার সঙ্গে বলুন।'

ডাক্তার বললেন, 'ভববাবু আপনার কে হন?'

রাজেশ বলল, 'আমি ওঁর ছেলে। আমার নাম রাজেশ।'

'ও, আচ্ছা।' ডাক্তার বলতে লাগলেন, 'দেখুন রাজেশবাবু, আপনার বাবার অসুখটা কিছু জটিল।'

কাঁপা গলায় রাজেশ বলল, 'খুব ভয়ের কিছু নেই তো?'

'একেবারে নেই, তা-ই বা কি করে বলি।' ডাক্তার স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন।

'অসুখটা কী ?' রাজেশের স্বর এবার আরো কাঁপল।

'আজকের রাতটা না দেখে চট করে কিছু বলতে পারছি না। তবে যা লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তাতে —'

'তাতে কী ?' স্বরটার তলদেশে থেকে উদ্বেগের একটা তরঙ্গ উঠে এল।

আগের বার ডাক্তার যেন অন্যমনস্কতার ঘোরে কথা বলেছিলেন। এবার কিন্তু তিনি বেশ সচেতন। বেশ সতর্ক ভঙ্গিতেই তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'না-না, এই মুহূর্তে আমি জোর দিয়ে কিছু বলতে পারছি না। কারুকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিন। আপাতত আজ রাত্তিরের জন্যে একটা ওষুধ লিখে দিচ্ছি। আপনার বাবার যদি জ্ঞান ফেরে ওটা খাওয়াবার চেষ্টা করবেন। আর সারা রাত মাথায় বরফ দেবার ব্যবস্থা করুন। কাল সকালে আমি একবার আসব।' ডাক্তার বেরিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে পা বাড়ালেন।

রাজেশ বলল, 'আপনার ভিজিটটা—'

'সে জন্যে ব্যস্ত হতে হবে না। ভববাবু যা অসুখ বাধিয়েছেন তাতে মনে হচ্ছে অনেকবার আমাকে যাওয়া-আসা করতে হবে। হিসেবটা পরেই করা যাবে'খন।'

ডাক্তার চলে গেলেন। তাঁর সঙ্গে নীরদকে পাঠিয়ে দিল রাজেশ।

সমস্ত রাত বরফ চলল।

রাজেশ কিংবা এ-বাড়ির চাকর-বাকরেরা, কেউ ঘুমোয় নি। সবাই পালা করে করে ভবেশের মাথায় আইস ব্যাগ ধরেছে। কিন্তু না, সারা রাতের এত প্রচেষ্টা, সব ব্যর্থ হয়ে গেল। যতবার থার্মোমিটার দেওয়া হয়েছে ততবারই দেখা গেছে জ্বর এক শ' পাঁচ ডিগ্রির ওপরে।

ভবেশ সেই একই রকম আছেন। তেমনই আচ্ছন্ন আর বেহুঁশ। মুখটা এখন এত লাল, মনে হয় শরীরের সমস্ত রক্ত সেখানে গিয়ে জমা হয়েছে।

সমস্ত রাত বরফ দিয়েও যে জ্বরের উত্তাপ বিন্দুমাত্র কমে না সে সম্বন্ধে দুশ্চিন্তার অবকাশ আছে বৈকি। রাজেশ একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ল।

এমনিতেই তার স্নায়ুগুলো খুব ঘাতসহ নয়। শৈশবে কয়েকটা বছর শারীরিক অপুষ্টির মধ্যে কেটেছে। তারই প্রভাবে রাজেশের স্বভাবের ভিত খুব মজবুত হয়ে উঠতে পারে নি। কোন বিপদ এসে পড়লে সে একেবারে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

ভবেশের এই অসুখ তাকে চঞ্চল করে তুলল। আকণ্ঠ এক অধীরতা চারপাশ থেকে বেষ্টন করতে লাগল যেন। এখন তার কী করা উচিত, বা করলে ভাল হয়—সে সম্বন্ধে কোন কিছু স্পষ্টভাবে ভাবতে পারল না।

ডাক্তারের কর্তব্যজ্ঞান সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। খুব সকালে, তখনও ভাল করে রোদ ওঠেনি—তিনি নিজেই চলে এলেন।

সারাটা রাত সীমাহীন এক অসহায়তার মধ্যে যেন দোল খেয়েছে রাজেশ। ডাক্তারকে দেখে খানিকটা ভরসা পেল সে। ছুটে এসে বলল, 'কিছুই তো হল না ডাক্তারবাবু।'

'জ্বর কমে নি?' ডাক্তার প্রশ্ন করলেন।

'আজ্ঞে না। একশ পাঁচ ডিগ্রির ওপর জ্বরটা সেই যে উঠে আছে নাববার এতটুকু লক্ষণ নেই। তা ছাড়া জ্ঞানও ফেরেনি।' ভয়াত ব্যাকুল স্বরে রাজেশ বলতে লাগল, 'আমার বড্ড ভয় লাগছে ডাক্তারবাবু।'

রাজেশের ব্যাকুলতা ডাক্তারকে যেন স্পর্শ করল। তার কাঁধে সান্ত্বনার মত একখানা হাত রেখে তিনি বললেন, 'অত ভেঙে পড়লে কখনও চলে।' একটু থেমে আবার বললেন, 'কাল রাত্রে পেসেন্ট মুখ দিয়ে কোন রকম আওয়াজ টাওয়াজ করেছেন? এই ধরুন, গোঙানি টোঙানি কিংবা প্রলাপ বকা-টকা?'

'আজ্ঞে না।'

'নড়া-চড়া?'

'আজ্ঞে না। ঠিক এক অবস্থায় পড়ে আছেন।'

ডাক্তার আর কোন প্রশ্ন করলেন না। ভবেশের বুকে নল লাগিয়ে হৃদ্‌পিণ্ডের উত্থান-পতন কিছুক্ষণ অনুভব করলেন। তারপর পেট টিপলেন, চোখের কোল দেখলেন, নাড়ি পরীক্ষা করলেন। অবশেষে বাহুমূলে ইঞ্জেকসান দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

রাজেশ জিজ্ঞেস করল, 'এখন কি রকম দেখলেন ডাক্তারবাবু?'

'সেই একই রকম।' ডাক্তার বললেন, 'একটা ইঞ্জেকসান দিয়ে গেলাম। সন্ধ্যে পর্য্যন্ত দেখা যাক। তারপর না হয় আরেকটা দিয়ে যাব'খন।'

সন্ধ্যে পর্যন্ত সেই একই ভাবে কাটল। ভবেশ তেমনই আচ্ছন্ন, তেমনই নিশ্চেতন। এর মধ্যে কখন যে রাজেশ স্নান করেছে, কখন খেয়েছে, আবার কখন যে আইস ব্যাগ নিয়ে ভবেশের শিয়রে এসে বসেছে—নিজেরই খেয়াল নেই।'

সন্ধ্যের খানিকটা পর আবার এলেন ডাক্তার। সকালের মতই ভবেশের চোখ, বুক, নাড়ি পরীক্ষা করলেন। তারপর একটা ইঞ্জেকসান দিয়ে চলে গেলেন।

এইভাবে আরো দুদিন কাটল। এর মধ্যে আরো কয়েকবার এসেছেন ডাক্তার কিন্তু থার্মোমিটারের ঊর্ধ্বগামী পারদকে কিছুতেই নামানো যায় নি এ ক'দিন তবু অজ্ঞান ছিলেন এবার প্রলাপ বকতে শুরু করেছেন ভবেশ।

ভবেশের অবস্থা রাজেশের শঙ্কাকে প্রায় শীর্ষবিন্দুতে পৌছে দিয়েছে ডাক্তার আদৌ ... লিত নন। রাজেশকে তিনি সমানে আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছেন

প্রথম তিনটে দিন ডাক্তারের আশ্বাস থেকেই সান্ত্বনা খুঁজে পেতে চেয়ে রাজেশ। কিন্তু চতুর্থ দিন সকালে তার মনে হল, ভবেশের অসুখের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে তা যথেষ্ট নয়। কিন্তু কী করা যেতে পারে ? কী ?

রাজেশ ভাবল কারো সঙ্গে পরামর্শ করতে পারলে ভাল হত। কার সঙ্গে করবে। প্রথমেই যার মুখটা মনে পড়ল সে দোলন। কিন্তু দোলনের সঙ্গে পরাম করবে কি, সে-ই তো সদর হাসপাতালে পড়ে আছে। দোলনের পর দ্বিতী যে মানুষটির ছবি তার সামনে এসে দাঁড়াল তিনি যোগদা মুখার্জি। তাঁকে একটা খবর দেওয়া যেতে পারে অবশ্য। খবর পেলে তিনি যে ছুটে আসবে এ ব্যাপারে রাজেশ নিঃসংশয়। তথাপি যোগদা মুখার্জির ব্যাপারে বিন্দুমা উৎসাহ বোধ করল না সে।

অবশেষে মামাদের কথা মনে পড়ল। হ্যাঁ, চাঁপদানিতে একটা চিঠি লেখ যেতে পারে। তারপর মামারা এসে যা ভাল বোঝেন, করবেন।

চাঁপদানির কথা মনে হতে আর দেরি করল না রাজেশ। কাগজ-কল নিয়ে ভবেশের ঘরেই একটা টেবিলে চিঠি লিখতে বসল। কিন্তু শেষ পর্য চিঠিটা আর লেখা হল না। তার আগেই ছুটতে ছুটতে উদ্‌ভ্রান্তের মত যিনি ঘরে এসে ঢুকলেন তাঁর দিকে তাকিয়ে রাজেশ প্রথমটা বিমূঢ়। তারপর স্তম্ভিত হতবাক। বিস্ময় বিমূঢ়তা—রাজেশের সমস্ত চেতনার ওপর দিয়ে একসঙ্গে কতকগুলো অনুভূতি যে তরঙ্গিত হয়ে গেল, সে নিজেই জানে না। যিনি সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন এই মুহূর্তে, এইমুহূর্তে কেন, দু-এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁকে কোন কারণে স্মরণ করেছে বলে রাজেশ মনে করতে পারল না। ত ছাড়া তিনি যে কোনদিন এ বাড়িতে আসতে পারেন এ ছিল অভাবিত অকল্পনীয় !

যিনি এসেছেন তিনি নতুন পাড়ার সেই রহস্যময়ী—বিভাদেবী। দলি রেজিস্ট্রির দিন সদর শহরে তাকে শেষ দেখেছিল রাজেশ। তারপর সে নিজে তার বাড়ি যায় নি ; তিনিও ভোলাকে দিয়ে ডাকিয়ে পাঠান নি।

রাজেশ লক্ষ্য করল, বিভাদেবী আসামাত্র এ ঘরে যে ক'টি চাকর-বাকর ছিল সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। সন্ত্রস্ত এবং হতবাক।

বিভাদেবীর কিন্তু কোনদিকে লক্ষ্য নেই। উদ্‌ভ্রান্তের মতই ভবেশের কাছে ছুটে গেলেন তিনি। তাঁর কপালে একবার হাত রেখে পরক্ষণেই সরিয়ে নিলেন। তারপর রাজেশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার বাবার এমন ভীষণ অসুখ আমাকে খবর দাও নি কেন?' যেন কৈফিয়তই দাবী করলেন তিনি।

মহিলার আচরণ, চোখমুখের অপরিসীম উৎকণ্ঠা, উদ্বিগ্ন চলাফেরা—সব মিলিয়ে রাজেশের বিস্ময় বিপুল হয়ে উঠেছিল। কোন রকমে সে বলতে পারল, 'আপনাকে খবর দেব!'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমাকে—' বিভাদেবী উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

দশ বছর পর রানীপুরে ফিরে এই মহিলাটিকে বার কয়েক দেখেছে রাজেশ। যতবার দেখেছে ততবারই বিভাদেবী তার মনে নিজের একটি মাত্র ছবিই এঁকে দিয়েছেন। সেই ছবিটি শান্ত, গম্ভীর এবং স্নেহশীলা একটি রমণীর।

আজ কিন্তু তিনি উত্তেজিত। রাজেশ কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই বিভাদেবী আবার বলে উঠলেন, 'ভোলার কাছে এইমাত্র খবর পেলাম। খবরটা পেয়েই ছুটতে ছুটতে আসছি। তিনদিন ধরে লোকটা বেহুঁশ, তোমার সাধারণ একটু কাণ্ডজ্ঞান থাকা উচিত ছিল রাজেশ। আমাকে না হলেও চাঁপদানি থেকে তোমার মামাদের আনাতে পারতে।'

রাজেশ বলতে চেষ্টা করল, এই মুহূর্তে মামাদেরই চিঠি লিখতে বসেছে। কিন্তু গলায় স্বর ফুটল না।

বিভাদেবী আজ নিষ্ঠুর। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আবার বললেন, 'ছিঃ ছিঃ, তুমি কী মানুষ রাজেশ! লোকটাকে একেবারে মেরে ফেলবার ব্যবস্থা করেছ।'

মহিলাটির অতর্কিত আবির্ভাব, তাঁর ধিক্কার, আঘাত এবং নিষ্ঠুরতা—সব মিলিয়ে রাজেশকে একেবারে বোবা করে দিয়েছে। সে শুধু তাকিয়ে রইল।

আঘাতের নেশাটা এবার একটু যেন কাটল বিভাদেবীর। বললেন, 'ডাক্তার ডেকেছ, না ঐভাবেই ফেলে রেখেছ?'

এতক্ষণে রাজেশ কথা বলতে পারল। শিথিল স্বরে সে জানাল, জ্ঞান হারিয়ে ভবেশ যেদিন বাড়ি ফিরলেন সেদিনই ডাক্তার আনা হয়েছে।

'কোন ডাক্তারকে ডেকেছ?'

রাজেশ নাম বলল।

বিভাদেবী বললেন, 'ডাক্তার কী বললে? মানে অসুখটা কী?'

ভয়ে ভয়ে রাজেশ বলল, 'এখনও ঠিক কিছু বলে নি। রোজ দুটো করে ইঞ্জেকশান দিচ্ছে আর বলছে, দু-চারদিন না গেলে রোগটা বোঝা যাবে না।'

'সে কি!' বিভাদেবী চমকে উঠলেন, অসুখ না ধরেই আন্দাজে

ইঞ্জেকসান দিয়ে যাচ্ছে! এক্ষুনি কারুকে ডাক্তারের কাছে পাঠাও। সে যেন সঙ্গে করে তাকে নিয়ে আসে।'

যে চাকর-বাকরগুলো চিত্রার্পিতের মত চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের একজনকে ডাক্তারের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিল রাজেশ।

বিভাদেবী রাজেশকে আর কিছু বললেন না। এবার তাঁর সমস্ত মনোযোগ গিয়ে পড়ল ভবেশের ওপর। রাজেশের কাছ থেকে বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড আর জামাকাপড় চেয়ে নিয়ে ক্ষিপ্র নিপুণ হাতে তিনি ভবেশের বিছানা বদলে দিলেন। বাসি ময়লা পোশাক ছাড়িয়ে পাটভাঙা ধবধবে ধুতি-পাঞ্জাবি পরালেন। তারপর আইস ব্যাগ নিয়ে মাথার কাছে বসলেন।

বিভাদেবী যখন শুশ্রূষায় মগ্ন সেই সময় ডাক্তার এলেন। মহিলাকে দেখে ঘরে পা দিতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালেন তিনি। তাঁর গলার ভেতর থেকে চকিত বিস্ময় যেন উথলে বেরিয়ে এল, 'এ কি, আপনি!'

বিভাদেবী মুখ ফেরালেন। ডাক্তারের সঙ্গে চোখাচোখি হতে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন। দূরে বসে রাজেশ অনুভব করল, ওঁরা পরস্পরের পরিচিত।

বিভাদেবী আশ্চর্য সহজ আর সাবলীল। স্বচ্ছন্দ স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ আমিই। ভেতরে আসুন।'

ডাক্তার ঘরের মধ্যে চলে এলেন। বিস্ময়টা তখনও তাঁর থিতিয়ে যায় নি। আগের স্বরেই বললেন, 'আপনাকে এ-বাড়িতে দেখে আমি কিন্তু অবাক হয়ে গেছি।'

বাধা দিয়ে বিভাদেবী বললেন, 'আমার জন্যে আপনাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। যে জন্যে ডাকিয়ে পাঠিয়েছি আগে তা শুনুন।'

ভবেশের খাটটা বিশাল। তার এক পাশে বসতে বসতে ডাক্তার বললেন, 'বলুন—'

'আপনিই তো পেসেন্টকে দেখছেন। অসুখটা কী বলে মনে হয়?'

একটু যেন থতমত খেলেন ডাক্তার। পরক্ষণে সামলে নিয়ে বললেন, 'আজ্ঞে এখনও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে—'

ডাক্তারের বক্তব্য শেষ হবার আগেই বিভাদেবী বলে উঠলেন, 'শুনলাম, রোজ নাকি দুটো করে ইঞ্জেকসান দিয়ে যাচ্ছেন। রোগ না বুঝে কী আন্দাজে ইঞ্জেকসান দিচ্ছেন?'

'আজ্ঞে, আমার ধারণা মেয়াদী ধরনের হাই ফীভার। তাই—'

'আপনার ধারণা ভুলও তো হতে পারে। রক্ত পরীক্ষা করেছেন?'

বিব্রত অপরাধী ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন ডাক্তার। থতিয়ে থতিয়ে ভীত

স্বরে বললেন, 'আজ্ঞে না, ওটা করা হয় নি।'

বিরুদ্ধ পক্ষের উকিল যেভাবে জেরায় জেরায় সাক্ষীকে ধরাশায়ী করে ফেলে ঠিক তেমন ভাবেই বিভাদেবী বললেন, 'কেন করেন নি? চারদিন লোকটা বেহুঁশ। এর মধ্যে ব্লাডটা কালচার করা উচিত ছিল না?'

'আজ্ঞে, ভেবেছিলাম আজকেই করব—'

বিভাদেবী বললেন, 'এতদিন যখন করা হয় নি, আর দরকার নেই।' রাজেশের দিকে ফিরে বললেন, 'ডাক্তারবাবুর ভিজিট-টিজিট কিছু দেওয়া হয়েছে?'

রাজেশ মাথা নেড়ে জানাল, 'না।'

ডাক্তারের দিকে আবার তাকিয়ে বিভাদেবী বললেন, 'আপনার পাওনা কী হয়েছে না হয়েছে, একটা বিল করে পাঠিয়ে দেবেন। আচ্ছা নমস্কার।'

ইঙ্গিতটা অত্যন্ত স্পষ্ট। বিহ্বলের মত উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তার। কিছু একটা বলতে চেষ্টা করলেন, পারলেন না। তারপর প্রতি-নমস্কার জানিয়ে সেই অনন্য ব্যক্তিত্বময়ী মহিলাটির সামনে থেকে একরকম পালিয়েই গেলেন।

ডাক্তার চলে গেলে বিভাদেবী রাজেশকে বললেন, 'তোমাকে এখনই একবার কলকাতা যেতে হবে। তোমার বাবার একজন বন্ধু আছেন, ডাক্তার মিত্র। নামকরা স্পেশালিষ্ট। ঠিকানাটা দিয়ে দিচ্ছি। গাড়ি নিয়ে চলে যাও। তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে।'

নীরদকে নিয়ে কলকাতায় ছুটল রাজেশ। আর যেতে যেতে তার মস্তিষ্কের মধ্যে নিদারুণ বিশৃঙ্খলা ঘটে যেতে লাগল। বিভাদেবী নামে এই মহিলাটি কে? ভবেশের সঙ্গে তাঁর কী সম্পর্ক? আদৌ কিছু আছে কি? যদি না থাকে ভবেশের জীবনের জন্য তাঁর এত আগ্রহ, এত ব্যাকুলতা, এত উদ্বেগ কেন?

ভাবতে সমস্ত উন্মুখ সত্তা দুরন্ত ঢলের মত আবেক দিকে ছুটে চলল। তবে কি—তবে কি বিভাদেবী ভবেশের—

কিন্তু তা কি করে সম্ভব? প্রথমত বিভাদেবী ভবেশের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকেন না, বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গভাবে নতুন পাড়ার একটি বাড়িতে বাস করেন। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী হলে এই ছোট শহরের সংক্ষিপ্ত বৃত্তের মধ্যে আলাদা আলাদা কি থাকা সম্ভব হত। আজকের অভিজ্ঞতার কথা বাদ দিলে ভবেশ সম্বন্ধে বিভাদেবীর একটি মাত্র মনোভাবই এতদিন অনুভব করে এসেছে রাজেশ, তার নাম বিদ্বেষ। রেজেষ্ট্রি অফিসের কাছে সেদিনের সেই নাটকে বিভাদেবী সম্বন্ধে ভবেশের যে মনোভাব জানা গিয়েছিল, আর যা-ই হোক, তার নামও প্রীতি নয়।

পরস্পরের প্রতি যত বিরূপতাই থাক, স্বামী-স্ত্রী হলে ভবেশ এবং বিভাদেবী চক্ষুলজ্জার খাতিরে অন্তত এক বাড়িতে থাকতেন।

প্রথম থেকেই রাজেশ লক্ষ্য করে আসছে, ভবেশের প্রতি বিভাদেবীর বিদ্বেষ ভয়ানক রকমের তীব্র, প্রখর আর অন্ধ। এত অন্ধ যে রাজেশের সঙ্গে ভবেশের সম্পর্ক জানা সত্ত্বেও বিভাদেবীর উত্তম বিন্দুমাত্র স্তিমিত হয় নি। বরং বিপুল উৎসাহে নিজের সমস্ত ঘৃণা আর বিতৃষ্ণা রাজেশের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন।

কিন্তু—কিন্তু কোন স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে তার ছেলের প্রাণে ঘৃণার মশাল জ্বেলে দেয়? সংসারে এমন নজীর আছে কি-না, সন্দেহ।

এক দিকে ঘৃণা, আরেক দিকে ব্যাকুলতা—বিভাদেবীর এই দ্বৈতরূপের খেলা রাজেশকে অপার বিভ্রান্তির মধ্যে ঠেলে দিয়েছে।

কলকাতা থেকে ডাক্তার এলেন। পরীক্ষা হল। পরীক্ষার রিপোর্ট থেকে অনায়াসেই রোগ ধরা পড়ল। খুব সাংঘাতিক ধরনের ম্যালিগনান্ট ফীভার। তার সঙ্গে টাইফয়েড আর রক্তচাপের কিছু লক্ষণ মিশ্রিত। সব মিলিয়ে ব্যাপারটা যেমন জটিল তেমনি ঘোরালো।

আগের ডাক্তারের মত এবার আর অন্ধকারে হাতড়ে ফেরা নয়। রোগ যখন ধরা পড়েছে তখন উপযুক্ত ওষুধেরও ব্যবস্থা হল। ভবেশের ডাক্তার বন্ধু বললেন, 'পেসেন্টের অবস্থা খুব ভাল নয়। দিন রাত সব সময় এঁর কাছে একজন থাকা দরকার। শুধু ওষুধে হবে না। ভাল নার্সিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে। যদি বলেন কলকাতা থেকে দু-জন নার্স পাঠিয়ে দেব।''

বিভাদেবী কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন, 'নার্স না হলেই কি নয়? আমি যদি কাছে থাকি?'

একটু ইতস্তত করে ডাক্তার মিত্র বললেন, 'সবসময় কিন্তু থাকতে হবে। এক ঘণ্টা অন্তর অন্তর স্পঞ্জ করে পেসেন্টের শরীর মুছিয়ে দিতে হবে। মাথায় আইস ব্যাগ ধরতে হবে। দিনের বেলা থাকলেই চলবে না; রাতও জাগতে হবে। আপনি কি পারবেন?'

বিভাদেবী হাসলেন। বললেন, 'দেখি না একবার চেষ্টা করে।'

ডাক্তার একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'বেশ, আপনিই তা হলে দায়িত্ব নিন।'

সেই মুহূর্ত থেকেই চিকিৎসা শুরু হল। যে রোগী নিশ্চেতন তাকে খাবার ওষুধ দেওয়া বৃথা। অতএব শিরা ভেদ করে ইঞ্জেকশান দিতে হল।

একসঙ্গে দুটো ইঞ্জেকশান দিলেন ডাক্তার মিত্র। স্থির হল, প্রতিদিন ভবেশকে সকালে দুটো এবং বিকালে দুটো—মোট চারটে ইঞ্জেকশান দেওয়া হবে। স্থির হল, রোজ সকালে ডাক্তার মিত্র কলকাতা থেকে রানীপুরে একবার করে আসবেন। সকালের ইঞ্জেকশান দুটো তিনিই দেবেন। বিকালের দুটো রানীপুরের কোন ডাক্তার অথবা কম্পাউণ্ডার ডাকিয়ে দিলেই চলবে। আপাতত জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই চালু থাকবে।

ডাক্তার মিত্র চলে যাবার পর বিচিত্র এক অধ্যায় শুরু হল। মানুষ নিজের সমস্ত রকম স্বাচ্ছন্দ্যের প্রশ্নকে বিলুপ্ত করে দিয়ে কি-ভাবে সেবা করে যেতে পারে, বিভাদেবীকে না দেখলে রাজেশের পক্ষে তা বিশ্বাস করা কষ্ট হত। কঠোর এক তপশ্চর্যার মত মৃত্যুর বিরুদ্ধে দুর্গ সাজিয়ে ভবেশের শিয়রে বসে রইলেন তিনি।

রাজেশও সর্বক্ষণ ভবেশের ঘরে এসে থাকতে চেয়েছে। বিভাদেবী কিন্তু থাকতে দেন নি! বলেছেন, 'যাও, একটু ঘুরেটুরে এস। সবসময় রোগীর ঘরে বসে থাকলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে।'

জোর করে তিনি রাজেশকে খেতে পাঠিয়েছেন, স্নান করতে পাঠিয়েছেন, রাত্রেও বেশিক্ষণ জাগতে দেন নি।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছে রাজেশ, বিভাদেবীকে এ বাড়িতে দেখে ভৃত্য বাহিনীর মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। তারা যেন কিছুটা স্তম্ভিত, কিছুটা বিমূঢ়, কিছুটা বা শঙ্কিত। তাদের শঙ্কা-বিস্ময় এবং বিমূঢ়তা রীতিমত অস্বাভাবিক ধরনের। রাজেশের মনে হয়েছে, বিভাদেবীর সমস্ত রহস্যই তাদের জানা। একেকবার প্রবল ইচ্ছা হয়েছে, তাদের সঙ্গে মহিলাটি সম্বন্ধে খোলাখুলি আলোচনা করে। পরমুহূর্তেই খেয়াল হয়েছে, আলোচনা করতে যাওয়া নিরর্থক। আগের অভিজ্ঞতা থেকেই রাজেশের জানা আছে, বিভাদেবীর প্রসঙ্গ নিয়ে সে যতখানি এগিয়ে যাবে চাকর-বাকরগুলো ঠিক ততখানিই পিছোবে।

আরো দিন দুই পর আবছা আবছা জ্ঞান ফিরল ভবেশের। আরও স্তিমিত দৃষ্টিতে এমনভাবে তিনি তাকালেন যাতে মনে হয়, কিছুই চিনতে পারছেন না।

চেতনা আর নিশ্চেতনার মাঝামাঝি একটা জায়গায় থেকে আরো একটা দিন কাটিয়ে দিলেন ভবেশ। অবশেষে পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে এল তাঁর।

সম্পূর্ণ জ্ঞান ফেরার লক্ষণ যখনই দেখা দিতে শুরু করেছে তখনই ভবেশের শিয়র থেকে উঠে পড়েছেন বিভাদেবী। রাজেশের উদ্দেশে বলেছেন, 'এবার তোমার বাবার কাছে তোমাকে বসতে হবে।'

'আপনি?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রাজেশ তাকিয়েছে।

'আমি এখন কাছে থাকব না। জ্ঞান ফিরে আসছে। জ্ঞান ফেরার পর আমাকে দেখলে তোমার বাবা উত্তেজিত হয়ে পড়বেন। এ সময় উত্তেজনা তাঁর পক্ষে ভয়ানক ক্ষতিকর। তা ছাড়া তিন দিন আমার স্নান হয় নি। শরীরটা চটচট করছে, মাথাও খুব ধরেছে। আমাকে একবার বাড়ি ফিরতে হবে। স্নান সেরে, জামা কাপড় বদলে, তারপর কিছু খেয়ে নিতে হবে। খুব খিদে পেয়েছে।' বলতে বলতে বিভাদেবী চোখ নামিয়েছেন। খিদের কথায় খুব সম্ভব তাঁর মুখে লজ্জার ছায়া পড়েছে।

রাজেশ ব্যস্ত হয়ে উঠেছে এবার, 'সে কি, ঐ জন্যে বাড়ি যেতে হবে কেন! এখানেই সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তিন দিন স্নান-খাওয়া হয় নি ; এখন আর কষ্ট করে অতদূর আপনাকে যেতে হবে না।'

'কিন্তু রাজেশ—' এবার মুখ তুলেছেন বিভাদেবী। গম্ভীর গলায় বলেছেন, 'এ বাড়ির ভাত তো আমার গলা দিয়ে নামবে না বাবা।'

রাজেশ হতচকিত। বিভ্রান্তের মত সে শুধু বলতে পেরেছে, 'আপনি কি বলছেন ঠিক বুঝতে পারছি না।'

তৎক্ষণাৎ কিছু বলেন নি বিভাদেবী। স্থির নিষ্পলকে কিছুক্ষণ রাজেশের দিকে তাকিয়ে থেকেছেন। তারপর বিচিত্র হেসে বলেছেন, 'আজ না বাবা। যদি কোনদিন বোঝাবার দিন আসে সেদিন বুঝিয়ে দেব।' বলে আর অপেক্ষা করেন নি। দ্রুত পা ফেলে চলে গেছেন।

ভবেশের জ্ঞান ফিরেছিল দুপুরে। সন্ধ্যের দিকে বেশ খানিকটা সুস্থ হয়ে উঠলেন তিনি। জ্বরও অনেক নেমে গেছে।

রাজেশ পাশেই বসে ছিল। তার দিকে তাকিয়ে দুর্বল গলায় ভবেশ ডাকলেন, 'রাজু—'

রাজেশ তাকাল।

ভবেশ বললেন, 'আজ কী বার রে?'

'রবিবার—' রাজেশ জানাল।

ক্ষীণ স্মৃতির মধ্যে কিছুক্ষণ কি যেন খুঁজে বেড়ালেন ভবেশ। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'মনে পড়ছে, মঙ্গলবার রাত্রিবেলা কেমিক্যাল ফ্যাক্টরি থেকে অসহ্য মাথা ধরা আর জ্বর নিয়ে বেরিয়েছিলাম। গাড়িতে করে বাড়ির দিকে ফিরতে ফিরতে চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। তারপর কী হয়েছিল, মনে নেই।'

রাজেশ বলল, 'আপনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। পাঁচ দিন পর আজ

আপনার জ্ঞান ফিরেছে।'

'পাঁচ দিন আমি বেহুঁশ! এমন সাঙ্ঘাতিক অসুখ তো কোনদিন আমার হয় না। তা হ্যাঁ রে 'আমাকে নিয়ে খুব বিপদে পড়ে গিয়েছিলি, না?'

রাজেশ বলল, 'খুব ভয় পেয়েছিলাম। প্রথম দুদিন বানীপুরের একজন ডাক্তার এনে আপনাকে দেখিয়েছি। তাতে যখন কিছু হল না তখন কলকাতা থেকে আপনার বন্ধু ডাক্তার মিত্রকে আনতে হয়েছিল!'

ভবেশ এবার দুর্বল হাত বাড়িয়ে ছেলের একটি হাত ধরলেন। তারপর কৃতজ্ঞ ঝাপসা স্বরে বললেন, 'তোর জন্যে এ যাত্রা বেঁচে গেলাম রাজু। তুই না থাকলে আমি মরে যেতাম।' বলতে বলতে স্বরটা রুদ্ধ হয়ে এল তাঁর।

একটি রুগ্ন শয্যাবিলীন মানুষের আবেগ রাজেশের অনুভূতির সমুদ্রে তরঙ্গ তুলল যেন। সঙ্গে সঙ্গে সে আর কিছু বলতে পারল না। অনেকক্ষণ পর বুকের ভেতরটার ঢেউ কিছু শান্ত হলে রাজেশ ব্যস্ত হয়ে উঠল। বলল, 'না-না, আমার জন্যে না। আমি আর কতটুকু করেছি আপনার জন্যে! আপনি অবশ্য বেঁচেছেন আরেকজনের জন্যে। ডাক্তার মিত্রের কথা কি আমি জানতাম! তিনিই আমাকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত আপনার কাছে বসে থেকেছেন। আপনার জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত তাঁর না ছিল ঘুম, না ছিল খাওয়া. তাঁরই পুণ্যে আপনি সেরে উঠেছেন।'

বিমূঢ়ের মত ভবেশ বললেন, 'কে—কে তিনি?'

রাজেশ কি উত্তর দিতে যাচ্ছিল। দেওয়া হল না। তার আগেই একটা বয় ঘরে এসে তাকে বলল, 'মাঈজী আপনাকে ডাকছেন।'

রাজেশ বলল, 'কে মাঈজী?'

'শ্রিফ ও হী—তিন রোজ যিনি ছিলেন।'

রাজেশ এবার বুঝতে পারল। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চল—' বলেই দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

পেছন থেকে ভবেশ বললেন, 'কে রে রাজু? মাঈজী আবার কে?' তাঁর কণ্ঠস্বরে কৌতূহল যত তার হাজার গুণ বিস্ময়।

রাজেশ দরজার দিকে যেতে যেতেই বলল, 'ফিরে এসে বলছি।'

বাইরে বেরিয়ে রাজেশ দেখল, অনেকটা দূরে নীচের তলায় যাবার সিঁড়ির কাছে, একটি নিরালা কোণে বিভাদেবী দাঁড়িয়ে আছেন। দুপুরবেলা, ভবেশের জ্ঞান ফেরার সময় তিনি যখন এ বাড়ি থেকে যান তখন বাসি ময়লা কাপড়ে, তিন দিনের স্নানহীন ঘুমহীন উদ্বিগ্ন পরিশ্রান্ত চেহারায় তাঁকে মলিন দেখাচ্ছিল।

এখন নিশ্চয়ই তাঁর স্নান সারা হয়ে গেছে। রুক্ষ চুলগুলিতে তেল পড়েছে; সেগুলো এখন খোঁপায় আবদ্ধ। পরনে ধবধবে শান্তিপুরী শাড়ি। কপালে প্রকাণ্ড সিঁদুরের টিপ।

পায়ে পায়ে কাছে এগিয়ে গেল রাজেশ। বলল, 'এখানে দাঁড়িয়ে আছেন যে?'

বিভাদেবী বললেন, 'তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি।'

'আসুন, ঘরে যাই।'

'না।' বিভাদেবী মাথা নাড়লেন।

রাজেশ জিজ্ঞেস করল, 'না কেন?'

রাজেশের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বিভাদেবী অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন। বললেন, 'তোমার বাবা এখন কেমন আছেন রাজেশ?'

'অনেক ভাল। জ্বর কমে গেছে। আমার সঙ্গে একটু আগে বেশ কথা বলছিলেন। আসুন না, যার জন্যে এত কষ্ট করলেন তিনি কেমন আছেন, নিজেই দেখতে পাবেন।'

'তোমাকে তো আগেই বলেছি রাজেশ, আমি ঘরে যাব না।'

ক্ষুব্ধ স্বরে রাজেশ এবার বলল, 'কেন যাবেন না তা কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না।'

সস্নেহে একটু হাসলেন বিভাদেবী। বললেন, 'তুমি তো জানই, আমাকে দেখলে তোমার বাবা খুশী হবেন না। এ অবস্থায় তাঁর শান্তি নষ্ট করা ঠিক নয়। সে যাক গে, জ্ঞান যখন ফিরেছে ভয়ের আর কিছু নেই। কাল সকালে কলকাতা থেকে ডাক্তার মিত্র এলে কি পথ্য দেওয়া হবে, ওষুধপত্রের কি ব্যবস্থা করতে হবে—সব জিজ্ঞেস করে নিও। আজ দুধ আর ফলের রস দেবে। আর যত দিন উনি পুরোপুরি সুস্থ না হচ্ছেন ততদিন একটা নার্স রেখো। ডাক্তার মিত্রকে বললেই উনি নার্স ঠিক করে দেবেন। আরেকটা কথা, নানা ব্যাপারে তোমার বাবা জড়িয়ে আছেন। একটু ভাল বোধ করলেই কিন্তু উনি উঠে বাইরে যেতে চাইবেন। ডাক্তার মিত্র সেদিন তোমার সামনেই তো বললেন, হার্টটা বেশ ড্যামেজ হয়েছে। আপাতত বেশ কিছুদিনের রেস্ট দরকার ওঁর। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাতে অনিয়ম করতে না পারেন, সেদিকে তোমার নজর রাখতে হবে। এখন তো উনি ভালর দিকেই। যদি মনে কর, অসুখটা খারাপ দিকে বাঁক নিচ্ছে ভোলাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। তা হলে আজ চলি।' বলে আর দাঁড়ালেন না।

আর সঙ্গে সঙ্গে রাজেশ বলে উঠল, 'শুনুন—'

রাজেশের স্বরে এমন একটা তরঙ্গ ছিল যাতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন বিভাদেবী।

রাজেশ বলল, 'একটু আগে বাবার সঙ্গে কী কথা হচ্ছিল জানেন?'

'কী কথা?'

'বাবা বলছিলেন, আমার জন্যেই তিনি নাকি এ যাত্রা বেঁচে গেছেন। আমি বলছিলাম, না, আপনি বেঁচেছেন আরেকজনের জন্যে। বাবা জানতে চাইছিলেন, কার জন্যে তিনি বেঁচে উঠেছেন। আমার কিন্তু উত্তরটা দেওয়া হয় নি।'

বিভাদেবী কিছু বললেন না।

রাজেশ আবার বলে উঠল, 'কেন উত্তরটা দিতে পারি নি জানেন?'

অন্যমনস্ক উদাসীন স্বরে বিভাদেবী বললেন, 'কেন?'

'উত্তরটা দিতে যাব, ঠিক সেই সময় বয়টা গিয়ে খবর দিলে, 'আপনি এসেছেন। সঙ্গে সঙ্গে চলে এলাম।'

বিভাদেবী নিশ্চুপ।

রাজেশও কিছুক্ষণ নীরব। নিজের অজ্ঞাতসারে অতি দ্রুত তার বুকের ভেতর কোথায় যেন একটা বিপর্যয় ঘটে গেল। হঠাৎ, যেন ঘোরের মধ্যে কাণ্ডটা করে বসল সে। লাফ দিয়ে বিভাদেবীর একখানা হাত ধরে ভবেশের ঘরের দিকে ছুটিয়ে নিয়ে চলল।

রাজেশের দুর্বার আকর্ষণে ছুটতে ছুটতে বিভ্রান্তের মত বিভাদেবী শুধু বলতে লাগলেন, 'এ কি রাজেশ, ছাড়—ছাড়। এ-সবের মানে কী?'

রাজেশ বলল, 'কিছুতেই আপনাকে ছাড়ব না। সিঁড়ির মুখ থেকে ভবেশের ঘরে টানতে টানতে বিভাদেবীকে নিয়ে এল সে।

ঘরে ঢোকামাত্র বিছানায় শায়িত অসুস্থ রুগ্ন মানুষটির চোখেমুখে ছায়ার পেছনে রোদের মত, রোদের পেছনে ছায়ার মত কতকগুলো নাম-না-জানা বিচিত্র অনুভূতি দ্রুত খেলা করে গেল।

কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত ঘরখানায় পাথরের মত শক্ত অটুট একটা স্তব্ধতা নেমে এল বুঝি। চিত্রার্পিতের মত এককোণে নতচোখে দাঁড়িয়ে আছেন বিভাদেবী। রাজেশও এবার ভেতরে ভেতরে কিছুটা সচেতন হয়ে উঠেছে। সচেতন এবং বিচলিত। মনে হচ্ছে ঝোঁকের মাথায় সাংঘাতিক রকমের এক হঠকারিতা করে বসা হয়েছে। বিভাদেবীকে এভাবে টেনে না আনলেই বোধ হয় ভাল হত।

কিছুক্ষণ মাত্র। তারপরেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত বিছানায় উঠে বসলেন ভবেশ।

পৃথিবীর সবটুকু বিস্ময়, বিমূঢ়তা, বিরক্তি, বিতৃষ্ণা, বিদ্বেষ আর উত্তেজনা স্বরের মধ্যে ঢেলে দিয়ে বলে উঠলেন, 'এ কি, তুমি! তুমি এ বাড়িতে?'

বিভাদেবী নিরুত্তর। একইভাবে নিস্পন্দের মত তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন।

কাঁপা গলায় রাজেশ বলল, 'উনি—ওঁরই জন্যে আপনি বেঁচে উঠেছেন।'

ছেলের কথা যেন শুনতেই পেলেন না ভবেশ। দুর্বল স্বরটাকে যতখানি সম্ভব তীক্ষ্ণ আর কর্কশ করে বলে উঠলেন, 'কে—কে তোমাকে এ বাড়িতে আসতে বলেছিল?'

রাজেশ চমকে উঠল। যে মানুষ নিজের সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাচ্ছন্দ্য দূরে থাক, সাধারণ জৈব নিয়মগুলো পর্যন্ত অগ্রাহ্য করে দিনের পর দিন কাছে বসে থেকেছেন, রাতের পর রাত বিনিদ্র কাটিয়েছেন তাঁর প্রতি এ কোন জঘন্য ব্যবহার ভবেশের!

নিস্পন্দ মূর্তিটার মধ্যে এবার চাঞ্চল্য জাগল যেন। অস্ফুট গলায় বিভাদেবী বললেন, 'কেউ আমাকে ঢুকতে দেয় নি। আমি নিজেই ঢুকেছি।'

'তুমি কি ভুলে গেছ, এ বাড়ির দরজা চিরদিনের মত তোমার কাছে বন্ধ?'

'ভুলি নি।'

'তবে?'

এতক্ষণ নতচোখে দাঁড়িয়ে ছিলেন বিভাদেবী। এবার মুখ তুললেন। ভবেশের চোখের ওপর দৃষ্টি রেখে অবিচলিত স্বরে বললেন, 'তুমি অসুস্থ, এদিকে রাজেশ ছেলেমানুষ; বিপদের মুখে হয়তো দিশেহারা হয়ে পড়বে, তাই না এসে পারি নি।'

ভবেশ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'করুণা দেখাতে এসেছিলে?'

'না।' বিভাদেবী মাথা নাড়লেন।

'তা হলে?'

'কর্তব্যের জন্যে আসতে হয়েছিল।'

'আমার ওপর তোমার কী কর্তব্য থাকতে পারে?'

একমুহূর্ত চুপ করে রইলেন বিভাদেবী। তারপর চোখ বুজে ফিস ফিস করলেন, 'কিছুই কি নেই!'

'না-না-না—' ভবেশ চিৎকার করে উঠলেন।

'তুমি অস্বীকার করতে পার। কিন্তু আর কোন সময় না হলেও স্বামীর এ অবস্থায় স্ত্রীকে কাছে আসতেই হয়।' বলে দাঁড়ালেন না বিভাদেবী। কিছু বুঝবার আগেই ক্ষিপ্রপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে অদৃশ্য হলেন।

আর রাজেশের মনে হল, তার সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে অনেকক্ষণ ধরে ঝন ঝন

করে কি যেন ভেঙেচুরে পড়তে শুরু করেছে।

তা হলে ইনিই—নতুন পাড়ার এই রহস্যময়ীই ভবেশের দ্বিতীয়া স্ত্রী! দশ বছর আগে একদিন এঁর জন্যেই তো চোখের জলে বুক ভাসিয়ে রানীপুর ছেড়ে চলে গিয়েছিল রাজেশ। আশ্চর্য, কি নাটকীয় ভাবেই না তাঁর রহস্যের ওপর থেকে আজ যবনিকা উঠল!

অতর্কিতে একটা কথা মনে পড়ল রাজেশের। স্বামী-স্ত্রীই যদি হবেন, তাঁদের মধ্যে এত বিদ্বেষ কেন? কেন বিভাদেবী ভবেশের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন পাড়ায় নির্বাসিত হয়ে আছেন?

আট

ভবেশের অসুখ দু'টি বিচিত্র স্রোতের মধ্যে রাজেশকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। প্রথমত, বিভাদেবীর পরিচয় তাঁর জানা হয়েছে। জানবার পর থেকে নিজের সত্তার সকল দিক জুড়ে নিদারুণ অস্থিরতা অনুভব করতে শুরু করেছে সে।

এতদিন এই মহিলাটির পরিচয় জানা যায় নি; সে একরকম ভালই ছিল। কিন্তু এখন? বিভাদেবী ভবেশের দ্বিতীয়া স্ত্রী, সেই সুবাদে রাজেশের তিনি সৎমা। সৎমা! শব্দটা মনে মনে উচ্চারণ করতে গিয়ে বুকের ভিতরটা জমাট বেঁধে গেল।

দশ বছর পর এ শহরে ফিরে কতবারই তো দেখা হয়েছে বিভাদেবীর সঙ্গে। তথাপি তাঁর সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কোন মনোভাব গড়ে ওঠে নি রাজেশের। একটি অজ্ঞাত-পরিচয় মহিলা বার বার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। সে জন্য কৌতূহল বোধ করেছে রাজেশ। কিছুটা বিস্ময়ও যে তার প্রাণে দোলা না দিয়েছে, তা নয়। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। বিভাদেবীকে ভালবাসবে, না ঘৃণা করবে—সে সম্পর্কে তার ভাবনা ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন।

কিন্তু যেই সে জানল, বিভাদেবী ভবেশের দ্বিতীয়া স্ত্রী সেই মুহূর্ত থেকে তার মন নির্দিষ্ট একটা কিছুকে আশ্রয় করতে চেয়েছে। সৎমায়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করাই তো সংসারের রীতি। বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠতে গিয়েও কিন্তু পারল না রাজেশ।

কেন যেন বার বার রাজেশের মনে হতে লাগল, বিভাদেবীর সঙ্গে তার মায়ের বিচিত্র একটা মিল আছে। খুব সম্ভব, তাঁরা একই দুর্ভাগ্যের শরিক।

বিবাহিত জীবনে একটি দিনের জন্যও সুখী হন নি মা। মৃত্যু পর্যন্ত শুধু

অপরিসীম কষ্টই পেয়ে গেছেন। যত কষ্টই পান, মায়ের তবু একটা সান্ত্ব ছিল। সংক্ষিপ্ত সীমাবদ্ধ জীবনে যে ক'টা দিন তিনি বেঁচেছিলেন, ভবেশে সঙ্গে একই বাড়িতে থাকতে পেরেছিলেন। বিভাদেবীর পাওয়ার ঘরে (সান্ত্বনাটুকুও নাই।

বিদ্বেষ? না। ভক্তি? না। উদাসীনতা? তা-ও না। বিভাদেবী ব্যাপারে নিজের প্রাণটাকে কোন খাত ধরে বইয়ে দেবে, কিছুতেই স্থির ক উঠতে পারল না রাজেশ।

বিভাদেবীর সম্বন্ধে যতবার ভেবেছে ততবারই একটা কথা মনে পড়ে রাজেশের। ভবেশের সঙ্গে তাঁর কী এমন সংঘাত ঘটতে পারে যাতে চিরদিনে জন্য স্বামীর ঘরের দুয়ার বন্ধ হয়ে গেছে?

যাই হোক, বিভাদেবীর পরিচয় এতদিনে জানা গেছে। কিন্তু রাজেশে সমস্ত সত্তা অস্পষ্টভাবে যেন টের পেয়েছে, ভবেশের স্ত্রীর পরিচয়টুকুই যথে নয়। এর তলদেশে আরো গভীর, আরো ব্যাপক, আরো রহস্যময় কিছু যেন আছে। সেটা আবিষ্কার করার জন্যই রাজেশের কৌতূহল দুরন্ত একট স্রোতকে আশ্রয় করে বিভাদেবীর দিকে ভেসে যেতে শুরু করেছে। সেটুকু না জানা পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই।

দ্বিতীয় স্রোতটা এসেছে ভবেশের দিক থেকে। আশৈশব এই মানুষটি সম্পর্কে রাজেশের জীবনে যে অনুভূতিটা সব চাইতে প্রখর, সব চাইতে সক্রিয় তার নাম ঘৃণা। কিন্তু সম্পত্তি-হস্তান্তর, সম্বর্ধনা, অভিনন্দন, ভোজসভা—এই সব একাকার হয়ে ভবেশের বিরুদ্ধে তার বিতৃষ্ণার ভিতটা অনেক শিথিল হয়ে গিয়েছিল। তারপর পুবের পাড়ায় মেনকার ঘরে অতর্কিতে ভবেশ-জীবনের একটা অন্ধকার দিক আবিষ্কার করে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল রাজেশ। চিরকালের সেই ঘৃণাটা দ্বিগুণ উদ্যমে আবার তার প্রাণে জ্বলে উঠেছিল।

কিন্তু—কিন্তু আচমকা ভবেশের অসুখটা সেই ঘৃণাকে আবার স্তিমিত করে দিয়েছে তার অনুভূতি থেকে বিতৃষ্ণা আর বিদ্বেষের অনেকখানি ধোয়া-মোছা হয়ে গেছে। সহানুভূতির একটা চলন্ত রুগ্ন অসহায় মানুষটির কাছাকাছি রাজেশকে টেনে নিয়ে যেতে শুধু করেছে যেন।

প্রায় দিন দশেক পর মোটামুটি সুস্থ হয়ে উঠলেন ভবেশ
গাড়ির পর গাড়ি এসে ভিড়তে লাগল পোর্টিকোর তলায়!
এলেন, নিশানাথ সাহা এলেন। রহমৎ সাহেব, জামান সাহেব এলেন। এই শহরের যত বিশিষ্ট নাগরিক আর ব্যবসায়ী ছিলেন, সবাই এলেন। এবং

সাংঘাতিক অসুস্থতার সময় কেন তাঁদের খবর দেওয়া হয় নি, কেন তাঁদের দুর্লভ সেবা থেকে বঞ্চিত করা হল, সে জন্য তাঁরা অনুযোগ করে গেলেন।

ভবেশ কিছুটা সুস্থ হলে হঠাৎ রাজেশের খেয়াল হল, অনেক দিন দোলনের কোন খোঁজ নেওয়া হয় নি। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের ভেতর সাংঘাতিক চাঞ্চল্য বোধ করল সে। স্থির করল, আজই—আজই একবার জেলা শহরের হাসপাতালে দেখতে যাবে।

বিকেলে হাসপাতালে এল রাজেশ। আগের দিন যেমন দেখে গিয়েছিল তার চাইতে দোলন এখন অনেকখানি ভাল।

আজ আসার সময় রানীপুরের বাজার থেকে কিছু ফল আর একগুচ্ছ রজনীগন্ধা নিয়ে এসেছে রাজেশ। সেগুলো বেডের পাশে ছোট্ট টেবিলটার ওপর প্রথমে সাজিয়ে রাখল। তারপর একটা উঁচু টুল সংগ্রহ করে কাছে এসে বসল।

বসার শুধু অপেক্ষা। সঙ্গে সঙ্গে দোলন বলে উঠল, 'ঐ ফল আর ফুল কেন? উঁহু, তোমার সঙ্গে তো সে চুক্তি ছিল না। কথা ছিল, তুমি আসবে। ও-সব আনতে কে বলেছে তোমাকে?'

দোলন যা বলেছে সেটুকুই সব নয়। তার বাইরেও অনুচ্চারিত একটা দিক রয়েছে। সেটা যেন বুঝতে পারল রাজেশ। তাড়াতাড়ি ব্যস্তভাবে বলে উঠল, 'তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, ওগুলো আমার নিজের পরিশ্রমের পয়সায় কেনা। ওতে বাবার ছোঁয়া লাগেনি।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর দোলনই স্বর টেনে বলল, 'খু-উ-ব—'

কিছুটা চমকেই উঠল রাজেশ। বিব্রত ভঙ্গিতে চিরদিনের চেনা মেয়েটির দিকে একবার তাকাল! একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়েই রইল। খুব সম্ভব তার চোখেমুখের প্রতিটি রেখা বিশ্লেষণ করতে লাগল।

দোলনকে বিশ্বাস নেই। কখন কোন দিক থেকে তার আক্রমণ এসে পড়বে আগে থেকে অনুমান করা অসম্ভব। ভয়ে ভয়ে রাজেশ বলল, 'কী খুব?'

দোলন শুয়ে ছিল। আস্তে আস্তে হাতের ভরে উঠে বসল। ঠোঁট উল্টে বলল, 'আমার ওপর তোমার খুব টান, না?'

রাজেশ শঙ্কিত। ফিস-ফিসিয়ে বলল, 'তুমি কী বলছ, আমি ঠিক—'

'বুঝিয়ে দিচ্ছি।' নিপুণ সহিসের মত ঠোঁটের প্রান্তে বিচিত্র হাসির রাশ এনে দোলন বলল, 'পনের দিন আগে একবার আমাকে দেখে গেছ। বলে গিয়েছিলে রোজ আসবে। পনের দিনে তোমার বুঝি 'রোজ' হয়!'

পদ্ধতিটা কিছু অভিনব বটে। অন্য সব দিন দেখা মাত্রই যুদ্ধ ঘোষণা

করে বসে দোলন। কোনদিন একটু ভূমিকা করে, কোনদিন বা তার বালা
না রেখেই সরাসরি আক্রমণ করে। কিন্তু আজ তার কথাবার্তার মুখচোখের ভ
—সমস্তই বড় বেশি পরিমাণে মোলায়েম। মনে মনে ভীত হয়েই রইল রাজেশ
শঙ্কিত স্বরে বলল, 'ক'টা দিন এমন ভীষণভাবে আটকে ছিলাম যে আসত
পারিনি।'

ঐটুকু কৈফিয়তেই সন্তুষ্ট হল না দোলন। বলল, 'কি এমন তোমার কা
যাতে ভীষণভাবে আটকে থাকতে হয়েছিল?'

'বাবার খুব অসুখ হয়েছিল?'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।' রাজেশ মাথা নাড়ল, 'পনের দিন ধরে তিনি বিছানায় পড়ে আছেন
প্রথম পাঁচটা দিন তো জ্ঞানই ছিল না। এখন অবশ্য অনেকটা সুস্থ।'

একটু চুপ। তারপর দোলনই বলে উঠল, 'যাক, পনেরটা দিন তাহলে
রানীপুরের হাড় জুড়িয়েছে।'

রাজেশ চকিত হয়ে উঠল। ঈষৎ তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, 'তার মানে!'

'মানে আবার কি। তোমার বাবা বিছানায় পড়েছে; যে ক'টা দিন ঘ
থেকে বেরুতে না পারে সে ক'টা দিন রানীপুরের শান্তি।'

রাজেশ নিশ্চুপ। তার মনে হয়, ভবেশের অসুখের খবরে দোলন যে রক
উৎসাহিত হয়ে উঠেছে না জানি তার মৃত্যু সংবাদে কি পরিমাণ খুশি হয়ে
উঠত! বিষণ্ণ বেদনার্ত দৃষ্টিতে দোলনের দিকে তাকিয়ে রইল রাজেশ।

এদিকে দোলনের চোখে তার স্বভাবের সেই হাসি ছলকাতে শুরু করেছে।
অনেকক্ষণ পরে ডাকল, 'রাজুদা, সেই কথাটা তোমার মনে আছে?'

'কোনটা?'

'ঐ যে আমার কাছে এলে দুঃখই পেতে হয়।'

অন্যদিন দুঃখের কথায় রাজেশ বলেছে, দোলনের সব আঘাতের জন্যই সে
প্রস্তুত। দোলন যে বজ্রই ছুঁড়ুক না কেন সে বুক পেতে নেবে। আজ কিন্তু
কিছুই বলতে পারল না।

দোলন আবার বলল, 'তার চাইতে বরং আমার কাছে আর কোনদিন তুমি
এসো না।'

রাজেশ কি যেন বলতে যাচ্ছিল; বলা হল না। তার আগেই দূরে কার
দিকে যেন তাকিয়ে দোলনের দু-চোখ খুশিতে নেচে উঠল। উচ্ছ্বসিত স্বরে সে
ডাকল, 'আসুন মাসিমা, আসুন—'

দোলনের চোখ অনুসরণ করে রাজেশ দেখল, বিভাদেবী। সঙ্গে সঙ্গে না

আনন্দ, না বিরূপতা, না উদাসীনতা—নাম-না-জানা বিচিত্র এক অনুভূতিতে তার হৃদ্‌পিণ্ড জমাট বেঁধে গেল বুঝি।

এতকাল মহিলার পরিচয় জানা ছিল না, সে জন্যে দুর্বার কৌতূহল হয়তো ছিল, কিন্তু এমন শ্বাসরুদ্ধ অস্থিরতা কোনদিন অনুভব করেনি রাজেশ। এই সদর হাসপাতালে তিনি যে আসতে পারেন, এ ছিল অভাবনীয়। এখানে বিভাদেবীর সঙ্গে দেখা না হলেই যেন আরাম বোধ করা যেত। রাজেশ একবার ভাবল, চলে যায়। উঠতে গিয়ে কিন্তু অনুভব করা গেল, পা দুটো কেউ যেন মেঝের সঙ্গে পেরেক ঠুকে আটকে দিয়েছে।

এদিকে বিভাদেবীও দোলনকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। মুহূর্তমাত্র। তারপর সহজ সাবলীল ভঙ্গীতে কাছে এসে রাজেশকে বললেন, 'কতক্ষণ এসেছ ?'

রাজেশ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারল না। শুষ্ক তরঙ্গহীন স্বরে বলল, 'এই খানিকটা আগে।'

ওদিকে চোখ পাকিয়ে দোলন চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে, 'এ্যাইও মাসিমা —এটা কি- রকম ব্যাপার হচ্ছে ?'

'কোনটা রে ?' বিভাদেবী হাসলেন।

'দেখতে এসেছেন আমাকে। আর গল্প করা হচ্ছে আরেকজনের সঙ্গে! উঁহু, তা কক্ষনো হবে না।'

হাসতে হাসতে বিভাদেবী বললেন, 'গল্প আবার কখন করলাম! রাজেশকে শুধু জিজ্ঞেস করেছিলাম, কখন এসেছ! তা হ্যাঁ রে মেয়ে, এখন কেমন আছিস বল।'

গাল ফুলিয়ে গলার স্বর মোটা করে দোলন বলল, 'থাক, এতদিন পরে আর দায় সারতে হবে না। সেই কবে একাবর দেখে গেছেন! এতদিন পর বুঝি খেয়াল হল—আমি মরে গেছি না বেঁচে আছি, সে খবরটা নেওয়া দরকার! যান—আপনি চাল যান। আমার খোঁজ আর নিতে হবে না।'

'বাবা রে বাবা, কি রাগ মেয়ের!' বিভাদেবী হাসতে লাগলেন। আর হাসতে হাসতেই হঠাৎ একসময় গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, 'খুব তো রাগ করছিস। কিন্তু মাঝখানে কেন আসতে পারিনি তা তো একবারও জিজ্ঞেস করলি না!'

এবার যেন একটু লজ্জাই পেল দোলন। নিজের মধ্যেকার অবুঝ বালিকাকে এক পাশে ঠেলে শান্ত মুখে বলল, 'কেন আসেন নি ?'

বিভাদেবী একমুহূর্ত কি ভেবে রাজেশকে দেখিয়ে বললেন, 'ওকে জিজ্ঞেস

...র স্থাথ মাঝখানের ক'টা দিন আমাদের কিভাবে কেটেছে।'

'আপনার দিন কি ভাবে কেটেছে রাজুদা কি করে জানবে!' বিস্ময়ে দোলনের স্বর তুলে গেল।

ঘাড় ঈষৎ হেলিয়ে বিভাদেবী বললেন' 'ও জানে।'

একটু স্তব্ধতা। তারপরেই দোলনের মুখের ওপর দিয়ে বিদ্যুৎ চমকে গেল যেন। চকিতে খাড়া হয়ে গেল সে। তারপর উত্তেজিত তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, 'ও-ও রাজুদার বাবার অসুখের জন্যেই তাহলে আপনি ব্যস্ত ছিলেন?'

'হ্যাঁ।' বিভাদেবী মাথা নাড়লেন।

'ওদের বাড়িতেও নিশ্চয়ই গিয়েছিলেন?'

'সে তো যেতে হয়েছিলই।'

'ও বাড়িতে ফিরে যেতে আপনার এতটুকুও আটকাল না! লজ্জা, ঘেন্না, অপমান—সব কিছুর মাথা কি খেয়ে বসেছেন! শ্লেষে-বিদ্রূপে-ধিক্কারে দোলন ঝলকাতে লাগল।

বিভাদেবী কিছু একটা বলতে চেষ্টা করলেন। পারলেন না। ঠোঁট দুটো থরথর কাঁপতে লাগল।

চুপ করে থেকেও রেহাই নেই। চাবুকের পর চাবুক এসে পড়তে লাগল মুখের ওপর। দোলন বলতে লাগল, 'একদিন না প্রতিজ্ঞা করে ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন! বলেছিলেন, এ জীবনে আর কোনদিন ওখানে ফিরবেন না। সে-সব তা হলে লোক-দেখানো! নাটক! তলায় তলায় যাবার ইচ্ছেটা পুরোপুরি ছিলই! শুধু একটা ছুতোর অপেক্ষা! এতদিনে সেটা মিলেছে।' একটু থেমে আবার শুরু করল, 'সত্যিই তো, যাবেন না-ই বা কেন? ওখানে কত আরাম! কত টাকা!'

আঘাতে আঘাতে প্রথমটা জর্জরিত হয়ে রইলেন বিভাদেবী। মনে হল, মাথাটা স্খলিত হয়ে ঘাড় থেকে ঝুলে পড়েছে। অনেক—অনেকক্ষণ পর যখন তিনি মুখ তুললেন, আশ্চর্য, সেখানে গ্লানির চিহ্নমাত্র নেই। গ্লানি কেন, ক্ষোভ যন্ত্রণা বেদনা—কিছুই আবিষ্কার করা গেল না। স্নিগ্ধ হাসির মহিমায় সে মুখ এই মুহূর্তে উদ্ভাসিত। ধীরে ধীরে স্বরের ওপর নিজের সমস্ত ব্যক্তিত্বের ভার রেখে বিভাদেবী বললেন, 'তুই যা-যা বললি সব সত্যি মা! তবে—'

'কী?'

'মেয়েমানুষের জীবনে ওগুলোর চাইতেও একটা বড় সত্যি আছে।'

ঘাড় বাঁকিয়ে চোখ কুঁচকে দোলন বলল, 'যথা?'

বিভাদেবী বললেন 'তোর যদি বিয়ে হত বুঝতে পারতিস স্বামীর ঐ

অবস্থায় লজ্জা-অপমান-ভয়, সব কিছু দু-হাতে সরিয়ে মেয়েমানুষকে কাছে যেতে হয়।'

'বাঃ বাঃ চমৎকার একখানা মিলনান্তক নাটকের সংলাপ শোনা গেল। আমার কিন্তু আনন্দে নাচতে ইচ্ছে করছে মাসিমা।'

বিভাদেবী উত্তর দিলেন না।

দোলন আবার বলে উঠল, 'তা হ্যাঁ মাসিমা—'

ম্রিয়মান স্বরে বিভাদেবী বললেন, 'কী বলছিস ?'

'রাজুদার সঙ্গে এ্যাদ্দিন যে লুকোচুরিটা চালাচ্ছিলেন তার পালা নিশ্চয়ই শেষ হয়েছে ?'

'মানে ?'

'মানে আপনার পরিচয় জানতে পেরেছে রাজুদা ?'

'হ্যাঁ।' বিভাদেবী মাথা-নাড়লেন।

রাজেশের ভূমিকা নির্বাক শ্রোতার। সে শুধু দোলন এবং বিভাদেবীর মুখের দিকে তাকাচ্ছে আর ভাবছে। এক যুগ পর রানীপুরে পা দিয়ে কী টের পেয়েছিল সে ? টের পেয়েছিল, বিভাদেবীর সঙ্গে দোলনদের যোগাযোগ দীর্ঘকালের। সময়ের বিচারেই সেটা দীর্ঘ নয়, ঘনিষ্ঠতার দিক থেকেও গভীর। তবে রাজেশের কাছে বিভাদেবীর সত্যিকার পরিচয় যে দোলনরা দেয়নি, সেটা অন্য কারণে। খুব সম্ভব বিভাদেবীর নিষেধ ছিল।

দোলন বলে উঠল, 'আপনারই তো এখন দিন মাসিমা—'

'কি-রকম ?' বিভাদেবী জিজ্ঞেস করলেন।

'রকম জানতে চাইছেন ! বেশ বলছি।' দোলন শুরু করল, 'প্রথমত ছেলে পেলেন। দ্বিতীয়ত স্বামীর কাছে ফিরতে পারলেন। এত পেলেন—আপনার দিন নয়।'

তৎক্ষণাৎ কিছু বললেন না বিভাদেবী। আস্তে আস্তে চোখদুটি জানালার বাইরে সরিয়ে নিয়ে সীমাহীন শূন্য আকাশের দিকে ছড়িয়ে দিলেন। তারপর উদাস গলায় বললেন, 'কী পেয়েছি আর কী পাই নি—এই মুহূর্তে তোকে সে হিসেব আমি দিতে পারব না।'

পাশে বসে রাজেশ চমকে উঠল। মনে পড়ল, রাতের পর রাত বিনিদ্র কাটিয়ে ভবেশের মৃত্যুর বিরুদ্ধে অজেয় প্রহরীর মত বসে ছিলেন বিভাদেবী। কিন্তু তার পুরস্কার কী মিলেছে ! নিষ্ঠুর লাঞ্ছনা আর অপমানই তো।

ভবেশ না হয় হৃদয়হীন, অকৃতজ্ঞ। কিন্তু রাজেশ নিজে ? ভবেশের ত্রুটি, ভবেশের অন্যায় সে-ই তো সংশোধন করে দিতে পারত। কিন্তু তা সে করে

নি। বিভাদেবীর পরিচয় জানার পর তার প্রাণ কৃপণ আর কুণ্ঠিত হয়েছে। দু-হাত বাড়িয়ে মহিলাকে কাছে টানার উদারতাটুকুও তার মধ্যে ছিল না।

বিভাদেবীর পাওয়া না-পাওয়ার কথায় কি যেন বলতে যাচ্ছিল দোলন, হঠাৎ অপ্রত্যাশিতের মত স্থলেখা এসে সামনে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল দোলন, 'আরে, এসো এসো—'তারপর এদিক সেদিক কি খুঁজে বলল, 'তাই তো আর টুল নেই। তুমি আমার কাছেই বস ভাই।' হাত বাড়িয়ে স্থলেখাকে নিজের বিছানায় এনে বসাল সে।

দোলনের শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে দু-চারটে কথা বলে বিভাদেবীর দিকে ফিরল স্থলেখা। বলল, 'ভাল আছেন মাসিমা ?'

বোঝা গেল বিভাদেবীর সঙ্গে স্থলেখার পরিচয় আছে। তিনি বললেন, 'আছি একরকম। তুমি ভাল তো ?'

'হ্যাঁ, ভাল।'

'তুমি তো এ বছর বি. এ. পাশ করেছ ?'

'হ্যাঁ।'

'এম. এ-তে ভর্তি হয়েছ ?'

'আর পড়ি, বাবার ইচ্ছে নয়।'

বিভাদেবী কি বুঝলেন তিনিই জানেন। বললেন, 'ও।'

আজ কি শুধু বিস্মিত, চমকিত আর বিব্রত হবার দিন! যাদের প্রত্যাশা করা যায় নি, যারা ছিল অকল্পনীয়, আজ তারাই দল বেঁধে সদর হাসপাতালে হানা দিতে শুরু করেছে। প্রথমে এসেছেন বিভাদেবী, তারপর এল স্থলেখা। বিভাদেবীর উপস্থিতি তবু কিছুটা সহনীয় কিন্তু স্থলেখার সেই চিঠিটার কথা ভাবতে গিয়েই রাজেশের মনে হল, তার সর্বাঙ্গ বেয়ে ঘাম ছুটছে। নিদারুণ অস্বস্তির মধ্যেও সে লক্ষ্য করল, স্থলেখা বিভাদেবী এবং দোলনের সঙ্গে কথা বলছে কিন্তু ফিরেও তার দিকে তাকাচ্ছে না। রাজেশ তার কাছে কতই না অপরিচিত!

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ রাজেশের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল দোলনের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে চকিত হয়ে উঠল সে। দোলনের ঠোঁট দুটি এই মুহূর্তে তীব্র খাঁজ খেয়ে বেঁকে আছে। একটা বিচিত্র হাসির খেলা চলছে সেখানে।

আড় চোখে একবার রাজেশকে দেখছে দোলন। পরমুহূর্তেই তার চোখ ছটফটে পাখির মত স্থলেখার মুখে নিবদ্ধ হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই আবার ফিরে আসছে রাজেশের দিকে।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর স্থলেখা উঠে পড়ল। দোলন আর বিভাদেবীর

উদ্দেশে বলল, 'আজ চলি দোলনদি, চলি মাসিমা—'

বিভাদেবীও উঠে পড়লেন। বললেন, 'আমিও যাব। চল, একসঙ্গেই ফেরা যাক।' দোলনকে বললেন, 'আজ যাচ্ছি। শিগ্‌গিরই আরেক দিন আসব।' বলে সুলেখাকে সঙ্গে নিয়ে দরজার দিকে দু-পা এগিয়ে হঠাৎ কি মনে পড়তেই ফিরে দাঁড়ালেন। রাজেশকে বললেন, 'তুমি বাড়ি ফিরবে না?'

'ফিরব।' রাজেশ মাথা নাড়ল।

'তা হলে বসে আছ কেন? সন্ধ্যে হয়ে আসছে। ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ হতে বেশি দেরি নেই! এস, আমাদের সঙ্গেই ফিরবে।'

রাজেশ একবার ভাবল, বিভাদেবী আর সুলেখার সঙ্গে যাবে না। সারা পথ দু'টি মানুষের অস্বস্তিকর সঙ্গ তার শান্তি কণ্টকিত করে রাখবে। পরমুহূর্তেই সে স্থির করল, যাবে। অপ্রত্যাশিতভাবে যখন দেখা হয়েই গেছে তখন বিভাদেবীর সঙ্গে বোঝাপড়াটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলাই ভাল।

'চলুন।' রাজেশ উঠে দাঁড়াল। বিভাদেবীর সঙ্গে দরজা পর্যন্ত গিয়ে কি ভেবে একবার পেছন ফিরল সে। দেখল, একটু আগে যে হাসিটাকে ঠোঁটের প্রান্তে ধরে রেখেছিল দোলন সেটাই এখন তার মুখময় ছড়িয়ে পড়েছে।

সদর থেকে বাস ধরে রানীপুরে ফিরতে হয়। অবশ্য ট্রেনেও যাওয়া যায় কিন্তু তা সময় সাপেক্ষ। ট্রেনটা অনেকখানি ঘুরপথে প্রায় ঘণ্টাদুয়েক লাগিয়ে তবে রানীপুরে পৌঁছোয়। সে জায়গায় বাসে পুরো এক ঘণ্টাও লাগে না।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কল্যাণে এদিকে চওড়া চওড়া মসৃণ রাস্তা বেরিয়েছে। তিনজনে অর্থাৎ বিভাদেবী, রাজেশ আর সুলেখা একটা রাস্তার পাশে এসে দাঁড়াল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর বিভাদেবীই প্রথম স্তব্ধতা ভেঙে ডাকলেন, 'রাজু, তোমার বাবা এখন কেমন আছেন?'

'ভাল।'

'বাড়ি থেকে বেরুতে টেরুতে দিচ্ছ না তো?'

'না।'

'কোন রকম অনিয়ম টনিয়ম হচ্ছে না?'

'না।'

একটু ভেবে বিভাদেবী আবার বললেন, 'তোমার বাবাকে আরো কিছুদিন বাড়িতে আটকে রেখে দিও। পুরোপুরি সুস্থ না হলে বেরুতে দিও না।' ভবেশ প্রসঙ্গে আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন বিভাদেবী, হঠাৎ কি খেয়াল হতে

ঈষৎ ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'ভাল কথা, সুলেখার সঙ্গে তোমার পরিচয় নেই ?'

কী উত্তর দেবে, প্রথমটা স্থির করে উঠতে পারল না রাজেশ। বিব্রত মুখে কিছুক্ষণ ইতস্তত করল সে। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'পরিচয় আছে কি নেই, আপনি বরং সুলেখাদেবীকেই জিজ্ঞেস করুন।'

ব্যাপারটা ধাঁধার মতই মনে হল। বিমূঢ় দৃষ্টিতে একবার রাজেশকে দেখে পরক্ষণেই বিভাদেবী চোখদুটি ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন সুলেখার দিকে। বললেন, 'কি ব্যাপার সুলেখা, তোমার সঙ্গে রাজেশের আলাপ নেই ?'

নিরুচ্ছ্বাস স্বরে সুলেখা বলল, 'রাজেশবাবু আমাদের বাড়ি একদিন গিয়েছিলেন। তখনই যা দেখেছি। কথাবার্তা কিছুই হয় নি। শুনেছি উনি ভবেশবাবুর ছেলে।'

বিভাদেবী কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। বললেন, 'রাজেশ তোমাদের বাড়ি গিয়েছিল ?'

সুলেখা বলল, 'হ্যাঁ।'

'কেন ?' এবার বিভাদেবীর স্বরে চমক খেলে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না সুলেখা। তার মুখের ওপর দিয়ে মুহূর্তের জন্য কতকগুলো ঢেউ দ্রুত বয়ে গেল যেন। কিছুক্ষণ পর অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিস্পৃহ স্বরে সে বলল, 'কেন গিয়েছিলেন, সে জবাব আমি না হয় না-ই দিলাম। আমি যখন সঙ্গে থাকব না, রাজেশবাবুর কাছ থেকে ইচ্ছে হলে সেটা জেনে নিতে পারেন।'

বিভাদেবী বিভ্রান্ত। সুলেখা আর রাজেশের মধ্যে কিছু একটা অনুমান করতে চেষ্টা করলেন তিনি। অনুমানটা স্পষ্ট একটা ধারণায় রূপ নেবার আগেই রানী-পুরের বাস এসে গেল। নিঃশব্দে তিনজনে উঠে পড়লেন। বিভাদেবী আর সুলেখা মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট সীটে গিয়ে বসল। রাজেশ বসল পেছনদিকের অন্য একটা সীটে।

রানীপুরে এসে বিভাদেবীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সুলেখা চলে গেল। রাজেশ লক্ষ্য করল,যাবার সময় সাধারণ সৌজন্যের একটা কথাও তার সঙ্গে বলল না।

সুলেখা চলে গেলে বিভাদেবী বললেন, 'এখন কি তোমার খুব কাজ আছে ?'

'কেন বলুন তো ?' জিজ্ঞাসু ভঙ্গিতে রাজেশ বলল।

বিভাদেবী বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। যদি জরুরী কাজ না থাকে, তোমাকে আমার বাসায় নিয়ে যেতাম।'

সেই বোঝাপড়াটার কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল রাজেশের। একটু ইতস্তত করে সে বলল, 'বেশ তো, যাব আপনার সঙ্গে।'

বাস থেকে রানীপুরের বাজার পাড়ায় নেমেছিল রাজেশেরা। দু'জনে পাশাপাশি চলতে শুরু করল। কিছুক্ষণ নীরবে হাঁটার পর বিভাদেবীই প্রথম কথা বললেন, 'আচ্ছা রাজু —'

রাজেশ যেন উন্মুখ হয়েই ছিল। তৎক্ষণাৎ সাড়া দিল, 'কি বলছেন ?'

'একটা ব্যাপার আমি কিন্তু কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না বাবা। তুমি হঠাৎ সুলেখাদের বাড়ি গিয়েছিলে কেন ?'

এই মহিলাটিকে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উচিত কি অনুচিত তা ভাবতে ভাবতে একসময় দ্বিধান্বিত সুরে রাজেশ বলেই ফেলল, 'বাবার খুব ইচ্ছে হয়েছে সুলেখাদেবীর সঙ্গে আমার—' এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ থামল সে।

'কার—কার বাবার ইচ্ছে ? তোমার ?' বিভাদেবী কিছুটা চকিতই যেন হয়ে উঠলেন।

'হ্যাঁ।' রাজেশ মাথা নাড়ল।

'কী ইচ্ছে তোমার বাবার ? সুলেখার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে চান নাকি ?'

'হ্যাঁ। সেই জন্যেই বাবা আমাকে একদিন ওঁদের বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন।'

তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী চোখে একবার রাজেশের পা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত দেখে নিলেন বিভাদেবী। আস্তে আস্তে বললেন, 'সুলেখাকে দেখাবার জন্যেই বুঝি তোমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন ?'

'হ্যাঁ।'

একটু চুপচাপ। তারপর শ্বাসরুদ্ধের মত বিভাদেবী বললেন, 'সুলেখাকে তোমার পছন্দ হয়েছে ?'

'সুলেখাদেবী কি পছন্দ না হবার মত মেয়ে ?' রাজেশ পাল্টা প্রশ্ন করল।

বিভাদেবী হকচকিয়ে গেলেন, 'না তা নয়—'

রাজেশ বলতে লাগল, "সব দিক থেকেই সুলেখাদেবী চমৎকার। শিক্ষিতা, মার্জিতা, সুশ্রী। তার উপর ভাল গাইতে পারেন। তবে তাঁর সঙ্গে আমার বিয়েটা ঘটে উঠবে না।'

বিভাদেবীর চোখদুটি এবার প্রদীপ্ত হয়ে উঠল যেন। উৎসাহের সুরেই তিনি বললেন, 'বিয়েটা হবে না কেন ?'

'কারণ, এ বিয়েতে সুলেখাদেবীর মত নেই, আমারও অনিচ্ছা।'

'কেন বল তো ?'

হঠাৎ যেন উত্তেজিত হয়ে উঠল রাজেশ, 'ক'দিন আগে উনি আমাকে একটা চিঠি লিখেছেন। তাতে জানিয়েছেন ভবেশ বাড়ুজ্জের ছেলে হয়ে আমি নাকি সাঙ্ঘাতিক অপরাধ করে ফেলেছি। আর সেই অপরাধে উনি আমাকে ঘেন্না করেন। যে আমাকে ঘেন্না করবে, আমার বাবাকে ঘেন্না করবে, রূপগুণের থাক তার পায়ে দাসখত লিখে তাকে বিয়ে করতে যেতে হবে -এতখানি নীচে আমি এখনও নামি নি।

বিভাদেবী চুপচাপ শুনছিলেন। বললেন, 'এ বিয়ে না হওয়াই ভাল। আমি জানি সুরেশ মনে মনে আরেকটি ছেলেকে পছন্দ করে।

সওগরম বাজার পার হয়ে বানীপুরের শহরতলীতে এসে পড়েছে দুজনে। মিউনিসিপ্যালিটির দাক্ষিণ্য অবশ্য এ পর্যন্ত এসে পড়েছে কিন্তু পরিমাণে তা ছিটেফোঁটা অনেক দূরে দূরে একেকটা টিমটিমে ল্যাম্পপোস্ট। রাস্তাগুলো কর্দমাক্ত, অসমান।

চলতে চলতে বিভাদেবী একসময় বলে উঠলেন, 'একটা কথা তোমায় বলব রাজু—'

'বলুন।' অন্যমনস্কের মত সাড়া দিল রাজেশ।

'হাসপাতালে দোলনকে তুমি বুঝি প্রায়ই দেখতে আস ?'

'না। আজ নিয়ে দু দিন মোট এসেছি।'

কি যেন একটু ভেবে বিভাদেবী বললেন, 'শুনেছি ছেলেবেলা থেকে তোমার সঙ্গে নাকি দোলনের চেনাশোনা।'

রাজেশ বলল, 'ঠিক ছেলেবেলা থেকে নয়। আমার মা যখন মারা যান তখন আমার বয়স পনের। সেই সময় থেকে দোলনদের চিনি। ওরা আমাদের পাশের বাড়িতে থাকত।'

বিভাদেবী বললেন, 'শুনেছি তুমি নাকি দোলনদের বাড়িতেও প্রায়ই যাও ?'

'ঠিকই শুনেছেন। কে বলেছে ?'

'দোলনের বাড়িতে আমার যে যাতায়াত আছে তা কি তোমার অজানা ?'

ঠিক। রাজেশের মনে পড়ল, দোলনের বাড়ির পেছন দিকে সেই ফুল-বাগানের পটে এই মহিলাকে প্রথম আবিষ্কার করেছিল সে। ওদেরই কারো মুখে তার যাওয়া-আসার খবর নিশ্চয়ই পেয়েছেন বিভাদেবী।

বিভাদেবী আবার বললেন, একটা কথা কি তুমি জান ?'

'কী ?'

'দোলনরা তোমার বাবাকে ভয়ানক ঘৃণা করে। ওদের একটা পত্রিকা

আছে, 'রানীপুর-সংবাদ'। পত্রিকাটার এমন কোন সংখ্যা নেই যাতে তোমার বাবার নামে কুৎসা রটানো হয় না। এ সব খবর তুমি রাখ?'

'রাখি।'

'তুমি কি জান, দোলনদের বাড়ির মধ্যে কে সব চাইতে বেশি ঘৃণা করে তোমার বাবাকে?'

'জানি—দোলন।'

'তোমার বাবাকে ঘৃণা করার জন্যে স্বলেখার ওপর তোমার তো খুব রাগ। একই কারণে দোলনের ওপরও তোমার অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত। শুধু অসন্তুষ্ট নয়, তার মুখ দেখাও তোমার পক্ষে পাপ। কিন্তু বাবা—'

'কী?'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বললেন না বিভাদেবী। মাঝখানের দূরত্ব কমিয়ে রাজেশের অনেকখানি কাছে চলে এলেন। তারপর ঘনিষ্ঠ হয়ে ফিস ফিস স্বরে শুরু করলেন, 'তুমি তাদের বাড়ি প্রায়ই যাও। সে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে পড়ে থাকলে তোমার দুশ্চিন্তার শেষ থাকে না। হাসপাতাল পর্যন্ত তোমাকে ছুটে আসতে হয়। কেন বল তো?'

অমনোযোগের সুযোগে রাজেশকে কখন যে দুরূহ একটি প্রশ্নের সামনে এনে বিভাদেবী দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন, খেয়াল ছিল না। চকিত, বিব্রত রাজেশ তাঁর মুখের দিকে একবার তাকাল। দেখল, স্নিগ্ধ অর্থময় একটি হাসির খেলা সেখানে চলছে।

রাজেশের মনে হল, বিরুদ্ধ পক্ষের উকিলের মত উল্টোপাল্টা কতকগুলো প্রশ্ন করে গোপন-গহন একটা খবর জেনে নিতে চাইছেন বিভাদেবী। বিভ্রান্তের মত সে শুধু বলতে পারল, 'না, মানে—'

বিভাদেবী কিছু বললেন না। তাঁর হাসি আরো স্নিগ্ধ আরো ইঙ্গিতময় হয়ে উঠল। রাজেশের মনে হল, বিভাদেবী যা জানতে চান তা বোধহয় জেনে ফেলেছেন।

একসময় নতুন পাড়ার একতলা বাড়িটায় এসে পৌঁছুল দু-জনে।

সদর দরজায় তালা লাগানো ছিল। সেটা খুলে রাজেশকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন বিভাদেবী। তারপর আসবাবের বাহুল্যহীন সেই পরিচ্ছন্ন ঘরটিতে তাকে বসিয়ে বললেন, 'তোমাকে কিছুক্ষণ একা-একা থাকতে হবে রাজেশ। আমার হাত-পা জলুনির ধাত। দু বালতি জল ঢেলে আসি গায়ে।' বলেই চলে গেলেন।

খুব বেশিক্ষণ নিঃসঙ্গ থাকতে হল না। খানিকটা পরেই মাথা মুছতে মুছতে বিভাদেবী ফিরে এলেন। বললেন, 'একটু চা করি ?'

রাজেশ বলল, 'চা-ই শুধু। আর কিছু না কিন্তু।'

বিভাদেবী কিছু বললেন না। একটু পর দেখা গেল, রাজেশের কথা তিনি রাখেন নি। চায়ের সঙ্গে ডিমের ওমলেট, টোস্ট আর বিস্কুটও সাজিয়ে দিয়েছেন।

রাজেশ আপত্তি করতে যাচ্ছিল। বিভাদেবী বললেন, 'কোন কথা নয়, যা দিয়েছি লক্ষ্মী ছেলের মত খেয়ে নাও।'

রাজেশ জানে বাঙলাদেশের মেয়েদের কাছে এ ব্যাপারে পরাজয় মানতেই হয়। নিঃশব্দে একটা বিস্কুট তুলে নিল সে।

চা খাওয়া শেষ হয়ে এলে বিভাদেবী বললেন, 'তুমি হয়তো ভাবতে পার তোমার বাবার অসুস্থ হবার আগে তোমার সঙ্গে আমার অনেকবারই তো দেখা হয়েছে তবু আমার পরিচয়টা তোমাকে দিই নি কেন ?'

রাজেশ বুঝল, শুধুমাত্র দোলন আর সুলেখা আলোচনার জন্যই হাসপাতাল থেকে তাকে ধরে আনেন নি বিভাদেবী। খুব সম্ভব তার মতই এই মহিলা একটা পরিষ্কার বোঝাপড়ায় আসতে চান।

রাজেশ বলল, 'হ্যাঁ, তা ভেবেছি বৈকি।'

বিভাদেবী বললেন, 'এবার নিশ্চয় বুঝতে পারছ, কেন পরিচয়টা দিই নি সেদিন নিতান্ত উত্তেজনার মাথায় তোমার বাবা আর আমার সম্পর্কের কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। নইলে আমার কোনদিনই ইচ্ছে ছিল না নিজের পরিচয় নিজের মুখে তোমার কাছে দিই। আমার কী ইচ্ছে ছিল জান ?'

'কী ?'

'তুমি আমার পরিচয় খুঁজে বার করবে।'

এরপর কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। এর মধ্যে জানালার বাইরে বেশ সমারোহ করেই ষষ্ঠ ঋতুর রাত নেমে এসেছে।

একসময় ফিস ফিস গলায় বিভাদেবী ডেকে উঠলেন, 'রাজু—'

রাজেশ তাকাল। বিভাদেবী বললেন, 'শুনেছি, তোমাদের সংসারে আমি আসব— সে জন্যে দশ বছর আগে অভিমান করে তুমি নাকি চলে গিয়েছিলে।'

কথাটা মিথ্যে নয়। কিন্তু জগতের সব সত্যিই কি মুখের ওপর বলা যায়? রাজেশ চুপ করে রইল।

বিভাদেবী আবার বললেন, 'বিশ্বাস কর বাবা, নিতান্ত নিরুপায় না হলে তোমাদের সংসারে আমি আসতাম না। আমার বাবা, মা, ভাই, বোন—কেউ

নেই। মামার সংসারে বোঝা হয়ে ছিলাম। বিয়ের নামে মামা তোমার বাবার কাছে তিন হাজার টাকায় আমাকে বেচে দিয়েছিল।' বলতে বলতে গাঢ় গভীর বিষাদে স্বরটা বুজে এল মহিলার।

বিভাদেবীর বিষাদ রাজেশের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছিল যেন। এবারও কিছু বলতে পারল না সে।

একটু চুপ করে থেকে বিভাদেবী বলতে লাগলেন, 'সে যাক গে। আচ্ছা রাজেশ; তোমার কি ধারণা হয়েছিল, আমি তোমাদের সংসারে এলে তোমাকে অনাদর করব।'

রাজেশ এবারও নিরুত্তর।

বিভাদেবী বলে যাচ্ছেন, 'আমার কি দুঃখ জানো বাবা,—আমাকে না দেখে না বুঝে শুধু মনগড়া একটা ভুল ধারণা নিয়েই তুমি চলে গিয়েছিলে। কিন্তু—'

'কী' এতক্ষণে মুখ খুলল রাজেশ।

'আমি আসা পর্যন্ত যদি অপেক্ষা করতে, হয়তো বুকের ভেতর অভিমান পুরে দশটা বছর সমুদ্রে তোমাকে ভেসে বেড়াতে হত না। আর আমাকেও বোধ হয় এমনি করে সংসার থেকে বেরিয়ে এসে একা একা দিন কাটাতে হত না।' বিভাদেবীর স্বর আবেগে তরঙ্গিত হতে লাগল।

রাজেশ কি বলবে ভেবে পেল না বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল শুধু।

বিভাদেবী আবার বললেন, 'তোমার জীবনের দশটা বছর অভিমানে অভিমানে নষ্ট হয়ে গেল। আর আমার দিনগুলো কাটল তোমার আশায় আশায় থেকে।'

এ কথার জবাব না দিয়ে রাজেশ বলল, 'একটা কথা কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না—'

'কী কথা বাবা?'

'বাবার সঙ্গে আপনি এক বাড়িতে থাকেন না কেন?'

হকচকিয়ে গেলেন বিভাদেবী। তারপর পরিপূর্ণ চোখে রাজেশের দিকে তাকিয়ে শান্ত মুখে বললেন, 'কেন থাকি না তা কি এখনও বুঝতে পার নি?'

'কিছু কিছু যে বুঝি নি, তা নয়।' রাজেশ বলতে লাগল, 'তবে সেটা পুরোপুরি বোঝা নয়। তাছাড়া—আমি যেটুকু বুঝেছি তার মধ্যে ভুল থেকে যেতে পারে। আমার ইচ্ছে এ ব্যাপারে আপনার মুখ থেকে ঠিক কারণটা জানব!'

হঠাৎ যেন আড়ষ্ট হয়ে গেলেন বিভাদেবী। চাপা বিপন্ন স্বরে বললেন, 'কিন্তু বাবা, তুমি যে আমাকে ভয়ানক মুশকিলে ফেলে দিলে।'

'মুশকিল !' একটু যেন অবাকই হল রাজেশ।

'নয় তো কী। তোমার বাবার সঙ্গে কেন এক বাড়িতে থাকি না, ত বলতে গেলে তাঁর বিরুদ্ধে অনেক কিছুই বলতে হয়। ছেলের কাছে স্বামী বিপক্ষে কি করে বলি !'

'কিন্তু বাবার বিরুদ্ধে যায়, এমন কথা তো আপনি আমাকে আগে বলেছেন।'

বিভাদেবী চমকে উঠলেন, 'তেমন কথা বলেছি !'

গলার স্বরে অস্বাভাবিক জোর দিয়ে রাজেশ বলল, 'নিশ্চয়ই।'

'কী বলেছি বল তো—'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলল না রাজেশ। গাঢ় গভীর ভাবনার মধ্যে কিছুক্ষণ মগ্ন থেকে একসময় আস্তে আস্তে শুরু করল, 'স্পষ্ট করে কিছু বলেন নি। তবে এমনভাবে বলেছেন যা বাবার পক্ষে আসে না।'

শ্বাসরুদ্ধের মত কিছুক্ষণ বসে রইলেন বিভাদেবী। তারপর ঝাপসা গলায় বললেন, 'বুঝতে পারছি তোমাকে তোমার বাবার সম্পত্তি নিতে বারণ করেছিলাম। দলিল রেজিস্ট্রির সময় বাধা দিয়েছিলাম এ-সব তোমারবাবার বিরুদ্ধেই যায়। কিন্তু কেন ঐ সব করেছিলাম, জানো ?'

কঠিন নীরস স্বরে রাজেশ বলল, 'একটি মাত্র কারণে। সতীনের ছেলে সুখী হবে, কোন সৎমা তা চায় বলুন ?'

মুহূর্তের জন্য বিভাদেবীর মুখ থেকে সমস্ত রক্ত সরে গেল। অনুভূতি-শূন্যের মত কতক্ষণ যে তিনি বসে রইলেন। তারপর দুহাতে মুখ ঢেকে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন, 'এ তুমি কি বললে রাজেশ! আমার স্বার্থের জন্যে তোমায় সম্পত্তি নিতে বারণ করেছিলাম ; শেষ পর্যন্ত এ-ই তুমি বুঝলে !'

আগের কথাটা রাজেশের মনের কথা নয়। তার ইচ্ছা ছিল, অতর্কিত আঘাত হেনে বিভাদেবীর মুখ থেকে গূঢ় গহন সত্যকে বার করে আনবে।

উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদছেন মহিলা। কাঁদছেন আর ভাঙা ভাঙা বিকৃত স্বরে বলছেন, 'আমার প্রাণটার দিকে একবারও তাকিয়ে দেখলে না বাবা! আমাকে একটু বুঝতেও চেষ্টা করলে না! নিজের স্বার্থেই যদি অন্ধ হব তা হলে তোমার বাবার কাছ থেকে চলে আসব কেন ? তুমি কি জানো, তোমার বাবা একদিন তাঁর সমস্ত সম্পত্তি আমাকে লিখেপড়ে দিয়েছিলেন !'

রাজেশ চমকে উঠল, 'বাবা আপনাকে সব সম্পত্তি লিখে দিয়েছিলেন ? কবে ?'

'বছর কয়েক আগে।' বিভাদেবী বলতে লাগলেন, 'তোমার যদি সন্দেহ

থাকে, রেজিস্ট্রি অফিসে খোঁজ নিয়ে দেখতে পার।'

রাজেশের সত্তার গভীর স্তরে সংশয়ের ছায়া পড়তে শুরু করেছে। অন্য-মনস্কের মত সে বলল, 'খোঁজ নেবার দরকার নেই। একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না।'

'কী ?'

'বাবা যদি তাঁর সমস্ত কিছুই আপনাকে দিয়েছিলেন, সে-সব ছেড়ে এলেন কেন ?'

'তোমাকে তো আগেই বলেছি রাজেশ, যে গ্রহণের মধ্যে গৌরব নেই তা পাপ। অত বড় পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে চলার শক্তি আমার নেই।'

'যা বলছেন স্পষ্ট করে বলুন।' নিস্তরঙ্গ ভারী গলায় রাজেশ বলল।

রাজেশের মনোভাব যেন বুঝতে পারলেন বিভাদেবী। এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন তিনি। তারপর মুখ থেকে হাত সরিয়ে সোজা রাজেশের চোখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। বললেন, 'তোমাকে একটা প্রশ্ন করি। কত দিন হল রানীপুরে ফিরেছ ?'

'তা মাসখানেকের বেশিই হবে।'

'এর মধ্যে নিশ্চয়ই টের পেয়েছ তোমার বাবার অর্থ যে পথে আসছে সেটা ন্যায় সঙ্গত পথ নয়।'

একটুক্ষণ থতিয়ে রইল রাজেশ। তারপর থেমে থেমে বলতে লাগল, 'অসৎভাবে উপার্জন করেছেন বলেই কি আপনি তাঁর সব কিছু ছেড়ে দিয়ে এসেছেন ?'

'শুধু সে জন্যেই না।' বিভাদেবী জোরে জোরে মাথা নাড়লেন।

'তবে ?'

'সে কথা এখন থাক।'

'থাকবে কেন, বলুন।' রাজেশ যেন একরকম জেদই ধরল।

দৃঢ় স্বরে বিভাদেবী বললেন, 'আজ সে কথা বলার সময় নয়।'

রাজেশ বলল, 'আপনি আর আমি যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি সেখানে দু-জনের মধ্যে কোনরকম অস্পষ্টতা থাকা ঠিক নয়। সব কিছু পরিষ্কার হলে পরস্পরকে বুঝতে আমাদের সুবিধা হবে।'

'জানি। তবু এখন আমি তা বলব না। তবে একটা কথা বলতে পারি, সমস্ত সম্পত্তি আমার হাতে তুলে দিয়ে তোমার বাবা নিজের সাঙ্ঘাতিক একটা মতলব হাসিল করতে চেয়েছিলেন। আমি তাতে রাজী হই নি। সেই জন্যেই সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে এখানে চলে আসতে হয়েছে। তুমি হয়তো জানো

না, মামার বাড়িতে থাকতেই ম্যাট্রিকটা পাশ করে ফেলেছিলাম। তারপর তোমার বাবার কছে এসে আই. এ. পাশ করেছি। তিন বছর মাত্র তাঁর সঙ্গে ছিলাম। তারপর একা একাই আছি। তোমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে জীবিকার জন্যে স্কুলে মাস্টারি নিয়েছিলাম আর পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। একে একে শেষ পর্যন্ত বি. এ. পাশ করে'ছি। বি-টি-টাও বাকি থাকে নি।'

বিভাদেবীর শেষ কথাগুলো যেন শুনতে পাচ্ছিল না রাজেশ। তার সমস্ত সত্তা চকিত হয়ে উঠেছে। আচমকা তীক্ষ্ণ স্বরে সে বলে উঠল, 'আপনি কি বলতে চান, আমাকে সম্পত্তি লিখে দিয়েও বাবা কোন একটা জঘন্য মতলব হাসিল করতে চান?'

কি যেন উত্তর দিতে গিয়ে থমকে গেলেন বিভাদেবী। একটু ইতস্তত করে দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে বললেন, 'সেটা তোমাকেই বিচার করে দেখতে হবে বাবা।' একটু থেমে আবার বললেন, 'যদি মনে কর, তোমার বাবার সঙ্গে কিছুতেই মেলাতে পারছো না, সোজা আমার কাছে চলে আসবে। আমার দরজা চিরদিনের জন্যে তোমার কাছে খোলা থাকবে। চিরদিনই তোমার জন্য আমি দু হাত বাড়িয়ে আছি রাজেশ।'

রাজেশ আর কোন প্রশ্ন করল না। শুধু তার মনে হল, একটা অসুখ ভবেশের অনেক কাছাকাছি তাকে নিয়ে গিয়েছিল। বিভাদেবী নামে এই মহিলা আবার তাকে দূরে সরিয়ে আনতে শুরু করেছেন।

এগার

ভবেশ এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। ডাক্তার বলেছেন, ইচ্ছা হলে আবার তিনি আগের মত বাইরে বেরুতে পারেন। কাজকর্মেও মন দিতে পারেন তবে খুব বেশী পরিশ্রম নিষিদ্ধ।

ডাক্তার যেই হাত-পা থেকে নিষেধের বেড়িগুলো খুলে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ভবেশও ছুটতে লাগলেন। ইদানীং তিনি কারখানায় যাচ্ছেন, রাইস মিলে যাচ্ছেন। যথারীতি রাত্রিগুলো আবার আগের মতই বাইরে কাটাতে শুরু করেছেন। তাছাড়া আরো কত জায়গায় যে ছোটাছুটি করছেন, রাজেশ অন্তত তার খোঁজ রাখে না।

দিনকয়েক পর একদিন সকালে বাড়ি ফিরে ছেলেকে নিজের ঘরে ডাকিয়ে

পাঠালেন ভবেশ। রাজেশ এলে বললেন, 'তোর সঙ্গে আমার খুব জরুরী কথা আছে রাজু—'

'বলুন—' কিছুটা নিস্পৃহ স্বরে রাজেশ বলল।

তৎক্ষণাৎ কিছু বললেন না ভবেশ। চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ কি ভেবে শুরু করলেন, 'তোর নামে সব সম্পত্তি লিখে পড়ে দিয়েছি। ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টগুলোও এখন তোর নামেই। তা ছাড়া রাইস মিল, ফ্যাক্টরি— এ-সবের মালিকও তুই। সমস্ত কিছু তোর হাতে তুলে দিয়ে সবরকম দুশ্চিন্তা আর দায়িত্ব থেকে আমি অব্যাহতি পেতে চেয়েছি।'

রাজেশ বলে উঠল, 'কিন্তু—'

বাধা দিয়ে ব্যস্তভাবে ভবেশ বললেন, 'তুই কি বলবি আমি জানি। নিশ্চয়ই বলবি, সব কিছু লিখে দিয়েও আমি কেন সেগুলো আগলে বসে আছি—এই তো?'

রাজেশ অবাক। ভবেশ যা বললেন, হুবহু সেই কথাগুলোই সে ভেবেছে।

ভবেশ আবার বলে উঠলেন, 'তোর নামে সব লিখে দেবার পর আগলে বসে থাকা আমার উচিত নয়। তবু থেকেছি একটি কারণে। ভেবেছি এতকাল পর তুই রানীপুরে ফিরলি, ক'টা দিন বিশ্রাম কর।' বলতে বলতে একটু থামলেন। কিছুক্ষণ পর আবার বললেন, 'আজ হল মঙ্গলবার। আমি ঠিক করেছি, আসছে সোমবার থেকে তোর দায়িত্ব তোকে দিয়ে দেব। আমি কিন্তু ও-সবের মধ্যে আর থাকব না। অবশ্য—তোর যদি কোথাও আটকায় আমার সঙ্গে পরামর্শ করে নিবি।'

রাজেশ এবারও কিছু বলল না।

ভবেশ থামেন নি, 'তোকে তো রাইস মিল আর কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিতে নিয়ে কাজকর্ম বুঝিয়ে দিয়েছি। সোমবারের আগে আরো একবার সে-সব বুঝিয়ে দেব। খুব একটা অসুবিধা তোর হবে না! সমস্ত কিছুই সিস্টেমের মধ্যে রয়েছে। সেটাকে শুধু চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে।'

রাজেশ এবারও নিশ্চুপ।

কি যেন চিন্তা করে ভবেশ বললেন, 'ফ্যাক্টরি আর রাইস মিল তো, তুই দেখেছিস কিন্তু আমার অন্য ব্যবসাপত্তরও আছে। সে-সব সম্বন্ধে তোকে কিছু বলাও হয় নি, দেখানোও হয় নি। রহমৎ সাহেবকে মনে আছে?'

রাজেশ মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'কয়েকদিনের মধ্যেই উনি একবার আসবেন, তোকে বর্ডারে নিয়ে গিয়ে আমাদের ব্যবসাপত্তর বুঝিয়ে দেবেন।' বলতে বলতে একটু থামলেন ভবেশ।

পরক্ষণেই আবার শুরু করলেন, 'আরেকটা কথা। একটি মহিলার সঙ্গেও আমাদের ব্যবসার কিছু সম্পর্ক আছে। তার সঙ্গেও তোর আলাপ করিয়ে দেব। তবে এখন নয়, পরে।'

'মহিলা!' রাজেশ যেন চকিত হয়ে উঠল। তার সমস্ত সত্তার ওপর অতর্কিতে একজনের ছায়া পড়ল। কার কথা বলেছেন ভবেশ! পুবের পাড়ার মক্ষিরাণী মেনকার নয় তো?

ভবেশ বললেন, 'হ্যাঁ, মহিলা--'

রুদ্ধশ্বাসে রাজেশ জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

'নাম বললে তো চিনবি না; পরে আলাপ করিয়ে দেব।'

'মহিলাটির সঙ্গে আপনার কিসের ব্যবসা?'

'আলাপ হলেই বুঝতে পারবি।'

সত্যি সত্যিই সোমবার ছেলের হাতে সমস্ত দায়িত্ব সঁপে দিলেন ভবেশ। দিয়ে বললেন, 'এবার তা হলে একটা দিন ঠিক করে ফেলি?'

রাজেশ জিজ্ঞেস করল, 'কিসের দিন?'

'সুলেখার সঙ্গে তোর বিয়ের। চৈত্র মাস শেষ হয়ে এল! ভাবছি বৈশাখের মাঝামাঝি একটা দিন ঠিক করে তোর বিয়েটা চুকিয়ে ফেলব। যোগদাবাবুরা খুব অস্থির হয়ে উঠেছেন।'

সুলেখার সেই চিঠিটা চোখের সামনে ভুলে উঠল রাজেশের। দূরে দেওয়ালের গায়ে একটা প্রকাণ্ড ওয়ালক্লকের দিকে তাকিয়ে তার হৃদস্পন্দনের শব্দ শুনতে শুনতে উচ্ছ্বাসহীন শুষ্ক স্বরে রাজেশ বলল, 'আপনি যোগদাবাবুদের 'না' বলে দিন।'

ভবেশ চমকে উঠলেন। তীক্ষ্ণ কাঁপা গলায় বললেন, 'কী বললি।'

রাজেশ আগের কথারই প্রতিধ্বনি করল, 'যোগদাবাবুদের আপনি 'না' বলে দিন।'

'সুলেখাকে কি তোর পছন্দ হয় নি?'

এই প্রশ্নটা দিনকয়েক আগে বিভাদেবীও করেছিলেন। রাজেশ বলল, 'পছন্দ-অপছন্দের প্রশ্ন নয়। এ বিয়েতে সুলেখা বা আমার, কারো ভালো হবে না।'

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছেলের কথাগুলো বিশ্লেষণ করলেন ভবেশ। বললেন, 'হঠাৎ এ ধারণা তোর হল কোথা থেকে?'

'আপনার এ প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারব না।'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে কি যেন চিন্তা করলেন ভবেশ। তারপর বললেন, 'স্নলেখার সঙ্গে কি তোর আর দেখা হয়েছিল ?'

রাজেশ বলল, 'ও কথা থাক।'

কিছুক্ষন স্তব্ধতা। তারপর ভবেশই একসময় বলে উঠলেন, 'মনে মনে তুই যে ধারণাটা করেছিস তা ভুল। না-না, আমি তোর কোন কথা শুনব না। তা ছাড়া আমার বড় আশা ছিল তোর বিয়েটা চুকিয়ে দিতে পারলে একটা মস্ত বড় কর্তব্য শেষ হয়। তারপর এ বাড়ি থেকে আমি চলে যেতে পারব।'

রাজেশ চকিত হয়ে উঠল, 'এ বাড়ি থেকে চলে যাবেন !'

ভবেশ মৃদু হাসলেন, 'হ্যাঁ।'

'কেন ?'

'আরাম-বিলাস, এ-সব আজকাল আমার একেবারেই ভাল লাগে না। জীবনের অনেকগুলো বছর তো ভোগের মধ্যেই কাটল। ভাবছি বাকি দিন ক'টা সাধারণ মানুষের মত কাটিয়ে দেব।'

রাজেশ স্তম্ভিত। ভবেশ সম্বন্ধে পূর্বাপর যেসব ধারণা সে গড়ে তুলেছিল, এক অতর্কিত ধাক্কায় তার ভিত টলে গেল। চূড়ান্ত ভোগের জীবনকে পরম বিতৃষ্ণায় পেছনে ফেলে তিনি যে কৃচ্ছ্রসাধনার ব্রত নেবেন, আর যাই হোক রাজেশ এতটা ভাবতে পারে নি। ভবেশ সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কোন মনোভাবই বোধ হয় আগে থেকে তৈরী করা যায় না। নতুন নতুন চমকে আগের ধারণাগুলিকে তিনি বিপন্ন করে তোলেন।

রাজেশ বলল, 'আপনি এ বাড়ি থেকে কোথায় যাবেন ?'

'বেশি দূরে না। এই রানীপুরেই থাকব। সে জন্যে একটা একতলা বাড়ি ভাড়া করেছি।'

'ভাড়া বাড়িতে আপনি থাকবেন !' রাজেশের স্বর কেঁপে গেল।

'ক্ষতি কি !' ভবেশ হাসলেন।

রাজেশ বলল, 'ক্ষতির কথা নয়। আমি ভাবছি—'

কথাটা আর শেষ হল না। বাধা দিয়ে ভবেশ বলে উঠলেন, 'ক'টা লোকের আর নিজস্ব বাড়ি আছে। দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ ভাড়া বাড়িতে থাকে। তারা থাকতে পারলে আমিও পারব।'

ভবেশ একেবারে উদার আর মহানুভব হয়ে গেছেন। দেশের অসংখ্য মানুষের কৃচ্ছ্রের সঙ্গে নিজেকে একাকার করে মিলিয়ে দিতে তাঁর বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। বিমূঢ় রাজেশ কোনরকমে বলতে পারল, 'কিন্তু এতকাল একভাবে থেকেছেন। এখন হঠাৎ যদি ভাড়া বাড়িতে গিয়ে ওঠেন, খুবই অসুবিধে হবে।'

'তা তো একটু হবেই। হলে কি আর করা যাবে।'

একমুহূর্ত কি ভাবল রাজেশ। তারপর বলল, 'তা ছাড়া আপনি চলে গেলে এ-বাড়িতে আমি একা একা থাকব নাকি ?'

হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন ভবেশ, 'একা থাকবি কোন দুঃখে! যাতে না থাকতে হয় সেই জন্যেই তো বলছি সুলেখার সঙ্গে বিয়েটা চুকিয়ে দিই।'

'না-না—' রাজেশ হঠাৎ চকিত হয়ে উঠল।

'খালি এক কথা, না-না—' ভবেশ বলতে লাগলেন, 'না কি হ্যাঁ তা নিয়ে তোর মাথা ঘামাতে হবে না। আমি যা ভাল বুঝব, করব।'

রাজেশ প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল। কিন্তু সে সুযোগ পাওয়া গেল না। তার আগেই ঘর থেকে ব্যস্তভাবে বেরিয়ে গেলেন ভবেশ।

বারো

সোমবার থেকে সত্যি সত্যিই শাস্ত্রের মুক্তপুরুষ হয়ে গেলেন ভবেশ। রাইস মিল এবং ফ্যাক্টরীতে যাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিলেন। তাঁর বদলে নতুন মালিক রাজেশ সে দুটো জায়গায় প্রতিদিন নিয়মিত হাজিরা দিতে লাগল। খাওয়া-দাওয়া সেরে এগারটা নাগাদ রাইস মিলে যায় রাজেশ। সেখানে ঘণ্টা তিন চারেক থেকে কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিতে আসে। সন্ধ্যে পর্যন্ত তার কাটে ফ্যাক্টরির অফিসে। তারপর বাড়ি ফেরা।

কাজকর্ম যে বিশেষ রাজেশকে করতে হয়, তা নয়! ভবেশ সব কিছু এমন সুকৌশলে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন যে কোথাও কোন জটিলতা নেই। কাজের চাকাটা মসৃণ নিয়মে অবিরাম ঘুরছেই। শুধু চলতে চলতে চাকাটার কোথাও ছন্দোপতন ঘটছে কিনা, সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

সারা দিনে রাজেশের কি আর এমন ব্যস্ততা! অভিজ্ঞ বয়স্ক কর্মচারীরা আছে, তারাই সব কিছু করে। রাজেশের কাজ শুধু দু-চারখানা চিঠি পড়া আর সই করা। এতেই অবশ্য সে সন্তুষ্ট থাকে না। কেমিক্যাল ফ্যাক্টরির মধ্যে গিয়ে শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ ছাখে। রাইস মিলের সুবিস্তৃত চত্বরে যেখানে মেয়ে আর পুরুষের সম্মিলিত দল সোনার দানার মত রাশি রাশি সিদ্ধ ধান শুকোতে দেয় সেখানে গিয়ে প্রায়ই চেয়ার নিয়ে বসে থাকে। শিশুর মত অসীম কৌতূহলে এই কর্মজগতের সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছাখে সে।

এখানকার বেশির ভাগ শ্রমিকই আদিবাসী—রাঁচী হাজারীবাগের পাহাড়ী

দিগন্ত থেকে এসেছে। প্রথম প্রথম তারা রাজেশকে ভয় পেত। রাজেশই ঠাট্টায়-গল্পে-রসিকতায় তাদের ভয় ভাঙিয়ে দিয়েছে। মালিকের মর্যাদা রেখে যতটা সম্ভব রাজেশের রসিকতায় সাড়া দেয়। বিশেষ করে মেয়ে-শ্রমিকগুলো আবার মর্যাদা টর্যাদার ধার ধারে না। মাঝে মাঝে এমন এক-একটা পরিহাস তারা করে বসে যা প্রায় আদি রসের প্রান্তঘেঁষা। শুনতে শুনতে কান গরম হয়ে ওঠে রাজেশের।

কেউ হয়তো বলে, 'কি রে ছোট মালিক, এখনও সাদী করিস নাই ?'

রাজেশ বলে 'না।'

'উমর কত হল ?'

'তিরিশ বছর।'

মেয়েটি গালে হাত দিয়ে, চোখ ঘুরিয়ে, ঘাড় বাঁকিয়ে এবার বলে, 'তিস সাল উমর হয়েছে, এখনও সাদি করিস নাই !'

রাজেশ হেসেছে, 'না !'

'হায় রামজী, তুই মরদানা তো ! ঠিকসে বোল।'

কথাটার মধ্যে অত্যন্ত স্থূল একটা ইঙ্গিত রয়েছে। সঙ্গত কারণেই চোখমুখ ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছে রাজেশের। আর চার পাশের প্রগলভা রঙ্গিনী মেয়েগুলো স্বভাবের হাসিতে উদ্দাম হয়ে উঠেছে। অতটা না হলেও পুরুষগুলো পর্যন্ত মুখ ফিরিয়ে হেসেছে।

মোটামুটি এই কর্মজগৎটা ভালই লেগেছে রাজেশের।

যাই হোক, দিনগুলো খুব একটা খারাপ কাটছে না। এদিকে সুখপ্রদ আরো একটা ঘটনা ঘটে গেছে। বিয়ের ব্যাপারে ভবেশের সঙ্গে একটা সংঘর্ষ প্রায় অনিবার্যই ছিল। কিন্তু বাথরুমে পা পিছলে হাঁটুর হাড়ে চিড় ধরিয়ে পরম বিবেচনার একটি কাজ করে বসেছে সুলেখা। তারই ফলে বিয়ের প্রসঙ্গ আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে।

দেখতে দেখতে একটা মাস কেটে গেল। পঞ্চম ঋতুর শেষাশেষি একদিন এই রানীপুরে এসেছিল রাজেশ। এখন বৈশাখ মাস পার হতে চলেছে।

এখন দিনের বেলায় বাতাসটা মরুভূমির স্মৃতিকে নিজের সর্বাঙ্গে ধরে রাখে। রাত্রি হলেই তার আরেক রূপ; তখন যেন সমুদ্রে ডুব দিয়ে সজল শীতল হয়ে আসে সে! রানীপুরের সারাদেহে যত দাহ, সমস্ত রাত ধরে সে তা জুড়িয়ে দেয়।

এদিকে রাইস মিল আর কেমিক্যাল ফ্যাক্টরির দায়িত্ব রাজেশের হাতে তুলে দেবার পর সে দুটো জায়গায় ভুলেও আর যান নি ভবেশ। তাঁর দিন কাটছিল অন্যভাবে। রাত্রিবেলাটা যথারীতি বাইরেই থাকতেন তিনি। ভোরবেলা বাড়ি ফিরে আর বেরুতেন না। সেই সন্ধ্যে পর্যন্ত নিজের ঘরখানিতে বসে শুধু পড়াশোনা করে যেতেন।

ছাত্রজীবনে অসাধারণ তীক্ষ্ণধী ছিলেন ভবেশ। কিংবদন্তী শোনা যায় প্রায় সর্বক্ষণই বইয়ের পাতায় তাঁর ধ্যানজ্ঞান সমর্পিত থাকত। কিন্তু পুবের পাড়ায় যখন আন্ রসের সন্ধান পেলেন তখন থেকেই ভবেশের কাছে পড়াশোনার জগতের দুয়ারটা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

আশ্চর্য, দীর্ঘকাল পর জীবনের প্রৌঢ় প্রহরে পৌঁছে আবার যেন তাঁকে পড়ার নেশায় পেয়েছে। ইদানীং সারাদিন ঘরের মধ্যে বসে বসে তিনি শুধু পড়েন, পড়েন আর পড়েন। মাঝে মাঝে কি সব নোটও নেন।

তন্ময় হয়ে অত কী পড়েন, জানার জন্য রাজেশের একবার কৌতূহল হয়েছিল। কথা বলার অজুহাতে কাছে গিয়ে বইগুলো দেখেও এসেছে সে। সেগুলোর অধিকাংশই দুরূহ রাজনৈতিক দর্শনের ওপর লেখা। কিছু কিছু আছে দেশ বিদেশের ইতিহাস।

রাইস মিল আর কেমিক্যাল ফ্যাক্টরি নিয়ে ব্যস্ত থাকার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে সদর হাসপাতালে দোলনকে দেখতে গেছে রাজেশ। মেয়েটা তার জন্য সর্বক্ষণই যেন তীর শানিয়ে বসে থাকে। দেখামাত্রই স্বভাবের সেই নিষ্ঠুর কৌতুকে তাকে ধরাশায়ী করতে চেয়েছে সে। এবার আক্রমণটা তার বড় বেশি তীব্র। কারণ ধানকল আর রাসায়নিক কারখানার দায়িত্ব যে রাজেশ নিয়েছে এবং সেখানে নিয়মিত যাতায়াত করছে—সে খবর দোলনের কাছে পৌঁছে গেছে।

সদর হাসপাতালেই বিভাদেবীর সঙ্গে আরো বারকয়েক দেখা হয়েছে। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রাজেশ কি-ভাবে দিন কাটাচ্ছে, ভবেশের শরীর কেমন আছে ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে গেছেন। শুধু ঐ সব প্রশ্নই, আর কিছু নয়।

বৈশাখের মাঝামাঝি একদিন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে গেল দোলন।

আর এদিকে পুরো একটা মাস মগ্ন হয়ে পড়াশোনার পর বৈশাখের শেষ দিনটিতে রাজেশকে হঠাৎ নিজের ঘরে ডাকিয়ে আনলেন ভবেশ। বললেন 'বোস, তোর সঙ্গে কথা আছে।'

রাজেশ বসলে ভবেশ আবার বললেন, 'ধানকলে কিংবা ফ্যাক্টরিতে তোর কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো ?'

'না।' রাজেশ মাথা নাড়ল।

'বেশ।' বলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন ভবেশ। তারপর বললেন, 'এবার কিন্তু আমি যাব।'

ভবেশ কী বলতে চান, বুঝতে না পেরে রাজেশ তাকাল। ঈষৎ বিমূঢ়ের মত বললে, 'কোথায় ?'

'তোকে তো সেদিনই বলেছি এই ভোগ বিলাস আমার আর ভাল লাগছে না। নিরিবিলি সাধারণভাবে থাকার জন্যে আমি একটা ছোট বাড়ি ভাড়া নিয়েছি। আমি সেখানেই যাব।'

রাজেশ কিছু বলল না।

ভবেশ আবার বললেন, 'আর সাতদিন মাত্র আমি এ বাড়িতে আছি। আজ বুধবার ; আসছে বুধবার আমি ভাড়া বাড়িতে চলে যাব।'

সত্যি সত্যিই সাতদিন পর চলে গেলেন ভবেশ। যাবার সময় বাড়িটা চেনাবার জন্য রাজেশকে সঙ্গে নিলেন।

ভবেশের নতুন ঠিকানা রানীপুরের উত্তর প্রান্তে। কিছুদিন আগে তিনি যা বলেছিলেন, অবিকল তা-ই। তার মধ্যে বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন নেই। বাড়িটা সত্যিই একতলা—অতি সাদামাঠা ; অতি সাধারণ।

ঘর মোটে তিনখানি। একটি শোবার ঘর, একটি বসবার এবং তৃতীয়টি রান্নার জন্য নির্দিষ্ট। এ-ছাড়া অবশ্য পায়খানা-বাথরুমও আছে।

শোবার ঘরখানিতে সাধারণ একটি তক্তপোশ পাতা। তার ওপর ততোধিক সাধারণ একটি বিছানা। শিয়রের কাছে কেরাসিন কাঠের বার্নিসহীন ছোট্ট টেবিল। টেবিলের ওপর অতি পুরনো একটা জার্মান টাইম পীস, কলম, একখানা হাত আয়না আর সস্তা দামের চিরুনি সাজানো। দক্ষিণের দেওয়াল ঘেঁসে কাঠের একটি আলমারি। আলমারির পাশে আলনা। আলনাটিতে মোটা লংক্লথের ক'টি পাঞ্জাবি আর মাঝারি থাপি ধুতি ঝুলছে। বসবার ঘরে একটি গোল লোহার টেবিলকে ঘিরে খানকয়েক কাঠের চেয়ার রয়েছে। আর রয়েছে আলমারি ভর্তি রাশি রাশি বই। সবই রাজনৈতিক দর্শন আর ইতিহাস সংক্রান্ত। রান্নাঘরটিও বাহুল্যবর্জিত। উনুন নেই ; একটা নতুন কেরোসিন কুকার, সিলভারের একটি হাঁড়ি, খান দুই করে এনামেলের থালা আর বাটি। আর আছে চারটি কাচের গেলাস।

আশ্চর্য, কবে যে এই নতুন ঠিকনাটিতে এ-সব কিনে ভবেশ সাজিয়ে রেখে

গেছেন, রাজেশ জানে না। সবই হয়েছে তার অজ্ঞাতসারে।

ভবেশ বললেন, 'আগে পুরনো জীবনের খোলসটা ছেড়ে আরাম করে বসি।' বলে যে গরদের পাঞ্জাবি আর দিশি কাচি ধুতি পরা ছিল সেগুলো খুলে লংক্লথের জামা এবং মোটা সুতোর কাপড় পরলেন। তারপর তক্তপোশের বিছানায় বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে তৃপ্তির একটা অব্যয় তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'আঃ!'

রাজেশ কিন্তু অতখানি উৎসাহিত হতে পারল না। খুঁত খুঁত স্বরে বলল, 'এর ভেতর আপনি থাকবেন কি করে!'

ভবেশ হাসলেন, 'ভাবিস না। ঠিক থাকতে পারব।'

'চাকর-বাকর কিছু রেখেছেন?'

'না।'

'ও-বাড়ি থেকে দু-একজনকে পাঠিয়ে দেব?'

'কোন দরকার নেই। অত আরাম চাই না বলেই তো এখানে চলে এলাম। আর তুই কিনা সেই আরামই আমার পেছনে ঠেলে দিতে চাইছিস।'

রাজেশ আবার বলল 'আপনার খাওয়া-দাওয়া—'

'নিজের হাতেই রান্না করে খাব।'

স্তম্ভিত বিস্ময়ে আরো কি বলতে যাচ্ছিল রাজেশ, তার আগেই অনেকগুলো গাড়ি বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল। সেগুলোর মধ্যে থেকে একে একে নেমে এলেন যোগদাবাবু, নিশানাথ সাহা, জামান সাহেব, রহমৎ সাহেব, হারানিধি পাল এবং রানীপুরের আরো অসংখ্য বিত্তবানের দল।

সবাই প্রায় একই সঙ্গে বাড়ির ভেতর ঢুকলেন। তারপর চারদিক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে সোল্লাসে বললেন, 'চমৎকার, চমৎকার! যেমনটি দরকার ঠিক তেমনটি করা হয়েছে।'

উল্লসিত কলরবের রেশ কিছু কমে এলে যোগদাবাবু ভবেশের দিকে তাকালেন। ধীরে ধীরে তাঁর চোখে যা যা ফুটতে লাগল সেগুলোর নাম-ভক্তি প্রশংসা, শ্রদ্ধা এবং বিস্ময়। এক সময় মুগ্ধ গলায় বললেন, 'সত্যি ভববাবু আপনার কাছে আমাদের অনেক কিছু শেখবার আছে। এ বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতেই ব্রহ্মচর্যের বেশ ধারণ করে ফেলেছেন। আমি বলছি যে জন্যে আপনার এখানে আসা তা নিশ্চয়ই সফল হবে।'

ভবেশ স্মিতমুখে বললেন, 'আপনাদের শুভেচ্ছা।'

আর পাশে দাঁড়িয়ে রাজেশ চকিত হয়ে উঠল। তবে কি জগতের দুঃখী মানুষদের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে আসার কথা, ভবেশ যা ঘোষণা করেছিলেন তা মিথ্যে? এই কৃচ্ছ্রসাধন ব্রতের পেছনে অন্য কোন অভিসন্ধি আছে?

এবার রহমৎ সাহেব সামনে এগিয়ে এলেন। সেই ভদ্রলোক—একদিন ভবেশের পিতৃত্ব নিয়ে যিনি বিশ্রী রকমের পরিহাস করেছিলেন। ঠোঁটের প্রান্তে বৈচিত্র অর্ধস্ফুট একটি হাসির রেখা টিপে ধরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ভবেশের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে চাপা গলায় বললেন, 'ভেকটা ভালই নিয়েছেন ভববাবু।'

চোখের কোণে ভবেশ হাসলেন। বললেন, 'ভেক না হলে এ দেশে কি ভিখ্ মেলে?'

'তা ঠিক—তা ঠিক—' জোরে জোরে প্রবলবেগে মাথাটাকে ডাইনে-বাঁয়ে আন্দোলিত করতে লাগলেন রহমৎ সাহেব। বলতে লাগলেন, 'অত্যন্ত খাঁটি কথা বলেছেন ভববাবু, অত্যন্ত খাঁটি কথা।'

ভবেশ এবার আর কিছু বললেন না। শুধু হাসতে লাগলেন।

রহমৎ সাহেব আরো একটু কাছে এসে চোখ কুঁচকে স্বরটাকে প্রায় অতলে নামিয়ে বললেন, 'তারপর ভববাবু, কত দিনের পরিকল্পনা?'

'মানে?' দু-চোখে প্রশ্ন ফুটল ভবেশের।

রহমৎ সাহেব বললেন, 'সারা দেশ জুড়ে পাঁচসালা পরিকল্পনা চলছে। তা আপনার এই পীর দরবেশ সাজার পালা কতদিন চলবে?'

'এক বছরের মত। আমার পরিকল্পনা একসালা।' ভবেশ হাসলেন।

'আসছে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত?'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। হঠাৎ একসময় রহমৎ সাহেবের দৃষ্টি এসে পড়ল রাজেশের ওপর। দুই হাত যুক্ত করে বললেন, 'নতুন মালিক কেমন আছেন?'

প্রথমদিন থেকেই রহমৎ সাহেবের ওপর বিরূপ হয়ে আছে রাজেশ। লোকটার কথা বলার ভঙ্গি, চোখ কোঁচকানো—সব কিছুই তার না-পছন্দ। নীরস সুরে সে বলল, 'ভালই আছি।'

পাশ থেকে ভবেশ বললেন, 'রাজুকে নিয়ে আমাদের বর্ডারের ব্যবসাটা এবার দেখিয়ে দিন।'

রহমৎ সাহেব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'ও হ্যাঁ; আমার একেবারেই খেয়াল ছিল না। অনেক আগেই নতুন মালিককে ব্যবসাপত্তর দেখানো উচিত ছিল। তা আজ কি নতুন মালিক মেহেরবানি করে আমার সঙ্গে যেতে পারবেন? দিন-কয়েক গরীবখানায় একটু তকলিফ থেকে আসবেন।'

ছেলের দিকে তাকিয়ে ভবেশ বললেন, 'কি রে, আজ যাবি?'

রাজেশ বলল, 'আজ কি করে যাব! পরশুদিন ওয়ার্কারদের হপ্তা দিতে হবে। এখনও ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলা হয় নি। তা ছাড়া নানা পার্টির

কাছ থেকে জরুরী চিঠি এসে রয়েছে। সেগুলোর উত্তর ড্রাফ্‌ট্‌ করতে হবে।'

রহমৎ সাহেবের দিকে তাকিয়ে মৃদু অর্থময় ভঙ্গিতে হাসলেন ভবেশ। প্রশংসার স্বরে বললেন, 'রাজুর রেসপন্সিবিলিটি সেন্সটা একবার দেখেছেন!'

রহমৎ সাহেব প্রশংসাটা অনুমোদন করলেন, 'তা বটে। আর দায়িত্ব বোধ থাকবেই বা না কেন? আপনারই তো ছেলে।' সুযোগ বুঝে ভবেশেরও কিঞ্চিৎ স্তুতি করে নিলেন রহমৎ সাহেব। পরক্ষণেই আবার বললেন, 'আজ যেতে না পারলে নতুন মালিক কবে যেতে পারবে?'

রাজেশ বলল, 'এক্ষুনি বলতে পারছি না। যাবার আগে আপনাকে জানাব।'

'সেই ভাল।' রহমৎ সাহেব বললেন, 'আগে থেকে খবর পেলে আমি নিজে এসে আপনাকে নিয়ে যেতে পারব।'

রাজেশ কিছু বলল না।

আরেকবার সমস্বরে স্তুতি, অভিনন্দন, শ্রদ্ধা, ভক্তি—ইত্যাদি ইত্যাদি জানিয়ে যোগদাবাবুরা একে একে চলে গেলেন। তাঁদের ভাবখানা এই ভবেশ যেন অভূতপূর্ব কিছু একটা করে বসেছেন। অভূতপূর্ব এবং মহৎ। মহৎ এবং বিস্ময়কর।

সবাই চলে গেলে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে ভবেশের দিকে তাকাল রাজেশ। তাকিয়েই রইল।

ছেলে তাঁকে বিশ্লেষণ করছে, বুঝতে পেরে উসখুস করে উঠলেন ভবেশ। বললেন, 'আমায় কি তুই কিছু বলবি রাজু?'

রাজেশ বলল, 'হ্যাঁ। আপনি সত্যি সত্যিই কি আরাম আর বিলাসের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে এখানে এসেছেন?'

'তোর কী মনে হয়?'

'আমার কী মনে হয়, সে কথা থাক। রহমৎ সাহেবরা যা বললেন তাকি সত্যি?'

'কী বললেন রহমৎ সাহেবরা?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন ভবেশ।

রাজেশ বলল, 'স্পষ্ট করে কিছু না বললেও ওদের কথা থেকে এটুকু বুঝতে পেরেছি, বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়েই আপনি এখানে এসেছেন।'

তৎক্ষণাৎ কোন উত্তর দিলেন না ভবেশ। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে দ্বিধান্বিত স্বরে বললেন, 'তা কিছু একটা মতলব নিয়ে এসেছি ঠিকই।'

'কী মতলব?'

'আজ নয় আরেক দিন বলব।' বলতে বলতেই হঠাৎ কি মনে পড়ে গেল ভবেশের। বললেন, 'ভাল কথা, তুই নিজে থেকে কোনদিন এখানে আসবি না। আমি ডেকে পাঠালে তবে আসবি।'

তেরো

রাজেশের প্রাণের কোন প্রান্তে এতটুকু স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না। সেদিন ভবেশের নতুন ঠিকানা থেকে ফিরে আসার পর অপরিসীম এক অস্বস্তি তাকে বেষ্টন করে রেখেছে।

দিনগুলো অবশ্য যথা নিয়মেই কেটে যাচ্ছে। সকালে উঠে ব্রেকফাস্ট সেরে খবরের কাগজগুলোর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতেই ন'টা সাড়ে ন'টা বেজে যায়। তারপর স্নানের পালা। তাড়াতাড়ি স্নান চুকিয়ে ভাত খেয়ে রাজেশ রাইস মিলে চলে আসে। সেখান থেকে কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিতে।

রাইস মিল আর ফ্যাক্টরি ছুটি হয়ে গেলে রাজেশের হাতে প্রচুর অবকাশ। কোন কোন দিন দোলনদের বাড়ি যায় সে। যেদিন না যায় সেদিন হয় ঘরে এসে শুয়ে থাকে নতুবা রানীপুরের রাস্তায় রাস্তায় অকারণেই ঘুরে বেড়ায়। অবশ্য আরো একটা কাজ হয়েছে তার। ধানকল আর কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে দিন দিনই ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে। মাঝে মাঝেই সে তাদের বস্তিতে যায়। কে কত মাইনে পায়, কিভাবে তাদের জীবন কাটে—সে-সব নিজের চোখে দেখে আসে।

সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হবার আগে নিজে কী ছিল রাজেশ? হেড মেকানিক—গালভরা ভারী এই বিশেষণটা অবশ্য তার নামের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিন্তু আসলে সে শ্রমিকই—জাহাজের ইঞ্জিনে উঁচুস্তরের একজন মজুর মাত্র। চাকরি জীবনে অধানস্থ শ্রমিক অর্থাৎ ডেক বয়, স্টোকার, অয়েল বয়—ইত্যাদিদের সামান্য মাইনের জন্য অভাব আর হতাশা তাকে বিচলিত করত।

জাহাজের নীচু স্তরের শ্রমিকরা যা মাইনে পায় তাতে কোন রকমে দিন চলে আর কি। সে তুলনায় ধানকল আর কারখানার শ্রমিকদের মাইনে অবর্ণনীয়। তা দিয়ে কোন রকমেই দিন চলার কথা নয়। তারা থাকে শুয়োরের খোয়াড়ের মত অন্ধকার সব বস্তিতে।

ব্যথিত রাজেশ একেক সময় ভাবে, সব কিছুর স্বত্ব যখন তার হাতে এসে গেছে তখন এই শ্রমিকদের জন্য কিছু করা উচিত। অন্তত কিছু মাইনে বাড়িয়ে

আর কোয়ার্টার তৈরী করে দিয়ে পশুর স্তর থেকে মানুষের জীবনে তাদের তুলে আনা দরকার।

দোলনদের বাড়ি যাওয়া, রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা কিম্বা শ্রমিকদের চিন্তায় ব্যথিত হওয়া—এ-সবে সময়ের কতটুকু অংশই বা কাটে! দিনের বেলা তবু কিছু কাজ আছে কিন্তু সমস্ত রাত্রির চেতনে, আর অবচেতনে, সত্তার ভেতরে আর বাইরে—সকল দিকে একটিমাত্র মুখই বার বার ছায়া ফেলে। সে মুখ ভবেশের। নিজের সবকিছু ছেড়ে দিয়ে, অপরিমিত সুখের জীবনকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে কেন—কেন এই ভদ্রলোক অমন কষ্টের মধ্যে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন ? কেন ?

অবশেষে কারণটা খুঁজে পাওয়া গেল।

একদিন রাজেশকে তার নতুন ঠিকানায় ডেকে পাঠালেন ভবেশ। রাজেশ যেতেই বললেন, 'তোর সঙ্গে আমাকে এবার একটা বোঝাপড়া করতে হবে।'

রাজেশ চকিত হয়ে উঠল।

ভবেশ বলতে লাগলেন, 'সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে আমি যে এখানে এসে কষ্ট করছি সেটা অকারণে নয়। সেদিন তুই ঠিকই ধরেছিলি, এর পেছনে আমার একটা উদ্দেশ্য আছে।'

রাজেশ উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল।

ভবেশ বললেন 'ছেলেবেলা থেকেই আমার উচ্চাশা কিছু বেশী। ইউনিভার্সিটি থেকে কোনরকমে দু-একখানা সার্টিফিকেট জোড় করতে পারলেই বেশীর ভাগ লোক কী করে ? অফিস পাড়ায় ঢুঁ মেরে মেরে একখানা দশটা পাঁচটার দাসত্ব জুটিয়ে ফেলে; সেটার পিছু পিছু এসে পড়ে সংসার। সংসারের পিছু পিছু আসে ছেলের অসুখ, স্ত্রীর সূতিকা, মেয়ের বিয়ে! কিন্তু অমন কেঁচোর মত জীবন যাপন আমার পক্ষে অসম্ভব।' বলতে বলতে একটু থামলেন। পর মুহূর্তে আবার শুরু করলেন, 'ত্যাখ রাজু, জীবনে আর্থিক সাকসেস্ আমার এসেছে। তার জোরে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছি। কিন্তু তাতেই আমি খুশী না। আমার আরো কিছু চাই।'

রুদ্ধ স্বরে রাজেশ জিজ্ঞাসা করল, 'আরো কী চান ?'

তক্তপোশে নিজের বিছানাটিতে বসে ছিলেন ভবেশ। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ঘরময় অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে একসময় ছেলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। জলজলে চোখে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আই ওয়াণ্ট পাওয়ার—'

'পাওয়ার !'

'ইয়েস্-ইয়েস, পাওয়ার'। ভবেশ বলতে লাগলেন, 'মানে ক্ষমতা—রাজনৈতিক ক্ষমতা।' তার স্বর উত্তেজনায় তরঙ্গিত হতে লাগল।

বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল রাজেশ।

ভবেশ আবার বললেন, 'অর্থ বলিস যশ বলিস, সামাজিক মর্যাদা বলিস—জগতে সব চাইতে বড় জিনিস হচ্ছে ক্ষমতা। আর যত রকমের ক্ষমতা আছে সে সবের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। সেটি হাতের মুঠোয় থাকলে পৃথিবীকে পায়ের নীচে পাওয়া যায়।'

রাজেশ তাকিয়েই আছে।

ভবেশ সমানে বলে যাচ্ছেন, 'যেমন করেই হোক, সেই ক্ষমতা আমায় পেতেই হবে। সেই জন্যই বাড়িঘর-বিলাস আরাম ছেড়ে কষ্টের পথ নিয়ে এখানে এসে উঠেছি।'

বিভ্রান্তের মত রাজেশ বলল, 'কিন্তু এখানে এলেই আপনি ক্ষমতা পেয়ে যাবেন ?'

'তাই তো মনে হয়।' ছেলের চোখের দিকে তাকিয়ে ভবেশ মুখ টিপে হাসতে লাগলেন।

রাজেশ বলল, 'আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'বেশ বুঝিয়ে দিচ্ছি।' বলে কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন ভবেশ। তারপর একসময় আস্তে আস্তে শুরু করলেন, 'এ এক বিচিত্র দেশ রাজু—বছর খানেকের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন জানিস তো ?'

'শুনেছি।'

রানীপুর কনষ্টিটিউয়েন্সি থেকে আমি এবার স্টেট অ্যাসেম্বলীতে যাবার জন্য নির্বাচনে দাঁড়াব। তোকে তো আগেই বলেছি, এখানে আমার অনেক শত্রু আছে। তারা সহজে ইলেকসনের বৈতরণী পার হতে দেবে না। আমার কিছু পয়সা হয়েছে—সে জন্য শালাদের চোখ টাটায়। আমি জানি, ইলেকসনের আগে আগে ঐ পয়সার সঙ্গে নানা রকম কুৎসা জড়িয়ে আমাকে ওরা ধরাশায়ী করে ফেলতে চাইবে। তুই তো নিজের চোখেই দেখেছিস, সম্পত্তি ঠকিয়ে নিয়েছি বলে কতকগুলো লোককে কি রকম লেলিয়ে দিয়েছিল। তবে আমিও ভব বাঁড়ুজ্জে; আমাকে কাত করা অত সোজা নয়।'

রাজেশ স্থির নিবদ্ধ দৃষ্টিতে ভবেশকে দেখতে লাগল। কিছু বলল না।

ভবেশ বলতে লাগলেন, 'সেই জন্যই বাড়িঘর জমিজমা তোর নামে লিখে দিয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে এখানে এসে উঠেছি।'

রাজেশ চমকে উঠল। তার মনে হল, মাথার মধ্যে একখানা আগুনের চাকা ঘুরতে শুরু করছে! তীক্ষ্ণ স্বরে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'এই জন্যেই—এই জন্যেই কি দশ বছর পর আমাকে রানীপুরে ফিরিয়ে এনেছেন?

প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেন ভবেশ। তারপর ব্যস্ত বিব্রতভাবে বলতে লাগলেন, 'তা কেন, তা কেন। তোকে তো ও-সব আমি দিতামই। মাঝখান থেকে আমার নিজেরও একটা কাজ হয়ে গেল।'

এবার কিছু বলল না রাজেশ। আগুনের সেই চাকাটা মাথার ভেতর ঘুরতে লাগল।

ভবেশ আবার বলে উঠলেন, 'তোকে আগেই বলেছি, এ দেশ বিচিত্র। এখানকার মানুষের মনস্তত্ত্ব আমি খুব ভাল করেই জানি। যখন তারা দেখবে রাজার ঐশ্বর্য ছেড়ে ভাঙাচোরা বাড়িতে এসে উঠেছি হাত পুড়িয়ে খাচ্ছি, কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি, তখন রানীপুরে আমার সম্বন্ধে ভক্তির বান ডেকে যাবে। যা দু-চারজন আমার এখানে আসার খবর পেয়েছে তাদের ঘরের দরজায় যদি চুপি চুপি কান পাতিস কী শুনতে পাবি জানিস? আমার সম্বন্ধে গদগদ প্রশংসার কথা। এই লোকগুলোই এক বছর পর ইলেকসনে আমার পক্ষে ভোট দিয়ে আসবে। অবশ্য এ ব্যাপারে একটা সাহায্য তোকে করতে হবে।'

রাজেশ সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

ভবেশ বলতে লাগলেন, 'তুই আমার ছেলে, আমি তোর বাবা। তোর-আমার মধ্যে যেন ভুল বোঝাবুঝি না হয়। তাই আগে থেকেই জানিয়ে রাখছি, আমি কিন্তু তোর নামে একটা কথা রটাব। লোককে বলব তুই ঠকিয়ে সব সম্পত্তি নিয়ে আমাকে বাড়ির বার করে দিয়েছিস।'

রাজেশ শিউরে উঠল। সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের সহানুভূতির আকর্ষণের জন্য কি কুৎসিত ষড়যন্ত্র! সে কী বলবে, ভেবে পেল না।

ভবেশ বললেন, 'আর রমণী ভটচায অবিনাশ গাইতিদের নিয়ে প্রায়ই তোর কাছে যাব। অবিনাশদের মনে যখন একবার সন্দেহ হয়েছে, আমি ওদের ঠকিয়ে সম্পত্তি গ্রাস করেছি তখন সেই সন্দেহটাকে কাজে লাগানো দরকার। আমি গিয়ে তোকে শাসাব, ধমকাব। আর প্রথম প্রথম তুই আমাদের তাড়িয়ে দিবি। তারপর একটু নরম হয়ে সম্পত্তি ফেরাবার ব্যাপারে স্তোক দিতে থাকবি। স্তোক দিতে দিতে একটা বছর কেটে যাবে। সম্পত্তির আশায় নির্বাচন আর বসে থাকবে না।' বলে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হয়ে গেল রাজেশ।

ভবেশ আবার বলে উঠলেন, 'আপাতত নির্দলীয় হয়ে ইলেকসন কনটেস্ট করব। একবার নির্বাচিত হতে পারলে আমাকে দলে টানবার জন্যে নানা পার্টির মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে। তখন যে পার্টিতে গেলে আমার সব চাইতে সুবিধে হবে সেখানে গিয়েই ভিড়ব তুই কি বলিস রাজু, তাই করাই তো উচিত?'

রাজেশ নিরুত্তর। শক্ত নিশ্চল একটা মূর্তির মত সে তাকিয়েই আছে।

ভবেশ আবার বললেন, 'কি রে চুপ করে রইলি যে? এ ব্যাপারে তোর কী মত?'

'আমার কোন মত নেই।' উচ্ছ্বাসহীন স্বরে রাজেশ বলল।

একটু চুপ করে থেকে ভবেশ বললেন, 'একটা বছর আমাকে এখানে থাকতে হবে। তারপর তোর কাছে ফিরতে পারব।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভবেশের মুখের দিকে তাকিয়ে রাজেশ বলল, 'ফিরে গিয়ে আবার বুঝি সম্পত্তিগুলো নিয়ে নেবেন।'

ভবেশ যেন খুবই ব্যথিত হলেন। জিভ কেটে বিষণ্ণ স্বরে বললেন, 'ছিঃ ছিঃ, আমাকেই তুই এত ছোট ভাবিস বাজু! ছিঃ!'

রাজেশ উত্তর দিল না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে গেল ভবেশের। বললেন, 'ভাল কথা, আমি কিন্তু তোর সম্বন্ধে একটা খবর পেয়েছি।'

রাজেশের স্নায়ুগুলো উৎকণ্ঠিত হল। শান্ত স্বরে সে বলল, 'কী?'

'তুই নাকি আজকাল ধানকল আর কেমিক্যাল ফ্যাক্টরির ওয়ার্কারদের সঙ্গে খুব মেলামেশা করছিস?'

'আপনাকে এ খবর কে দিলে?'

'যে-ই দিক, খবরটা সত্যি তো?'

তীক্ষ্ণ চোখে ভবেশের দিকে তাকাল রাজেশ। তার চেতনার এক দিক থেকে আরেক দিগন্ত পর্যন্ত চকিতের জন্য বিদ্যুৎ চমকে গেল। তবে কি— তার পেছনে কোন গুপ্তচর লাগিয়েছেন ভবেশ? আস্তে আস্তে দাঁতে দাঁত চেপে সে বলল, 'হ্যাঁ সত্যি।'

একটু কি ভেবে ভবেশ বললেন 'বেশি মেশামেশির দরকার কি। নষ্ট পেলে ওরা কিন্তু মাথায় উঠবে।'

প্রায় ঘণ্টা তিনেক ভবেশের সঙ্গে কাটিয়ে রাজেশ যখন রানীপুরের পথে নামল তখন তার প্রাণের ভেতর এলোমেলো অসংখ্য বিক্ষুব্ধ স্রোত বইতে শুরু

করেছে। ভবেশ সম্বন্ধে আশৈশব সে যে ঘৃণা, বিরূপতা আর অশ্রদ্ধা পোষণ করে আসছে মাঝখানের দিনকয়েক সেগুলো অনেকখানি শ্লথ হয়ে গিয়েছিল। আবার সেই ঘৃণার বিন্দুতে ফিরে যেতে শুরু করেছে রাজেশ।

চৌদ্দ

দশ বছর পর ছেলেকে রানীপুরে ফিরিয়ে আনার পেছনে ভবেশের যে গূঢ় গহন দুর্জ্ঞেয় উদ্দেশ্য ছিল, এতদিনে তা জানা গেছে। রাজেশকে তিনি ফিরিয়ে এনেছেন একটি মাত্র কারণে। এক বছরের জন্য তাকে নিজের যাবতীয় কিছুর অছি নিযুক্ত করে ভবেশ কৃচ্ছ্রসাধনের ভেক নিয়েছেন। রাজেশের মনে হয়, অছি শব্দটা যথার্থ নয়। বলা উচিত যখ।

বশংবদ আর কারুকেও তো বছর খানেকের জন্য সসাগরা পৃথিবীর মালিক করে দিতে পারতেন ভবেশ। তারপর নির্বাচনের বৈতরণী পেরুবার পর আবার সেটা ফিরিয়ে নিলেই চলত। তা না করে দশ বছর পর পলাতক ছেলেকে কেন তিনি ফিরিয়ে আনলেন?

রাজেশের ধারণা, অন্য কাককে সম্পত্তি লিখে দিলে বিশ্বাসঘাতকতার সম্ভাবনা রয়েছে। হয়তো কোনদিন আর সে-সব তিনি ফিরে পাবেন না। কিন্তু ছেলের বেলায় সে ভয় কম।

সেদিন কৃচ্ছ্রসাধক ভবেশের নতুন ঠিকনা থেকে বেরিয়ে আসার পর সমস্ত সত্তার মধ্যে বিপর্যয় শুরু হয়ে গেছে। উত্তেজনার বশে একবার তার মনে হয়েছে এই ভণ্ড কপট মানুষটার প্রকৃত স্বরূপ সে রানীপুরের বাসিন্দাদের সামনে মেলে ধরবে। পরক্ষণেই তার মনে হয়েছে, কি দরকার ওতে! তার চাইতে ভবেশের সম্পত্তি ভবেশকে ফিরিয়ে দিয়ে আবার সমুদ্রে ভেসে যাওয়াই ভাল।

কিন্তু রানীপুর থেকে রাজেশের যাওয়াও হয় নি। আবার ভবেশের স্বরূপও জানিয়ে দিতে পারে নি সে।

এখান থেকে পা বাড়াতে গিয়ে রাজেশ অনুভব করেছে কোথায় যেন শিকড়ে টান পড়েছে। মাত্র তিন চার মাস হল সে রানীপুরে ফিরেছে। এখানকার সত্তার সঙ্গে খুব গভীরভাবে নিজেকে মিশিয়েও দেয় নি। বরং বলা যায়, আলতোভাবেই রানীপুরের জীবনস্রোতের উপর ভেসে থেকেছে সে। তবু এখান থেকে চলে যাবার নামে তার প্রাণ পুরোপুরি সায় দিয়ে উঠতে পারে নি। মনে হয়েছে এই ছোট্ট সংক্ষিপ্ত নগণ্য শহর শত পাকের অসংখ্য বন্ধনে যেন তাকে জড়িয়ে ধরেছে। শুধু কি তা-ই, যাবার নামে বার বার শ্লেষবিদ্রূপময়ী

সেই মেয়েটার মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। ঠোঁটের প্রান্তে তীব্র ঝাঁজ ফেলে ঘাড় বাঁকিয়ে সে যেন ফিস ফিসিয়ে উঠেছে, 'পালিয়ে যাচ্ছ! তবে যে কথা দিয়েছিলে, তোমার বাবা যার যার সম্পত্তি ঠকিয়ে নিয়েছে, তাদের সব ফিরিয়ে দেবে! আমি আগেই জানতাম, পারবে না।' সেই মহিলাও সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। যেন বলতে চেয়েছেন 'তুমি চলে যেও না বাবা। দশ বছর তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছি—সে কি এভাবে তোমার চলে যাবার জন্যে?' নিজের অস্তিত্বের অতল থেকেও কে যেন বলে উঠেছে, 'এখনই যাবার কি হল। সেই ইলেকশন পর্যন্ত অন্তত থাকো! থেকে গেলে ভবেশের আরো অনেক খেলা দেখতে পাবে।'

নিদারুণ এক অস্বস্তি আর উত্তেজনার ভেতর দিন কাটতে লাগল রাজেশের।

এরই মধ্যে একদিন রহমৎ সাহেব এসে তাকে বর্ডারের ব্যবসা-বাণিজ্য দেখাতে নিয়ে গেলেন।

ব্যবসা-পত্তরের নমুনা দেখে রাজেশ স্তম্ভিত, বিস্মিত, হতবাক। রহমৎ সাহেবের এই ব্যবসাতে না আছে শো-রুম, না খদ্দের, না বেচাকেনা, না কিছু। দিনের বেলা কোন ব্যস্ততা কোন কাজকর্মই নেই এখানে। কিন্তু অন্ধকার যেই নামল সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত এলাকাটা জুড়ে ময়দানবের ছোঁয়া লেগে গেল যেন। কোথা থেকে লরী বোঝাই হয়ে চাল-ডাল-কাপড়-ওষুধ—সব এসে থামল সীমান্তে। সেখানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ঝোপঝাড়, চীনা ঘাস আর হোগলার জঙ্গল। একদল লোক সেই জঙ্গলের ভেতর রাত্রি নামার আশায় যেন ওত পেতেই থাকে। লরী থামতেই তারা কাঁধের উপর চালের বস্তা, ওষুধের পেটি, কাপড়ের গাঁট ফেলে বেড়ালের মত মখমল-পায়ে সীমান্তের ওপারে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যায়।

দেখে শুনে রাজেশ শিউরে উঠল, 'সর্বনাশ। এ আপনারা কি করছেন!'

রহস্যময় চোখে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন রহমৎ সাহেব। তারপর বললেন, 'কি করছি।'

'এ তো স্মাগলিং!'

কানটা রাজেশের মুখের কাছে নিয়ে এসে রহমৎ সাহেব বললেন, 'ইংরিজি শব্দ মনে হচ্ছে। ওটার মানে কী নতুন মালিক!'

রুক্ষ নীরস স্বরে রাজেশ বলল, 'মানেটা আপনি খুব ভাল করেই জানেন।'

রহমৎ সাহেব এবার আর কিছু বললেন না। মৃদু মৃদু সেই হাসির খেলাটা

তাঁর চলতেই লাগল।

রাজেশ আবার বলে উঠল, 'কিন্তু আপনারা যা করছেন দেশের পক্ষে তা তো সাঙ্ঘাতিক ক্ষতিকর। এ-সব এ্যান্টি-সোশাল কাজ। ছিঃ—ছিঃ—'

সেই নিঃশব্দ মৃদু হাসিটি রহমৎ সাহেবের ঠোঁটের প্রান্তে তেমনিভাবেই লেগে আছে। নিরীহ স্বরে তিনি বললেন, 'আমরা ব্যবসাদার মানুষ রাজেশবাবু।'

'তাতে কি।'

'যেখানে দুটো পয়সা বেশি সেখানেই মাল বেচব; এটাই তো সোজা হিসেব।'

উত্তেজিত রাজেশ বলতে যাচ্ছিল, 'তাই বলে—' বলা আর হল না। বাধা দিয়ে রহমৎ সাহেব বলে উঠলেন, 'আপনি কী বলবেন, আমি জানি। কিন্তু জাতি, দেশ—এ-সব বড় বড় কথায় আমাদের দরকার কি! সে-সব বুঝবেন নেতারা। আমাদের হিসেব সোজা। ব্যবসা করতে নেমেছি—দুটো পয়সা চাই। মামলা ফুরিয়ে গেল।'

'কিন্তু—আপনারা যে ব্যবসা করেছেন তাতে ভয়ও তো আছে।'

রহমৎ সাহেবের দু চোখে প্রশ্ন ফুটল, 'কিসের ভয়?'

'কিসের আবার, পুলিশের।'

রাজেশের কথার উত্তর না দিয়ে রহমৎ সাহেব বললেন, 'আপনাকে আমি একটা কথা বলতে চাই। কিছু মনে করবেন না যেন।'

কিছু না বলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইল রাজেশ।

রহমৎ সাহেব বললেন, 'সত্যি বলছি, আপনি ভবেশ বাঁড়ুজ্জের ছেলে হবার যোগ্য নন।'

'তার মানে!' রাজেশ চকিত হয়ে উঠল।

'মানেটা কঠিন কিছু নয়। ভববাবুর বুদ্ধির লক্ষ ভাগের এক ভাগও আপনার মধ্যে নেই। যদি থাকত অমন বোকার মত একটা কথা বলতেন না।

ভেতরে ভেতরে উষ্ণ হয়ে উঠেছিল রাজেশ। উষ্ণ এবং ক্রুদ্ধ। তার কিঞ্চিত ঝাঁঝ স্বরের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এল. 'ভববাবুর মত বুদ্ধিমান হয়ে আমার দরকার নেই। বোকার মত কি এমন কথাটা বলেছি, দয়া করে বুঝিয়ে দেবেন!'

আশ্চর্য, রহমৎ সাহেবের চরিত্রের মধ্যে উত্তেজনা-উত্তাপ-রাগ, এ জাতীয় কোন কিছুই নেই। মুখে তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই।' আপনি পুলিশের কথা

বললেন তো?' পুলিশেরা মানুষ, এ কথা মানেন তো?'

'মানি।'

রহমৎ সাহেব বললেন, 'আপনাদের শাস্ত্রে লোভ বলে একটা রিপুর কথা আছে না?'

'তাতে কি?'

'তাতে আমাদের সুবিধে হয়েছে।' কথাটা তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করুন।'

ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধের জন্য মাঝে মাঝে নানা জায়গায় আমাদের ভেট পাঠাতে হয়। রানীপুরে থেকে আপনার বাবা ভেটের ব্যবস্থা করেন। তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করে কোথায় কোথায় পুজো পাঠাতে হবে, সে ব্যবস্থা এবার থেকে আপনিই করবেন। আমি আগের মত এ-দিকটা দেখব।'

এরপর অনেকক্ষণ স্তব্ধতা।

এক সময় রাজেশ বলে উঠল, 'আচ্ছা রহমৎ সাহেব—'

'বলুন—'রহমৎ সাহেব তাকালেন।

'আমার বাবার সঙ্গে আপনার যোগাযোগটা হয়েছিল কি-ভাবে?'

তার স্বরে এমন একটা তীক্ষ্ণতা, নাকি বিদ্রূপ অথবা শ্লেষ—যা-ই হোক ছিল যাতে রহমৎ সাহেব কিছুটা হকচকিয়ে গেলেন। তারপরেই হাসতে হাসতে আকাশের দিকে আঙুল নির্দেশ করে বললেন, 'আমাদের সাধ্য কি, যোগযোগ করি। ওপরওলাই করিয়ে দিয়েছেন।'

অস্ফুটে রাজেশ বলল, 'বেশ রাজযোটকই হয়েছে।'

রহমৎ সাহেবের কান আশ্চর্য সজাগ। রাজেশের প্রায় অনুচ্চারিত কথাগুলো ঠিক ঠিক শুনে ফেলেছেন তিনি। বললেন, 'রাজযোটক! চমৎকার বলেছেন রাজেশবাবু।'

সীমান্ত থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য দেখে রানীপুরে ফেরার সময় একটা তালাবন্ধ নতুন চামড়ার স্যুটকেশ দিলেন রহমৎ সাহেব। রাজেশ বলল, 'কি ব্যাপার, এতে কী আছে?'

রহমৎ সাহেব বললেন 'দশ হাজার টাকা। গত তিন মাসে ব্যবসায়ে বিশ হাজার টাকা লাভ হয়েছে। ভববাবু আর আমার মধ্যে চুক্তি আছে লাভের আধাআধি তাঁর, বাকি আধাআধি আমার। তাঁর ভাগটা আপনার কাছেই দিয়ে দিলাম।'

'এ টাকা দিয়ে আমি কি করব! আপনি বাবাকেই দেবেন

'ভববাবু আপনাকেই দিয়ে দিতে বলেছেন।'

'কি মুশকিল!'

রহমৎ সাহেব বললেন, 'এক কাজ করুন, আপনি বরং টাকাটা নিয়ে সোজা আপনার বাবার কাছেই চলে যান। তারপর তিনি যেমন বলবেন টাকাটার সেই রকম ব্যবস্থা করবেন।'

টাকাটা নিয়ে রানীপুরে ভবেশের নতুন ঠিকানায় আসতেই তিনি বললেন, 'ব্যাঙ্কে তোর নামে একটা নতুন একাউণ্ট করে টাকাটা আপাতত রেখে দে।' বলতে বলতে কি যেন মনে পড়ল হঠাৎ। পরক্ষণেই ব্যস্তভাবে শুরু করলেন, তোর নিজের নামে একাউণ্ট করে দরকার নেই। অনেক একাউণ্টই তো 'তোর নামে আছে। সব মিলিয়ে ইনকাম ট্যাক্সের ঝামেলা বেধে যাবে। অন্য একটা নাম নিয়ে এই টাকাটা দিয়ে নতুন একাউণ্ট খুলে ফেল। আর রহমৎ সাহেব এবার থেকে যে টাকা দেবে তা নতুন একাউণ্টেই জমা করবি।'

রাজেশ কিছু না বলে বেরিয়ে পড়ল। ভিক্টোরীয় যুগের সেই ক্যাসেলটার দিকে যেতে যেতে অত্যন্ত অবসন্ন বোধ করতে লাগল সে। অবসন্ন আর বিপর্যস্ত।

সীমান্তে গিয়ে ভবেশ-চরিত্রের আরেকটা অন্ধকার দিক দেখে এসেছে সে। এই মানুষটির সমস্ত পাপার্জিত সঞ্চয়ের উত্তরাধিকার তার হাতে এসেছে—ভাবতেই কেমন যেন লাগল রাজেশের। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে রহমৎ সাহেব যে টাকাটা দেবেন তা-ও তার পাহারাতেই থাকবে। রাজেশের মনে হল, ভবেশের অন্যায়ের স্তূপ টণ টণ ওজন হয়ে তার সমস্ত বিবেকের ওপর অনড় হয়ে বসতে লাগল।

পনের

ভবেশ যা অনুমান করেছিলেন তা-ই হল। রানীপুরের সম্রাট ভোগের সিংহাসন থেকে পথের ধুলোয় নেমে এসেছেন—এ খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে খুব বেশী-দিন লাগল না। তার প্রতিক্রিয়া হতে লাগল মিশ্র ধরনের। ভবেশের এ-ভাবে, প্রায় তপোবনের জীবনে চলে আসায় এ শহরের কিছু নাগরিক সংশয়ান্বিত হয়ে উঠল। বিশেষ করে 'রানীপুর-সংবাদ' এটাকে খুব একটা উচ্চাঙ্গের চাল বলে মন্তব্য করে আপাতত মুখ বন্ধ করল। তবে সাধারণ মানুষ কিন্তু ভক্তিতে গদগদ।

এদিকে এ খবরও রটে গেছে রাজেশ নাকি প্রতারণা করে ভবেশকে পথে বসিয়েছে। শুধু তা-ই নয়। অবিনাশ-রমণদের জুটিয়ে আগের ব্যবস্থা অনুযায়ী দু-চারদিন তাকে শাসিয়েও গেছেন ভবেশ। স্তম্ভিত বিস্ময়ে রাজেশ শুধু তাকিয়ে থেকেছে আর ভেবেছে, লোকটা কত উঁচু দরের অভিনেতা!

শাসাতে শাসাতে চোখের ইশারা করেছেন ভবেশ। অর্থাৎ প্রত্যুত্তরে রাজেশ যেন তাদের হাঁকিয়ে দেয়। কিন্তু তার সমস্ত সত্তা এমনভাবে বিমূঢ় হয়ে গেছে যে হাঁকানো দূরে থাক, কিছু বলতে পর্যন্ত পারে নি। সে ভেবেই পায় নি কোন অলৌকিক প্রক্রিয়ায় প্রতারিত অবিনাশের দলকে তিনি যোগাড় করে ফেলেছেন!

যাই হোক যে দিনগুলো রাজেশের সামনে দিয়ে মিছিল করে চলেছে তারা স্বাদ-গন্ধ বর্ণহীন পানসে এবং ম্যাড়মেড়ে। শুধু ধানকল আর কেমিক্যাল ফ্যাক্টিরির শ্রমিকদের সঙ্গে যতটুকু সময় থাকা যায় ততটুকু মন্দ কাটে না।

দোলনও এখানে নেই যে তার তিক্তমধুর প্রখর সান্নিধ্য থেকে খানিকটা সজীবতা সংগ্রহ করে আনবে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর দিনকয়েক রানীপুরে থেকে শরীর সারাবার জন্য মামাবাড়ি চলে গেছে সে। মাঝে মাঝে এক-আধদিন তার মায়ের সঙ্গে গিয়ে গল্প করে এসেছে রাজেশ। কিন্তু নিয়তহাসিনী মহিলাটি ইদানীং কেমন যেন কুণ্ঠিত। খুব সম্ভব ভবেশকে প্রতারণা করার ঘটনা তাঁর প্রাণে বিপরীত প্রতিক্রিয়া করে থাকবে। বিভাদেবীর কাছে অবশ্য যাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে যেতে গিয়েও পা থমকে গেছে।

এই অবস্থায় একদিন অনেক রাত্রে রাজেশকে ডেকে পাঠালেন ভবেশ। বেশী রাত না হলে আজকাল ছেলেকে ডাকেন না তিনি। সম্ভবত তাঁর সঙ্গে রাজেশের যে বিন্দুমাত্র যোগাযোগ আছে—এ কথা লোককে মোটেই জানতে দিতে চান না।

রাজেশ এলে তিনি বললেন, 'মহা বিপদে যে পড়লাম রাজু—'

'কী হয়েছে?' রাজেন জিজ্ঞেস করল।

'সুলেখার পা তো প্রায় সেরে এল। এদিকে বিয়ে বিয়ে করে যোগদাবাবু আবার আমাকে খেয়ে ফেলতে শুরু করেছেন। অন্তত আশীর্বাদটা করে রাখবার জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু তোর তো আবার এ বিয়েতে মত নেই।'

'না, নেই।'

ওদিকে এ বিয়ে না হলে আমার পক্ষে ইলেকসান জেতা খুব কষ্টকর হয়ে উঠবে।'

'কেন ?' রাজেশ চমকে উঠল।

ভবেশ বললেন, 'বাজার পাড়ার দিকটায় যোগদাবাবুর খুব প্রভাব আছে। তিনি যাকে ভোট দিতে বলবেন ওখানকার লোক চোখ কান বুজে অন্ধের মত তাকেই দিয়ে আসবে। প্রায় হাজার আড়াই ভোট আছে ওখানে। অতগুলো ভোট হাতে থাকলে অনেকখানি নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।' এগিয়ে এসে ছেলের একখানা হাত ধরে বলতে লাগলেন, 'এখন তোর উপর সব নির্ভর করছে বাবা।'

রাজেশ স্তম্ভিত। একদিন এই ভদ্রলোক নিজের সমস্ত উত্তরাধিকার রাজেশের হাতে তুলে দিয়ে তাকে বিয়ে করিয়ে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আকুল হয়ে উঠেছিলেন ঘোষণা করেছিলেন, এই দুটো কর্তব্য শেষ হলেই বানপ্রস্থে চলে যাবেন। সম্পত্তি হস্তান্তরের উদ্দেশ্যটা আগেই জানা হয়ে গেছে। বিয়ে দেবার জন্য যে তাঁর আকুলতা সেটাও যে কত বড় মিথ্যে তা-ও এইমাত্র প্রমাণিত হল।

দশ বছর পর স্নেহের বান ডাকিয়ে ছেলেকে রানীপুরে ফিরিয়ে আনা—এর পেছনে একটিমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল ভবেশের। সেই উদ্দেশটা হল, নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তাকে দাবার ঘুটির মত ব্যবহার করা।

আস্তে আস্তে নিজের হাতখানা ভবেশের মুঠি থেকে মুক্ত করে নিল রাজেশ। নীরস রূঢ় স্বরে বলল, 'আমার পক্ষে এ বিয়ে করা একেবারে সম্ভব না।'

ভবেশ আহত হলেন। বললেন, 'কেন অমত করছিস বল্ দেখি। মেয়ে সুন্দরী, শিক্ষিতা তার ওপর যোগদাবাবু আর তাঁর স্ত্রীর এ বিয়েতে এত ইচ্ছে—'

তীক্ষ্ণ গলায় রাজেশ বলল, 'যোগদাবাবু আর তাঁর স্ত্রীর চাইতে আপনার ইচ্ছেটা কিছু কম নাকি!'

একটুক্ষণ থতিয়ে রইলেন ভবেশ। তারপর ছেলের কথাগুলো মনে মনে বিশ্লেষণ করে নিয়ে বললেন, 'ইচ্ছেটা কিছু অন্যায় নাকি। মেয়ে ভাল, সদ্বংশ। সব চাইতে বড় কথা সংসারে তোকে প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া বাপ হিসেব আমার কর্তব্য। ভাল মেয়ে যখন পেয়েই গেছি, ব্যস্ত হব না?'

অসহ্য—অসহ্য! বিয়ের ব্যাপারে ভবেশের কর্তব্যের সাফাই গাওয়া রাজেশকে প্রায় ক্ষিপ্ত করে তুলল। যেন সারাজীবন তার প্রতি সব কর্তব্যই পালন করে ফেলেছেন। শুধু বাকি আছে এই বিয়ে দেওয়াটা। রাজেশ প্রায় চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল। প্রাণপণে উত্তেজনাটাকে দমিয়ে বলল,

'আপনাকে অনেকবার বলেছি, এ বিয়ে আমি করব না। ঐ আমার শেষ কথা।'

'কিন্তু কেন? কোন একটা কারণ তো থাকা চাই।' ভবেশ এবার কিছুটা অসন্তুষ্ট।

রাজেশ সুলেখার চিঠিটার কথা একবার বলতে যাচ্ছিল। পরমুহূর্তেই তার খেয়াল হল, চিঠিটার শেষ দিকে একটা অনুরোধ ছিল, রাজেশ যেন এই যোগাযোগের কথা কারুকে না বলে। রাজেশ বলল, 'ধরুন, কোন কারণই নেই। এমনিই সুলেখাকে আমি বিয়ে করতে চাই ছি না।'

তৎক্ষণাৎ কিছু বললেন না ভবেশ। নিজের গভীরে অনেকক্ষণ মগ্ন হয়ে রইলেন। তারপর চিন্তাগ্রস্তের মত একসময় শুরু করলেন, 'তাই তো, ভারি বিপদ হল দেখছি।' বলতে বলতে হঠাৎ তাঁর মুখের ওপর দিকে বিদ্যুৎ চমকে গেল যেন। ছেলের দিকে সরাসরি তাকিয়ে সোৎসাহে এবার বললেন, 'ভাল কথা—এক কাজ করলে কেমন হয়?'

'কী কাজ?'

'সুলেখার আশীর্বাদটা না হয় এখন হয়ে থাক। যোগদাবাবুকে বলি, বিয়েটা ইলেকসানের পরে হবে। ইলেকসানটা একবার চুকে গেলে তুই বিয়ে করলে তো ভালই, নইলে আর কি করা যাবে। যে কোন একটা অজুহাতে ওটা কাটিয়ে দিতে হবে।'

অর্থাৎ আপাতত একটা বছর যোগদাবাবুকে ভবেশ চটাতে চান না। কেন না তাঁর কাঁধে চড়ে নির্বাচনের বৈতরণী অনেকখানিই পাড়ি দিতে হবে ভবেশকে। আশ্চর্যের ব্যাপার, যোগদাবাবুকে খুশি রাখার জন্য বলি হতে হবে রাজেশকে।

শিউরে ওঠে রাজেশ বলল, 'আপনার যা খুশি করতে পারেন, আমি এর মধ্যে নেই।' বলে আর অপেক্ষা করল না সে। দ্রুত গতিতে ভবেশের নতুন ঠিকানা থেকে বেরিয়ে পড়ল।

সুলেখার আশীর্বাদের কথা বলতে ভবেশ যেদিন ছেলেকে ডাকিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তারপর দু'টি সপ্তাহ পার হয়ে গেছে।

তারপর একদিন বয়ের ডাকে ঘুম ভাঙল রাজেশের। বিছানা থেকে উঠে বিরক্ত স্বরে সে প্রশ্ন করল, 'কী ব্যাপার! এত সকালে ডাকাডাকি কেন?'

বয়টা ভয়ে ভয়ে বলল, 'জী, এক আদমী আপনার সাথ মুলাকাত করতে এসেছে। বলছে, আপনার সঙ্গে কি জরুরী দরকার আছে।'

'লোকটা কে?'

'জী, আমি চিনি না।'

'কোথায় সে?'

'নীচে বসিয়ে এসেছি।'

'চল—' ঘুমের পোশাকেই নীচের তলায় চলল রাজেশ।

একতলার ড্রইং রুমে আসতেই দেখা গেল একটা লোক জড়সড় মেজেতে বসে আছে। তার মুখের দিকে তাকাতেই রাজেশ চমকে উঠল। একদিন অকালের বর্ষা মাথায় নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে বিচিত্র ঘোরের মধ্যে রানীপুরের নিষিদ্ধ ভুবনে চলে গিয়েছিল সে। সেখানে মেনকা নামে সেই মেয়েমানুষটির ঘরে এই লোকটিকে দেখা গিয়েছিল। তীক্ষ্ণ চাপা গলায় রাজেশ বলে উঠল, 'তুমি গণেশ না!'

ওদিকে লোকটাও উঠে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে রাজেশের দিকে তাকিয়ে আছে। যেন এখানে এ-বাড়িতে রাজেশকে আবিষ্কার করবে—এ প্রত্যাশা তার সুদূর কল্পনাতেও ছিল না। লোকটা ফিস ফিসিয়ে উঠল, 'হ্যাঁ বাবু, আমি গণেশই—'

'তুমি এখানে কেন?'

'আজ্ঞে, ভববাবুর ছেইলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

বিভ্রান্ত বোধ করল রাজেশ। তারপর বলল, 'আমিই ভবেশবাবুর ছেলে।'

কথাটা বিশ্বাস করতে গণেশের বেশ খানিকটা সময় লাগল যেন। তারপর বিমূঢ়ের মত সে বলল, 'আপনি!'

'কেন, তোমার কি কোন আপত্তি আছে?'

থতিয়ে গণেশ বল, 'আজ্ঞে আপত্তি থাকবে কেন! তবে কিনা—'

এবার সরাসরি দরকারের কথায় চলে এল রাজেশ। বলল, 'আমার কাছে তোমার কী দরকার?'

বিস্ময়ের রেশ এখনও কাটে নি। তার মধ্য থেকেই গণেশ বলে উঠল, 'আজ্ঞে ভববাবু আপনাকে একখানা চিঠি দিয়েছেন।'

'কই দেখি।' রাজেশ হাত বাড়াল।

মন্ত্রচালিতের মত ফতুয়ার পকেট থেকে একখানা সাদা খাম বার করে এগিয়ে দিল গণেশ। খামটা হাতে নিয়ে ছিঁড়ে চিঠি বার করল রাজেশ। তারপর পড়তে লাগল:

"স্নেহের রাজু,

পত্রবাহকের নাম গণেশ। সে তিন হাজার টাকা লইয়া যাইতেছে। এই টাকাগুলি ব্যাঙ্কে জমা দিবার প্রয়োজন নাই। তোর ঘরে যে আলমারি আছে আপাতত তার মধ্যেই রাখিয়া দিবি। ব্যাঙ্কে জমা দিলে ঝামেলা হইবে।

কোথা হইতে এ টাকা আসিল তাহা লইয়া ইনকাম ট্যাক্সওলারা চাপিয়া ধরিতে পারে।

যাহা হউক, গণেশ মাঝে মাঝেই টাকা লইয়া যাইবে। ঐ সব টাকা তোর আলমারিতে রাখিয়া দিবি। ইলেকসানের ঝঞ্ঝাট চুকিয়া গেলে আমি বাড়ি ফিরিয়া যাহা হয় করিব। ইতি—

ভবেশ।"

চিঠি পড়া শেষ হতে না হতেই দেখা গেল কোমরের কষি থেকে গাদা গাদা পাকানো নোট বার করে ফেলেছে গণেশ। সেগুলো রাজেশের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, 'এই লিন বাবু, এট্টু গুণে লেবেন।'

হাত বাড়িয়ে টাকাগুলো নিল রাজেশ কিন্তু গুণল না। অন্যমনস্কের মত বলল, 'এ-সব কিসের টাকা?'

গণেশ যেন কিছুটা অবাক। বলল, 'আপনি জানেন না!'

'না।' রাজেশ মাথা নাড়ল।

চোখ-মুখের বিচিত্র এক ভঙ্গি করে গণেশ বলল, 'এ-সব লাভের টাকা। কাঁচা-মালের ব্যাওসা করে ভববাবু আর মেনকা-মা যা—'

গণেশের কথা শেষ হবার আগেই রাজেশ বলে উঠল, 'কাঁচামাল।'

'আপনাকে তো সেদিন রাত্তিরেই বলে দিয়েছিলুম ভববাবু মেয়েমানুষের ব্যাওসা করে। আর—'

রাজেশ আর শুনতে পাচ্ছিল না। তার সমস্ত স্নায়ু যেন ঝিম ঝিম করছে। শরীরের সব রক্ত প্রচণ্ডবেগে ধমনীতে আঘাত হেনে যাচ্ছে। অবশেষে স্ত্রীলোকের ব্যবসা থেকে ভবেশের যা আয় হয় তা-ও যখের মত তাকেই পাহারা দিতে হবে।

ষোল

দেখতে দেখতে আরো ক'টা মাস কেটে গেল। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়-শ্রাবণ পার হয়ে অবশেষে ভাদ্র এসে পড়ল।

এই ভাদ্র মাসটিতে ভবেশের সঙ্গে ছোটখাটো একটা সংঘর্ষ হয়ে গেল রাজেশের। বুকের ভেতর অনেক আগে থেকেই একটু একটু করে বিস্ফোরক জমা হচ্ছিল; একটা ঘটনাকে আশ্রয় করে সেটা কিছু পরিমাণে বিদীর্ণ হল।

ব্যাপারটা এইরকম। শ্রাবণের শুরু থেকেই ধানকল আর কেমিক্যাল ফ্যাক্টরির কর্মীদের মধ্যে পুজো বোনাস নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়েছে। গত বছর ভবেশ দু-মাসের মাইনে বোনাস হিসেবে দিয়েছেন। এবার তাদের দাবী চার মাসের।

ধানকল এবং কেমিক্যাল ফ্যাক্টরির সমস্ত শ্রমিক নিয়ে একটা ইউনিয়ন আছে। ইউনিয়নের সেক্রেটারি হচ্ছে কেমিক্যাল ফ্যাক্টরির একজন টাইপিস্ট। নামসুশান্ত সেন। সবার মুখপাত্র হিসেবে রাজেশের কাছে সে-ই দরবার করে যাচ্ছে।

সুশান্ত জানিয়েছে, এই প্রতিষ্ঠানে যা লাভ তাতে নাকি বোনাস হিসেবে দু-মাসের মাইনেই নয়, অনায়াসে আট দশ মাসের পর্যন্ত দেওয়া যেতে পারে। তবে অতখানি দাবি তাদের নেই, চার মাসের মত পেলেই তারা আপাতত খুশি। রাজেশ তাকে জানিয়েছিল, হিসেবপত্র দেখে এ সম্বন্ধে পরে সে সিদ্ধান্ত নেবে।

হিসেবের খাতা দেখতে গিয়ে রাজেশের চক্ষুস্থির। এ ব্যাপারে দু রকমের খাতা আছে। একরকমের খাতায় শ্রমিক এবং ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেণ্টকে ধোঁকা দেবার জন্য লভ্যাংশ অনেক কমিয়ে দেখানো হয়। দ্বিতীয় রকমের খাতা থাকে নেপথ্যে, প্রকৃত হিসেবটা তার মধ্যেই লুকানো।

সুশান্ত অন্যায় কিছু বলে নি। আট দশ মাস কেন, আরো বেশিদিনের মাইনে বোনাস হিসেবে অক্লেশেই দেওয়া যেতে পারে। তাতে প্রতিষ্ঠানের গায়ে বিন্দুমাত্র আঁচড়ও লাগবে না।

প্রতিষ্ঠান দুটো লিমিটেড কোম্পানি। 'বোর্ড অব ডাইরেক্টার্স' একটা আছে বটে তবে ছায়া মন্ত্রিসভার মত তাদের কোন অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। ডাইরেক্টর হিসেবে কয়েকজনের নাম অবশ্যই দেখেছে রাজেশ কিন্তু সেই নামগুলোর পিছনে রক্তমাংসের কোন মানুষ আছে কিনা; সে সম্বন্ধে তার নিদারুণ সংশয় আছে। যদি তারা থাকেও কোনদিন তাদের দেখা যায় নি। অথচ প্রতিমাসে তাদের নামে মোটা মোটা অঙ্কের আলাউন্স দেওয়া হয়ে থাকে।

পরিচালকেরা থাকুক আর না-ই থাকুক, এই প্রতিষ্ঠান দুটির মূলাধারে যিনি বসে আছেন তিনি ভবেশ। সমস্ত দায়িত্ব ছেলের হাতে তুলে দিয়ে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেবার পরও ভবেশই সর্বময় ঈশ্বর। সুতরাং বোনাসের প্রশ্ন নিয়ে একদিন রাত্রে তার সঙ্গে দেখা করল সে।

সব শুনে ভবেশ প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কি সর্বনাশ, চার মাসের বোনাস

কোথা থেকে দেব!'

দৃঢ় স্বরে রাজেশ বলল, 'কিন্তু দেওয়া তো যায়। আমি হিসেবের খাতা দেখেছি।'

তীক্ষ্ণ স্থির দৃষ্টিতে ছেলের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিলেন ভবেশ। জোরে জোরে প্রবলবেগে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'দিতে পারলেই দিতে হবে নাকি?'

'দিতে না-ই বা হবে কেন?'

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন না ভবেশ। একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'একটা ব্যাপারে আমার কিন্তু খুব সন্দেহ হচ্ছে রাজু—'

'কী ব্যাপারে?'

'সত্যি সত্যিই তুই প্রতিষ্ঠান দুটোর মালিক, না ওয়ার্কারদের রিপ্রেজেন্টেটিভ!'

'এ কথা বলছেন যে?'

'এমনি এমনি বলছি না। ওয়ার্কারদের হয়ে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে দেখে বলছি।'

রাজেশ বোঝাবার চেষ্টা করল, 'যুদ্ধের ব্যাপার নয়। যে লোকগুলো আমাদের কাছে কাজ করছে তাদের যদি দুটো পয়সা বেশি দিই-ই, কী এমন ক্ষতি হয়!'

ভবেশ বললেন, 'তুই একেবারে ছেলেমানুষ রাজু। দু-মাসের মাইনে বেশী দেওয়া খুব বড় কথা নয়। কিন্তু অন্য দিকগুলো যদি দেখতিস—'

'কোন দিকগুলো?'

'এবার যদি ওদের দাবী অনুযায়ী চারমাসের বোনাস দিই, আসছে বছর ছ'মাসের চাইবে ওরা। তার পরের বছর আটমাসের। এইভাবে দিন দিন ওদের চাওয়াটা কোথায় গিয়ে ঠেকবে ভাবতে পারিস? তা ছাড়া 'দু মাসের মত বোনাস দেবার ব্যবস্থা করে খাতায় লাভের হিসেব করা হয়েছে; আর ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টকে তা দেখানোও হয়েছে। এখন যদি চারমাসের বোনাস দিতে যাই, বিপদটা কিরকম হবে চিন্তা করতে পারিস?'

রাজেশ অবুঝের মত বলল, 'এ বছরটা ওদের দাবি মেনে নিন। ক'টা তো মোটে টাকা।'

'না; কিছুতেই না।'

'শুনুন—এই দাবীটুকু মেনে নিলে ওয়ার্কারদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অনেক ভাল হয়ে যাবে।'

কি একটু ভেবে ভবেশ বললেন, 'আচ্ছা, বোনাস বোনাস করে সব চাইতে বেশি মাতামাতি কে করছে ? দলের পাণ্ডাটা কে ?'

রাজেশ বলল, 'সুশান্ত সেন।'

'এক কাজ কর। সুশান্তকে বাড়িতে ডাকিয়ে হাজার খানেক টাকা ওর হাতে গুঁজে দে। সুশান্ত যেন ওয়ার্কারদের জানিয়ে দেয়, হিসেবপত্তর সব দেখে গেছে সে। দু-মাসের বেশি বোনাস দেওয়ার ক্ষমতা কোম্পানির নেই। দেখবি সব গোলমাল থেমে গেছে।'

'আমার দ্বারা ও সব হবে না। চার মাসের বোনাস ওদের দিতে হবে। আমি সেই মত ব্যবস্থা করব।'

ভবেশ এবার যেন হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, 'টাকাগুলো নষ্ট করবি বলেই কি তোর হাতে আমার সব কিছু তুলে দিয়েছিলাম !'

রাজেশও উত্তেজিত। বলল, 'তবে কি যখের মতো আগলাবার জন্যে দিয়েছিলেন ! বেশ, আপনার সবকিছু ফিরিয়ে নিন। ওতে আমার কোন প্রয়োজন নেই।'

ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন অনুমান করলেন ভবেশ। সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র রূপান্তর ঘটে গেল তাঁর। স্বরটা শীর্ষবিন্দু থেকে ঝপ করে অতল খাদে নেমে গেল যেন। কাছে এসে রাজেশের পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'শুধু শুধু রাগ করছিস কেন বাবা। দুটো পয়সা যদি থাকে, কাদের থাকবে ? আমাদেরই তো।'

রাজেশ উত্তর দিল না।

সেদিন রাতে ভবেশের তপোবন থেকে বেরিয়ে আসার পর রাজেশ বার বার প্রতিজ্ঞা করল, শ্রমিকদের চার মাসের বোনাস সে দেবে, নিশ্চয়ই দেবে। কিন্তু দিতে গিয়ে দেখল অস্তিত্বের কোন নিভৃত থেকে ভবেশ যেন কঠিন নিঃশব্দ ভ্রূকুটিতে তাকে বিদ্ধ করছেন আর বলছেন, 'কার টাকা দিচ্ছিস তুই ! কার টাকায় দাতা সাজছিস !' সুতরাং বার বার প্রতিজ্ঞাটা তাকে ভঙ্গ করতে হল।

হঠাৎ অত্যন্ত অবসন্ন বোধ করতে লাগল রাজেশ।

সতের

পুজোর থেকেই রানীপুর জুড়ে নির্বাচনী প্রচার শুরু হল।

সাধারণ নির্বাচনের আর ক'মাসই বা বাকি ! সুতরাং জনসভা, বক্তৃতা,

শ্লোগান আর পোস্টার—এই চতুরঙ্গে সজ্জিত হতে লাগলেন ভবেশ। শুধু এতেই সন্তুষ্ট থাকলেন না। সুলেখাকে আশীর্বাদ না করেও কি মন্ত্রে যে যোগদারবাবুকে বশীভূত রেখেছেন, তিনিই জানেন। যোগদাবাবু রানীপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। তাঁকে দিয়ে অনায়াসেই নিজের নির্বাচনী এলাকায় কাজ শুরু করে দিলেন। যে রাস্তাগুলো ছিল কুমীরের পিঠের মত খোয়া-ওঠা, যেখানে চলতে গেলে ঠোকর লেগে পতন অবধারিত সে সব জায়গায় মসৃণ পীচের মলাট পড়ল। যেখানে কোনদিন আলো জ্বলত না সেখানে হঠাৎ সারি সারি টিউব লাইটের ঢল নামল।

নিশানাথ সাহা, জামানসাহেব, যোগদাবাবু, হারানিধি পাল—রানীপুরের তাবৎ ব্যবসায়ী, আর অনুগৃহীত মানুষের দল জনবলে, অর্থবলে ভবেশকে সাহায্য করে যাচ্ছেন। তাঁরা জানেন, একবার নির্বাচিত হতে পারলে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভবেশ বিধান সভায় সাধারণ একজন সদস্য হয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন না। ছলে-বলে-কৌশলে, যেভাবেই হোক রাজনৈতিক ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছুতে চেষ্টা করবেন। তাতে তাঁদেরই সুবিধে।

প্রায় প্রতিদিনই ইদানীং মীটিঙ করে যাচ্ছেন ভবেশ। কৌতূহলের বশে এ-রকম দু-একটা মীটিঙে লুকিয়ে লুকিয়ে রাজেশ গেছে।

ভবেশের সভায় লোক জমায়েত বেশ ভালই হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার, সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা সম্বন্ধে বিগলিত হয়ে আবেগরুদ্ধ স্বরে ভবেশ যখন বক্তৃতা দেন চারদিক থেকে হাততালির ধুম পড়ে যায়। ভবেশ বলেন, তিনি দীন জনসেবক হয়ে জীবনের অবশিষ্ট দিন ক'টা কাটিয়ে দিতে চান। রানীপুরের মানুষ যদি তাঁকে নির্বাচিত করে সেবার সুযোগ দেন, তিনি কৃতজ্ঞ থাকবেন।

ভবেশ যে গর্ব করে একদিন বলেছিলেন, এ দেশের মনস্তত্ত্ব খুব ভাল করেই তিনি জানেন—তা মিথ্যে বলেন নি। মীটিঙের ভিড়ে শ্রোতাদের বলতে শুনেছে, 'ভব বাঁড়ুজ্যে একেবারে বদলে গেছে রে। কেমন বাবু ছিল, এখন ময়লা জামা ময়লা জামাই সই। কাপড়ের খুঁটটা ছাখ, কেমন ছেঁড়া।' আরেকজন বলেছে 'কার যে কখন মতিগতি ফেরে।' অন্য একজন বলেছে, 'আমাদের পাড়ার রাস্তাগুলো কতকাল ধরেই তো খোয়া উঠে দাঁত বার করে ছিল। ভব বাঁড়ুজ্যে মিউনিসিপ্যালিটির কান ধরে সেগুলোর ছিরি ফিরিয়ে দিয়েছে। আগে কোন দিন রাস্তায় একটা আলো জ্বলত! এখন ছাখো গে, আলোর এমন তেজ যে রাত্তিরবেলা রাস্তা থেকে ছুঁচটা পর্যন্ত খুঁটে তুলতে পারবে।' চতুর্থ একজন বলেছে, 'লোকটা যে শক্তিমান তার মধ্যে তো কোন সন্দেহ নেই। ওকে ভোট দিলে দেখো কাজ আদায় হবে।'

ভবেশ যে এলাকা থেকে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সেখানে প্রার্থী দিয়েছে। তাদের প্রচারও পুরোদমে চলছে। এদের মধ্যে একটি দলের প্রার্থী একজন অধ্যাপক—বয়সে তরুণ, কলকাতার একটি কলেজে অর্থনীতি পড়ান, নাম চিরঞ্জীব মজুমদার।

ভবেশের বিরুদ্ধে যে ক'জন প্রার্থী দাঁড়িয়েছে তাদের মধ্যে চিরঞ্জীবই সব চাইতে উজ্জ্বল, সব চাইতে প্রদীপ্ত। ভদ্রলোক চমৎকার বক্তৃতা করতে পারেন। তা ছাড়া রানীপুরের সমস্ত যৌবরাজ্য দোলনের নেতৃত্বে তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। (ইতিমধ্যে শরীর সারিয়ে মামাবাড়ি থেকে ফিরে এসেছে দোলন।)

অনেক প্রার্থী থাকলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতাটা শেষ পর্যন্ত ভবেশ আর চিরঞ্জীবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে বলে মনে হয়। অবশ্য ভবেশের জয় যে সুনিশ্চিত সে সম্পর্কে সন্দেহের বোধ হয় অবকাশ নেই।

ভবেশের বিপক্ষে যারা দাঁড়িয়েছে, তাদের প্রত্যেকের বিশেষ করে চিরঞ্জীবের মীটিংগুলোও দু-চারদিন চুপিসারে গেছে রাজেশ। নির্বাচিত হলে প্রতিটি প্রার্থীই, বিশেষত চিরঞ্জীব রানীপুরের বাসিন্দাদের কোন স্বর্গরাজ্যে পৌঁছে দেবে তার চমকপ্রদ একটা ছবি এঁকে অবশেষে ভবেশকে নিয়ে পড়েছে। ভবেশই যে প্রার্থীদের মধ্যে সব চাইতে প্রবল, এ ব্যাপারে তারা সবাই সচেতন। ভবেশের নামে কুৎসার কালি ছিটিয়ে তার কিছু ভোট ভাঙাতে পারলেই যেন সবাই সন্তুষ্ট।

আঠার

রাজেশের দিনগুলো একইভাবে কেটে যাচ্ছিল। ঠিক একভাবে নয়, তার অস্থিরতা আরো বেড়েছে। সেটা অকারণে নয়। শ্রমিকদের চার মাসের বোনাস দিতে না পারার জন্য তার প্রাণে ক্ষোভ তো ছিলই। ইদানীং প্রায় প্রতি সপ্তাহেই রহমৎ সাহেব রাশি রাশি নোট দিয়ে যাচ্ছেন। আর প্রত্যহ সকালে একবার করে আসছে গণেশ। সে-ও টাকা নিয়ে আসছে; অজস্র অপরিমিত টাকা।

সারারাত আজকাল ঘুমোতে পারে না রাজেশ। শিয়রের কাছে আলমারি বোঝাই যে টাকাগুলো আছে সেগুলো তার সমস্ত সত্তাকে সর্বক্ষণ কণ্টকিত করে রাখে। রাজেশের মনে হয়, ওগুলো টাকা নয়—শত শত লাঞ্ছিত তরুণীর অভিশাপ। তাদের মৃত্যুর শর্ত ওগুলোর গায়ে অদৃশ্য হরফে যেন লেখা আছে। এ ঘরে শুয়ে যেই একটু চোখ বুজে আসে, সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়,

আলমারির ভেতর থেকে অসংখ্য অশরীরী আত্মা বেরিয়ে এসে ফিস ফিস শুরু করে দেয়। তারা যেন গুঙিয়ে গুঙিয়ে কাঁদে, শাসায় আর বলে, 'তোমার বাবাকে আমরা ধরতে পারি নি ; তোমাকে পেয়েছি। তুমি তার সমস্ত অন্যায়ের অংশী, তোমাকে আমরা ছাড়ব না।'

এর মধ্যে একদিন একটা সাঙ্ঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটল।

দিনটা রবিবার। আজ রাইস মিল আর কেমিকাল ফ্যাক্টরি ছুটি। কাজেই রাজেশকে বেরুতে হয় নি। দুপুর বেলা খাওয়া-দাওয়ার পর দক্ষিণের জানালায় দাঁড়িয়ে শূন্য দৃষ্টিতে অবাধ দিগন্তের দিকে তাকিয়ে ছিল সে। হঠাৎ বয় এসে খবর দিল, গণেশ এসেছে।

এ বাড়িতে প্রতিদিন একবার করে গণেশের হাজিরা দেওয়া একবারে নিয়মিত ব্যাপার। নীচে এসে রাজেশ হতবাক। আকণ্ঠ উদ্বেগ আর ভয় নিয়ে গণেশ জড়সড় হয়ে আছে।

রাজেশকে দেখামাত্র গণেশ ছুটে এল। সন্ত্রস্ত চাপা গলায় বলল, 'সর্ব্বোনাশ হয়ে গেছে বাবু। শিগ্‌গির চলুন আমার সন্‌গে।'

বিমূঢ়ের মত রাজেশ বলল, 'কোথায় ?'

'মেনকা-মা'র কাছে।'

'কোথায় বললে ?'

'আজ্ঞে আমরা যেখেনে থাকি।'

'তার মানে ঐ নরকে !'

'তা আপনি যা বলেন, যেতে কিন্তুক হবেই।' গণেশ বলতে লাগল, 'মেনকা-মা পেরথম আমায় ভববাবুর কাছেই পাঠিয়েছিল। তা ভববাবুকে কুথাও পেলম নি। তাই মেনকা-মা আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে বললে।'

রাজেশের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। নিষ্ঠুর গলায় সে বলল, 'ঐ বেশ্যাপাড়ায় যেতে বলছিস হারামজাদা ; জুতিয়ে গাল ছিঁড়ে দেব।'

'জুতোটুতোগুলো পরে মারবেন ; আগে চলুন তো।'

'কেন যাব ?'

হঠাৎ গলাটা আরো খাদে নামিয়ে দিল গণেশ। বলল, 'খুব মুশকিল বাবু ; গিয়ে এট্টা ব্যবস্থা না করলে আপনি, আমি, ভববাবু, মেনকা-মা—সবাই বিপদে পড়ে যাব।'

বিপদের কথায় চকিত হল রাজেশ। কি একটু ভেবে বলল, 'আচ্ছা চল—'

পুবের পাড়ায় সেই দোতলা বাড়িটায় আসতেই সবিস্ময়ে মেনকা বলল, 'এ কি আপনি !'

পাশ থেকে রাজেশের হয়ে গণেশই জবাব দিল, 'উনিই ভববাবুর ছেইলে রাজেশবাবু।'

রাজেশকে ভবেশের ছেলে হিসেবে আবিষ্কার করার মধ্যে যে বিস্ময় সেটা কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। অপরিসীম এক উদ্বেগ আগে থেকেই মেনকাকে

বেষ্টন করে ছিল। সেটাই এবার ফুটে বেরুল।

মেনকা বলল, 'মহা বিপদ হয়েছে রাজেশবাবু। আপনার বাবাকে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত আপনাকেই ডাকিয়ে আনিয়েছি। আমার একেবারে মাথার ঠিক নেই।'

'কী হয়েছে?'

'একটি মেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।'

রাজেশের মাথা টলতে শুরু করেছে। তালু শুকিয়ে একরাশ থরথরে ধারালো বালির মত হয়ে উঠেছে। সারা শরীর বেয়ে ঘামের স্রোত নেমেছে। ঝাপসা গলায় সে বলল, 'আমি কী করব?'

'একটা উপায় ঠিক করুন। পুলিশ এসে যখন জেরা শুরু করবে, কেন মেয়েটা মরল, কী হয়েছিল, তখন কী বলতে হবে আগে থেকেই সব ঠিক করে রাখতে হবে। চলুন, মেয়েটাকে আগে দেখে আসবেন।'

'না-না, আমাকে এর ভেতর জড়াবেন না। কিছুই ভাবতে পারছি না আমি।'

মেনকা এবার ভেংচে উঠল, 'জড়াবেন না! কেন জড়াব না? রোজ রোজ লাভের বখরাটা তো ঠিক নিচ্ছেন আর হাঙ্গামা পোয়াবার বেলায় শুধু আমি। তা হবে না।'

রাজেশ চমকে উঠল। মেনকা তাকে ভেবেছে কি! নিতান্ত অনিচ্ছায় এবং বিবেকের বিরুদ্ধে ভবেশের লভ্যাংশ সে হাত পেতে নেয় বটে, তাই বলে মেয়েমানুষের ব্যবসায় সে অংশীদার নয়। এর সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই তার। কথাগুলো বলতে গিয়েও থমকে গেল রাজেশ। কোন রকমে গোঙানির মত শব্দ করে শুধু বলতে পারল, 'আমার মাথা ভীষণ ঘুরছে, আমাকে ছেড়ে দিন দয়া করে। আপনার পায়ে পড়ি, মুক্তি দিন।'

একদৃষ্টে রাজেশের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মেনকা বলল, 'আপনি খুব দুর্বল লোক. ভববাবুর ছেলে হবার উপযুক্ত নন।'

ভবেশের ছেলে হবার কোন যোগ্যতা যে রাজেশের নেই —এই কথা বলে আরেকজনও ধিক্কার দিয়েছিলেন। তিনি রহমৎ সাহেব। এই মুহূর্তে তাঁর মুখটা মনে পড়ে গেল রাজেশের।

মেনকা আবার বলে উঠল, 'আপনি যান। আপনার মত দুর্বল লোককে দিয়ে আমার কাজ হবে না। যেখান থেকে হোক ভববাবুকে খুঁজে বার করতে চেষ্টা করি। ওঁকে পেলেই সব সুরাহা হয়ে যাবে।'

মুক্তি পাওয়া মাত্র আর অপেক্ষা করল না রাজেশ। ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাতক হল।

উনিশ

মেনকার বাড়ি থেকে বেরিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত টলতে টলতে এগিয়ে চলেছে

রাজেশ।

রানীপুরের রাস্তায় মোটর-রিক্সা-মানুষের স্রোত, দু-পাশের বাড়িঘর—কিছুই যেন দেখতে পাচ্ছে না। সত্তার গভীরে একটি শব্দই বার বার প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—আত্মহত্যা! আত্মহত্যা! আত্মহত্যা!

কিন্তু আত্মহত্যাই কি! রাজেশের অস্তিত্বের অতল থেকে কে যেন চিৎকার করে উঠল, না-না, এ স্বেচ্ছামৃত্যু নয়, এ হত্যা—নির্মম নিষ্ঠুরভাবে একটি জীবনের অবসান ঘটানো।

এই মৃত্যুর জন্য কে দায়ী? রাজেশের মনে হল, তার চেতনা আর অবচেতনার সকল দিক থেকে হাজার হাজার হাত ভবেশের দিকে উত্থিত হয়েছে।

চলতে চলতে কখন যে পুবের পাড়া পার হয়ে বাজার পাড়া ডাইনে ফেলে রানীপুরের পশ্চিমগামিনী রাস্তাটার পাশে এসে পড়েছিল, রাজেশের খেয়াল নেই। হঠাৎ লাউডস্পীকারের শব্দে চকিত হয়ে উঠল সে।

রাস্তাটার পাশে ইতস্ততঃ বাড়িঘরের মাঝখানে খানিকটা ফাঁকা মাঠ। সেখানে মীটিঙ চলছে। হাজার তিনেক শ্রোতার সামনে আবেগময় উদ্দীপ্ত কণ্ঠে জনৈক বক্তা কোন প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।

রাজেশ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মঞ্চের দিকে চোখ পড়তেই সে দেখতে পেল, অনেকের মধ্যে দোলন, সুলেখা (তার পা ইতিমধ্যে ভাল হয়ে গেছে) আর চিরঞ্জীব বসে আছে! আগে আরো দু-একটা সভায় চিরঞ্জীবকে দেখেছে তাই তাঁর মুখটা রাজেশের চেনা।

তা হলে চিরঞ্জীবের স্বপক্ষেই নির্বাচনী সভা চলছে!

যে লোকটি বক্তৃতা দিচ্ছিল তার পালা শেষ হয়েছে। শ্রোতাদের হাত তালির রেশ থামতে না থামতেই দোলন মাইকের সামনে এসে দাঁড়াল।

চিরঞ্জীবকে নির্বাচিত করলে রানীপুরের নাগরিকরা কতখানি সুখ-সুবিধ পাবে সে-সম্বন্ধে কিছু বিবরণ পেশ করে অবশেষে ভবেশকে নিয়ে পড়ল দোলন। ভবেশের মত মানুষ যে সারা জীবন প্রতারণা করে রানীপুরের অসংখ্য মানুষকে পথে বসিয়েছে, যার জন্য তার নিজের পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে, শহরের দুর্নীতি-পরায়ণ সমস্ত লোকের যে মধ্যমণি, একজীবনে যে গণিকালয়ে পড়ে থাকত—এমন মানুষ জনসাধারণের প্রতিনিধি হবার যোগ্য নয়। দোলন আরও বলছে 'ভবেশ বাঁড়ুজ্জে আজ ব্রহ্মচারী সেজে আপনাদের বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করছে। আপনাদের সে বুঝিয়েছে তার ছেলে তাকে সর্বস্বান্ত করে পথে বসিয়েছে। সব ধোঁকাবাজি, সব আপনাদের বিপথে চালাবার জন্য মস্ত বড় একটা চাল। ছেলে পথে বসালেই কাকেও জনসেবায় নামতে হয়—এমন কথা আমরা শুনিনি। আর নামলেও জনসেবার নানা দিক আছে। সে সব দিকে না গিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার এই চেষ্টা কেন? নিশ্চয়ই এর পেছনে লোকটির মারাত্মক অভিসন্ধি আছে। তা ছাড়া আমার বিশ্বাস, ছেলে তাকে পথে বসায় নি। তার ছেলেকে আমি চিনি। ভবেশ বাঁড়ুজ্জের মত ধূর্ত শয়তানকে পথে

বসাতে হলে যত বড় শয়তান হওয়া দরকার তার ছেলের পক্ষে এক জীবনে, এক জীবনে কেন, দশ জীবনেও তা হওয়া সম্ভব না। যে মানুষের সারাটা জীবন শুধু কালিমাখা, তাকে ভোট দিয়ে নিজেদের প্রতিধ্বনি করা যায় কিনা, তা আপনাদেরই বিবেচনা করতে হবে।'

চিরঞ্জীবের নির্বাচনী সভায় আরো দু-একবার গেছে রাজেশ! এইবার ছাড়া দোলনের বক্তৃতা আগে আর শোনে নি। শুনে সে হতাশই হল।

রাজেশের ধারণা ছিল, ভবেশ-চরিত্রের সকল অন্ধকার দিকই দোলনের নখ-দর্পণে। কিন্তু তা তো নয়। রাজেশকে নিজের সম্পত্তির অছি খাড়া করার কথাটাই যা ঠিক বলেছে সে। সীমান্তের ব্যবসা থেকে শুরু করে মেনকার ধরে সেই আত্মহত্যা পর্যন্ত যে বিস্তৃত অন্ধকার পশ্চাৎপট ভবেশকে ঘিরে রয়েছে তার বিন্দুমাত্র খবরই রাখে না মেয়েট। পরিবার ধ্বংস করা, লাম্পট্য, প্রতারণা—এগুলোকেই ব্রহ্মাস্ত্র ভেবে বসেছে দোলন। কিন্তু ভবেশ যেভাবে দুর্গ সাজিয়ে বসেছেন তাতে অস্ত্রগুলো তাঁর গায়ে সামান্য আঁচড়ও কাটতে পারবে কিনা সন্দেহ।

সেই মেয়েটির আত্মহত্যা রাজেশের সমস্ত সত্তাকে আগে থাকতেই আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। দোলনের বক্তৃতা শেষ হতেই মঞ্চের দিকে ছুটে গেল রাজেশ। কাছে এসে ডাকল, 'দোলন—'

ডাকটা কানে যেতে মুখ ফেরাল দোলন। সঙ্গে সঙ্গে অপরিসীম বিরক্তিতে তার চোখ কুঁচকে গেল। তীক্ষ্ণ নীরস স্বরে সে বলল, 'তুমি এখানে! বাপের হয়ে চরগিরি করতে এসেছ!'

রাজেশ বলল, 'আমার সঙ্গে একটু এসো।'

'এখন আমি যেতে পারব না, কাজ আছে।'

'আমার দরকারটাও খুব জরুরী। এসো।'

এবার আরো কর্কশ আরো রুক্ষ হয়ে উঠল দোলন, 'তোমার দরকার কী আমি জানি। অনুগ্রহ করে এখন আমাকে বিরক্ত না করলেই বাধিত হব। তুমি যেতে পার।'

মুহূর্তের জন্য মুখটা রক্তবর্ণ হয়ে উঠল রাজেশের। পরক্ষণেই সমস্ত অপমান অগ্রাহ্য করে সে বলে উঠল, 'এখন যদি না আসো পরে আপসোস করতে হবে।'

পরিস্থিতিটা প্রীতিকর নয়। চারপাশের লোক তাকিয়ে আছে এবং তাদের কথা শুনছে। খুব সম্ভব উপভোগও করছে। কি একটু ভেবে দোলন নেমে এল। বলল, 'তাড়াতাড়ি রাজকার্যটা সেরে ফেল।'

'এখানে নয়।'

'তবে আবার কোথায়?'

'কোথাও গিয়ে একটু বসতে হবে।'

দাঁতে দাঁত চেপে দোলন বলল, 'চল।'

একটু পর দু-জনে খানিকটা নির্জনতা দেখে বসার জন্য একটা গাছের ছায়

বেছে নিল। বসেও কিছুক্ষণ চুপ করে রইল তারা।

সেই দুপুরবেলা গণেশ ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। এখন প্রায় সন্ধ্যে।

একসময় দোলনই স্তব্ধতা ভাঙল, 'কি চুপ করে আছ কেন? জরুরী কাজের নাম করে তো খুব ডেকে আনলে। সে কি পাশে বসে আমার সঙ্গসুধা উপভোগ করার জন্যে?'

কথাটা যেন শুনতেই পায় নি এমন ভঙ্গিতে রাজেশ বলল, 'আচ্ছা দোলন, তোমাদের কি সত্যি সত্যিই ধারণা বাবাকে নির্বাচনে হারানো উচিত?'

স্থির নিবদ্ধ দৃষ্টিতে রাজেশের দিকে তাকিয়ে দোলন বলল, 'তুমি কি রসালাপ করার জন্য আমাকে এখানে ডেকে এনেছ?'

'মোটেও না। আমার প্রশ্নটা খুবই সীরিয়াস।'

দোলন এবার চিৎকার করে উঠল, 'না-ই যদি হারাতে চাইব তা হলে এই সব মীটিঙ, বক্তৃতার ব্যবস্থা কেন? কেনই বা দিনরাত আমরা পরিশ্রম করে চলেছি?'

'কিন্তু আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, তোমরা বাবাকে হারাতে চাও না।'

'তোমার মনে হওয়ার কারণ?'

'একটু আগে তোমার লেকচার শুনছিলাম। বাবার বিরুদ্ধে যা যা তুমি বললে, তাতে কিছুই হবে না। এ সব কথা রানীপুরের সবাই জানে। যদি তাঁকে হারাতে চাও আরো জোরালো আঘাত দিতে হবে।'

'জোরালো আঘাত!' দোলন এবার কিছুটা হতবাক।

'হ্যাঁ।' ঘোরের মধ্য থেকে রাজেশ বলে উঠল, 'তোমার কাছে কাগজ-কলম আছে?'

'আছে।'

'বার কর। তারপর আমি যা বলছি লিখে নাও।'

দোলন যেন কিছুটা বিভ্রান্তই বোধ করল। তার সঙ্গে সর্বক্ষণই একটা ঝোলা থাকে। শ্রীনিকেতনী ঝোলাটার ভেতর থেকে খাতা এবং পেন বার করে সে উন্মুখ হল।

'লেখ—'আচ্ছন্নের মত, মরিয়ার মত, এরপর রাজেশ বলে যেতে লাগল। শ্রমিকদের বোনাস নিয়ে বিরোধ থেকে স্মাগলিং, ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি, স্ত্রীলোকের ব্যবসা এবং সেই মেয়েটির আত্মহত্যা পর্যন্ত বক্র কুটিল পথের দুপাশে যে অন্ধকারের মেলা ভবেশ সাজিয়ে রেখেছেন—কিছু বাদ দিল না সে।

লিখতে লিখতে দোলন স্তম্ভিত। মনে হল, একটা দুঃস্বপ্নের অতলে ধীরে ধীরে রাজেশ তাকে ডুবিয়ে দিচ্ছে। শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসছে তার। এতকাল ভবেশ চরিত্রের কতটুকুই বা জানা ছিল!

একসময় লেখা থামিয়ে দিল দোলন। আর লিখতে পারছে না সে। তার সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে ধস নামতে শুরু করেছে যেন। ভবেশ সম্বন্ধে এতদিন তার জ্ঞান ছিল ভাসা ভাসা, রাজেশ নামে এই ছেলেটিকেই বা কতটুকু চিনতে

পেরেছিল। এতদিন শ্লেষে, বিদ্রূপে আর নিষ্ঠুর আঘাতে বার বার তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে সে। ভেবেছে, ভবেশের ছেলে ভবেশেরই প্রতিরূপ হবে। কিন্তু তার ধারণাটার মধ্যে এতবড় একটা ভুল ছিল, কে তা জানত। ধীরে ধীরে রাজেশের দিকে তাকাল দোলন। তার চোখের দৃষ্টি কোমল হয়ে গেছে, সমস্ত মুখখানা জুড়ে বিস্ময় দুলছে। রাজেশকে এতকাল যা ভেবে এসেছে অতর্কিতে তার বিপরীত রূপে তাকে আবিষ্কার করে দোলনের বিস্ময় যত, আনন্দও তার বিন্দুমাত্র কম নয়। তাকিয়ে আছে দোলন, তাকিয়েই আছে, তাকিয়েই আছে।

এদিকে দোলন লিখছে কি লিখছে না, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই রাজেশের। অন্ধের মত সে বলে যাচ্ছে, 'এই লোকটার একদিন ছিল স্ত্রীলোকের তৃষ্ণা, তারপর হল অর্থের তৃষ্ণা। এখন হয়েছে ক্ষমতার তৃষ্ণা—'

দোলন ফিসফিসিয়ে বলে উঠল, 'নিজের বাবার বিরুদ্ধে এ-সব তুমি কী বলছ রাজুদা—'

'ঠিকই বলছি। তাঁর মারণাস্ত্র তোমার হাতে তুলে দিলাম।' বলতে বলতে হঠাৎ যেন মনের সমস্ত ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল রাজেশ। উন্মাদের মত দোলনের একটি হাত ধরে সে গোঙাতে লাগল, 'আমি আর পারছি না দোলন। বাবা ক্ষমতার পেছনে ছুটেছেন, সে *জন্য* তাঁর সমস্ত পাপের অছি সাজতে হয়েছে আমাকে। প্রতিদিন একটু একটু করে বাবা আমাকে বলি দিচ্ছেন। যেমন করে পার তোমরা ওঁকে হারাও।' বলতে বলতে হঠাৎ উঠে পড়ে হাঁটতে সুরু করল।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল দোলন। ডাকল, 'রাজুদা—রাজুদা—'

রাজেশ সাড়া দিল না, ফিরেও তাকাল না। টলতে টলতে এগিয়ে চলল।

আর স্তব্ধ নিশ্চল একটা মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল দোলন।

তিন দিন পর।

রাতের তৃতীয় যামে ঘরময় অস্থির পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল রাজেশ। কিছুদিন ধরেই রাত্রিবেলায় তার চোখে ঘুম নেই। যাই হোক, হঠাৎ দরজায় টোকা পড়ল।

রাজেশ বলল, 'কে?'

বাইরে থেকে সাড়া এল, 'আমি দরজা খোল।'

স্বরটা ঘনিষ্ঠভাবে চেনা। চকিত রাজেশ দরজা খুলে দেখল, ভবেশ দাঁড়িয়ে আছেন। বলল, 'এ কি, আপনি এত রাত্রে!'

ভবেশ আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকলেন। বললেন, 'রানীপুরের সব লোক জানে এ বাড়ির সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই। দিনের বেলা তাদের চোখের ওপর দিয়ে ঢুকতে তো পারি না। তাই রাতই বেছে নিতে হয়েছে।'

একটু চুপচাপ।

তারপর ভবেশই স্তব্ধতা ভেঙে ডেকে উঠলেন, 'রাজু—'

তাঁর স্বরের মধ্যে এমন কিছু ছিল যাতে রাজেশ চমকে উঠল। ভবেশের চোখের দিকে তাকাতেই তার মনে হল, দৃষ্টিটা ফাঁদে আটকে গেছে। ভবেশের

চোয়াল কঠিন, চোখ আরক্ত, ঠোঁট ফাঁক হয়ে দুটি দাঁত বেরিয়ে পড়েছে ভেতরে নিহিত কি এক অসহ্য উত্তেজনায় চিবুকটা আর কণ্ঠের কাছের মাংস অল্প অল্প কাঁপছে।

রাজেশের অস্তিত্বের গহনে শঙ্কার ছায়া পড়ল। শিথিল সুরে সে বলল, 'কী বলছেন ?'

ভবেশ বললেন, 'এ-সবের মানে কি !'

'কোন সবের ?'

একটা ইস্তাহার জাতীয় ছাপা কাগজ ছেলের দিকে এগিয়ে দিয়ে ভবেশ বললেন, 'এটা পড়—'

নিঃশব্দে কাগজটা নিয়ে পড়তে লাগল রাজেশ। সেদিন, দোকানকে যা যা সে বলে এসেছিল প্রায় সবই কাগজটায় ছাপা আছে। নিচে কোন নাম নেই।

পড়া শেষ হলে রাজেশ সমস্ত ভঙ্গিতে মুখ তুলল। ভবেশ বললেন, 'এ সব খবর তো ওদের জানবার কথা না। জানল কী করে ? তুই বলেছিস ?'

রাজেশ নিশ্চুপ।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন ভবেশ, 'এই জন্যেই—এই জন্যেই কি বিশ্বাস করে নিজের সব কিছু তোকে দিয়েছিলাম ? সব দিক দেখিয়ে দিয়েছিলাম ?'

রাজেশ এবারও কিছু বলল না।

ভবেশ আর কোন প্রশ্ন করলেন না। কিছুক্ষণ ক্ষিপ্তের মত ঘরময় পায়চারি করে এক সময় ছেলের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন 'নেভির চাকরিটা এখনও আছে ?'

এবার মুখ খুলল রাজেশ, 'আছে।'

'এক কাজ কর বরং। মাস ছয়েকের জন্যে একটা ভয়েজ দিয়ে আয়।'

রাজেশ চকিত হয়ে উঠল, 'আপনি আমাকে চলে যেতে বলছেন !'

স্পষ্ট জড়তাহীন স্বরে ভবেশ বললেন, 'হ্যাঁ। তোর জন্যেই ইতিমধ্যেই আমার অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। আর কিছুদিন তুই এখানে থাকলে আমাকে আর ইলেকসানে জিততে হবে না।'

রাজেশ নির্বাক। শুধু স্তম্ভিত বিস্ময়ে ভবেশের দিকে তাকিয়ে রইল সে।

ভবেশ আবার বললেন, 'যে কটা দিন ভয়েজের জন্যে জাহাজ না পাস, চাঁপদানিতে তোর মামাদের ওখানে গিয়ে থাকবি। আমার ইচ্ছে, কালই তুই চলে যা।'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না রাজেশ। অনেকক্ষণ ধরে ভাবল সে। ভাবল, এই ভাল। এভাবে বুকের ভেতর অসহ্য অনড় যন্ত্রণা নিয়ে জীবন কাটাবার চাইতে চলে যাওয়াই পরম স্বস্তির। এক সময় বলল, 'বেশ, কালই যাব। কিন্তু ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টগুলো আমার নামে আছে। ও ছাড়া ধানকল আর কেমিক্যাল ফ্যাক্টরির ম্যানেজিং ডিরেক্টরও আমিই। ওসব—'

বাধা দিয়ে ভবেশ বললেন, 'ও-সব নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না।'

পরের দিন সকালেই রানীপুর ছেড়ে চলল রাজেশ। আপাতত চাঁপদানি যাবে সে; সেখান থেকে সমুদ্রে।

রানীপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ডিসট্যাণ্ট সিগন্যালটার দিকে এই মুহূর্তে তাকিয়ে আছে রাজেশ। ট্রেন আসতে এখনও আধঘণ্টা দেরি। সিগন্যালটাই যেন দেখছিল না সে! সেটা পেরিয়ে তার দৃষ্টি অনেক—অনেকদূর বিলীন হয়ে গেছে।

দশ বছর আগের একটা দিনের কথা ভাবছিল রাজেশ। সেদিন চোখের জলে বুক ভাসিয়ে এই স্টেশন থেকেই চাঁপদানির ট্রেন ধরেছিল সে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, আর কোনদিন রানীপুরে ফিরবে না। তবু তাকে ফিরতে হয়েছিল। ভবেশই ফিরিয়ে এনেছিলেন।

রাজেশ জানে, কয়েকমাস রানীপুরে কাটিয়ে আজ যে সে চলেছে—এই তার শেষ যাওয়া। আর কোনদিন কোন ছলেই ভবেশ তাকে ফেরাতে পারবেন না।

কাল রাত্রে যে কথা সে ভেবেছিল, এই মুহূর্তে সেগুলো মনে পড়ছে। এই ভাল—এখান থেকে চলে যেতে পারলেই তার মুক্তি। ভবেশের ফাঁদ থেকে সে যে বেরিয়ে আসতে পেরেছে, এতেই অত্যন্ত হাল্কা বোধ করতে লাগল রাজেশ।

ভবেশের কথা ভাবতে ভাবতে কখন যেন ডিসট্যাণ্ট সিগন্যালটা ডাউন হয়ে গেছে। দু-চার মিনিটের মধ্যেই আপ লোকাল ট্রেনটা এসে পড়বে। তারপরে রানীপুরের সঙ্গে চিরদিনের মত সম্পর্ক শেষ।

অতর্কিতে—নিজের একান্ত অজ্ঞাতসারে সেই মেয়েটির মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠল। সেই মেয়েটি—সেই শ্লেষ-বিদ্রূপময়ী দোলন। দোলনের পাশে আরেকটি মুখও যেন ফুটে উঠছে। সে মুখ বিভাদেবীর। সঙ্গে সঙ্গে সত্তার গহন কেন্দ্রে কেমন যেন অস্থিরতা অনুভব করল রাজেশ। সেই অস্থিরতাটা সত্তার একটি বিন্দু থেকে ধীরে ধীরে চেতনা আর অবচেতনার সকল দিকে ঢেউ-মত ছড়িয়ে পড়তে লাগল। রাজেশ ভাবল, যাবার সময় তাদের সঙ্গে দেখা করা তো হল না।

এদিকে ডিসট্যাণ্ট সিগন্যালের তলায় কালো একটা বিন্দুর মত ট্রেনটা দেখা দিয়েছে। দেখতে দেখতে ট্রেনটা প্ল্যাটফর্মে এসে থামল।

স্খলিত পায়ে একটা থার্ডক্লাস কামরার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল রাজেশ; কিন্তু ওঠা আর হল না। হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন হাত ধরল। চমকে পেছন ফিরে রাজেশ হতবাক! বিভাদেবী আর দোলন দাঁড়িয়ে আছে।

কাঁপা গলায় বিভাদেবী বললেন, 'এভাবে তোমার চলে যাওয়া হতে পারে না বাবা।'

বিমূঢ়ের মত রাজেশ বলল, 'কিন্তু—'

'কী ?'

'আমি যে চলে যাচ্ছি, সে-খবর আপনারা কোথায় পেলেন ?'

'ভোলা দিয়েছে। তোমার ওপর নজর রাখতে বলেছিলাম তাকে। প্রতিটি দিন তোমার কিভাবে কাটত, প্রতিটি রাত না ঘুমিয়ে কেমন করে জেগে থাকতে —সব খবর ভোলা আমাকে দিত। কাল রাত্রে তোমার বাবা রানীপুর ছেড়ে তোমাকে চলে যেতে বলেছেন আর এই ট্রেনেই তুমি যাচ্ছ—সে কথাও সে আমাকে বলেছে। কিন্তু রাজেশ দশ বছর আগে আমার ওপর অভিমান করে তুমি চলে গিয়েছিলে। আজ কার ওপর অভিমান করে যাচ্ছ ?'

উদাসীন মুখে রাজেশ বলল, 'কারো ওপরেই না।'

বিভাদেবী বললেন, 'তবে চলে যাচ্ছ কেন ?'

'এমনই। রনীপুরের কেউ বোধহয় আমাকে চায় না।'

'চায় কি না চায়, কোনদিন যাচাই করে দেখেছ ? তাকিয়েছ আমার প্রাণটার দিকে কোনদিন ? দশ বছর ধরে কার—কার আশায় আমি বসে আছি!' বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন বিভাদেবী। একটুক্ষণ মাত্র। তারপরেই একটা কাণ্ড করে বসলেন। দোলনের মুখটা রাজেশের দিকে ফিরিয়ে বললেন, 'তুই রানীপুরে থাকিস, তা এই মেয়েটা চায় কি না চায়—ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা কর।'

বিস্মিত চকিত বিভ্রান্ত রাজেশ দোলনের মুখের দিকে তাকাল। নাঃ, সে মুখে শ্লেষ বিদ্রূপের চিহ্নমাত্র নেই। শুধু বিচিত্র এক আকুলতা আলোছায়ার মত দোল খাচ্ছে।

এদিকে বিভাদেবী সমানে বলে যাচ্ছেন, 'সেদিন তুই ওকে তোর বাবার সব কথা বলেছিস। কী আত্মগ্লানির মধ্যে তাঁর পাপের দায় মাথায় নিয়ে দিন কাটাচ্ছিলি, তা-ও জানিয়েছিস। সে সব ও আমাকে বলেছে। এতকাল তোর সম্বন্ধে দোলনের একটা ভুল ধারণা ছিল। সেদিনের ঐ কথাগুলোতে সে ধারণা তার কেটে গেছে। তোকে ও অনেক আঘাত দিয়েছে, আমি জানি। কাছে গেলে তোকে সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এ সব করেছে ভুল ধারণাটার বশে। আমি শুনেছি তোর মা মারা গেলে সেই ছেলে বয়সে দোলন ছাদের ঘর থেকে তোর হাত ধরে নামিয়ে এনেছিল। একটু চেয়ে ভাখ রাজেশ, সেই মেয়েটার সেই প্রাণটা এখনও তেমনি আছে।' একটু থেমে বললেন, 'কাল রাতে দোলন আমার ওখানেই ছিল। আজ ভোলা তোর চলে যাবার খবর দেওয়ামাত্র ওর মুখখানা যা হয়ে গিয়েছিল—'

রাজেশ দোলনের মুখের দিকে তাকিয়েই আছে, তাকিয়েই আছে, তাকিয়েই আছে। তার অগোচরে কখন যে আপ লোকাল ট্রেনটা স্টেশন ছেড়ে চলে গেছে, খেয়াল নেই।

বিভাদেবী বললেন, 'চল্ এবার—'

দোলনের মুখ থেকে চোখ না সরিয়ে রাজেশ বলল, 'কোথায় ?'

'আমি তোকে যেখানে নিয়ে যাই।'

নাঃ, এই দুটি রমণী রাজেশকে রানীপুরের সীমানা পেরুতে দিল না।

একুশ

স্টেশন থেকে রাজেশকে সোজা নতুন পাড়ায় নিজের সেই একতলা বাড়িটিতে নিয়ে গেছেন বিভাদেবী। সেখানে তাঁর কাছেই আছে সে।

সারাদিন বাড়িতেই থাকে রাজেশ। কদাচিৎ এক আধবার বাইরে বেরোয় কি বেরোয় না।

এদিকে দোলন প্রতিদিনই বার তিন চারেক এ-বাড়িতে আসে। রাজেশের সঙ্গে, বিভাদেবীর সঙ্গে গল্প করে চলে যায়। কথাবার্তার বেশীর ভাগ অংশ জুড়ে যা থাকে তা হল, আসন্ন সাধারণ নির্বাচন।

দশ বছর পর রানীপুরে প্রথম প্রথম—প্রথম প্রথম কেন, এই সেদিন পর্যন্ত যে তীক্ষ্ণভাষিণী কঠিনা মেয়েটিকে সে দেখেছিল তাকে যেন আর চেনাই যায় না। আজকের তরুণীটি হাসিতে-গল্প-পরিহাসে আর প্রাণবন্ত উচ্ছ্বাসে বহুকাল আগের বালিকা দোলন হয়ে গেছে যেন।

আর যত দিন যাচ্ছে স্নেহের সহস্র বন্ধনে রাজেশকে ঘিরে ফেলতে শুরু করেছেন বিভাদেবী।

এইভাবে তিনটে দিন কেটে গেল।

এদিকে নির্বাচনী প্রচার আরো প্রবল হয়ে উঠেছে। উচ্চকণ্ঠ লাউডস্পীকার-গুলোর চিৎকারে কানের পর্দা ফেটে যাবার উপক্রম। দিবারাত্রি এই তারস্বর চিৎকারের মধ্যে যাঁর নামটা সব চাইতে বেশি করে শোনা যায় তিনি ভবেশ।

দোলনরা ভবেশের অন্ধকার দিকগুলি সম্বন্ধে প্যাম্ফ্লেট ছাপিয়ে সারা রানীপুর ছড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তাতে খুব বেশি কাজ হয় নি। সামান্য একটু বুদ্বুদ উঠেই রানীপুরের সরোবর আবার স্থির হয়ে গেছে। নামস্বাক্ষর হীন প্যাম্ফ্লেটগুলোকে নির্বাচনের সময়কার কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি বলেই লোকে ধরে নিয়েছিল। ভবেশ কৃচ্ছ্রসাধনের ভেক ধরে, মধুর হাসির সদাব্রত খুলে দিয়ে, রাস্তাঘাট সারিয়ে, যেখানে আলো ছিল না সেখানে দেয়ালী সাজিয়ে

আর বেকার ছেলেদের রানীপুরের কারখানায় চাকরি যোগাড় করে দিয়ে নিজের স্বপক্ষে পাল্লাটাকে এত ভারি করে রেখেছেন যার কাছে প্যামফ্লেটের কুৎসার ওজন প্রায় নগণ্যই।

আগামী নির্বাচনে ভবেশের জয় প্রায় সুনিশ্চিত। দিন যত এগিয়ে আসছে ভবেশের বিরুদ্ধপক্ষ, বিশেষ করে দোলনরা ততই হতাশ হয়ে পড়ছে।

যাই হোক, একদিন সকালে বিভাদেবী বললেন, 'তোর সঙ্গে একটা ব্যাপারে আমাকে বোঝাপড়া করতে হবে রাজেশ।'

সেদিন স্টেশনে আবেগের মুখে সেই যে 'তুই' বলা শুরু করেছিলেন বিভাদেবী, সে সম্বোধনটা আর বদলান নি। বোঝাপড়ার কথায় রাজেশ কিন্তু চকিত হয়ে উঠল। বলল, 'কি ব্যাপারে?'

'পাঁচ বছর আগে তোরই মত একদিন আমার নামে সব লিখে দিয়ে, নিজের সব পাপ আমার মাথায় চাপিয়ে নির্বাচনে নামতে চেয়েছিলেন তোর বাবা। আমি সে পাপের দায় নিতে চাইনি বলে সংসার থেকে আমাকে সরে আসতে হয়েছে।'

বিভাদেবীর সঙ্গে ভবেশের বিচ্ছেদের কারণটা এতদিনে যেন পরিষ্কার হল রাজেশের কাছে। সে তাকিয়েই রইল।

বিভাদেবী আবার বললেন, 'সেদিন আমাকে দিয়ে পারেন নি। তাই পাঁচ বছর পর তোকে শিকার করতে চেয়েছেন। কিন্তু তোকেও ধরে রাখতে পারেন নি। এই দিক থেকে তোর আর আমার মধ্যে সাঙ্ঘাতিক মিল। তোর বাবাকে দিয়ে আমরা কেউ সুখী না।' একটু থেমে পরক্ষণেই শুরু করলেন, 'ছাখ, রাজনীতি আমি বুঝি না। তবে জীবনের অন্য কিছু কিছু নীতি বুঝি। তাই বলছিলাম—'

ঠিক এইসময় দোলন এসে ঘরে ঢুকল। ইশারায় তাকে বসার নির্দেশ দিয়ে বিভাদেবী বললেন, 'তোর বাবার মত মানুষ নির্বাচিত হলে রানীপুরের খুব ক্ষতি। যে মানুষ নিজের স্ত্রী এবং সন্তানকে সুখী করতে পারে না, দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের কল্যাণ সে কি করে করবে? তা ছাড়া---'দেশের সেবার জন্য নয়, ক্ষমতার লোভেই রাজনীতিতে নেমেছেন তোর বাবা। সমস্ত জীবন তিনি অন্যায় করেছেন, পাপ করেছেন। এর ওপর রাজনৈতিক ক্ষমতা যদি হাতে পান কি সাঙ্ঘাতিক হয়ে উঠবেন, ভাবতে পারিস। না, রাজু, না—তোর বাবাকে কিছুতেই নির্বাচনে জিততে দেওয়া হবে না।'

'তাঁকে হারাবেন কি করে?'

রাজেশের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বিভাদেবী বললেন, 'রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে পেলে তোর বাবা যত অন্যায় করবেন স্ত্রী হিসেবে সন্তান হিসেবে তার

গ্লানি আমাদের ওপরও এসে পড়বে বাবা। তোর বাবার ওপর আমাদের যদি এতটুকুও ভালবাসা থাকে নির্বাচন থেকে তাঁকে নিশ্চয়ই ফেরাতে হবে।'

'কিন্তু কি-ভাবে?'

'একটি মাত্র পথ খোলা আছে।'

'পথটা কী?'

রাজেশের দিকে একবার তাকিয়েই অন্য দিকে মুখ ফেরালেন বিভাদেবী। তারপর স্খলিত স্বরে বললেন,—'সে কথা তোকে বলতে সাহস পাচ্ছি না। আবার না বললেও নয়।'

রাজেশ আর কিছু বলল না। বিভাদেবীর বলার জন্য প্রতীক্ষা করে রইল।

অনেক, অনেকক্ষণ পর আবার ফিরে দাঁড়ালেন বিভাদেবী। এবার তাঁর দিকে তাকিয়ে রাজেশের সমস্ত চেতনা চকিত হয়ে উঠল। এই মুহূর্তে একটা শিখার মত মনে হচ্ছে বিভাদেবীকে। চোখ জ্বলছে, মুখ জ্বলছে, তাঁর সর্বাঙ্গ ঘিরে আগুনেরই যেন একটা বেষ্টনী। নির্মম স্বরে তিনি বললেন, 'তোর বাবাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই।'

স্নায়ুর মধ্যে প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেল যেন রাজেশ, 'পুলিশের হাতে!'

'হ্যাঁ।' বিভাদেবী বলতে লাগলেন, 'রানীপুরের থানাকে দিয়ে হবে না। আমাদের যেতে হবে কলকাতায়। সেখানে পুলিশের উঁচু মহলে যোগাযোগ করতে হবে। আরেকটা কথা, আমরা যে পুলিশে এ খবর দিচ্ছি কোনমতেই যেন তোর বাবা জানতে না পারেন। তা হলে সাবধান হয়ে যাবেন।'

রাজেশ কিছুই শুনতে পাচ্ছে না, কিছুই বুঝতে পারছে না। তার সামনে থেকে সব কিছু যেন বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

বিভাদেবী বলতে লাগলেন, 'যে সব অপরাধ উনি করেছেন তাতে তিন চার বছর জেল নিশ্চয়ই হয়ে যাবে। সে প্রায়শ্চিত্ত ওঁর দরকার। তারপর আগুনে পুড়ে শুদ্ধ হয়ে তিনি যখন ফিরে আসবেন তখন আমরাই তাঁকে মাথায় করে রাখব।'

রাজেশ এবারও যেন কিছু বুঝতে পারছে না।

কি একটু ভেবে বিভাদেবী আবার বললেন, 'পাঁচ বছর আগে আমার নামে সব লিখে দিয়ে এমন সব দলিল আমার হাতে তোর বাবা তুলে দিয়েছিলেন যাতে অনায়াসেই তাঁকে জেলে পাঠাতে পারতাম। পারিনি শুধু তোর কথা ভেবে। ভেবেছি, যদি কোনদিন ফিরে এসে তুই কৈফিয়ত চাস, বলিস, কেন আমাকে না জানিয়ে বাবাকে জেলে পাঠিয়েছ, সেদিন কি কৈফিয়ৎ দেব? তাই আজকের এই দিনটার আশায় বসে থাকতে হয়েছে। এ কি রাজু, তুই যে কিছুই বলছিস না বাবা। এতে কি তুই রাজী না?'

স্খলিত স্বরে রাজেশ বলল, 'এখন আমি কিছুই ভাবতে পারছি না। দিন আমাকে সময় দিন।'

দুটো দিন আচ্ছন্ন উদ্‌ভ্রান্তের মত বসে বসে শুধু ভাবল রাজেশ। শৈশবের শুরু থেকে এ পর্যন্ত সমস্ত ইতিহাসটাই বায়োস্কোপের পর্দার মত চোখের সামনে ফুটে উঠল। ঠাকুরদার কথা ভাবল সে, পিসির কথা ভাবল, ভবেশের জীবনের আদিগন্ত অন্ধকারের কথা ভাবল। অবশেষে তার মনে পড়ল মায়ের কথা। মা---তার নিজের মা।

এতটুকু প্রতিবাদ না করে ভবেশের অনাদর উপেক্ষা-অন্যায় আর পশুত্বের মধ্যে একটু একটু করে নিজেকে আহুতি দিয়েছেন মা। তিলে তিলে মরে গেছেন কিন্তু স্বামীর বিবেকহীনতার বিরুদ্ধে একটা আঙুলও কোনদিন তোলেন নি। সেদিন যদি ভবেশকে তিনি বাধা দিতেন, হয়তো ভবেশের জীবন ঘিরে এত অতলস্পর্শ অন্ধকার নামত না।

কিন্তু বিভাদেবী! অগ্নিরূপিণী এই মহিলা স্ত্রী হয়েও ভবেশের অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন।

দুদিন পর নিজের বিবেককে নিরঙ্কুশ করে ফেলল রাজেশ। বিভাদেবীর সামনে গিয়ে বলল, 'আপনি যা বলেছেন তাতে আমি রাজী।'

বাইশ

এর পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত।

কলকাতায় উঁচু পুলিশ মহল অতর্কিতে হানা দিয়ে ভবেশকে ধরে ফেলেছেন। রহমৎ সাহেবকে অবশ্য ধরা যায় নি সীমান্তের ওপারে তিনি ফেরার হয়েছেন। তবে পাচারের জন্য চাল-ডাল-ওষুধ কাপড় যে গুদামে মজুত করা হত সেটা আবিষ্কৃত হয়েছে। সেখানে হাজার কয়েক টাকার বিদেশী নোট আর ভবেশের সঙ্গে রহমৎ সাহেবের ব্যবসা সংক্রান্ত মারাত্মক ক'টি চিঠি পাওয়া গেছে। পুবের পাড়ায় হানা দিয়ে মেনকাকে ধরা হয়েছে এবং অনেকগুলো বন্দিনী অসহায় মেয়েকে কলকাতায় নিয়ে উদ্ধারাশ্রমে পাঠানো হয়েছে। আর ধরা পড়েছে ইনকাম ট্যাক্সের কারচুপি-করা খাতাগুলো।

ভবেশ ধরা পড়ার পরের দিনই মর্মান্তিক খবর এল। নিদারুণ আঘাতটা সহ্য করতে না পেরে জেল-হাজতে তিনি আত্মহত্যা করেছেন।

দিন দুয়েক পর ভবেশের দেহ ভস্মীভূত করে রাজেশ, দোলন আর

বিভাদেবী নতুন পাড়ার সেই বাড়িটিতে ফিরে এলেন। বিভাদেবীর এখন বিধবার সাজ ; রাজেশের সাজ পিতৃদায়ের।

যতক্ষণ চিতা জ্বলছিল একটি কথাও বলেন নি[illegible]ভাদেবী ; নির্নিমেষে শুষ্ক নিস্প্রাণ একটা মূর্তির মত শুধু তাকিয়ে ছিলেন।

এখন বাড়ি ফিরে সেই শিখারূপিণী মহিলাটি হঠাৎ দু-হাতে মুখ ঢেকে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়লেন, 'এ আমি কি করলাম, ঝোঁকের মাথায় কি করে বসলাম—'

পাশে বসে ঝাপসা গলায় রাজেশ বলল,' কাঁদবেন না—কাঁদবেন না—'

বিভাদেবী উন্মত্তের মত মাথা নাড়তে লাগলেন, 'তোর কাছে যে আর কোন-দিনই আমি মুখ দেখাতে পারব না বাবা। তোর যে সর্বনাশ করে দিলাম।'

রাজেশের চোখও বাষ্পাচ্ছন্ন। সে বলতে লাগল, 'চুপ করুন—চুপ করুন—'

বিভাদেবী থামলেন না, 'আমি জানি, তুই কোনদিন আমাকে ক্ষমা করতে পারবি না।'

'ও-কথা বলতে নেই। এ ব্যাপারে আপনার দায় যতখানি আমার তার চাইতে কম নয়।'

বিভাদেবী কোন কথাই শুনলেন না। আপন মনে বলে যেতে লাগলেন, 'আমার যে আর কিছুই রইল না রাজু। সব গেল! উনি গেলেন, তুইও ঘৃণায় মুখ বাঁকিয়ে নিশ্চয়ই চলে যাবি। আমি স্বামীঘাতিনী!'

হঠাৎ আত্মবিস্মৃতির একটা ঘোর যেন রাজেশের সমস্ত সত্তার ওপর ভর করল। রুদ্ধ স্বরে সে বলল, 'কে বলে আপনার সব গেছে! আমি তো আছি। আপনাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না মা।'

'কী—কী বললি!' চকিতে মুখ থেকে হাত সরিয়ে বিভাদেবী তাকালেন। তাঁর প্লাবিত চোখে বিদ্যুৎ স্ফুরণের মত কি যেন খেলে গেল।

চোখ বুজে রাজেশ আবার বলল, 'মা'। বিভাদেবীকে এই তার প্রথম মা বলা।

মুখ দিয়ে শব্দ বেরুতে না বেরুতেই দু-হাতে রাজেশকে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন বিভাদেবী।

পাশে দাঁড়িয়ে ছিল দোলন। তার চোখও সজল। কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল সে। কিন্তু বুকের ভেতরটা এই মুহূর্তে তার এত উত্তাল যে স্বরটা বেরিয়ে আসার পথ পেল না।

এদিকে একটি তরঙ্গিত কোমল বুকের মাঝখানে মুখ রেখে রাজেশ অনুভব করল একদিন যাকে হারানো বলে মনে হয়েছিল আজ সেটাই কত বড় পাওনা হয়ে ফিরে এসেছে।